সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৯তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
থেকে
সূরা আল ক্বামার

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহিদুল্লাহ এফ. বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১৯তম খন্ড সূরা আল আহকাফ থেকে সূরা আল ক্বামার)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১বি ২কিউডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৬

৮ম সংস্করণ
মহররম ১৪৩১ জানুয়ারী ২০১০ পৌষ ১৪১৬

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকামাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
19th Volume
(Sura Al Ahqaf to Sura Al Qamar)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka.
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition
1996
8th Edition
Moharram 1431 January 2010
Price Tk. 200 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-05-7

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমান যমীন, চাঁদ সুরুজ, মহাদেশ মহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তাঁর নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?

কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়
এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আলামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

এই খন্ডে যা আছে

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়— হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত— এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'—এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'—'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি—তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❏ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❏ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

সূরা আল আহকাফ

আয়াত ৩৫ রুকু ৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حٰمٓ ۚ ﴿۱﴾ تَنۡزِیۡلُ الۡکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَکِیۡمِ ﴿۲﴾ مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا عَمَّاۤ اُنۡذِرُوۡا مُعۡرِضُوۡنَ ﴿۳﴾ قُلۡ اَرَءَیۡتُمۡ مَّا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَرُوۡنِیۡ مَاذَا خَلَقُوۡا مِنَ الۡاَرۡضِ اَمۡ لَهُمۡ شِرۡکٌ فِی السَّمٰوٰتِ ؕ اِیۡتُوۡنِیۡ بِکِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ هٰذَاۤ اَوۡ اَثٰرَۃٍ مِّنۡ عِلۡمٍ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۴﴾ وَ مَنۡ اَضَلُّ مِمَّنۡ یَّدۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَنۡ لَّا یَسۡتَجِیۡبُ لَهٗۤ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ وَ هُمۡ عَنۡ دُعَآئِهِمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۵﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হা, মীম, ২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কেতাব (আল কোরআন)-এর অবতরণ, (যিনি) মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ৩. আকাশমন্ডলী ও যমীন এবং তাদের উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে আমি যথাযথ (লক্ষ্য) ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং (এগুলো) এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (পয়দা করেছি), (কিন্তু এ মহাসত্যের) অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা— যে যে জিনিস দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কখনো কি (ভেবে) দেখেছো, (আজ) যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকছো— আমাকে একটু দেখাও তো, তারা এ যমীনের কোনো অংশও কি নিজেরা বানিয়েছে, অথবা এ আকাশমন্ডলী বানানোর কাজে তাদের কি কোনো ভূমিকা আছে? এর আগের কেতাবপত্র কিংবা সে সূত্র ধরে চলে আসা জ্ঞানের (অন্য) কোনো অবশিষ্ট প্রমাণ যদি তোমাদের হাতে মজুদ থাকে, তাহলে তাও এনে আমার কাছে হাযির করো— যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ৫. তার চাইতে বেশী বিভ্রান্ত ব্যক্তি কে হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কেয়ামত পর্যন্ত (ডাকলেও) তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তারা তো তাদের (ভক্তদের) ডাক থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَـَٔامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ۝

৬. যখন গোটা মানব জাতিকে জড়ো করা হবে, তখন এরা তাদের দুশমনে পরিণত হয়ে যাবে এবং এরা তাদের এবাদাতও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে। ৭. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন কাফেররা সে সত্য সম্পর্কে বলে, যা তখন তাদের সামনে এসে গেছে– এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু! ৮. তারা কি একথা বলতে চায়, সে (রসূল) নিজেই তা বানিয়ে নিয়েছে; তুমি তাদের বলো, (হাঁ) সত্যিই যদি এমন কিছু আমি (আল্লাহর নামে) বানিয়ে পেশ করি, তাহলে আল্লাহর (ক্রোধ) থেকে আমার (বাঁচানোর) জন্যে তোমরা তো কোনো ক্ষমতাই রাখো না; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তোমরা তার মধ্যে কি কি কথা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বলছো এবং তোমাদের ও আমার মাঝে (কে কথা বানাচ্ছে; এ কথার) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৯. তুমি বলো, রসূলদের মাঝে আমি তো নতুন নই, আমি এও জানি না, আমার সাথে কি (ধরনের আচরণ) করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী (ব্যবহার করা) হবে; আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়, আর আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই। ১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো, এ (মহাগ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহর কাছ থেকে (নাযিল) হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অস্বীকার করো (তাহলে এর পরিণাম কি হবে)– এবং এর ওপর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী যেখানে সাক্ষ্য প্রদান করে তার ওপর ঈমান এনেছে, (তারপরও) তোমরা অহংকার করলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ، وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ، وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ، حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ، حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ

রুকু ২

১১. যারা অস্বীকার করেছে তারা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে, যদি (ঈমান আনার মাঝে) সত্যিই কোনো কল্যাণ থাকতো তাহলে (কতিপয় সাধারণ মানুষ) আমাদের আগে তার দিকে এগিয়ে যেতো না, যেহেতু এরা নিজেরা কখনো পথের কোনো দিশা পায়নি, তাই অচিরেই তারা বলতে শুরু করবে, এ তো হচ্ছে একটি পুরনো (ও মিথ্যা) অপবাদ! ১২. এর আগে (মানুষদের) পথপ্রদর্শক ও (আল্লাহর) রহমত হিসেবে মূসার কেতাব (তাদের কাছে মজুদ) ছিলো; আর এ কেতাব তো পূর্ববর্তী কেতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (এটা এসেছে) আরবী ভাষায়, যেন তা সীমালংঘনকারীদের সাবধান করে দিতে এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্যে তা হতে পারে সুসংবাদ। ১৩. যেসব মানুষ (একথা) বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের একমাত্র মালিক, অতপর তারা (এর ওপর) অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের জন্যে নিসন্দেহে কোনো ভয় শংকা নেই এবং তাদের (কখনো) উদ্বিগ্নও হতে হবে না, ১৪. তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, এ হচ্ছে তাদের সেই কাজের পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে। ১৫. আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে; (কেননা) তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে এবং (এভাবে) তার গর্ভধারণকালে ও (জন্মের পর) তাকে দুধ পান করানোর (দীর্ঘ) তিরিশটি মাস সময়; অতপর সে তার পূর্ণ শক্তি (অর্জনের বয়েস) পর্যন্ত পৌঁছয় এবং (একদিন) সে চল্লিশ বছরে এসে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার মালিক, এবার তুমি আমাকে সামর্থ দাও– তুমি আমার ওপর (শুরু থেকে) যেসব অনুগ্রহ করে এসেছো এবং আমার পিতা

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ
الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ
أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا
يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ
دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ

মাতার ওপর যে অনুগ্রহ তুমি করেছো, আমি যেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, (সর্বোপরি) আমি যেন (এমন সব) ভালো কাজ করতে পারি যার ফলে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে, আমার সন্তান-সন্ততিদের মাঝেও তুমি সংশোধন এনে দাও; অবশ্যই আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি, আমি তো তোমার অনুগত বান্দাদেরই একজন। ১৬. (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা (দুনিয়ায়) যেসব ভালো কাজ করে তা আমি (যথাযথভাবে) গ্রহণ করি, আর তাদের মন্দ কাজগুলো আমি উপেক্ষা করি, এরাই হবে (সেদিন) জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, এদের কাছে প্রদত্ত (আল্লাহর) ওয়াদা, যা সত্য প্রমাণিত হবে। ১৭. (তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা,) যে ব্যক্তি (নিজ) পিতা মাতাকে বলে, তোমাদের ধিক, তোমরা (উভয়ে কি) আমাকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করে আনা হবে, অথচ আমার আগে বহু সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদের একজনকেও কবর থেকে বের করে আনা হয়নি, এ কথা শুনে) পিতা মাতা উভয়েই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং (সন্তানকে) বলে, ওহে, তোমার দুর্ভোগ হোক! (এখনও সময় আছে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য (প্রমাণিত হবে, তারপরও) সে হতভাগা বলে, (হাঁ, তোমাদের) এসব কথা তো অতীতকালের কিছু উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়! ১৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর মানুষ ও জ্বিনদের পূর্ববর্তী দলের মতো আল্লাহর শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, এরা সবাই তাদের একই দলে শামিল হয়ে যাবে, আর এরা হচ্ছে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯. (এ উভয় দলের) প্রত্যেকের জন্যেই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী (মান ও) মর্যাদা রয়েছে, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজের যথার্থ বিনিময় দেবেন, আর তাদের ওপর (কোনো রকম) অবিচার করা হবে না। ২০. যেদিন

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ط اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ صلے وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ لا قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ

কাফেরদের (জাহান্নামের জ্বলন্ত) আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); তোমরা তো তোমাদের (ভাগের) যাবতীয় নেয়ামত (দুনিয়াতেই) বিনষ্ট করে এসেছো এবং তোমাদের পার্থিব জীবনে তা দিয়ে (প্রচুর পরিমাণ) ফায়দাও তোমরা হাসিল করে নিয়েছো, আজ তোমাদের দেয়া হবে এক চরম অপমানকর আযাব, আর তা হচ্ছে (আল্লাহর) যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের বিদ্রোহমূলক কাজের শাস্তি।

রুকু ৩

২১. হে নবী, (এদের) তুমি আ'দ সম্প্রদায়ের (এক) ভাই (হুদ নবী)-র কাহিনী শোনাও; যে 'আহকাফ' উপত্যকায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের (আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখাচ্ছিলো, তার আগে পরেও আরো বহু সতর্ককারী (নবী) এসেছিলো, (তাদের মতো) সেও বলেছিলো (হে মানুষ), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না; আমি তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি। ২২. (একথা শুনে) তারা বললো, আমাদের মাবুদদের বন্দেগী থেকে আমাদের ভিন্ন পথে চালিত করার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছো? যাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে সেই আযাব নিয়ে এসো যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের দিচ্ছো। ২৩. সে বললো, (সে) জ্ঞান তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই রয়েছে, আমি তো শুধু সে কথাটুকুই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই– (ঠিক) যেটুকু দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দারুণ অজ্ঞানতার মাঝে নিমজ্জিত একটি (গোমরাহ) জাতি। ২৪. অতপর (একদিন) যখন তারা দেখতে পেলো, (বড়ো) একটি মেঘখন্ড তাদের জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা (সমস্বরে) বলে ওঠলো, এ তো এক খন্ড মেঘ মাত্র! (সম্ভবত)

مُمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ

شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا

وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ

مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

আমাদের ওপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করবে; (হুদ বললো,) না, এটি কোনো বৃষ্টির মেঘ নয়– এ হচ্ছে সে (আযাবের) বিষয়, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে, (মূলত) এ হচ্ছে এক (প্রলয়ংকরী) ঝড়, যার মাঝে রয়েছে ভয়াবহ আযাব। ২৫. আল্লাহর নির্দেশে এ (ঝড়) সব কিছুই ধ্বংস করে দেবে, তারপর তাদের অবস্থা (সত্যিই) এমন হলো যে, তাদের বসতবাড়ী (ও তার ধ্বংসলীলা) ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না; আমি এভাবেই অপরাধী জাতিসমূহকে (তাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি। ২৬. (এ যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে) তাদের যা যা আমি দিয়েছিলাম তা (অনেক কিছুই) তোমাদের দেইনি; (শোনার জন্যে) আমি তাদের কান, (দেখার জন্যে) চোখ ও (অনুধাবনের জন্য) হৃদয় দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তাদের সে কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনোই কাজে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকলো, যে (আযাবের) বিষয় নিয়ে তারা হাসি তামাশা করতো, একদিন সত্যি সত্যিই তা তাদের ওপর এসে পড়লো।

রুকু ৪

২৭. তোমাদের চারপাশের আরো অনেকগুলো জনপদকে আমি (এ একই কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি (বার বার ওদের কাছে) আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, যেন তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে। ২৮. তারা কেন (সেদিন) তাদের সাহায্য করতে পারলো না, যাদের তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নৈকট্য হাসিলের জন্যে 'মাবুদ' বানিয়ে নিয়েছিলো; বরং (আযাব দেখে) তারাও তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেলো, (মূলত) এ হচ্ছে তাদের (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) মিথ্যা ও যাবতীয় অলীক ধারণা যা তারা পোষণ করতো!

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنْصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُونِهٖٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْـِۧيَ

২৯. (একবার) যখন একদল জ্বিনকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (তোমার) কোরআন (পাঠ) শোনছিলো, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগলো, সবাই চুপ হয়ে যাও, অতপর যখন (কোরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেলো তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আযাব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেলো। ৩০. তারা বললো, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (ও তার তেলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. হে আমাদের জাতি, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর (রসূলের) ওপর ঈমান আনো, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। ৩২. আর তোমাদের মাঝে যদি কেউ আল্লাহর পথের এ আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় (তবে তার জানা উচিত), এ যমীনে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দেয়ার কোনো রকম ক্ষমতাই সে রাখে না, (বরং এ আচরণের জন্যে) সে আল্লাহর কাছে তার কোনোই সাহায্যকারী পাবে না; এ ধরনের লোকেরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত। ৩৩. এ লোকগুলো কি এটা বুঝতে পারে না, যে মহান আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন বানিয়েছেন এবং এ সব কিছুর সৃষ্টি যাঁকে সামান্যতম ক্লান্তও করতে পারেনি, তিনি কি একবার মরে গেলে মানুষকে পুনরায় জীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম

الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

নন? হাঁ, অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান! ৩৪. সেসব কাফেরদের যখন (জ্বলন্ত) আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); আমার এ প্রতিশ্রুতি কি সত্য (ছিলো?) তারা বলবে, হাঁ আমাদের মালিকের শপথ (এটা অবশ্যই সত্য); অতপর তাদের বলা হবে, এবার (তোমরা) শাস্তি উপভোগ করো, (এবং এ হচ্ছে সে আযাব) যা তোমরা অস্বীকার করতে! ৩৫. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো– (ঠিক) যেমন করে ধৈর্য ধারণ করেছিলো আমার (দৃঢ়প্রতিষ্ঠ) সাহসী নবীরা, এ (নির্বোধ) ব্যক্তিদের ব্যাপারে তুমি কখনো তাড়াহুড়ো করো না; যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে– যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য এক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর কাউকে সেদিন ধ্বংস করা হবে না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হিজরতের আগে অবতীর্ণ এই সূরাটিতে সামগ্রিকভাবে ঈমান ও আকীদার বিষয় আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, এই সমগ্র সৃষ্টি জগতে যতো জীব ও জড় বিদ্যমান তাদের সকলের তিনি একমাত্র সর্বময় কর্তা, মালিক ও প্রভু প্রতিপালক, ওহী ও রেসালাত সত্য, হযরত মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল, তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়েছেন। হযরত মোহাম্মদের ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে তার পূর্ববর্তী কেতাবগুলোকে সত্য প্রতিপন্নকারী হিসাবে। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া অনিবার্য তার পরে পার্থিব জীবনে অর্জিত সকল কাজ ও উপার্জন এবং সকল ভালো ও মন্দ আচরণের হিসাব ও প্রতিফল লাভ অকাট্য ও অবধারিত। এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপনের আহবানই এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

এই প্রাথমিক আকীদা বিশ্বাসের ওপরই ইসলাম তার সমগ্র ইমারতের ভিত্তি গড়ে তোলে। এ কারণেই কোরআন তার প্রত্যেকটা মক্কী সূরায় এ বিষয়টাকে মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। এমনকি মুসলিম জাতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর মাদানী সূরাগুলোতে যখনই সে জীবন যাপনের কোনো বিধিবিধান বা নির্দেশ জারী করতে চেয়েছে, তখনও সে এই ঈমান ও আকীদা বিষয়ক মূলনীতিসমূহের ওপর নির্ভর করেছে। কেননা এই দ্বীনের প্রকৃতিই এরূপ যে, তা আল্লাহর একত্ব, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত এবং আখেরাতের হিসাব নিকাশ ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে তার যাবতীয় নিয়ম বিধি আইন কানুন, রীতিনীতির ভিত্তি, তার সবচেয়ে মযবুত যোগসূত্র ও তার সফল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস গণ্য করে। আর এই ঈমানের শাশ্বত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই ইসলামের সকল আইন কানুন, রীতিনীতি ও বিধিবিধান চিরঞ্জীব, চিরউদ্দীপ্ত ও চির উষ্ণ থাকে।

সূরা আল আহকাফ তার এই ঈমান বিষয়ক বক্তব্যকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছে, তার তন্ত্রীতে আঘাত হেনেছে এবং সর্বপ্রকারের জাগতিক, মানসিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গনে তাকে তুলে ধরেছে। এমনকি এই ঈমান ও আকীদার বিষয়কে এ সূরা শুধু মানবজাতির নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবস্তু রূপে গণ্য করে। এ কারণেই সে কোরআনের সাথে জ্বিনদের সংশ্লিষ্টতার ঘটনার একটা দিকও বর্ণনা করে, যেমন বর্ণনা করে কোরআনের প্রতি বনী ইসরাঈলের কারো কারো আকৃষ্ট হওয়ার প্রসংগটিও। একইভাবে এ সূরায় সত্যের নীরব সাক্ষী প্রাকৃতিক জগতের সাক্ষ্য এবং বনী ইসরাঈলের এক (তাওরাত অভিজ্ঞ) ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও সমান গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে এই সূরা মানব হৃদয়কে আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল দিগন্তে ও পরকালের কেয়ামত নামক প্রান্তরে বিচরণ করায়। অনুরূপভাবে এটি তাদেরকে হুদ সম্প্রদায় এবং মক্কার চারপাশের বিধ্বস্ত জনপদগুলোর ধ্বংসলীলাও পরিদর্শন করায়। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীকে সে কোরআনের মতোই একটা সত্যভাষী গ্রন্থ রূপে উপস্থাপন করে।

সূরাটি এমন চারটি পর্বে বিভক্ত, যার প্রতিটি পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পুরো সূরাটা চারটা অংশে বিভক্ত হলেও মূলত একটা একক ও একীভূত সূরা। প্রথম পর্বের সাথে সাথেই সূরার সূচনা হয়েছে। পূর্ববর্তী ছ'টা সূরার মতোই এটিও আরবী বর্ণমালার অক্ষর 'হা মীম' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আর এ দুটো অক্ষরের অব্যবহিত পরই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নাযিল হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'এই কেতাব নাযিল হয়েছে মহাবিজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে।' এর পরপরই মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত। 'আমি আকাশ পৃথিবী ও উভয়ের মাঝে বিরাজমান সব কিছুকে কেবল সত্যের ভিত্তিতে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' সুতরাং পঠিত কোরআনরূপী গ্রন্থ ও দৃশ্যমান জগতরূপী গ্রন্থ উভয়েই

সত্যানুগ ও সুপরিকল্পিত হওয়ার দিক দিয়ে সমান। আল্লাহ তায়ালা এর পরই বলছেন, 'আর কাফেরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই।'

এই সর্বাত্মক ও শক্তিশালী ভূমিকা দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। শুরুতেই বলেছেন যে, তৎকালীন জাহেলী সমাজের মানুষ যে শেরেকের অনুসারী ছিলো, তা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না, অপরদিকে তেমনি তার পেছনে কোন সঠিক তথ্য ও বিশ্বস্ত সনদও ছিলো না, 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যেসব জিনিসের উপাসনা করে থাকো, সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীর কী কী জিনিস সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো দেখি! না কি আকাশে তাদের কোনো অংশদারিত্ব আছে?' সেই সাথে যারা নিজেদের উপাসকদের ফরিয়াদ শুনতেই পায় না, গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাদের পূজারীদের ঘোরতর নির্বুদ্ধিতারও নিন্দা করা হয়েছে। সেসব অপদার্থ উপাস্যরা কেয়ামতের দিন তাদের উপাসকদের সাথে ঝগড়া করবে এবং সেই বিপদের দিনে তাদের কৃত উপাসনাকেই প্রত্যাখ্যান করবে!

এরপর হযরত মোহাম্মদ (স.) তাদের কাছে যে সত্যের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তার সাথে তাদের অন্যায় ও অশোভন আচরণের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'তারা তাকে প্রকাশ্য জাদু তো বলেছেই উপরন্ত তাকে মোহাম্মদ (স.)-এর মনগড়া বাণী বলেও অপবাদ দিয়েছে। এই পর্যায়ে রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন এর এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন, তার নবুওত, আল্লাহভীতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার সার্বিক আল্লাহনির্ভরতার সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন এবং এসব বিদ্বান আহলে কেতাবের সাক্ষ্য দেয়ার পরও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে যেন তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করেন। *(আয়াত ৮, ৯, ১০)*

এরপর এই অব্যাহত প্রত্যাখ্যানের পক্ষে তারা যেসব খোঁড়া ওজুহাত পেশ করে থাকে, পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে তার স্বরূপ উন্মোচন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এখানে তাদের এই গোয়ার্তুমির আসল কারণ তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে পূর্ববর্তী কেতাব তাওরাতের প্রতি কোরআনের সমর্থন এবং এ কেতাবের প্রকৃত ভূমিকা ও লক্ষ্য কি সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে যারা ঈমান এনেছে ও ঈমানের ওপর অবিচল থেকেছে, তাদের শুভ পরিণামের বিবরণ দিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে। *(আয়াত ১১, ১২, ১২ ও ১৪)*

দ্বিতীয় পর্বে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির দুটো নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, একটা সুস্থ অপরটা বিকৃত। আকিদা বিষয়ক বিতর্কের ক্ষেত্রে এই দুটো নমুনাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। উভয় নমুনার বিবরণ দেয়া শুরু করা হয়েছে উভয়ের প্রথম উন্মোষকাল থেকেই,, অর্থাৎ যখন তারা আপন আপন মা বাবার কোলে অবস্থান করে তখন থেকেই। তারপর তাদের বয়োপ্রাপ্তি ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথম নমুনার মানুষ আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে সচেতন, মা বাবার প্রতি সদাচারী, কৃতজ্ঞ, তাওবাকারী অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী। *(আয়াত ১৫)*

এই শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের সর্বোত্তম কাজগুলো আমি গ্রহণ করি। (আয়াত ১৬) অপর নমুনাটা হলো মা ও বাবার অবাধ্য হওয়া। সে আল্লাহরও অবাধ্য এবং সে আখেরাতকেও অস্বীকার করে। এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি তার মা ও বাবা বিরক্ত অসন্তুষ্ট থাকে। এই শ্রেণীটা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, এরাই হচ্ছে সেইসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর উক্তি সত্য প্রমাণিত হয়েছে...... তারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই শ্রেণীর লোকদের ভয়াবহ পরিণতি সম্বলিত একটা ত্বরিত দৃশ্য দেখিয়ে এই পর্বটার ইতি টানা হয়েছে। সে দৃশ্যটা হলো, 'যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে হাযির করা হবে। বলা হবে, তোমরা তো তোমাদের সমস্ত উত্তম উপকরণগুলো পার্থিব জীবনেই শেষ ও উপভোগ করে এসেছো। তাই আজ তো তোমরা শুধু অপমানজনক আযাবই ভোগ করবে....। (আয়াত ২০)

তৃতীয় পর্বে আ'দ জাতির ধ্বংসলীলা দেখানো হয়েছে। তাদের সতর্ককারী নবীকে প্রত্যাখ্যান করেই তাদেরকে ধ্বংস হতে হয়েছিলো। এই কাহিনীর কেবল একটা অংশই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে পানিবিহীন বাতাস ও মেঘ ভেসে আসছিলো। তারা তা থেকে জীবন ও বৃষ্টির প্রত্যাশা করছিলো। অথচ তা তাদের কাছে নিয়ে এসেছিলো সর্বাত্মক ধ্বংস ও তাদের ঈপ্সিত আযাব। (আয়াত ২৪, ২৫)

এই ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা আরবের কাফেরদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, আ'দ জাতি এদের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী ও বিত্তশালী ছিলো, তথাপি তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি। (আয়াত ২৬)

পর্বের শেষ ভাগে মক্কার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের তথাকথিত দেবদেবীর তাদের সাহায্যে অক্ষম হওয়া এবং তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। কেননা এ দ্বারা আরবের বর্তমান মোশরেকরা সচেতন হবে ও হেদায়াত লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

চতুর্থ পর্বে রয়েছে একদল জ্বিনের কোরআনের সংস্পর্শে আসার কাহিনী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোরআন শুনতে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে কোরআন শুনে এতোই অভিভূত হলো যে, কোরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকলো না। তারা বলতে বাধ্য হলো যে, 'এ কোরআন পূর্ববর্তী কেতাবকে সত্য বলে, সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করে।' এরপর তারা স্বজাতির লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও সতর্ক করে ও ঈমানের দাওয়াত দেয়। তারা বলে, হে আমাদের জনগণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার কথা শোনো ও তার প্রতি ঈমান আনো। ...... (আয়াত ৩১, ৩২)

এই জ্বিন দলটি তাদের স্বজাতির লোকদের কাছে গিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছে, তা ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। ৩৩ নং আয়াতে প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা প্রথম সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টি উভয় কাজেই আল্লাহর ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। এই পর্যায়ে কাফেরদেরকে দোযখের সামনে উপস্থাপনের দৃশ্যটা দেখিয়ে মক্কার কাফেরদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তখন দোযখ সামনে দেখে তারা স্বীকার করবে যে, দোযখ সত্য। অথচ দুনিয়ায় থাকাকালে তারা তা স্বীকার করতো না, কিন্তু সেদিন দোযখকে স্বচক্ষে দেখে সত্য বলে স্বীকার করায় কোনো লাভ হবে না।

সূরার শেষ আয়াতটিতে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন ধৈর্যধারণ করেন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো না করেন। কারণ তাদের তো একটা ক্ষুদ্র মেয়াদ পর্যন্তই অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ মেয়াদটুকু শেষ হওয়া মাত্রই তারা আযাব ও ধ্বংসের শিকার হবে। বলা হয়েছে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ও সাহসী নবীরা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছে, তুমিও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ করো।' (আয়াত ৩৫)

এবার এই চারটি পর্বের আয়াতগুলোর বিস্তারিত তাফসীর নিয়ে আলোচনা পেশ করছি।

তাফসীর

'হা মীম, এ কেতাব মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছুই সৃষ্টি করেছি, একমাত্র সত্যের ভিত্তিতে ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কাফেরদেরকে যে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

সূরার শুরুর দুটো অক্ষর হচ্ছে প্রথম সুরেলা সুললিত আবেদন। এটা আসলে আরবদের ভাষায় ব্যবহৃত আরবী বর্ণমালার সাথে এই বর্ণমালা দিয়ে লেখা এই কেতাবের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইংগিত দেয়। এ ধরনের প্রতীকী উচ্চারণ বা বাকধারা মানবীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব ও নযীরবিহীন। এই নযীরবিহীন বাকধারার ব্যবহার মূলত এই সাক্ষ্য বহন করে যে, এ কেতাব কোনো মানুষের রচনা নয় বরং মহাবিজ্ঞ ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া বাণী। অনুরূপভাবে এ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহর রচিত ও তাঁর কাছ থেকে নাযিল করা এই গ্রন্থ এবং আল্লাহর সৃজিত দৃশ্যমান ও হৃদয় দ্বারা উপলব্ধ এই মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থখানি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় গ্রন্থ আগাগোড়া সত্যের ওপর ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদিকে মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ হতে এ কেতাবের অবতরণ সর্বোচ্চ শক্তিমত্তা নিপুণতম ব্যবস্থাপনা ও বিচক্ষণতম প্রজ্ঞা দক্ষতা ও কর্মকুশলতার পরিচায়ক। অপরদিকে আকাশ পৃথিবী ও তার মাঝখানে বিরাজমান যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিও সর্বাধিক নিখুঁত নির্ভুল ও সঠিক কাজ।' শুধু তাই নয়, এটা অত্যন্ত সুক্ষ্ম, নিপুণ ও ভারসাম্যপূর্ণ কাজ। 'নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত' অর্থাৎ আল্লাহর সৃজনকুশলতা ও তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য যাতে সফল ও কার্যকর হয় সে জন্যে এ মহাবিশ্ব একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

কোরআন ও সৃষ্টিজগত

আল্লাহর এই উভয় গ্রন্থ অর্থাৎ কোরআন ও সৃষ্টিজগত উন্মুক্ত ও প্রকাশ্য। দুটোই দেখা যায় ও শোনা যায়। দুটোই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, নিপুণ কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞা, তাঁর সুদক্ষ শাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং সুষম পরিকল্পনার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বিশ্বপ্রকৃতিরূপী গ্রন্থখানি কোরআনরূপী গ্রন্থের সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং তাতে যে হুশিয়ারী ও সুসংবাদ রয়েছে তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন, 'যারা কুফরী করেছে, তারা যেসব বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, সে ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' এখানে আল্লাহর নাযিল করা গ্রন্থ কোরআন ও দৃশ্যমান গ্রন্থ বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি ইংগিত করে উভয় গ্রন্থের শিক্ষা ও হুশিয়ারীর প্রতি কাফেরদের অবজ্ঞা ও অবহেলায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

মানুষের কাছে নাযিল করা এই পঠিত গ্রন্থ আল কোরআন বলে, আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসের মনিব ও প্রভু। কেননা তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, প্রতিটি জিনিসের শাসক ও পরিচালক এবং প্রতিটি জিনিসের পরিকল্পক, নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা।

ওদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই জীবন্ত গ্রন্থও এই একই সত্যের সাক্ষ্য দেয়। এর সুষ্ঠু পরিচালনা, নিখুঁত সমন্বয় এবং পারস্পরিক সাজুয্য ও সংহতি সাক্ষ্য দেয় যে, এর সৃষ্টিকর্তা, শাসক, পরিচালক ও ভাগ্য বিধাতা এক ও একক, তিনি নিজের পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক জ্ঞানের আলোকেই এ বিশ্বপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেন, সেইসব কিছুর স্বভাবপ্রকৃতি একই রকম। তাহলে মানুষ কোন যুক্তিতে একাধিক সত্ত্বাকে মনিব ও মাবুদরূপে বরণ করে? তাদের এসব কথিত মাবুদ কী কী জিনিস সৃষ্টি করেছে? এই যে বিশ্বজগত আমাদের চোখের সামনে ও বিবেকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এর সৃষ্টিতে তাদের কী অবদান আছে! এ বিশাল সৃষ্টিজগতের কোন্ কোন্ সৃষ্টিকে তারা সৃষ্টি করেছে?

মহান আল্লাহ তায়ালা এ প্রশ্নটাই তুলে ধরেছেন ৪ নং আয়াতে, 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যাদের পূজা করে থাকো, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছো কি? আমাকে দেখাও তো, তারা পৃথিবীতে কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ সৃষ্টিতে কি তাদের কোনো অবদান আছে? ... যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

আল্লাহ তায়ালা এখানে তাঁর রসূল (স.)-কে একথাই শিক্ষা দিচ্ছেন, যেন তিনি তার জাতির সামনে বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থখানির সাক্ষ্য তুলে ধরেন। কেননা এটা এমন এক গ্রন্থ, যার সাক্ষ্য কোনো বিতর্কের অবকাশ রাখে না কিংবা কোনো ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ কাউকে দেয় না। এ গ্রন্থ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক যুক্তি দিয়েই মানুষের সহজাত বোধশক্তিকে সম্বোধন করে। কারণ সে সহজাত বোধ শক্তির সাথে এ বিশ্বপ্রকৃতিরূপী গ্রন্থের এক নিজস্ব, সূক্ষ্ম ও গোপন সংযোগ রয়েছে, যাকে কেউ ধামাচাপা দিতে পারে না কিংবা প্রতারিত করতে পারে না।

'আমাকে দেখাও তো, তারা পৃথিবীর কোন জিনিসটি সৃষ্টি করেছে?' কোনো মানুষ কস্মিনকালেও এ কথা দাবী করতে পারবে না যে, আল্লাহ তায়লা ছাড়া যেসব গাছ, পাথর, জ্বিন, ফেরেশতা বা অন্য যা কিছুরই পূজা করা হয় তা পৃথিবীর কোন বস্তুকে সৃষ্টি করেছে কিংবা পৃথিবীতে কোন বস্তুর উদ্ভব ঘটিয়েছে। প্রকৃতির যুক্তি এমনিই অখন্ডনীয় ও অকাট্য বাস্তব যুক্তি। যে কোনো অবাস্তব ও অযৌক্তিক দাবীর সামনে তা চিৎকার করে তার অসারতা প্রমাণ করে দেয়।

'অথবা আকাশ সৃষ্টিতে কি তাদের কোনো অবদান আছে?' বস্তুত একথাও সত্য যে, কোনো মানুষ কস্মিনকালেও এমন দাবী করতে পারে না যে, আকাশ মন্ডলের সৃষ্টিতে বা তার মালিকানায় এবং তার কর্তৃত্বে ও আধিপত্যে সেসব কল্পিত উপাস্যের কোনো হাত বা অংশীদারী বা অবদান আছে। আকাশমন্ডলীর প্রতি একটা নযর বুলালেই অন্তরে সৃষ্টিকর্তার অকল্পনীয় ক্ষমতা ও অভাবনীয় মাহাত্ম এবং তাঁর একত্বের চেতনা ও বিশ্বাস গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়, আর মন থেকে উধাও হয়ে যায় যাবতীয় বিকৃতি ও বিপথগামিতা। যে আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে নাযিল করেছেন, তিনি ভালো করেই জানেন বিশ্বপ্রকৃতিকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করলে মানুষের অন্তরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাই তিনি মহাবিশ্বরূপী বইটির দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, যাতে তারা মহাবিশ্বকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে যথোচিত শিক্ষা গ্রহণ করে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা মানব মনে বিভিন্ন সময়ে যেসব বিকৃতি ও গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেগুলোকে দূর করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। এসব বিকৃতি ও গোমরাহীর কারণে মানুষের মন নানা ধরনের অযৌক্তিক দাবী দাওয়া বা মতামতের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা এসব ধ্যান

ধারণার অসারতা তুলে ধরেছেন এবং তার কোনো যুক্তি প্রমাণ থাকলে তা প্রদর্শনের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। সেই সাথে সঠিক যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনের পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন এবং পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়নের নির্ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

'তোমরা আমার কাছে পূর্ববর্তী কোনো পুস্তক অথবা তার সূত্র ধরে আসা ধারাবাহিক কোনো জ্ঞান নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।' অর্থাৎ হয় আল্লাহর কোনো সত্য পুস্তক নিয়ে এসো, নচেত অন্য কোনো নির্ভুল ও প্রামাণ্য জ্ঞান নিয়ে এসো। কোরআনের পূর্বেকার কোনো ঐশী পুস্তকই এমন নেই, যা মহান বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য না দেয়। আর এমন কোনো ঐশী গ্রন্থও কখনো নাযিল হয়নি, যা একাধিক উপাস্যের ধারণাকে সমর্থন করে, অথবা বলে যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ বা অবদান আছে। বস্তুত এমন কোনো নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানও কোথাও নেই, যা অমন উদ্ভট ধ্যান ধারণাকে সমর্থন করে।

এভাবেই কোরআন মানব জাতির কাছে বাস্তবমুখী সাক্ষ্য তুলে ধরে। এই সাক্ষ্য অকাট্য ও অখন্ডনীয়। কোরআন মানব জাতিকে বিনা প্রমাণে কোনো কিছু বলতে বা দাবী করতে নিষেধ করে এবং তর্ক করার বিশুদ্ধ পন্থা শিখিয়ে দেয় একটিমাত্র আয়াতে। এ আয়াতটির শব্দের সংখ্যা তেমন বেশী নয়, কিন্তু এর মর্ম অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, এর সুর ও ঝংকার অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ও ক্ষুরধার এবং এর যুক্তিপ্রমাণ অকাট্য ও অখন্ডনীয়।

আল্লাহর বদলে অন্যদের ডাকা

এরপর পরবর্তী আয়াতে এইসব কল্পিত উপাস্যদের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করার মতো চরম বিকৃত ও বিভ্রান্তির নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব কল্পিত মাবুদেরা তাদের উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয়া তো দূরে থাকো, তাদের আহবান ও ফরিয়াদ তারা টেরও পায় না এবং কেয়ামতের দিনও তারা তাদের সাথে ঝগড়া করবে ও তাদের পূজার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন উপাস্যদের উপাসন করে, যারা কেয়ামত পর্যন্তও তাদের আহবানে সাড়া দেবে না..... তাদের চেয়ে বিপথগামী আর কে আছে? (আয়াত-৫)

আরবের মূর্তিপূজারীদের কেউবা খোদ মূর্তিগুলোকেই উপাস্য মনে করতো, কেউবা ওগুলোকে ফেরেশতাদের প্রতিমূর্তি মনে করতো। আবার কেউবা গাছপালার কেউবা ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষভাবে অথবা শয়তানের পূজা করতো। অথচ এ সবের কেউই তাদের পূজারীদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে সমর্থ ছিলো না, কেউ সাড়া দিতে পারলেও তাতে কোনো লাভ হতো না। পাথর ও গাছপালাতো সাড়া দিতেই পারে না। ফেরেশতারা মোশরেকদের ডাকে সাড়া দেয় না, আর শয়তানেরা সাড়া দিতে পারতো কেবল কু-প্ররোচনা ও বিভ্রান্তকরনের মাধ্যমে। কেয়ামতের দিন যখন সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর সামনে সমবেত করা হবে, তখন এই সমস্ত কল্পিত উপাস্যদের সকলেই তাদের বিপথগামী পূজারীদের পূজা প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের সাথে তাদের সকল সম্পর্ক অস্বীকার করবে, এমনকি সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে যে, শয়তানও তা অস্বীকার করবে। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইবরাহীমে বলেন–

'কেয়ামতের বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শয়তান বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, আর আমি যা কিছুই তোমাদের সাথে ওয়াদা করতাম, তা ভঙ্গ করতাম। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো জরবদস্তি ছিলো না। আমি

তো কেবল তোমাদের আহ্বান করতাম, আর তোমরা তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, নিজেদেরকে তিরস্কার করে। আজ আমিও তোমাদেরক বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবো না, তোমরাও পারবে না আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলে, তা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। অপরাধীদের জন্যে আজ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'

এভাবেই কোরআন মোশরেকদের সামনে তাদের মিথ্যাদাবীর মুখোশ খুলে দেয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার ব্যর্থতা ও অসারতা দেখিয়ে দেয়। ইতিপূর্বে সে তাদের সামনে প্রাকৃতিক জগতের সেই মহাসত্যকে তুলে ধরে, যা তাদের কুফরী ও শেরেকীকে বাতিল বলে ঘোষণা করে ও প্রত্যাখ্যান করে। সে আল্লাহর একত্বকে এমন এক শাশ্বত মহাসত্য বলে আখ্যায়িত করে যার সম্পর্কে মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থও একই কথা বলে। সে বলে, একত্ববাদ স্বয়ং মোশরেকদের পার্থিব কল্যাণের জন্যেও অপরিহার্য, আর দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের শেরেক ও কুফরী কি ফলাফল বয়ে আনবে সে দিকে লক্ষ্য রাখার অপরিহার্যতা সম্পর্কেও তাদের হুশিয়ারী করা হয়েছে।

মানুষের আনুগত্যও শেরেক

এখানে কোরআন মোশরেকদের উপাস সেসব অচেতন ও প্রাণহীন প্রতিমূর্তিগুলোরই নিন্দা সমালোচনা করেছে যেগুলো কোরআন নাযিল হবার সময় জনগণের কাছে ঐতিহাসিক উপাস্য হিসাবে পরিচিত ছিলো। কিন্তু এ আয়াতের ভাষা সেই ঐতিহাসিক প্রথাসিদ্ধ মূর্তিপূজার চেয়ে অনেক ব্যাপক অর্থবোধক। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোনো যুগের এবং যে কোনো স্থানেরই হোক না কেন পূজারী ও প্রার্থনাকারীদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না এমন বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তির যারা পূজা বা আনুগত্য বা গোলামী করে। তাদের চেয়ে বেকুফ, নির্বোধ ও বিপথগামী আর কে আছে? মানুষের ডাকে সাড়া দেয়া, তার ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা তো শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। বস্তুত শেরেক শুধুমাত্র প্রাচীন পৌত্তলিকদের সাদামাটা মূর্তিপূজাতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন বহু মোশরেক রয়েছে, যারা আল্লাহর এবাদাতের সাথে সাথে ক্ষমতাশালী, প্রতাপশালী অথবা বিত্তশালীদের গোলামী ও আনুগত্য করে থাকে এবং তাদের কাছে অনেক কিছু প্রার্থনা করে থাকে। এভাবে তাদের আল্লাহর সাথে শরীক করে। অথচ তারা তাদের কাছে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা যথাযথভাবে মঞ্জুর করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না। এমনকি তারা নিজেদেরও লাভ লোকসান করতে অক্ষম। তাদের কাছে কোনো জিনিস চাওয়া শেরেক। তাদের কাছে কোনো কিছু আশা করাও শেরেক। তাদেরকে ভয় করাও শেরেক। তবে এই শেরেক অপ্রকাশ্য হওয়ার কারণে অনেকেই এ ধরনের শেরেকে অবচেতনভাবে লিপ্ত হয়ে থাকে।

এরপর ৭ নং আয়াত থেকে রসূল (স.) ও তাঁর দাওয়াতের সাথে মোশরেকদের ভূমিকা ও আচরণ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তাদের চলমান অবস্থা ও মোশরেকসুলভ আকীদা বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করার পর এক্ষণে ওহী ও তাওহীদ বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন কাফেররা তাদের কাছে সত্য সমাগত হওয়ার পরও বলে, এতো প্রকাশ্য জাদু। (আয়াত ৭-১২)

এ আয়াতগুলোর শুরুতেই ওহী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ওহী সম্পর্কে তারা যে আজেবাজে মন্তব্য করতো ও বিরক্তি প্রকাশ করতো, তার নিন্দার মাধ্যমে এ আলোচনার সূচনা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এই ওহী তো হচ্ছে এমন সব বাণী,

যার ভেতরে কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহ সংশয় নেই। এ হচ্ছে অকাট্য ও সন্দেহাতীত সত্য। অথচ একেই কিনা তারা বলে জাদু! কোথায় সত্য বাণী আর কোথায় জাদু! এ দুটোর মাঝে তো আকাশ পাতালের ব্যবধান। এ দুটোর মধ্যে না আছে কোনো মিল, না আছে কোনো সাদৃশ্য।

তাদের এ অন্যায় মন্তব্য ও নিকৃষ্ট বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই এবং এর পেছনে যুক্তিপ্রমাণের লেশমাত্রও নেই। তাই এই জঘন্য মন্তব্য ও বক্তব্যের ওপর কঠোর আক্রমণ দিয়েই এ আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। তারপর পরবর্তী আয়াতে (৮ নং আয়াত) এ আক্রমণকে আরো জোরদার করে তাদের আরেকটা বক্তব্য খন্ডন করা হয়েছে, 'তবে কি তারা বলছে, মোহাম্মাদ নিজেই এগুলো রচনা করেছে?' তাদের এই অপবাদটাকে এ আয়াতে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যের আওতায় আনা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ ধরনের কথা বলা একেবারেই অসংগত ও অন্যায়। আসলে তাদের ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা এতো বেড়ে গিয়েছে যে, তারা এমন কথাও বলতে পারছে যা কল্পনায়ও আসে না।

মোশরেকদের কথার প্রতিউত্তর

আয়াতের শেষাংশে রসূল (স.)-কে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন নবীসুলভ সৌজন্য ও শালীনতা রক্ষা করেই এর জবাব দেন। কেননা তিনি যখন তার প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ, এই মহাবিশ্বের প্রকৃত শক্তি কার হাতে এবং প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা কার, সে সম্পর্কে অবহিত, তখন সেই চেতনা থেকেই তো তার সৌজন্যবোধ ও শালীনতাবোধ উৎসারিত। কাজেই তিনি কিভাবে সৌজন্য, শালীনতা ও গাম্ভীর্য থেকে মুক্ত হতে পারেন?' 'তুমি বলো, আমি যদি নিজেই এ বাণী রচনা করে থাকি, তাহলে তো তোমরা আমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারো না। তোমরা এ ব্যাপারে যা কিছু বলছো, তা আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন। এ সম্পর্কে আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াশীল।'

অর্থাৎ তুমি তাদেরকে বলো, আমি কিভাবে এটা রচনা করতে পারি? কার ওপর নির্ভর করে রচনা করবো। কী উদ্দেশ্যে রচনা করবো? তোমরা যাতে আমার ওপর ঈমান আনো ও আমার অনুসারী হও, সেই উদ্দেশ্যে? কিন্তু আমি যদি এটা রচনা করতাম, তাহলে তো তোমরা আমাকে এর ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা করতে পারতে না। তিনি তো আমাকে আমার মনগড়া বাণী প্রচারের জন্যে শাস্তি দিতেন। তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকলে ও আমার অনুসারী হলে আমার কী লাভ হতো? আল্লাহ তায়ালা যদি আমার মনগড়া কথাবার্তা প্রচার করার দায়ে আমাকে শাস্তি দিতেন, তাহলে সে শাস্তি থেকে রক্ষার বা আমাকে সাহায্য করার ক্ষমতাই তো তোমাদের নেই।

বস্তুত একজন নবীর পক্ষে এটাই যথোচিত জবাব। এ জবাব তিনি তাঁর সেই প্রতিপালকের কাছ থেকেই লাভ করেন। যাকে ছাড়া তিনি বিশ্ব চরাচরে আর কাউকে দেখতে পান না এবং যার শক্তি ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি আছে বলে তাঁর জানা নেই, রসূল (স.)-এর শ্রোতা সেই মোশরেকরা যদি তাদের বিবেককে কাজে লাগাতো, তাহলে তারা বুঝতো যে, এটাই যুক্তিসঙ্গত জবাব। এই জবাব দিয়ে তিনি তাদের বিষয়টাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছেন এই বলে, 'তোমরা যা বলছো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই অবগত আছেন।' অর্থাৎ তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং নিজের জানা মোতাবেক তোমাদেরকে

কর্মফল দেবেন। 'আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেস্ট।' অর্থাৎ সাক্ষী ও ফায়সালাকারী উভয় হিসাবেই যথেষ্ট। 'তিনি ক্ষমাশীল দয়াশীল।' তিনি তোমাদের প্রতি কৃপা দেখিয়ে তোমাদেরকে সুপথেও চালিত করতে পারেন এবং হেদায়াত লাভ ও ঈমান আনয়নের পূর্বে কৃত তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করতে পারেন।

এ জবাবে যেমন হুশিয়ারী ও সতর্কবাণী রয়েছে, তেমনি রয়েছে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহিত করনের বাণীও। মানবহৃদয়ের গভীরে এবং তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এ বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেভাবে হাসি তামাশা ও উপহাস বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে জিনিসটাকে হালকা করে দেখছে, আসলে তা মোটেই ততোটা হালকা নয়। বরং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মহান দাওয়াত দাতা রসূল (স.)-এর বিচার বিবেচনায় তা এতোটা বিরাট ও গুরুতর, তারা তা অনুভব করতে পারে না।

রসূলদের মর্যাদা

'আমি কোনো নতুন বা অভূতপূর্ব রসূল নই।'

এরপর পুনরায় অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ওহীর সত্যতা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, সে দৃষ্টিকোণটা হচ্ছে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিকোণ। বলা হচ্ছে যে, তারা মোহাম্মদ (স.)-এর ওহী ও রেসালাতের কোন জিনিসটা অস্বীকার করবে? কেনইবা তারা তার ওপর জাদুমন্ত্র বা মনগড়া বক্তব্য প্রচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে? অথচ তাঁর ওহী ও রেসালাত তো নতুন বা অভিনব কিছু নয়।

'তুমি বলো আমি তো নতুন বা অভূতপূর্ব কোনো রসূল হয়ে আসিনি।....... আমি তো সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।'

বস্তুত তিনি প্রথম রসূল নন। তার আগেও বহু রসূল এসেছেন। তার ব্যাপারটা তাদের মতোই। তিনি কোনো অভিনব রসূল নন। তিনি একজন মানুষ। আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি রসূল হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখেন। তাই তিনি তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন। আর তিনিও কোনো রাখ ঢাক না রেখে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু প্রকাশ ও প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন, তা খোলাখুলি ও স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেছেন। এই হলো রেসালাতের প্রকৃতি ও মূল কথা। যিনিই রসূল হিসাবে নিযুক্ত হন মহান আল্লাহর সাথে তার আন্তরাত্মার এতো গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে যে, তিনি তাঁর কাছে কোনো প্রমাণ চান না। নিজের জন্যে তিনি কোনো বিশেষ পদমর্যাদাও আল্লাহর কাছ থেকে কামনা করেন না। তিনি তো তার পথেই এগিয়ে চলেন। তিনি তাঁর প্রতিপালকের বার্তা ও বাণী প্রচার করেন ঠিক যেভাবে তাঁর কাছে ওহী যোগে পাঠানো হয়েছে সেইভাবে।

'আমি জানিনা আমার সাথেই কী আচরণ করা হবে, আর তোমাদের সাথেই বা কী আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল আমার কাছে যে ওহী আসে, তাই অনুসরণ করি।' তিনি কোনো অদৃশ্য বা গায়েবী তত্ত্ব জানেন কিংবা তাঁর নিজের, তাঁর জাতির ও তাঁর রেসালাতের দশা ও পরিণতি কী হবে, তা জানেন বলে যে তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পালন করেন তা নয়। বরঞ্চ তিনি আল্লাহর নির্দেশমতো কাজ করেন, তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও তাঁর আদেশের পূর্ণ অনুগত থেকে প্রতিটি দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে যেদিকে নিয়ে যান, সেই দিকেই তাঁর পা চলে। গায়েব বা অদৃশ্য তাঁর সম্পূর্ণ

অজানা। তার গোপন রহস্য কেবল আল্লাহই জানেন। তিনি কোনো গোপন তথ্য জানতে কৌতুহলী হন না। কেননা তার অন্তর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট। মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও আদব তাকে যা জানানো হয়নি তা জানার জন্যে কৌতূহলী হতে নিষেধ করে। তাই তিনি সব সময় তার নিজ দায়িত্বসীমার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। একথাই বলা হয়েছে এভাবে, 'আর আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।'

বস্তুত যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয় অবহিত, এটা তাদেরই রীতি। এর মধ্য দিয়ে তারা রসূল (স.)-এর কাছ থেকে সান্ত্বনা পান। তাই তারা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত চালিয়ে যান নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায়। এর পরিণাম কী, ভবিষ্যত কী তা তারা জানেন না। এর ভবিষ্যতের ওপর তাদের বিন্দুমাত্র কোনো নিয়ন্ত্রণও নেই। তারা শুধু এতোটুকুই জানে এবং জানাকে যথেষ্ট মনে করে যে, এটা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। নবী রসূলরা এর জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে কোনো প্রমাণও চান না। কেননা তাদের প্রমাণ তাদের অন্তরে রয়েছে। তারা তাদের জন্যে কোনো বিশেষ মর্যাদাও চান না। কেননা তাদের বিশেষ মর্যাদা হিসাবে এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। রসূল (স.) নিজস্ব গন্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করে যেতে যেতে এক সময় আহলে কেতাবের মধ্য থেকে সাক্ষী পেয়ে যান। কেননা ওহী ও রেসালাতের প্রকৃতি ও স্বরূপ তাদের কাছে সুপরিচিত।

ইহুদী আলেমের ইসলাম গ্রহণ

'তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, এ ওহী যদি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তা অস্বীকার করো বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষ্য দিয়ে এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, তারপর সে নিজে ঈমান আনে, কিন্তু তোমরা অহংকার করো। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে হেদায়াত করেন না।' এখানে একটা বাস্তব ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়ে থাকতে পারে এবং এ ধরনের একাধিক সাক্ষী আহলে কেতাবের মধ্য থেকে ছিলো যারা জানতো যে, এই কোরআন অবিকল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া অন্যসব কেতাবের মতোই। কেননা তারা তাওরাতের প্রকৃতি ও স্বরূপ জানতো। তাই ঈমান এনেছিলো। একাধিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ছালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অবশ্য এ বর্ণনা এজন্যে বেখাপ্পা লাগে যে, এ সূরাটা মক্কী সূরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ছালাম ইলসাম গ্রহণ করেছিলেন মদীনায়। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয় যে, সূরা মক্কী হলেও এ আয়াতটা মাদানী। এভাবে আয়াতটা হযরত আব্দুল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অন্য বর্ণনায় বলা হয় যে, আয়াতটা মক্কী এবং এটা হযরত আব্দুল্লাহ সম্পর্কে নাযিল হয়নি।

এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, এ আয়াত মক্কারই অন্য একটা ঘটনার দিকে ইংগিত দিচ্ছে। ঘটনাটা হলো, মক্কী যুগেই কিছু আহলে কেতাব ঈমান এনেছিলো যদিও তাদের সংখ্যা খুবই অল্প। আহলে কেতাব হয়ে তাদের ঈমান আনা অজ্ঞ মোশরেকদের জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো। এ কারণে কোরআন একাধিক জায়গায় এ ঘটনার উল্লেখ করে। মোশরেকরা ওহী ও কেতাব সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও ওহীকে অস্বীকার করার যে অন্যায় ঔদ্ধত্য দেখাতো, এ ঘটনার উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করা হয়।

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, এ ওহী যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে।' এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিতর্কের যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয়েছে, তা আসলে মক্কাবাসীর অব্যাহত গোয়ার্তুমি ও হঠকারীতাকে দূর করার উদ্দেশ্যেই অবলম্বন করা হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে রসূল

(স.)-এর দাওয়াতকে ক্রমাগত অগ্রাহ্য করতে থাকার ব্যাপারে তাদের মনে এই মর্মে ভয়ভীতি ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলা হয়েছে যে, এ ওহী মোহাম্মদ (স.)-এর বর্ণনা অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেও তো থাকতে পারে। আর যদি সত্যই তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই অগ্রাহ্য করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে! সুতরাং এই বিপদজনক পরিণতি এড়াতে তাদের সতর্ক হওয়াই ভালো। যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি যে আযাবের ভয় দেখান, তা তাদের ওপর নেমে আসবেই। সুতরাং প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করার নীতিটা অব্যাহত রাখা তাদের ঠিক হচ্ছে কিনা, তা আর একবার ভেবে দেখা উচিত।

সেই ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবার আগে তাদের ভেবে দেখা উচিত অশুভ পরিণাম থেকে বাঁচার উপায় কী এবং শুভ পরিণাম লাভ করার উপায় কী। বিশেষত যখন আহলে কেতাবের এক বা একাধিক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, কোরআনের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং তার পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি একইরকম আর যখন আহলে কেতাবের কেউ না কেউ এই উপলব্ধির ভিত্তিতে ঈমানও এনেছে। অথচ এখন যাদের কাছে কোরআন এলো তাদেরই মাতৃভাষায় রচিত হয়ে, তারা কিনা তার প্রতি কুফরী করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে! এটা সুস্পষ্ট যুলুম এবং সত্যের প্রকাশ্য লংঘন। এ কুফরী আল্লাহর গযব ডেকে আনতে পারে এবং যাবতীয় সৎকাজকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। 'আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে সুপথ দেখান না।'

মানুষের মন থেকে যাবতীয় সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে ও তার সংশোধনের নিমিত্তে কোরআন বিবিধ পন্থা অবলম্বন করেছে। কোরআনের অনুসৃত এসব রকমারি পন্থা ও পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত দাতাদের জন্যে যথেষ্ট কার্যকর ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কেতাব, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও এখানে প্রত্যয়ী পদ্ধতির পরিবর্তে সন্দেহ সৃষ্টিকারী পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে, তা আমি আগেই বলেছি, ক্ষেত্র বিশেষে এটা একটা হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি বটে।

দ্বীন গ্রহনে গরীবরা এগিয়ে

এরপর পুনরায় কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে মোশরেকদের কিছু কিছু উক্তির সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদের যে উক্তির সমালোচনা করা হয়েছে, তাতে তারা তাদের কোরআন প্রত্যাখ্যানের পক্ষে একটা খোঁড়া ওজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। আসলে এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের ওপর তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশেরই চেষ্টা করেছে।

'কাফেররা বলে, কোরআন যদি ভালো হতো তাহলে মুসলমানরা আমাদের আগে এর দিকে এগিয়ে যেত না.....।'

কার্যত দেখা গেল, শুরুতে একদল দরিদ্র ও দাস শ্রেণীর মানুষই সমাজের অন্য সবাইকে টেক্কা দিয়ে আগে আগে ইসলাম গ্রহণ করে বসলো। সমাজের ধনি শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের চোখে এটা বিরক্তিকর ঠেকলো। তারা বলতে লাগলো, এই নতুন ধর্ম যদি ভালো হতো, তাহলে ওরা এ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশী জানতো না এবং আমাদের আগে তা গ্রহণ করতো না। যেহেতু আমরা অভিজাত ও উচ্চতর মর্যাদাশালী, আমাদের বুদ্ধিজ্ঞান ওদের চেয়ে বেশী, আমাদের মূল্যায়ন ও বিচার বিবেচনাও অপেক্ষাকৃত ভালো ও সঠিক, সেহেতু আমরাই ওদের চেয়ে বেশী জানি কোনটা ভালো ও কোনটা মন্দ।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা সে রকম নয়। তারা কোনো সন্দেহ সংশয়ের কারণে নয়, কিংবা কোনটা সত্য ও কিসে কল্যাণ তা না জানার কারণেও নয়, বরং নিজেদেরকে মোহাম্মদ (স.)-এর

প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের চেয়ে অনেক উর্ধে মনে করার কারণে এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় পদগুলোর দখল ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো হারানোর ভয়েই তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ ছিলো। তাছাড়া বাপদাদার নামে ও বাপদাদার ধর্মের নামে তারা যে গর্ব করতো, সেটাও ছিলো তাদের এই একগুয়েমির একটা অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরে সেসব বাধাবিঘ্ন ছিলো না, যা অভিজাতদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রেখেছিলো।

আসলে আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই অভিজাত আরবদেরকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও যুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেয়নি। এই আত্মম্ভরিতা ও অহংকারই তাদেরকে একগুয়েমি, হঠকারিতা ও প্রত্যাখ্যানে প্ররোচিত করতো। নানা রকমের ওজুহাত সৃষ্টি করতো ও হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদেরকে উস্কে দিতো। তারা কখনো স্বীকার করতো না যে, তারা ভুল করতে পারে। তারা নিজেদেরকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত গড়ে তুলতো এবং এই বৃত্তের চারপাশেই জীবন কেন্দ্রীভূত থাকুক, এটা আশা করতো।

'আর যখন তারা এ কোরআন দ্বারা হেদায়াত লাভ করতো না, তখন বলতো, এতো পুরানো যুগের আজগুবী কাহিনী।'

বটেই তো! তারা যখন সত্যের অনুসারী হতে পারছে না তখন সত্যের ভেতরেই নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি বা খুঁত রয়েছে! তাদের পক্ষে তো আর ভুল করা সম্ভব নয়। নিজেদের চোখে তারা একেবারেই নিষ্পাপ ও নির্ভুল।

কোরআন ও তাওরাত

ওহী ও রেসালাত সংক্রান্ত এ পর্বটার সমাপ্তি টানা হচ্ছে হযরত মূসার ওপর অবতীর্ণ কেতাবের উল্লেখ এবং এই কোরআন কর্তৃক সেই কেতাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। যেমন ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের একজন কর্তৃক কোরআনের পক্ষে সাক্ষ্য দানের উল্লেখ করা হয়েছে।

'ইতিপূর্বে মূসার কেতাব এসেছিলো পথনির্দেশক ও করুণাস্বরূপ। আর এই কেতাব আরবী ভাষায় সে কেতাবের সমর্থনে করুণা হয়ে এসেছে, যা অপরাধীদেরকে সতর্ক করে ও সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দেয়।'

কোরআন ও তার পূর্বেকার নাযিল হওয়া কেতাবগুলোর বিশেষত হযরত মূসার ওপর নাযিল হওয়া কেতাবের মধ্যকার সম্পর্কের কথা কোরআন বারবারই উল্লেখ করে থাকে। হযরত ঈসার ওপর নাযিল হওয়া কেতাব আসলে তাওরাতেরই পরিপূরক ও ধারাবাহিকতা। তাওরাতেই রয়েছে মূল আকীদা বিশ্বাস ও আইন কানুন। এ জন্যেই হযরত মূসার কেতাবকে 'ইমাম' বা পথ নির্দেশক বলা হয়েছে এবং রহমাত বা 'করুণা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক রসূলের রেসালাতই পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর জন্যে করুণা ও আশির্বাদস্বরূপ। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অর্থেই তা করুণা। আর এটা সত্যায়নকারী ও সমর্থক, যার ওপর সকল নবীর আনীত শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ তায়ালার সেই মূল বিধানের সমর্থক, যার অনুসরণ করেন সকল নবী এবং সেই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও গন্তব্যের সমর্থক, যার দিকে সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে যেতে হবে তার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে।

কোরআন যে আরবী ভাষায় রচিত সে কথাটা বলার উদ্দেশ্য কেবল আরবদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর এই বাড়তি অনুগ্রহটাও করেছেন, এই অতিরিক্ত সুবিধাও দিয়েছেন এবং এই বিশেষ সম্মানেও ভূষিত করেছেন যে, শেষ নবীর মিশনটা সফল করার

জন্যে তিনি তাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তাদের মাতৃভাষাকেই এই মহাগ্রন্থ কোরআনের ভাষা বানিয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে রেসালাতের প্রকৃতি ও তার ভূমিকা বর্ণনা করা হচ্ছে,

'যাতে এ কেতাব অপরাধীদেরকে সতর্ক করে দেয় এবং সৎকর্মশীলদের দেয় সুসংবাদ।'

আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে নেয়ার অর্থ কী?

প্রথম পর্বের শেষভাগে বর্ণনা করা হচ্ছে সৎকর্মশীলদের প্রতিদান এবং কোরআন তাদেরকে যে সুসংবাদ দেয় তার ব্যাখ্যাও দেয়া হচ্ছে। এই সাথে এই সুসংবাদের শর্তও উল্লেখ করা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর একক প্রভুত্বে তথা তাওহীদে ও তাওহীদের অনিবার্য দাবীর ব্যাপারে অটল ও অবিচল বিশ্বাসই হলো সুসংবাদের শর্ত।

'যারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতপর এই কথার ওপর অবিচল থেকেছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের কোনো দুর্ভাবনারও প্রয়োজন নেই। তারা জান্নাতবাসী হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। তাদের সৎকাজের প্রতিদান হিসাবেই এ ব্যবস্থা।'

মনে রাখতে হবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' এ কথাটা শুধু কথার কথাই নয়। এমনকি এটা শুধু অন্তরে পোষণ করা আকীদা বিশ্বাসও নয়। বরং এ হচ্ছে জীবন যাপনের এক পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ড, প্রত্যেকটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রত্যেকটা তৎপরতা ও প্রত্যেকটা মনোভংগী এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' এটা এমন একটা ঘোষণা, যা চিন্তা ও অনুভূতির জন্যেও একটা মানদন্ড নির্ধারণ করে দেয়, একটা সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি স্থির করে দেয় সকল মানুষের জন্যে, যাবতীয় বস্তু ও জিনিসের জন্যে, যাবতীয় কাজ ও ঘটনার জন্যে এবং এ সৃষ্টি জগতে যাবতীয় সম্পর্ক ও সম্বন্ধের জন্যেও।

'আল্লাহ তায়ালাই যখন আমাদের প্রভু ও প্রতিপালক', তখন একমাত্র তাঁরই এবাদাত করতে হবে, একমাত্র তাঁর দিকেই মনকে কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে, একমাত্র তাকেই ভয় করতে হবে এবং একমাত্র তাঁর ওপরই হতে হবে নির্ভরশীল। 'একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যখন আমাদের প্রভু ও মনিব' তখন তিনি ছাড়া আর কারো কাছে আমাদের হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহির প্রশ্ন ওঠে না, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন পড়ে না এবং তাকে ছাড়া আর কারো জন্যে কৌতুহলেরও কিছু নেই।

তিনিই যখন আমাদের প্রতিপালক, তখন যাবতীয় চিন্তা, কর্ম, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন একমাত্র তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই পরিচালিত হবে।

তিনি যখন আমাদের একমাত্র মনিব ও হুকুম দাতা, তখন তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো হুকুম জারী করতে পারে না, তাঁর আইন ছাড়া আর কারো আইন চলতে পারে না এবং তাঁর নীতি ও নির্দেশনা ছাড়া আর কোনো নীতি ও নির্দেশনার আনুগত্য করা যেতে পারে না।

তিনিই যখন আমাদের একমাত্র মনিব, তখন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং আল্লাহর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমার প্রতিটি সৃষ্টির সাথে সমবেত ও একাত্ম। এভাবে 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের একমাত্র প্রতিপালক' এ কথাটা একটা পূর্ণাংগ বিধান, কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারিত একটা কথা মাত্র নয়, কিংবা জীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন কোনো নেতিবাচক আকীদা বিশ্বাসও নয়।

সত্যের পথে অবিচল থাকা

'অতপর অবিচল থেকেছে' এ হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত। বস্তুত এই বিধানের ওপর ঈমান আনার পর তার ওপর অবিচল থাকা, বহাল থাকা বা টিকে থাকা হচ্ছে আর একটা স্তর। এর অর্থ হচ্ছে, মনের স্থিরতা ও প্রশান্তি ভাবাবেগের স্থিরতা ও চিন্তার স্থীতিশীলতা। যেদিক থেকে যতো আকর্ষণীয় বা

লোভনীয় প্রস্তাবই আসুক, তার ঈমান নড়বড়ে হবে না বা সংশয়ের শিকার হবে না এই অবিচলতা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। এ কাজ নানাভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে জীবন বিধানকে একবার গ্রহণ করা হয়েছে, তার ওপর কাজ ও চরিত্র দ্বারা টিকে থাকা এবং পথের সব রকমের বাধা বিঘ্ন, পিচ্ছিলতা ও কাঁটাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়াই অবিচলতার মর্মার্থ। এই পথে প্রতি মুহূর্তে বিপথগামিতার সম্ভাবনা থাকে।

বস্তুত 'আমাদের প্রভু আল্লাহ তায়ালা' এ ঘোষণা আল্লাহর জীবন বিধানকে গ্রহণ করার ঘোষণা মাত্র। এই বিধানকে গ্রহণ করার পরই এর ওপর টিকে থাকার স্তরটা আসে। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে টিকে থাকার ক্ষমতা দেন, তারা হলো আল্লাহর নিষ্কলুষ ও পুণ্যবান বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন। তাদের কোনো ভয়ও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। কিসের ভয় এবং কিসের দুশ্চিন্তা! তারা যে জীবনবিধানকে গ্রহণ করেছে, সেটাই তো তাদেরকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেয়। এর ওপর অবিচল থাকা এই নিশ্চয়তাকে আরো নিষ্কন্টক করে।

'তারাই হচ্ছে জান্নাতবাসী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে-(থাকবে) তাদের সম্পাদিত সৎ কর্মের কারণেই।'

'তাদের সম্পাদিত সৎ কর্ম' এই কথাটা 'আমাদের প্রভু আল্লাহ' এই উক্তির চমৎকার ব্যাখ্যা দেয়। এই জীবন ব্যবস্থার ওপর টিকে থাকার অর্থ কী, তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই উক্তি থেকে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করা অনুরূপ একটা কাজেরই প্রতিদান। অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব' এই ঘোষণা দান এবং এই ঘোষণার ওপর স্থায়ী হওয়া ও টিকে থাকারই প্রতিদান হবে জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকা- এটাই তো স্বাভাবিক!

সুতরাং আমরা একথা উপলব্ধি করতে পারি যে, ইসলামে আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত যেসব কলেমা রয়েছে, সেগুলো কেবল মৌখিকভাবে উচ্চারিত হবার কলেমা নয়। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই-এ সাক্ষ্য দান নিছক একটা মৌখিক মন্ত্র জপ করা নয়, বরং এ হলো একটা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের অংগীকার। এটা যখন নিছক মৌখিক মন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করবে, তখন তা আর ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলে গণ্য হবে না।

এ আলোচনা থেকে আমরা একথাও অনুধাবন করতে পারি যে, বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান যে কলেমায়ে শাহাদাত পড়ে থাকে, তার প্রকৃত মর্যাদা ও মর্মার্থ কী? এই কলেমা তারা কেবল মুখেই উচ্চারণ করে থাকে, এটা তাদের মুখকে অতিক্রম করে না এবং এর কোনো প্রভাবও তাদের বাস্তব জীবনে পড়ে না। ফলে কলেমা পড়া সত্তেও তারা পৌত্তলিকদের মতো জাহেলী জীবন যাপন করে। তাদের মুখ দিয়ে কলেমা উচ্চারিত হলেও তা তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা বা 'আল্লাহই আমাদের একমাত্র রব' বলে ঘোষণা করা যে আসলে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা পালনের অংগীকার সে কথা না বুঝা বা বুঝেও বাস্তবজীবনের সাথে তার মর্মকে সম্পর্কহীন রাখা চরম ধৃষ্ঠতা বৈ কিছু নয় এবং এমনটি যারা করবে তাদের ও কাফেরদের মধ্যে কোনো ব্যবহারিক ব্যবধান আছে বলে মনে করাটা মুর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা বা আল্লাহই আমাদের একমাত্র রব বলে ঘোষণা করা যে আসলে একটা জীবন ব্যবস্থা পালনের অংগীকার সে কথা প্রত্যেক মোমেনের অন্তরে চিরস্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হওয়া দরকার। এতে করে এই ঘোষণায় যে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার অনুসন্ধানে সে ব্যাপৃত হয়ে পড়বে।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

এই পর্বটিতে মানবীয় স্বভাবপ্রকৃতির সরলতা ও বক্রতা এবং সেই সরলতা ও বক্রতার শেষ পরিণতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। শুরুতেই উপদেশ দেয়া হয়েছে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অথবা এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে প্রায়ই এই উপদেশটি দেয়া হয়ে থাকে। কারণ পিতামাতা ও সন্তানের মাঝে যে বন্ধন বিদ্যমান শক্তি ও গুরুত্বের দিক দিয়ে ঈমানী বন্ধনের পরেই তার স্থান সর্বোচ্চে। আল্লাহ ও রসূলের পরেই পিতামাতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের পরেই পিতামাতার আনুগত্যকে এরূপ গুরুত্ব দেয়া দ্বারা দুটো বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত এই যে, পিতামাতার সম্মান ও মর্যাদা সন্তানের কাছে আল্লাহর রসূলের পরেই সর্বাধিক। দ্বিতীয়ত আল্লাহ রসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের বন্ধনই একজন মুসলমানের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক অগ্রাধিকারসম্পন্ন। এর পরই রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

এই পর্বে দুই ধরনের মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির নমুনা প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রথম নমুনাটাতে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের বন্ধন পিতামাতার আনুগত্যের বন্ধন উভয়ের মধ্যে কোনো গরমিল নেই। উভয়টা একই সাথে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় নমুনায় সন্তান ও পিতামাতার মধ্যকার সম্পর্ক এবং আল্লাহর ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী। এই দুটোতে কোনো মিল বা সাযুজ্য নেই। প্রথম নমুনার পরিণাম জান্নাত এবং সুসংবাদই তার প্রাপ্য। আর দ্বিতীয় নমুনার পরিণাম জাহান্নাম এবং তার জন্যে আযাব অনিবার্য। এই প্রসংগে কেয়ামতের একটা দৃশ্যে আযাবের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে পাপাচার ও দাম্ভিকতার শাস্তি কি, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

'আমি মানুষকে তার মা বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।'

এ নির্দেশ শুধু কোনো বিশেষ মানুষকে দেয়া হয়নি, বরং দেয়া হয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে। এর ভিত্তি হলো তার মনুষ্যত্ব ও মানবতা। অন্য কোনো গুণাগুণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ শর্তহীনভাবে মা বাবার সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের অধিকারী বানায়। এ জন্যে তার ভেতরে অন্য কোনো গুণাগুণ থাকার প্রয়োজন হয় না। এই সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে স্বয়ং মানুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে। এ নির্দেশ বিশেষভাবে শুধু মানুষকেই দেয়া হয়েছে। পশুপাখী বা কীটপতংগের জগতে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে কনিষ্ঠদেরকে কখনো নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায় না। এইসব সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা জন্মগতভাবেই তাদের জ্যেষ্ঠদেরকে কনিষ্ঠদের তদারকী ও লালন পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কাজেই আলোচ্য আয়াতে কনিষ্ঠ তথা সন্তানদেরকে মা বাবার তদারকী করা ও যত্ন নেয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কোরআনে ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসে মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে বার বার সন্তানকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে মা বাবাকে নির্দেশ দেয়ার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল এবং কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তা দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, মা বাবা কর্তৃক সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করা তথা সাহায্য করার জন্যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট। মা বাবারা সহজাত আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বত স্ফূর্তভাবেই সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করে থাকে। এ জন্যে স্বতন্ত্র কোনো উদ্বুদ্ধকারীর দরকার হয় না। শুধু তাই নয়, সন্তানের জন্যে এক বিস্ময়কর ও সর্বাত্মক ত্যাগের পরিচয় দিতে গিয়ে এসব সৃষ্টির মধ্যকার অনেক মা বাবা

মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এ জন্যে তারা কোনো বিনিময়েরও আশা করে না। এমনকি এ জন্যে কেউ বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক তাও তারা প্রত্যাশা করে না। কিন্তু নতুন প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী কারো দিকেই তেমন দৃষ্টি দেয় না। যে প্রজন্ম তার জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, তার দিকেও দৃষ্টি দেয় না। কেননা সে আপনা থেকেই সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকেও এটাই আশা করে যে সে তার জন্যে আপন উদ্যোগে ত্যাগ স্বীকার করুক ও তার তদারকী করুক। এভাবেই পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ ঘটতে থাকে।

পরিবারঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মযবুত ভিত্তি

পক্ষান্তরে ইসলাম তার নিজের ভবন নির্মাণের জন্যে পরিবারকেই প্রথম ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে গ্রহণ করে। পরিবারকে সে মানব শিশুর লালন ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করে যেখানে সে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে ও বেড়ে ওঠে। সেখানে যতোটুকু ভালোবাসা, সাহায্য ও সহযোগিতা তার প্রাপ্য, তা সে পেয়ে থাকে। যে শিশু পরিবারের লালন ক্ষেত্রে লালিত পালিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সে শিশু তার জীবনের বিভিন্ন দিকে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম রূপে গড়ে ওঠে, চাই পরিবারের বাইরে তাকে লালন পালনের জন্যে আরাম আয়েশের উপকরণের যতোই প্রাচুর্য থাকুক না কেন। পরিবার ছাড়া আর যেখানেই মানব শিশু লালিত পালিত হবে, তার প্রকৃতিতে সর্বপ্রথম যে জিনিসটার অভাব অনুভূত হবে, তা হলো স্নেহ মমতা ও ভালোবাসা। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশু তার জন্মের প্রথম দু'বছর তার মার ওপর তার একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় এতে তার কোনো অংশীদার সে সহ্য করতে পারে না। অথচ এতিমখানায় বা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে শিশুদের লালন পালনের যে ব্যবস্থা থাকে, সে ব্যবস্থায় এসব উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। সেখানে যে মহিলা শিশুদের লালন পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, সে একসাথে বহুসংখ্যক শিশুকে লালন পালন করে। এসব শিশু পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কারখানায় কর্মরত তাদের মাকে নিয়ে তাদের হৃদয়ে হিংসার বীজ রোপিত হয় প্রথম দিন থেকেই। সুতরাং তাদের মনে আর কখনো শিশুকালে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয় যে, তার লালন পালনের দায়িত্বে কোনো সুনির্দিষ্ট একক ব্যক্তিগত কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত থাকুক, যাতে তার সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অথচ এই প্রয়োজনটা একমাত্র স্বাভাবিক পারিবারিক পরিমন্ডলে ছাড়া আর কোথাও পূরণ হয় না। কলকারখানার শিশু নিকেতনে ভিন্ন ভিন্ন শিফটে ভিন্ন ভিন্ন আয়ার আবির্ভাব হতে থাকে। ফলে সেখানে সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব থাকে না। এভাবে শিশুদের ব্যক্তিত্বও গড়ে ওঠে হরেক রকমের এবং তারা তাদের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শিশু নিকেতনগুলোতে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিদিনই একথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে যে, নিখুঁত ও সুস্থ সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কত তীব্র এবং কেনই বা ইসলাম সেই সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর তার ঈপ্সিত সমাজ গড়তে এতো উদগ্রীব।

সন্তানের কল্যাণে মায়ের আত্মত্যাগ

মায়েরা সন্তানদের সুস্থ বিকাশ ও গঠনের নিমিত্তে যে নযীরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করে এবং সন্তানরা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক মা বাবার সাথে যতো ভালো আচরণই করুক, সেই ত্যাগের বদলা যে কস্মিনকালেও দিতে পারে না, সে কথা কোরআন এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছে এভাবে,

'তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তাকে অতি কষ্টে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও প্রসবান্তে দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে।'

এখানে মূল আয়াতের শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও সুর ব্যঞ্জনা সব মিলে গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন সময়ের কষ্ট ও যন্ত্রণাকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, 'তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে ও অতি কষ্টে প্রসব করেছে।'

এ যেন এমন এক মহিলার জ্বালা যন্ত্রণার সকাতর প্রকাশ, যে এক দীর্ঘস্থায়ী ভারী বোঝা বহন করে হিমশিম খেয়ে গেছে এবং তার শ্বাস প্রশ্বাস নেয়াও যেন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এখানে আসলে গর্ভকালের শেষ দিনগুলোর দৃশ্য এবং প্রসবান্তের বেদনাকাতর দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

গর্ভধারণ যে একজন মায়ের কতবড় ত্যাগ ও কোরবানী তা প্রসূতী বিদ্যা ও ভ্রুণতত্ত্বের বিচারে আমরা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

শুক্রকীটের সাথে ডিম্বানুর মিলন ঘটা মাত্রই তা জরায়ুর প্রাচীরের সাথে যুক্ত হবার জোর প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় এই ডিম্বানু এক মহা রাক্ষুসীতে পরিণত হয়। সে জরায়ুর প্রাচীরকে খেয়ে খেয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। ফলে এ ছিন্ন জায়গায় মায়ের রক্ত নেমে আসে। ডিম্বানু মায়ের রক্তে পরিপূর্ণ একটা পুকুরে সাঁতার কাটতে থাকে। এই রক্ত মায়ের শরীরের যাবতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ। ডিম্বানু এই রক্ত চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে ও বড় হয়, আর জরায়ুর প্রাচীরকে খাওয়া তো তার অব্যাহত থাকেই। একইভাবে রক্ত চুষে খেয়ে জীবনের উপাদানগুলোকে সে নিজ দেহে ধারণ করতে থাকে। বেচারী মা যা কিছু পানাহার করে চুষে খায় ও হযম করে, সবই এই মহা খাদকিনী রাক্ষুসী ডিম্বানুর দেহে নির্যাস ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য হয়ে প্রবেশ করে। এরপর যখন ভ্রুণের দেহে হ'ড্ডি জন্ম নিতে আরম্ভ করে, তখন মায়ের রক্ত থেকে তার শর্করা চোষা আরো বেড়ে যায়। কারণ সে তার হাড়ের গুঁড়ো রক্তে ছড়িয়ে দেয়, যাতে এই ক্ষুদ্র ডিম্বানুটা তা দ্বারা শক্তিশালী হয়। এই হলো এ সংক্রান্ত বিপুলসংখ্যক তথ্যের সংক্ষিপ্ত সার।

এরপর আসে প্রসবের পালা। এটা এমন একটা কঠিন কাজ যে, শরীরটাকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। কিন্তু এর ব্যথা ও যন্ত্রণার তীব্রতা প্রকৃতির কার্যধারাকে বন্ধ করতে পারে না। আর এতো কষ্টের ভেতরেও মা তার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আনন্দময় ঘটনার কথা ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না যে সে পৃথিবীকে একটা নতুন জীবন উপহার দিতে যাচ্ছে। অথচ বেদনায় তার সে কি বেহাল অবস্থা! প্রায় মৃত্যু দশা।

এরপর আসে দুধ খাওয়ানো ও লালন পালনের স্তর। এ সময় মা তার হাড় ও গোশতের নির্যাস বিলীন করে দেয় সন্তানের লালন পালনের মধ্য দিয়ে। এতোবড় ত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও মা থাকে আনন্দিত, তৃপ্ত, দয়ালু ও মমতাময়ী। সদ্যপ্রসূত সন্তানের প্রতি কখনো বিন্দুমাত্র বিরক্তও হয় না। তার জন্যে অনবরত কঠোর পরিশ্রম করে, কখনো তার ধৈর্যের বাঁধও টোটে না। সে তার সমস্ত দুঃখ বেদনার উপশম ও সান্ত্বনা লাভ করে তখন, যখন দেখতে পায় তার সন্তান সুস্থ ও নিরাপদ আছে এবং নাদুস নুদুস হয়ে বেড়ে উঠছে। এটাই তার একমাত্র ও অতীব প্রিয় প্রতিদান ও পুরস্কার। মায়ের এই অতুলনীয় ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতিদান মানুষ কোনভাবেই দিতে পারে না—তা সে মায়ের যতোই সেবা করুক। এতোসব কষ্ট ও ত্যাগের সামনে তার কৃত সমস্ত সেবা যত্ন তুচ্ছ।

তাই রসূল (স.)-এর কাছে যখন এক ব্যক্তি তার মাকে ঘাড়ে করে পবিত্র কা'বায় তওয়াফ শেষে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি? তখন তিনি বলেছিলেন, 'না, এমনকি তোমাকে লালন পালন করতে গিয়ে তোমার মাকে যে অসংখ্যবার নানারকমের বিপদ মুসিবত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুঃখ– যাতনা পোহাতে হয়েছে, তার একটিবারেরও হক আদায় করতে পারেনি।' বস্তুত রসূল (স.) যথার্থই বলেছিলেন।

মা বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সেবা যত্নের উপদেশ দানের পর মায়ের ত্যাগ তিতিক্ষা ও দুঃখ যাতনা ভোগের এই বিবরণ দিয়ে মানুষের বিবেককে তাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর সন্তানের পরিপক্কতা ও বোধশক্তি লাভ এবং স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি অর্জন ও মন মগযের সুপথ প্রাপ্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে,

বয়সের পূর্ণতা ও বুদ্ধির পরিপক্কতা

'অবশেষে যখন সে পরিপক্কতা লাভ করলো এবং চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলো, তখন সে বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে শক্তি দাও যেন আমার ওপর আমার মা বাবার ওপর তুমি যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছো, তার শোকর আদায় করতে পারি, যেন তুমি সন্তুষ্ট হও এমন সৎ কাজ করতে পারি এবং আমার বংশধরদেরকেও তুমি সৎকর্মশীল বানাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।'

৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সময়টাকে বয়সের পরিপক্কতার স্তর ধরা হয়ে থাকে। আর চল্লিশ বছর হচ্ছে পরিপক্কতা ও বিবেকবুদ্ধির পূর্ণতার স্তর। এ সময়েই মানব সত্ত্বার যাবতীয় শক্তিসামর্থ ও বল পূর্ণ পরিণতি অর্জন করে। এ স্তরে পৌঁছার পর মানুষ শান্তভাবে ও ধীরস্থিরভাবে চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনার প্রস্তুতি নেয়। এই বয়সেই একজন সুস্থ, বিকারমুক্ত ও নির্মল স্বভাবধারী মানুষ চলমান জীবনধারার অন্তরালের বিষয় ও ইহকালীন জীবনের পরবর্তী সময়কার বিষয় নিয়ে ভাবতে প্রবৃত্ত হয়। এ সময়েই সে আখেরাত ও কর্মফল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে আগ্রহী হয়।

এখানে কোরআন একজন সুস্থ ও নির্মল প্রকৃতির মানুষের মনে উদ্ভূত ধ্যান ধারণাকে তুলে ধরছে. বিশেষত সেই সময়কার ধ্যান ধারণাকে যখন সে জীবনের একটা যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয় এবং জীবনের একটা স্তর পার হয়ে যখন সে অন্য একটা স্তরে পদার্পণ করতে যায়। এ সময় সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে এবং বলে,

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমতা দাও যেন আমার ওপর ও আমার মা বাবার ওপর তুমি যে অনুগ্রহ করেছো, তার শোকর আদায় করতে পারি ...।'

এ হলো মহান আল্লাহর দান ও অনুগ্রহকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে, এমন ব্যক্তির দোয়া তার নিজেকে ও তার আগে তার মা বাবাকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহকেই শুধু নয়, বরং সেই নেয়ামতের বিশালতা ও বিপুলতাকেও স্বীকার করে আর সে অনুপাতে তার শোকর আদায় খুবই অপ্রতুল রয়ে গেছে– একথাও উপলব্ধি করে এমন ব্যক্তির দোয়া। এহেন ব্যক্তি তার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করছে যেন তিনি তাকে এই অক্ষমতা, অপূর্ণতা ও অপ্রতুলতাকে অতিক্রম করে যথোচিত শোকর আদায়ে সাহায্য করেন এবং শোকর আদায়ের এই বিরাট ও মহান দায়িত্বকে উপেক্ষা করে অন্যান্য কাজে নিজের ক্ষমতার অপচয় না করে।

'আর আমি যেন এমন সৎ কাজে লিপ্ত হই, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও...।' এ হচ্ছে তার আরেকটা দোয়া। সে এমন নেক কাজ করার ক্ষমতা চাইছে, তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার মতো উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের হবে। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হচ্ছে সকল সৎ কাজের চূড়ান্ত ও মূল উদ্দেশ্য এবং ওটাই প্রত্যেক পুণ্যবানের একমাত্র আশা, আকুতি ও অভিলাষ।

'আর আমার বংশধরকেও তুমি সৎকর্মশীল বানাও।' এ হলো তার তৃতীয় দোয়া। এখানে মোমেনের হৃদয়ের যে আকাংখা ও অভিলাষকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা হলো, তার নিজের সৎকর্ম যেন তার বংশধরেব মধ্যেও চালু হয়ে যায়, তার হৃদয় যেন এই মর্মে আশ্বস্ত হয় যে. তার

পরবর্তী প্রজন্মও আল্লাহর এবাদাত করবে ও তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। আল্লাহর সৎ বান্দারা সব সময় সৎ বংশধর কামনা করে থকেন। পার্থিব ধন সম্পদ ও জাঁক জমকের চেয়েও এটা তাদের কাছে অনেক বেশী অগ্রগণ্য এবং অনেক বেশী তৃপ্তিদায়ক। পিতা মাতার দোয়া সন্তানদের পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়, যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলো আল্লাহর আনুগত্য করে ও তাঁর কাছে কৃত সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। এই একনিষ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে যে সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে তাহলো তাওবা ও আত্মসমর্পণ, 'আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম ও আত্মসমর্পণ করলাম।'

এই হচ্ছে আপন মনিবের সামনে প্রকৃত সৎ ও নিষ্কলুষ স্বভাবধারী বান্দার ভূমিকা। ওদিকে বান্দার সাথে মনিবের ভূমিকা কী, সেটাও কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছে,

'এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের কৃত উৎকৃষ্টতম কাজগুলোকে আমি গ্রহণ করি এবং তাদের খারাপ কাজগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতবাসী করি। এটাই তাদের সাথে কৃত সত্য ওয়াদা।'

এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, সর্বোত্তম কাজের জন্যেই পুরস্কৃত করা হবে উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী বান্দাদেরকে আর তাদের কৃত অসৎ কাজগুলোকে ক্ষমা করা হবে। তারপর তাদের শেষ ঠিকানা হবে জান্নাত। জান্নাতের আসল অধিবাসীদের সাথেই তারা অবস্থান করবে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তিনি পালন করবেন। তিনি কখনো ওয়াদা ভংগ করবেন না। তাদেরকে তিনি বিপুল নেয়ামত ও অনুগ্রহ দিয়ে পুরস্কৃত ও তুষ্ট করবেন। এরপর আসছে অন্য নমুনাটার বিবরণ। এটা হলো বিভ্রান্তি, বিপথগামিতা ও পাপাচারের নমুনা,

পিতা মাতার মনে কষ্ট দেয়া

'আর যে ব্যক্তি তার মা বাবাকে বলে, তোমাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম! তোমরা কি আমাকে এই এই ভয় দেখাচ্ছ যে, আমি কবর থেকে উত্থিত হবো? অথচ আমার আগে কতো জাতি অতিবাহিত হয়েছে।'

অর্থাৎ মোমেন পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান সর্বপ্রথম অত্যন্ত আক্রমণাত্মক, ধৃষ্টতাপূর্ণ ও কটু বাক্যের মাধ্যমে তাদেরকে বলে, 'উহ, তোমাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম।' তারপর সে একেবারেই খোঁড়া ওজুহাত দেখিয়ে আখেরাতকে অস্বীকার করে। সে বলে, তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাচ্ছ যে, আমাকে কবর থেকে বের করা হবে? অথচ আমার আগে বহু জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে।' অর্থাৎ যারা বলে গেছে, তাদের কেউ তো ফিরে এসে ভয় দেখালো না যে; কেয়ামত একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। সকল মানুষকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে পার্থিব জীবনের সমাপ্তির পর! কেউ বলেনি যে, এভাবে জীবনটা ভাগ হয়ে গেছে। একটা প্রজন্ম এক সময়ে আবির্ভূত হবে, চলে যাবে এবং আরেকটা প্রজন্ম আসবে। সুতরাং দুনিয়াটা কোনো খেলা নয় এবং নিরর্থকও নয়। পার্থিব জীবনের চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ অবশ্যই দিতে হবে। (অর্থাৎ দুনিয়াতেই তার পর্যালোচনা হয়ে থাকে)।

তার মা বাবা তার এই কুফরিতে পরিপূর্ণ কথাবার্তা ও আখেরাতের অস্বীকৃতি শুনতে থাকে, মা বাবার অবাধ্য ও আল্লাহর অবাধ্য এই সন্তানের উদ্ধৃত কথাবার্তা তাদেরকে আতঙ্কিত করে,

'তার (মা বাবা) উভয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, আর তাকে বলে, (তোমার সর্বনাশ হবে। ঈমান আনো। আল্লাহর আযাবের বাণী ফলে গেছে সেই সব জাতির সাথে যারা ইতিপূর্বে জ্বিন ও মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নিশ্চয়ই তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

তার ওপর ও তার মতো অন্য যেসব কাফেরের ওপর যে বাণী ফলেছে, তা হচ্ছে তাদের আখেরাতের আযাব। এসব কাফেরের সংখ্যা অনেক। তারা জ্বিন ও মানুষ উভয় জাতভুক্ত এবং তারা অতীত হয়ে গেছে। তাদের ওপর আযাব আসা অবধারিত। আল্লাহর এ ওয়াদা কখনো ভংগ হবার নয়। 'তারা ক্ষতিগ্রস্ত।' বস্তুত পৃথিবীতে ঈমান থেকেও আখেরাতে বেহেশত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু হতে পারে না। তদুপরি বিপথগামীদের জন্যে যে আযাব অবধারিত তার চেয়ে বড় ক্ষতি তো আর কল্পনাই করা যায় না।

'সৎপথে চালিত ও বিপথগামী এই উভয় শ্রেণীর শাস্তির কথা সাধারণভাবে বর্ণনা করার পর এই উভয় শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে,

'প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুপাতে শ্রেণী বিন্যস্ত হবে। তাদের সকলের কৃতকর্মে ফল দেয়া হবে। তাদের ওপর কোনোই অবিচার করা হবে না।'

বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বা মান রয়েছে। অনুরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মও রয়েছে। উপরোক্ত সাধারণ ঘোষণার আওতায় প্রত্যেক শ্রেণীকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, এই দুটো নমুনা মানব সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এ দুটো নমুনাকে এখানে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মনে হয় এ দুটো কোনো শ্রেণী নয়, বরং এরা সুনির্দিষ্ট দুই ব্যক্তি।

কিছু কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এ দুটো নমুনা আসলে দু'জন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। তবে এই বর্ণনা শুদ্ধ নয়। তাই এই দুটোকে দুটো শ্রেণী মনে করাই উত্তম। ফলে উভয়ের যে ফলাফল জানানো হয়েছে, তা সে নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্যেই নির্দিষ্ট থাকবে। প্রথম ফলটা হলো, 'তারাই সেই সব লোক, যাদের সর্বোত্তম কাজ আমি গ্রহণ করি ...' দ্বিতীয় ফল হলো, 'তারাই সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহর আযাবের বাণী অবধারিত হয়ে গেছে ... আর সবার শেষে সাধারণভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 'প্রত্যেকের জন্যে স্ব স্ব কৃতকর্ম অনুযায়ী মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে ....' এর প্রত্যেকটা আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ দ্বারা প্রত্যেকটা নমুনার জন্যে আলাদা আলাদাভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

এরপর কাফেরদের সামনে আখেরাতের শাস্তিকে তুলে ধরা হয়েছে,

'সে দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে রাখা হবে। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে তোমাদের ভালো ভালো জিনিস নিয়ে গেছো ও উপভোগ করেছো। সুতরাং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যে দম্ভ দেখাতে এবং যে পাপাচারে লিপ্ত থাকতে তার বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে।'

দৃশ্যটা অত্যন্ত অপ্রতিরোধ্য ও দ্রুতগামী। তবে এতে একটা গভীর তাৎপর্যবহ জিনিস রয়েছে। সেটা হলো দোযখের সামনে কাফেরদের হাযির করার দৃশ্য। তারপর দোযখে নিক্ষেপের আগে তাদেরকে দোযখের কিনারে রাখা ও দোযখে নিক্ষেপের কারণ জানানো হবে যে, 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে তোমাদের ভালো ভালো জিনিস নিয়েছো ও উপভোগ করেছো ....' অর্থাৎ ভালো ভালো জিনিস তাদের ছিলো। কিন্তু তার সব তারা দুনিয়াতেই খেয়ে শেষ করেছে, আখেরাতের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করেনি। আখেরাতের জবাবদিহীর কথা চিন্তা না করেই সব উপভোগ করেছে। যেভাবে জন্তু জানোয়াররা উপভোগ করে সেইভাবে। আল্লাহর শোকরও আদায় করেনি। হালাল হারাম বাছ বিচারও করেনি। তাই তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনটাই সার হবে, আখেরাত বলতে তাদের কিছুই থাকবে না। দুনিয়ার ক্ষুদ্র একটা মুহূর্তকে তারা আখরাতের সেই

বিশাল জীবনের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছে, যার কোনো সীমা পরিসীমা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো জানা নেই। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাই পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।'

আদ জাতির ঘটনা

ভিন্ন প্রসঙ্গের এই পর্বটি আলোচ্য সূরায় মূল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং সাথে সাথে আগের দুটো পর্ব থেকে ভিন্ন মাত্রার একটি বিষয়ের প্রতি তা মানুষের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করছে। বিষয়টি হচ্ছে আ'দ সহ মক্কার আশপাশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও বিলুপ্তির ঘটনা সম্পর্কিত। মক্কার মোশরেকদের সাথে ওদের মিল ছিলো। কারণ, মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে মক্কার মোশরেকরা যে আচরণ করেছে, যে নীতি অবলম্বন করেছে, ঠিক সেই একই আচরণ ও নীতি আ'দ সম্প্রদায় তাদের নবী হুদ (আ.) ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো নিজ নিজ নবী রসূলদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলো। তারা তাদের নবীদের কাছে বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর প্রশ্ন করতো আর তারাও তাদের নবুওতের দায়িত্ব ও মানবীয় ক্ষমতার আওতায় ভেতর থেকে যতটুকু সম্ভব এর যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু যখন তারা তাদের নবীদের সতর্কবাণীর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি, তখনই তাদেরকে কঠিন আযাব এসে গ্রাস করে নিয়েছে এবং পৃথিবীর বুক থেকে তাদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অথচ তারা ছিলো শৌর্য বীর্যের অধিকারী। কিন্তু এই শৌর্য বীর্য তাদেরকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তারা ছিলো অঢেল ধন সম্পদের অধিকারী। কিন্তু এই ধন সম্পদও তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তারা ছিলো অপূর্ব মেধা ও মননশীলতার অধিকারী। কিন্তু এই মেধা ও মননশীলতা তাদের কোনোই কাজে আসেনি। এমনকি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ওরা যেসব দেবদেবীর পূজা অর্চনা করতো, সেগুলোও তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

এ সকল ঘটনা মক্কার মোশরেকদেরকে তাদের একই পথ ও আদর্শের অধিকারী পূর্বপুরুষদের ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। ফলে এর মাধ্যমে তারা নিজেদের করুণ পরিণতিকেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এ সকল ঘটনা তাদেরকে রেসালাতের সরল, আবহমান ও নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় সামনে এনেও দাঁড় করায়। এই সেই ধারা যা একক ও অভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত, যার কোনো পরিবর্তন নেই, কোনো বিবর্তন নেই। কারণ, সকল যুগের সকল নবী রসূলের মূল আকিদা ও আদর্শ হচ্ছে অভিন্ন, এর মূল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত এবং এর শাখা প্রশাখা কাল থেকে কালান্তরে বিস্তৃত।

'আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করো, তার আগে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিলো ...। (আয়াত ২১)

আলোচ্য আয়াতে আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই বলতে হুদ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআন তাকে আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই বলে আখ্যায়িত করে সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো সে কথা বুঝাতে চায়। অর্থাৎ এই সম্পর্কের দাবী ছিলো, হুদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়া, তাঁর প্রতি সদাচরণ করা এবং সর্বোপরি তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। ঠিক একই ধরনের সম্পর্ক ছিলো শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে। অথচ তারা তাঁর সাথে বৈরী ও শত্রুতামূলক আচরণ করছিলো।

বালুর উঁচু টিলাকে আরবীতে 'হেকফুন' বলা হয়। এরই বহুবচন হচ্ছে 'আহকাফুন'। আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন উঁচু টিলাতে আ'দ জাতি বসবাস করত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর

প্রিয় নবীকে আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই অর্থাৎ হুদ (আ.)–এর ঘটনা স্মরণ করতে বলছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দেয়া এবং এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তারই মতো একজন নবী ভাই হওয়া সত্তেও সম্প্রদায় ও লোকজনের কাছ থেকে কি ধরনের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ পেয়েছেন। অনুরূপ আচরণ তিনিও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা সত্তেও নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাচ্ছেন। কাজেই তিনি এই ঘটনার বিষয়ে অবগত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবেন। কারণ অতীতে যারাই এ ধরনের আচরণ করেছে তারাই এই অশুভ পরিণতির শিকার হয়েছে। তারা দূরের কেউ নয়, বরং তারা এদের আশপাশেরই এলাকার লোকজন।

হুদ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে সতর্ক করেছিলেন। এ কাজ তিনি একাই করেননি, তাঁর আগেও নবী রসূলরা একই কাজ করেছেন। তাঁরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে সতর্ক করেছেন, অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ এবং নবুওত ও রেসালাতের দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। এটা নতুন বা আজগুবি কোনো বিষয় নয়, বরং এটা অতি পরিচিত ও চিরাচরিত একটা বিষয়!

আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো এবাদাত করা যাবে না–এ বিষয়েই হুদ (আ.) সহ অন্যান্য নবী রসূলরা মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন যে, 'আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।' এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর এবাদাতকে মনের বিশ্বাস এবং জীবনের আদর্শ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এর বিপরীত করলে পৃথিবীতে অথবা পরকালে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আলোচ্য আয়াতে, 'মহান দিবস' বলতে কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তকে বুঝানো হয়েছে।

হুদ (আ.)– কর্তৃক আল্লাহর পথে এই আহ্বান ও কঠিন শাস্তির ভয় দেখানোর উত্তরে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যে তাচ্ছিল্যপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলো তার ভাষা হচ্ছে এই, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেবদেবী থেকে দুরে সরাতে এসেছো? যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদেরকে যে বিষয়ের (শাস্তির) ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আসো।' (আয়াত ২২)

তাদের এই উত্তরে এক ধরনের কুধারণা, নির্বুদ্ধিতা, সতর্ককারীর প্রতি চ্যালেঞ্জ, আসমানী গযবকে ত্বরান্বিত করার আবদার, বিদ্রূপ ও অস্বীকৃতি এবং মিথ্যার ওপর অটল থেকে তা নিয়ে গর্ব করার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

অপরদিকে আল্লাহর নবী হুদ (আ.) এসব বিষয় নবীসুলভ উদারতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে মোকাবেলা করছেন। তাঁর মাঝে কোনো অহমিকাবোধ নেই এবং নেই কোনো সীমালংঘন। অত্যন্ত নরম ও বিনয়ী ভাষায় তিনি বলছেন, 'এ জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা সত্যিই এক মূর্খ সম্প্রদায়।' (আয়াত ২৩)

অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব হলো, তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া এবং আসমানী গযবের ব্যাপারে তোমাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়া। এই গযব কখন পতিত হবে এবং এর ধরণ ধারণ কি হবে, এসব আমার জানার বিষয় নয়, বরং আমি তো তাঁর থেকে একজন বার্তাবাহক মাত্র। এর অতিরিক্ত কিছু জানার বা করার শক্তি আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দেননি। তবে তোমাদের এসব দাবী দাওয়ার পেছনে তোমাদের বোকামীই কাজ করছে বলে আমি মনে করি। কারণ একজন হিতাকাংখী ও পরমাত্মীয় যিনি তোমাদেরকে আসন্ন আসমানী গযবের ব্যাপারে সতর্ক করছে তাকে চ্যালেঞ্জ করা বা অস্বীকার করার মতো বড় বোকামী ও মূর্খতা আর কী হতে পারে?

আদ জাতির ওপর আল্লাহর গযব

হুদ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যকার এই দীর্ঘ বিতর্কের প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করে পরবর্তী চূড়ান্ত প্রসঙ্গের প্রতি আয়াতের বক্তব্য মোড় নিচ্ছে। সেই চূড়ান্ত প্রসঙ্গটি হচ্ছে হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের চ্যালেঞ্জের জবাব এবং তারা দ্রুত যে বিষয়টির কামনা করেছিলো তার বাস্তবায়ন। বলা হয়েছে, 'তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখলো, তখন বললো, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে ...। (আয়াত ২৪-২৫)

আলোচ্য আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, গোটা আদ জাতি প্রচন্ড গরম ও খরা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। অসহনীয় তাপদাহ গোটা পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিলো। সেই সংকটময় মুহূর্তে একখন্ড মেঘ তাদের দিকে ভেসে আসে। সেটা দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সেটাকে বরণ করে নেয়ার জন্যে তারা উপত্যকায় নেমে আসে। তারা মনে করেছিলো এ মেঘ তাদের জন্যে বৃষ্টি বহন করে এনেছে। তাই আনন্দে তারা বলে উঠেছিলো, 'এ তো হচ্ছে মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে' ... কিন্তু নেপথ্য থেকে সত্যের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেয়, 'বরং এটা সেই বস্তু যা পাওয়ার জন্যে তোমরা অধীর হয়ে পড়েছিলে। এটা এমন বায়ু যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি যা তার পালনকর্তার আদেশে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' এই আসমানী আযাব টর্নেডো যেখানেই আঘাত হেনেছে সেখানেই সবকিছুকে তছনছ ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় বায়ুকে জীবন্ত, সংবেদনশীল ও প্রলয়ঙ্করী রূপে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'যে বায়ু তার প্রভুর নির্দেশে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়।' ... এর দ্বারা পবিত্র কোরআন মানব জাতির মন মস্তিষ্কে এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে, এই জগতের প্রতিটি বস্তু জীবন্ত, এর প্রতিটি শক্তি সংবেদনশীল এবং নিজ স্রষ্টার নির্দেশের ব্যাপারে সচেতন। ফলে নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। মানব জাতিও এই বিশাল জগতের অন্যতম একটি শক্তি। যখন প্রকৃত ঈমান তার মাঝে সৃষ্টি হয়, যখন জ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টির আলোকে তার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়, তখন সে তার চারপাশের জাগতিক শক্তিগুলো অনুভব করতে সক্ষম হয়। তখন সে এগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং সেগুলোও জীবন্ত ও সচেতন বস্তুর ন্যায় তার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এখানে জীবন ও সংবেদনশীলতার স্বাভাবিক মানবপরিচিত রূপের কোনোই প্রয়োজন হয় না। কারণ, প্রতিটি বস্তুর মাঝেই আত্মা রয়েছে ও জীবন রয়েছে। তবে আমরা তা সাধারণত উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ, দৃশ্যমান জগত আমাদের সামনে অদৃশ্য জগতের সব কিছুকেই আড়াল করে রেখেছে। আমাদের আশপাশে যে জগত দৃশ্যমান এর অন্তরালে রয়েছে অসংখ্য গোপন রহস্য তা কেবল দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমেই অবলোকন করা যায়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে নয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বায়ু আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছে এবং সব কিছুকেই তছনছ করে দিয়েছে। ফলে সেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকগুলোর শূন্য ভিটের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। তারা নিজেরা, তাদের গবাদি পশু, তাদের আসবাবপত্র এবং তাদের ধনদৌলত পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। তাদের সামান্য চিহ্নটুকু অবশিষ্ট থাকেনি। তাদের ভিটে বাড়ীগুলো ঠিকই ছিলো, কিন্তু তা ছিলো নির্জন ও ভূতুড়ে। সেখানে কোনো ঘরও ছিলো না। এমনকি কোনো চুলাও ছিলো না। আর এভাবেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়ে থাকি।' অর্থাৎ অপরাধী জাতিগুলোকে শায়েস্তা করার নিয়মে কোনোই ব্যত্যয় ঘটবে না।

ধ্বংসও বিনয়ের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য উপস্থাপন করার পর এবার অনুরূপ মন মানসিকতার অধিকারী উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং তাদের মনে আতঙ্ক ও কাঁপুনি জাগিয়ে তোলার জন্যে বলা হচ্ছে, 'আমি তাদেরকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলাম তা তোমাদেরকে দেইনি। আমি তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছিলাম কিন্তু তা তাদের কোনো কাজে আসলো না ... । (আয়াত ২৬)

অর্থাৎ আমার নির্দেশপ্রাপ্ত বায়ুর আঘাতে যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো তাদেরকে আমি যে শক্তি সামর্থ, ধন দৌলত, জ্ঞান বিজ্ঞান ও সহায় সম্পদ দান করেছিলাম তা তোমাদেরকে দান করিনি। এছাড়া তাদেরকে আমি কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরও দান করেছিলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআন মানুষের চিন্তা শক্তিকে কখনও হৃদয় (কুলব), কখনও অন্তর (ফুয়াদ), কখনও বুদ্ধি (লুব) আবার কখনও জ্ঞান (আক্ল) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করে। এ সব ক'টি শব্দ দ্বারা কোনো না কোনোভাবে মানুষের অনুভূতি ও অনুধাবন শক্তিই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় শক্তি তাদের কোনোই কাজে আসেনি। কারণ, এগুলোকে তারা অকেজো করে রেখেছিলো, আবৃত করে রেখেছিলো। তার প্রমাণ হলো, 'ওরা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিলো।' আর যারা আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনগুলোকে জেনে শুনে অস্বীকার করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলোকে মিটিয়ে দেয়, অকার্যকর করে ফেলে। ফলে তাদের মাঝে কোনো অনুভূতি থাকে না, কোনো চিন্তাশক্তি থাকে না এবং থাকে না কোনো দিব্যদৃষ্টি। আর সে কারণেই যে আসমানী গযব নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপে লিপ্ত হয়েছিলো, সেই গযবই তাদেরকে পেয়ে বসে।

এ ঘটনা থেকে প্রত্যেক বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে যে, নিজের শক্তি, ধন ও বিদ্যার ব্যাপারে কেউ যেন আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার না হয়ে পড়ে। কারণ, প্রকৃতির মাঝে যে শক্তি রয়েছে তা সে ক্ষমতাবান, ধনবান ও জ্ঞানবানদের ওপর চেপে বসলে আর রক্ষা নেই, তাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ছেড়ে দেবে। তখন তাদের ভিটে বাড়ী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। নাফরমান ও অপরাধীদেরকে আল্লাহ তায়ালা এভাবেই পাকড়াও করেন। এটা তার অমোঘ বিধান।

প্রকৃতির ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহর নির্ধারিত জাগতিক নিয়ম অনুসারে বায়ু স্বয়ংক্রিয় শক্তির অধিকারী। কোনো কিছুকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ তায়ালা এই শক্তি প্রয়োগ করেন। তখন এই শক্তি জাগতিক নিয়মের অধীনেই পরিচালিত হয় এবং নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান মোতাবেকই কাজ করে থাকে। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনের আদৌ কোনো প্রশ্ন ওঠে না যেমনটি সংশয়বাদীরা মনে করে থাকে। প্রাকৃতিক বিধানের যিনি স্রষ্টা তিনিই প্রতিটি বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করে রেখেছেন। কোনো ঘটনা, কোনো ক্রিয়া, কোনো লক্ষ্য, কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুই এই প্রাকৃতিক নিয়ম ও নির্ধারিত পরিমাণের বাইরে নয়।

অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির মতো বায়ুও আল্লাহর নির্দেশে কাজ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মানবশক্তিও আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে থাকে। মানবশক্তির সহায়ক শক্তি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা নিজ ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাই মানুষ যখন কোনো কাজের উদ্যোগ নেয় তখন সে এই জগতে তার নির্ধারিত ভূমিকা পালন করার জন্যেই তা নেয়। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়েরই বাস্তবায়ন ঘটায়। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও পছন্দ অপছন্দ

প্রকৃতির সামগ্রিক বিধানেরই একটা অংশ মাত্র। এর মাধ্যমে জগতের সাধারণ নিয়ম শৃংখলার মাঝে একটা ভারসাম্য রক্ষা হয়। জগতের প্রতিটি বস্তুই একটা নির্ধারিত নিয়ম ও সীমা রক্ষা করে চলছে। এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই, অনিয়ম নেই।

আদ সম্প্রদায়সহ মক্কার আশেপাশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতির বিবরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এই পর্বটির শেষে বলা হচ্ছে, 'আমি তোমাদের আশপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি যাতে তারা ফিরে আসে ... (আয়াত ২৭, ২৮)

আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী যেসব সম্প্রদায় তাদের নবী রসূলদেরকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন দক্ষিণাঞ্চলের আ'দ সম্প্রদায়, উত্তরাঞ্চলের হেজর নামক নগরে বসবাসকারী সামুদ সম্প্রদায়, ইয়েমেনের সাবা সম্প্রদায় এবং মাদইয়ান সম্প্রদায় যারা মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করত। তেমনিভাবে লূত সম্প্রদায় যাদের বাস ছিলো উত্তরাঞ্চলে। এই অঞ্চল দিয়ে মক্কার লোকেরা গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য সফরে যেতো।

এ সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তারা তাদের ভ্রান্তপথেই থেকে গেছে। ফলে তিনি তাদের ওপর কঠিন শাস্তি নাযিল করেছেন। এই শাস্তি ছিলো বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির এবং এগুলো পরবর্তী লোকজনদের জন্যে শিক্ষার ঘটনা হিসেবে রয়ে গেছে। এসব ঘটনা জেনে তারা যেন সতর্ক হতে পারে। মক্কার মোশরেক সম্প্রদায় এসব ঘটনার নীরব সাক্ষী স্থানগুলো দিয়ে অহরহ যাতায়াত করতো।

তাই আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি সেই চিরন্তন সত্যের দিকেই আকৃষ্ট করছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও মোশরেক সম্প্রদায়গুলোকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের কল্পিত দেবদেবীরা তাদেরকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি, অথচ তারা মনে করতো, এদের পূজা অর্চনা করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবই তাদের ভাগ্যে জুটেছে। এই বাস্তব সত্যটির প্রতিই ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলো, তারা তাদেরকে সাহায্য করলো না কেন?' (আয়াত ২৮) ওরা এদেরকে সাহায্য করা তো দূরে থাকো, বরং এদেরকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। তাই বলা হয়েছে, 'এটা ছিলো তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়' ওদের এসব পরিণতি ধ্বংস ও বিনাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই যারা আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে তারা এই পরিণতির বাইরে আর কী আশা করতে পারে? তাদের পরিণতি তো এটাই হতে বাধ্য।

জ্বিনদের ঈমান আনার ঘটনা

আলোচ্য সূরার এই পর্বে জ্বিনদের ঈমান আনার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যারা পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনতে পেয়ে অন্যদেরকেও তা নীরবে নিশব্দে শোনার জন্যে ডেকেছিলো। তাদের মনে প্রশান্তি এসেছিলো এবং ঈমানের আলোকে তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলো। সাথে সাথে তাদেরকে পরকালের ক্ষমা ও মুক্তির সুসংবাদ জানিয়ে

নাফরমানী ও গোমরাহীর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করেছিলো। এখানে তাদের ঘটনাটি একটি অতীত বিষয়ের রূপে আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের মধুর বাণীতে তাদের হৃদয় মন কতটুকু উদ্বেলিত ও প্রভাবিত হয়েছিলো তা সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে তাদের এই বাক্যটিতে 'চুপ থাকো' অর্থাৎ কোরআনের বাণী তাদের কানে এসে ঝংকৃত হওয়ার সাথে সাথে তারা তা মনযোগ সহকারে শুনতে থাকে এবং পরস্পরকে চুপ থাকতে বলে।

আলোচ্য পর্বে জ্বিনদলের ঘটনা ও তাদের বক্তব্য মানুষের মনকে নাড়া দেয়ার জন্যেই উল্লেখ হয়েছে। এই ঘটনা সত্যই মানব হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। কারণ পবিত্র কোরআন মূলত তাদের হেদায়াতের জন্যে এসেছে। অথচ এর দ্বারা জ্বিন জাতিও হেদায়াত লাভ করছে। জ্বিন দলের যে বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কোরআন ও মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিলকৃত তাওরাত একই সূত্র হতে উৎসারিত। উভয়টি আসমানী কেতাব। এই সত্যটি জ্বিন জাতি উপলব্ধি করতে পারলো, অথচ মানব জাতি তা পারলো না। ওদের এই সত্য উপলব্ধির মাঝে একটা গভীর আবেদন রয়েছে যা আলোচ্য সূরার মূল বিষয়ে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

জ্বিন দলের বক্তব্যের মাঝে বিশ্বজগতের প্রকাশ্য নিদর্শনগুলোর প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে এবং এর দ্বারা এই সত্যটিই বুঝানো হয়েছে যে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই মৃতকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতাও রাখেন। অথচ এই সত্যটিকে অনেকেই স্বীকার করতে চায় না, বরং এ নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়।

পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনার মাঝে কেয়ামতের একটি ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'সেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে।' .... (আয়াত ৩৪)

সূরার শেষে রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি উপদেশ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং কাফেরদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে তা নির্ধারিত সময়ের জন্যে ছেড়ে দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। আর এই নির্ধারিত চরম সময়টি খুবই নিকটবর্তী, যেন ঘন্টাখানেক পরেই আসবে। কাজেই সেই চরম মুহূর্তটি আসার আগেই তাদেরকে এই সতর্কবাণী পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

পবিত্র কোরআন অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে শোনার পর জ্বিন দলটি যে বক্তব্য পেশ করেছে তাতে পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো এসেছে। অর্থাৎ ওহীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, তাওরাত ও কোরআনের প্রতি অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করা, পবিত্র কোরআন যে সত্যের সন্ধান দেয়, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, পরকালের হিসাব নিকাশ, সৎকর্মের পুরস্কার এবং অসৎ কর্মের শাস্তিসহ অন্যান্য বিষয়গুলো বিশ্বাস করা, সৃষ্টি ও লালন পালনের একক ক্ষমতার অধিকারীরূপে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করা যে, যিনি জগত সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিতও করতে পারেন। এসব বিষয় ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিষয় এই সূরাতে আলোচিত হয়েছে তা সবই জ্বিন দলটির বক্তব্য হিসেবে এসেছে যারা মানব জাতি থেকে ভিন্ন একটি জাতি।

উল্লেখিত জ্বিন দলটির বক্তব্য আলোচনা করার আগে খোদ জ্বিন জাতি সম্পর্কে এবং তাদের এই ঘটনা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই।

জ্বিন সম্পর্কে কোরআন হাদীসের বক্তব্য

জ্বিন বলতে কোনো প্রাণী আছে কিনা, তাদেরকে কেন্দ্র করে এমন কোনো ঘটনা আদৌ ঘটেছে কিনা, তারা আরবী ভাষায় নাযিলকৃত কোরআনের ভাষা বুঝতে পারে কিনা, তারা মোমেন

বা কাফের হতে পারে কিনা, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত বা পথভ্রষ্ট হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে কিনা– এসব কয়টি প্রশ্নের নিষ্পত্তি খোদ কোরআন বর্ণিত এই ঘটনাটি দ্বারাই হয়ে যায়–যাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, জ্বিন জাতির একটি বিশেষ দল পবিত্র কোরআন শোনার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)–এর কাছে গিয়েছিলো এবং তারা এই বলেছিলো ও এই করেছিলো। এই অকাট্য ও সন্দেহাতীত প্রমাণের অতিরিক্ত আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দলীল প্রমাণের মাধ্যমে যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করছেন, পুনরায় তার নিষ্পত্তির ক্ষমতা ও অধিকার কোনো মানুষের থাকতে পারে না। তারপরেও মানবীয় দৃষ্টিভংগি থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

আমাদের আশপাশে যে জগত দৃশ্যমান তা রহস্যে পূর্ণ, তাতে রয়েছে অজানা অচেনা অনেক সৃষ্টি ও শক্তি। আমরা এসব অজানা শক্তি ও রহস্যের কোলে বাস করছি। এ সবের কিছু কিছু আমাদের জানা, তবে এর অধিকাংশই অজানা। প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন রহস্য ও শক্তি উদঘাটন করছি এবং এদের সম্পর্কে জানতে পারছি। অনেক সৃষ্টিকে তার আসল পরিচয়ে আমরা জানতে পারছি। আবার কখনও জানতে পারছি এদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্টের মাধ্যমে। আবার কখনও জানতে পারছি আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে বিদ্যমান তাদের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে।

এ বিশাল জগত সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, তা এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গেছে। কারণ এই বিশাল জগতের যে স্থানটুকুতে আমরা বাস করছি, আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস করেছেন এবং যেখানে আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা বাস করবে তা এই বিশাল জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। নিখিল বিশ্বের বিশাল আকৃতি ও পরিমাপের তুলনায় আমাদের আবাসস্থল পৃথিবী নামক এই গ্রহটি উল্লেখ করার মতো কিছুই নয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক স্তরে থেকেও আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু জানতে পেরেছি তা কেবল পাঁচশতক পূর্বের জানা বিষয়াদির তুলনায় জ্বিন জাতির অস্তিত্বের চেয়েও অনেক অনেক বেশী রহস্যপূর্ণ ও বিস্ময়সমূহের। যে অণু পরমাণুর রহস্য সম্পর্কে আজ আমরা আলাপ আলোচনা করছি, তা যদি পাঁচশত বছর আগের কারো সাথে করতাম তাহলে তারা আমাদেরকে নির্ঘাত পাগল ঠাওরাতো, অথবা এটাকে তারা জ্বীনের চেয়েও আজগুবী ও বিস্ময়কর একটি বিষয় বলে মনে করতো।

আমরা যা কিছু জানছি, যা কিছু আবিষ্কার করছি তা আমাদের মানবীয় ক্ষমতার আওতায়ই করছি। এই শক্তি ও ক্ষমতা পৃথিবীর বুকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যেই আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। কাজেই এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন এবং যতটুকু সহায়ক, কেবল ততটুকুই জানা ও আবিষ্কারের জন্যে আমাদেরকে ক্ষমতা ও শক্তি দেয়া হয়েছে। প্রকৃতি ও পরিধির দিক দিয়ে আমাদের জ্ঞান ও আবিষ্কার এই প্রয়োজনের সীমাকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। মানবতার আয়ুষ্কাল যতোই দীর্ঘায়িত হোক না কেন, জগতের বিভিন্ন শক্তি আমাদের যতোই করায়ত্ত হোক না কেন এবং এই জগতের বিভিন্ন রহস্য যতোই উদঘাটিত হোক না কেন, আমাদের জানা ও আবিষ্কার এই সীমারেখাকে কখনও অতিক্রম করবে না। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা, এটাই আল্লাহর হেকমত।

ভবিষ্যতে আমরা আরো অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারবো, আরো অনেক কিছু জানতে পারবো, এই সৃষ্টিজগতের অনেক অজানা রহস্য ও তথ্য উদঘাটন করতে পারবো। যার ফলে হয়ত অণু পরমাণুর রহস্য এ সবের তুলনায় বাচ্চাদের খেলনা বলে মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও

আমাদের পক্ষে মানবীয় জ্ঞানের সীমারেখা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না এবং সম্ভব হবে না আল্লাহর এই বক্তব্যকে অতিক্রম করা যে, 'তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে .....' হাঁ, এই বশাল জগতের অন্তর্নিহিত রহস্যাদির তুলনায় আমাদের জ্ঞান খুবই নগণ্য ও সামান্য। এসব রহস্যের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র সেই আল্লাহরই রয়েছে যিনি এসবের সৃষ্টিকর্তা ও লালনকর্তা। তিনি যে অসীম জ্ঞানের অধিকারী আর মানবজাতির জ্ঞানের আওতা ও এর উপায়– উপকরণ যে সীমিত সে সত্যটি পবিত্র কোরআনের এই আয়াতেই প্রতিফলিত হয়েছে, 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে যদি কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী শেষ করা যাবে না। (সূরা লোকমান ২৭)

এই যখন আমাদের অবস্থা তখন আমাদের দৃষ্টির বাইরেব অজানা রহস্যময় জগতের কোনো কিছু আছে কি না আছে এবং তা বোধগম্য কি বোধগম্য নয়, এ ব্যাপারে জোর দিয়ে কিছু বলা আমাদের সাজে না। তাছাড়া আমাদের দেহের মাঝেই যে রহস্য লুকায়িত আছে, এর মাঝে যেসব মন্ত্র ও শক্তি কাজ করছে সেটাই তো আমরা এখনও পুরোপুরিভাবে জানতে পারিনি, আমাদের মস্তিষ্ক ও আত্মার ভেদ সম্পর্কে জানবো কি করে?

এমন অনেক রহস্য থাকতে পারে যার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি প্রচলিত নিয়মের আওতায় জানা সম্ভব নয়। বড় জোর এর বিশেষ কোনো গুণ, বিশেষ কোনো প্রভাব অথবা এর নিছক অস্তিত্বের প্রমাণ জানা যেতে পারে। কারণ, পৃথিবীর বুকে খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করার জন্যে এ সবের জ্ঞান লাভ করা জরুরী নয়।

এখন যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঐশী বাণীর মাধ্যমে এসব রহস্য ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কোনো তথ্য জানিয়ে দেন যা আমাদের সহজাত যোগ্যতা ও প্রতিভার ওপর ভিত্তি করে করা কোনো গবেষণা বা পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নয়, তাহলে সেটা আমাদেরকে অত্যন্ত বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে হবে, তাতে কোনো কম বেশী করা চলবে না। কারণ যে একক উৎস থেকে আমরা এই জ্ঞান লাভ করছি তিনি আমাদেরকে এই নির্ধারিত পরিমাণই জানিয়েছেন, তার বেশী নয়। তিনি ব্যতীত এসব রহস্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার আর কোনো উৎস নেই।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য, সূরা জ্বিন এর বক্তব্য, জ্বিন সম্পর্কিত কোরআনের বিভিন্ন বক্তব্য এবং আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কিত একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্যের আলোকে আমরা জ্বিন জাতি সম্পর্কে যে তথ্য পাই তা সামান্য, বেশী কিছু নয়। এ তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, জ্বিন হচ্ছে একটা বিশেষ জাতি যাদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম (আ.)–এর সম্পর্কে বক্তব্য দিতে গিয়ে ইবলিস নিজেই বলেছে, 'আমি ওর তুলনায় উত্তম, আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছো, আর ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি দিয়ে' এখানে উল্লেখ্য যে, ইবলিস হচ্ছে জ্বিন জাতিরই সদস্য। এ সত্যটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন, 'কেবল ইবলিই (সেজদা) করেনি, আর সে ছিলো জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে সে নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করে।' .... এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, জ্বিন ও ইবলিস একই জাতের অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে আরো জানা যায় যে, জ্বিন জাতির স্বভাব ও বৈশিষ্ট মানব জাতির স্বভাব ও বৈশিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন জ্বীনের সৃষ্টি আগুন থেকে, জ্বিন মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ জ্বিনকে দেখতে পায় না। ইবলিস সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখানে থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।' (সূরা আল আ'রাফ ২৭)

মানুষের মতো জ্বীনেরাও দল ও সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে, মানুষের মতো তাদেরও গোষ্ঠী ও সমাজ আছে। ওপরে বর্ণিত আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে।

মানুষের মতো জ্বীনেরাও এই পৃথিবীতে বাস করছে। তবে কোথায় বাস করছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। বাস যে করছে তা সঠিক। কারণ আল্লাহ তায়ালা যখন আদম (আ.)–কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে বলেছেন, তখন ইবলিসকেও সে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের (জীবন যাপনের) যাবতীয় উপকরণ থাকবে।' (সূরা আল বাকারা–৩৬)

যে সকল জ্বিনকে সোলায়মান (আ.)–এর করায়ত্ত করে দেয়া হয়েছিলো তারা পৃথিবীতে এমন এমন কাজ সমাধা করতো যার জন্যে তাদের জীবন ধারণের শক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক ছিলো। পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকার শক্তি যেমন এদের আছে, তেমনি পৃথিবীর বাইরেও জীবিত থাকার শক্তি এদের আছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, (জ্বিনরা বললো) 'আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি, অতপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিবেষ্টিত। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্যে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে দেখবে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডকে পেতে রাখা হয়েছে।' (সূরা আল জ্বিন ৮-৯)

জ্বিন জাতির আর একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, এরা মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। তেমনিভাবে আল্লাহর নেক বান্দা ব্যতীত অন্যান্য ভ্রষ্ট লোকদেরকে পরিচালনা করার মতো ক্ষমতা ও অনুমতি এদেরকে দেয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে ধিকৃত ইবলিস শয়তানের উক্তি উদ্ধৃত করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'সে বললো, তোমার মর্যাদার কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়বো। তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে নয়।' (সূরা আঝ ঝুমার ৮২-৮৩)

এছাড়া আরো একাধিক আয়াতে অনুরূপ উক্তির উদ্ধৃতি এসেছে। তবে শয়তান মানুষকে কিভাবে এবং কোন উপায়ে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে তা আমাদের জানা নেই।

জ্বিন জাতির আর একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, এরা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় এবং মানুষের মুখের ভাষাও এরা বুঝতে পারে। এর প্রমাণ খোদ আলোচ্য আয়াতটি, যাতে বলা হয়েছে যে, একদল জ্বিন পবিত্র কোরআন শুনে এবং এর মর্মার্থ উপলব্ধি করে প্রভাবিত হয়েছিলো।

জ্বিন জাতির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এরা হেদায়াতও লাভ করতে পারে এবং পথভ্রষ্টও হতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা জ্বিন এ বলা হয়েছে, 'আমাদের কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।' (সূরা আল জ্বিন ১৪-১৫)

এছাড়া আলোচ্য আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, জ্বীনের দলটি পবিত্র কোরআনের মধুর বাণী শুনে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলো এবং তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলো। তারা নিজেরা আগে ঈমান গ্রহণ করার পর যখন বুঝতে পারলো যে, তাদের স্বজাতির মাঝে এই ঈমান নেই, তখন তারা তাদেরকে ঈমানের জন্যে আহ্বান করে।

জ্বিন জাতি সম্পর্কে এই সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণ্য বক্তব্য পেশ করার পর বিনা দলীল প্রমাণে এর অতিরিক্ত কিছু বলা সমীচীন নয়।

বাকী আলোচ্য আয়াতে এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে গোটা সূরা জ্বিন– এ যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থনে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

ইমাম বোখারী, ইমাম আহমদ ও ইমাম বায়হাকী নিজ নিজ কেতাবে বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.)–এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'রসূলুল্লাহ (স.) জ্বিনদের সামনে তেলাওয়াত করেননি এবং তাদের দেখেনওনি। রসূলুল্লাহ (স.) এক দল সাহাবীকে নিয়ে ওকায বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। এসময় শয়তানদের মাঝে এবং আসমানী সংবাদের মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিলো। তাদের ওপর উল্কাপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। তখন শয়তানরা স্বজাতির কাছে ফিরে গেলো। তারা বললো, তোমাদের কি হয়েছে? তারা উত্তরে বলল, আমাদের মাঝে এবং আসমানী সংবাদের মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের ওপর উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়েছে। তখন তারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়েছিলো এবং খুঁজতে লাগল, কি ঘটেছে যার ফলে তাদের মাঝে ও আসমানী সংবাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি হল। যে দলটি তেহামার দিকে গিয়েছিলো তারা রসূলুল্লাহ (স.)–এর দিকে অগ্রসর হল। তারা তাঁকে একটি খেজুর বাগানের পাশে পেল, তিনি তখন উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে তাঁর সাহাবাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। তারা যখন কোরআনের তেলাওয়াত শুনতে পেল তখন মনযোগ দিয়ে তা শুনতে লাগল এবং বলে উঠা, 'আল্লাহর কসম, এই জিনিসটিই আমাদের মাঝে ও আসমানী সংবাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে তারা স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বললো, 'হে আমাদের জাতি! আমরা একটি অদ্ভুত কোরআন শুনতে পেয়েছি যা সত্যপথের সন্ধান দেয়। তাই আমরা সেটার ওপর বিশ্বাস এনেছি। আমরা আর কখনও আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না।' ...... আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, 'বল, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে, একদল জ্বিন মনযোগ সহকারে (কোরআন) শুনেছে .....' বস্তুত জ্বিনদের বক্তব্য রসূলকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী, বিশিষ্ট তাবেয়ী আলকামাহর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছে যে, তিনি একদিন ইবনে মাসউদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করলে, যে রাতে জ্বিনদের ঘটনা ঘটেছিলো সে রাতে আপনাদের মধ্য থেকে কেউ কি রসূলুল্লাহ (স.)–এর সাথে ছিলেন? তিনি বললেন, না, আমাদের কেউ সে রাতে রসূলের সাথে ছিলো না। কিন্তু অন্য এক রাতে আমরা তাঁর সাথে ছিলাম, সে রাতে আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাকে আমরা বিভিন্ন উপত্যকা ও মালভূমিতে খুঁজতে লাগলাম। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম। তাঁকে কি উড়িয়ে নেয়া হলো, নাকি তাকে হত্যা করা হলো। আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মাঝে রাতটি কাটালাম। ভোর হওয়ার পর আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি হেরা গুহার দিক থেকে আসছেন। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই আপনাকে আমরা খুঁজেছি, কিন্তু আপনাকে আমরা পাইনি। ফলে আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মাঝে রাত কাটিয়েছি। তিনি উত্তরে বললেন, আমার কাছে জিন জাতির একজন প্রতিনিধি এসেছিলো, তার সাথে আমি গিয়েছি এবং তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে সে জ্বিনদের চিহ্ন এবং তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা রসূলকে তাদের খাদ্যবস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর নামে যবাই করা পশুর যে কোনো হাড় তোমাদের হাতের নাগালে পড়বে সেটাই তোমাদের জন্যে বৈধ

হবে এবং তা গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অপরদিকে যে কোনো পশুর ল্যাদা ও গোবর তোমাদের পশুর জন্যে খাবার হিসেবে গণ্য হবে। তাই রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন; 'তোমরা এ দুটো জিনিস দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না, কারণ সেগুলো তোমাদের (জ্বিন) ভাইদের খোরাক।'

জ্বিন দলের এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে হিশাম রসূলুল্লাহ (স.)–এর জীবন চরিত্রে উল্লেখ করেছেন যে, রসূলের চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর যখন মক্কায় তাঁর বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন তিনি ছাকীফ গোত্রের সাহায্য কামনায় তায়েফে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছাকীফ গোত্রের লোকেরা তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে। তাঁর পেছনে বখাটে ছেলে পেলেদের লেলিয়ে দেয়। তারা তাঁর দুই পায়ে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। তখন তিনি নিজ প্রভুর কাছে সেই হৃদয়স্পর্শী ও গভীর আবেদনময় দোয়াটি করেন এবং বলেন, 'হে মাবুদ! আমার দুর্বলতা, আমার অসহায়ত্ব ও মানুষের বিরুদ্ধে আমার অক্ষমতার কথা তোমাকেই জানাচ্ছি। হে পরম দয়াময়, তুমি দুর্বল ও নির্যাতিত মানুষের মালিক। আমার মালিকও তুমি। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড় দিচ্ছো? কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাচ্ছ–যেখানে আমি অবাঞ্ছিত বিবেচিত হবো? অথবা এমন কোনো শত্রুর হাতে কি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছো যাকে আমার দন্ডমুন্ডের মালিক বানিয়েছো? আমার প্রতি তোমার যদি কোন আক্রোশ না থাকে, তাহলে আমার কোনোই দুঃখ নেই। তবে তোমার নিরাপত্তা আমার জন্যে প্রশস্ততর হোক, সেটাই আমার কাম্য। তোমার আলোময় চেহারার আশ্রয় কামনা করছি, যার আলোকচ্ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, যার বদৌলতে দুনিয়া ও আখেরাতের কাজ সঠিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে,–তুমি আমার প্রতি তোমার গযব নাযিল করো না, আমার প্রতি তোমার ক্রোধ নিপতিত করো না। শাস্তির মালিক তুমি, রাযী থাকার মালিকও তুমি, তুমি ব্যতীত কারো কোনো সহায় নেই, শক্তি নেই।

ইবনে হিশাম বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স.) ছাকীফ গোত্রের ব্যবহারে হতাশ হলে মক্কার উদ্দেশ্যে তায়েফ ত্যাগ করেন। পথে এক খেজুর বাগানে তিনি আশ্রয় নেন এবং মধ্যরাতে নামায আদায়ে মগ্ন হয়ে যান। তখন তার পাশ দিয়ে একদল জ্বিন যাচ্ছিলো যাদের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের সংখ্যা যতদূর আমি জানি–ছিলো সাত। তারা সবাই ছিলো নুসাইবী গোত্রের জ্বিন। তারা তখন রসূল (স.)–এর তেলাওয়াত শুনতে থাকে। তাঁর নামায শেষ হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যায় এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়। তারা যা শুনেছিলো তার প্রতি ঈমান এনেছে। জ্বিন দলের ঘটনাটি আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)–কে ওহীর মাধ্যমে জানান এবং আলোচ্য সূরার আয়াত নং ২৯ হতে আয়াত নং ৩১ ও সূরা জ্বিন নাযিল করেন।

ইবনে হিশামের বরাত দিয়ে ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনার ব্যাপারে ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মন্তব্য করে বলেন, 'ঘটনা ঠিক, কিন্তু সে রাতে জ্বিন দল কোরআন শুনেছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কারণ, ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, জ্বিন দলের কোরআন শরীফ শোনার ঘটনাটি ঘটেছিলো ওহীর প্রথম যুগে। আর রসূলুল্লাহ (স.)–এর তায়েফ যাত্রা হয়েছিলো তাঁর চাচা আবু তালিবের ইন্তেকালের পর অর্থাৎ হিজরতের এক দুই বছর আগে। ইবনে ইসহাকও সেটি বলেছেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে আমরা এর মধ্য থেকে কেবল ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটিই গ্রহণ করছি। কারণ, এই বর্ণনাটি পবিত্র কোরআনের বক্তব্যের সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন 'সূরা জ্বিন' এ বলা হয়েছে, 'বলো, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে', এই আয়াতই অকাট্য প্রমাণ পেশ করে যে, জ্বিন দলের ঘটনাটি রসূলুল্লাহ (স.) ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন, তিনি জ্বিনদেরকে দেখতে পাননি এবং তাদের উপস্থিতিও অনুভব করতে পারেননি। তাছাড়া ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী এবং এটি এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে এসে ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সাথে মিলে গেছে। তদুপরি পবিত্র কোরআনে জ্বিনদের যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে এই বর্ণনাটি সঙ্গতিপূর্ণ। জ্বিনদের বৈশিষ্ট হলো, এরা মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না। কাজেই ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে এই বিশুদ্ধ বর্ণনাটিই যথেষ্ট।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আমি একদল জ্বিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিলো ...। (আয়াত ২৯)

আয়াতের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই জ্বীনের ওই দলটিকে কোরআন শোনার জন্যে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা কোনো দৈব বা আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। আল্লাহর অভিপ্রায় ছিলো যে, জ্বিন জাতি মূসা (আ.)-এর নবুওতের ব্যাপারে যেমন অবগত ছিলো তেমনিভাবে সর্বশেষ নবুওতের ব্যাপারেও তারা অবগত হোক, এর প্রতি ঈমান আনুক এবং নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুক, যে জাহান্নাম কেবল শয়তানদের জন্যেই নয় বরং মানব দানব সকলের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই বারো তের জন জ্বীনের দলটির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কোরআন যে দৃশ্য চিত্রায়িত করেছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পবিত্র কোরআনের মধুর বাণী তাদের হৃদয় মনে কি পরিমাণ আবেগ অনুভূতি এবং বিনয় ও ভক্তির উদ্রেক করেছিলো তা এই ছোট্ট কথাটির মাঝেই সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে,

'যখন তারা সেখানে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো, 'চুপ থাকো'। এই ছোট্ট কথাটির মাঝে যে ব্যঞ্জনা আমরা পাই তার দ্বারাই বুঝা যায় যে, পবিত্র কোরআন শোনার গোটা মুহূর্তটিতে তাদের মনের অবস্থা কি ছিলো।

এরপর বলা হয়েছে, 'অতপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্কবাণী রূপে ফিরে গেলো ... এই ছোট্ট, বাক্যটিতেও সেই একই চিত্র ফুটে উঠেছে, যার মাধ্যমে আমরা জ্বিনদের মনে পবিত্র কোরআন শোনার কারণে কি প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো তা উপলব্ধি করতে পারি। তারা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনযোগ সহকারে এবং চুপচাপ কোরআনের তেলাওয়াত শুনেছিলো। তেলাওয়াত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা দেরী না করে তাড়াতাড়ি নিজেদের লোকদের কাছে ছুটে চলে যায়। কারণ, তাদের হৃদয় মনে ও আবেগ অনুভূতিতে যে পরিবর্তন এসেছিলো তা নিয়ে চুপ করে বসে থাকা বা অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা ছিলো তাদের জন্যে একটি নতুন অনুভূতি যা তাদের হৃদয় মনকে ভরে দিয়েছিলো এবং তাদের এমন প্রচন্ড ও অদম্য প্রভাবের সৃষ্টি করেছিলো যার ফলে তারা ক্ষিপ্রতার সাথে ছুটে চলে যায় এবং প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বিষয়টি অন্যকে জানাতে যায়। 'তারা বললো, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কেতাব শুনেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কেতাব পূর্ববর্তী সব কেতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।' (আয়াত ৩০)

অর্থাৎ তারা তাড়াতাড়ি তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ছুটে গিয়ে জানায় যে, তারা একটি নতুন কেতাবের বাণী শুনতে পেয়েছে যা মূসা (আ.)–এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এই কেতাব মূল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মূসা (আ.)–এর কেতাবকে সত্য প্রমাণিত করে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্বিনেরা মূসা (আ.)–এর কেতাব সম্পর্কে জানতো। তাই শোনার সাথে সাথে উভয়টির মধ্যকার সম্পর্ক তারা বুঝতে সক্ষম হয়, যদিও তারা হয়তো কোরআনের সেই আয়াতগুলোতে মূসা (আ.) ও তাঁর কেতাবের নাম শুনতে পায়নি। কিন্তু সে সবের প্রকৃতি ও ধরন ধারণই তাদের জানিয়ে দিচ্ছিলো যে, সেগুলো সে একই উৎস থেকে উৎসারিত যা থেকে উৎসারিত হয়েছে মূসা (আ.)–এর কেতাব। এই জ্বিন জাতি যারা অনেকটা মানবীয় জীবনের প্রভাববলয় থেকে দূরে বসবাস করে তাদের পক্ষ থেকে কেবল কোরআনের বাণী শুনেই এই ধরনের সাক্ষ্য প্রদান করাটা খুবই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর তাদের হৃদয়ের অনুভূতি ও উপলব্ধি এই ভাষায় ব্যক্ত করে, 'সেই কেতাব সত্যধর্ম ও দৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করে।'

সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের প্রভাব অপরিমেয় ও অপরিসীম। যে বিবেক স্বচ্ছ ও অবিকৃত তা কখনও এই প্রভাবের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যে হৃদয় অংহকারমুক্ত, গর্বমুক্ত ও রিপুরবন্ধনমুক্ত তা কখনও এই প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারে না। বরং পবিত্র কোরআনের অদম্য প্রভাব প্রথম স্পর্শেই এ জাতীয় হৃদয় মনকে নাড়া দিয়ে দেয়। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলে ওঠে, 'এই কেতাব সত্যধর্ম দৃঢ় ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।'

এরপর জ্বিনের দল অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এবং বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ছুটে যায় এবং তাদেরকে এই সত্যের ব্যাপারে সজাগ করে তোলে। কারণ, এটাকে তারা নিজেদের একটা কর্তব্য বলে মনে করেছিলো। তারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললো, 'হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন। .... (আয়াত ৩১, ৩২)

তাদের এই বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা পৃথিবীর বুকে পবিত্র কোরআনের অবতরণকে মানব দানবসহ সকল বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আহ্বান হিসেবে দেখেছিলো। তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (স.)–কে কেবল এই পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করতে দেখেই তাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে পথপ্রদর্শক হিসেবে বিশ্বাস করেছিলো, আর সে কারণেই তারা নিজ সম্প্রদায়কে সেই আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলো। তাদের বক্তব্য থেকে এটাও বুঝা যায় যে, তারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস এনেছিলো এবং এটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে পরকালের ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই তারা নিজ সম্প্রদায়কে এই সত্যটিও জানিয়ে দেয়।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াত পর্যন্তই জ্বিনদের বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পূর্বাপর বিবেচনা করে দেখলে বুঝা যায়, পরের আয়াত দুটোর বক্তব্যও সে জ্বিনদের নিয়েই। এই মতটিকেই আমরা সঠিক বলে মনে করি। বিশেষ করে নিচের আয়াতটি লক্ষনীয়,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথায় সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।' (আয়াত ৩২)

এই আয়াতটি জ্বিন দলের আগের বক্তব্যের স্বাভাবিক উপসংহার বলে মনে হয়। কারণ, আগের আয়াতে তারা নিজ সম্প্রদায়কে ঈমানের জন্যে বলেছিলো এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতে বলেছিলো। কাজেই এখন একটা জোরালো ও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থেকে যায় যে, তারা ঈমান গ্রহণ না করলে এবং আল্লাহর রসূল (স.)-এর ডাকে সাড়া না দিলে কী পরিণতি হবে, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, যারা ঈমান গ্রহণ করবে না তারা কখনও আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, কাউকে সাহায্যকারী হিসেবেও পাবে না এবং তারা সঠিক ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

তেমনিভাবে পরবর্তী আয়াতটিও জ্বিনদের বক্তব্য বলে মনে হয়। এই আয়াতটিতে তারা সেসব লোকের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছে যারা আল্লাহর রসূল (স.)-এর ডাকে সাড়া দেয় না এবং মনে করে পরকালে তাদের কোনো হিসাব নিকাশ হবে না এবং তারা এভাবেই ছাড়া পেয়ে যাবে। তাই জ্বিন দল বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে, 'তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। কেন নয়, নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (আয়াত ৩৩)

আলোচ্য আয়াতে জগত নামক এই দৃশ্যমান খোলা কেতাবটির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সূরার প্রথমেও তা করা হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনের প্রায় সূরার ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। প্রথমে প্রত্যক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে করা হয়, এরপর কোনো ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে পুনরায় তা ব্যক্ত করা হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সূরার বক্তব্যের মাঝে একটি সঙ্গতি ও মিল সৃষ্টি হয়।

জগত নামক এই বিশাল কেতাবটি আমাদের সামনে মহান স্রষ্টার অপার কুদরত ও ক্ষমতার সাক্ষ্য পেশ করে। যে স্রষ্টা আকাশ ও পৃথিবীর মতো বিশাল জগত সৃষ্টি করতে পারেন তিনি যে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিতও করতে পারেন-সে সত্যটি একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারে, আর এই সত্যটিকেই প্রমাণ করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রশ্ন ও উত্তরের ভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কারণ, এই বর্ণনা ভঙ্গি অত্যন্ত শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী হয়। আয়াতের শেষ অংশে পূর্বের বক্তব্যের সমর্থনে একটা সাধারণ মন্তব্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান' ... কাজেই, জন্ম মৃত্যুসহ অন্যান্য সকল বিষয়েই আল্লাহর এই অপার ক্ষমতার আওতাধীন। এতে সন্দেহ থাকার কিছুই নেই।

পরকালের হিসাব নিকাশ

পুনর্জন্মের আলোচনা আসার সাথে সাথে পরকালের হিসাব নিকাশের গোটা দৃশ্যটাই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তাই পরবর্তী আয়াতে সে দৃশ্যের অবতারণা করে বলা হচ্ছে, 'যে দিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সে দিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আযাব আস্বাদন করো। কারণ, তোমরা কুফরী করতে।' (আয়াত ৩৪)

'যে দিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে' ... এই বক্তব্যটি এসেছে মূল দৃশ্যের বর্ণনা বা এর ভূমিকাস্বরূপ। দর্শক পরবর্তী দৃশ্যের জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলো তখনই গোটা দৃশ্যটি আকস্মিকভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং সাথে সাথে এ সম্পর্কিত সংলাপও চলতে থাকে প্রশ্নের সুরে, 'এটা কি সত্য নয়?'

কি কঠিন প্রশ্ন, কি নির্মম প্রশ্ন! বিশেষ করে তাদের জন্যে যারা পরকালকে অস্বীকার করতো, যারা পরকালের বিষয় নিয়ে উপহাস করতো, বিদ্রূপ করতো এবং যারা তাচ্ছিল্য ভরে পরকালের শাস্তি বলতে কিছু থাকলে তার দ্রুত আগমন কামনা করতো। আজ তাদের মাথা নত হয়ে আসবে এবং যে সত্যটিকে তারা অস্বীকার করতো সেই সত্যটির সামনেই আজ তাদেরকে আত্মসর্পণ করতে হচ্ছে।

এই কঠিন ও নির্মম প্রশ্নটির উত্তরও আসছে অত্যন্ত লাঞ্ছনা, অপমান ও ভয় ভীতিমাখা কণ্ঠে, 'হাঁ, আমাদের পালনকর্তার শপথ' ... এভাবেই তারা সেদিন প্রভুর নামে কসম খাবে। অথচ জীবদ্দশায় এই প্রভুর ডাকে তারা সাড়া দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি, তাঁর প্রেরিত রসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি এমনকি আল্লাহর প্রভুত্বও তারা কখনও স্বীকার করেনি। আর তারাই আজ সেই প্রভুর নামে কসম খাচ্ছে, পরম সত্যকে অস্বীকার করে নিচ্ছে যা ছিলো তাদের কাছে একদিন অবিশ্বাস্য।

এই অপমানজনক ও লজ্জাকর উত্তরের পর আর কোনো বক্তব্য থাকে না। তাই ঘটনার ইতি টেনে বলা হচ্ছে, 'আযাব আস্বাদন করো। কারণ তোমরা কুফরী করতে' মোট কথা, আসামী যেখানে নিজেই তার দোষ স্বীকার করছে সেখানে বিচার যা হওয়ার তাই হয়েছে, আর এভাবেই দৃশ্যটির দ্রুত সমাপ্তি ঘটে। কারণ, চূড়ান্ত রায় এখানে এসে গেছে, চূড়ান্ত বক্তব্যও এখানে এসে গেছে। কাজেই আর কোনো যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই। আসামীরা পরকালকে অস্বীকার করতো, এখন তারা সেটাকে স্বীকার করে নিচ্ছে। তাই পূর্বের অস্বীকৃতির পরিণামও তাদেরকে এখন ভোগ করতে হচ্ছে।

সবরের নির্দেশ

কুফর ও ঈমানের চূড়ান্ত ফলাফল ও পরিণতির দৃশ্য উপস্থাপন করার পর এবং রসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে কাফেরদের মন্তব্য উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সূরার শেষে রসূলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশস্বরূপ বলা হয়েছে, 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, যেমন সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী রসূলরা ধৈর্যধারণ করেছে। তুমি ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবে না ... (আয়াত ৩৫)

আলোচ্য আয়াতের প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত অর্থবহ। এর প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, ভেদ ও রহস্যে পরিপূর্ণ। এখানে রসূলকে ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে অনেক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। তাছাড়া আরো কথা হচ্ছে, তাঁর প্রথমা স্ত্রী যিনি ছিলেন মমতা, ভালবাসা ও ত্যাগের আধার। সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে তিনি একমাত্র আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করার জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করে। এমনকি তাঁকে সাহায্য করার মতো এবং রক্ষা করার মতোও কেউ আর জীবিত থাকেনি। সেই অসহায় অবস্থায় তিনি আপন গোষ্ঠীর লোকদের কাছ থেকে নির্যাতন ও নিপীড়ণমূলক যে আচরণ পেয়েছিলেন তা দূর সম্পর্কের কারও কাছ থেকে পাননি। শুধু তাই নয় তিনি বার বার বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর লোকদের কাছে গিয়ে দ্বীন গ্রহণ করতে বলেছেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে খালি হাতে ফিরতে

হয়েছে, অথবা ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হতো হয়েছে, অথবা পাথরের আঘাত খেয়ে পবিত্র পা দু'টো রক্তাক্ত করে ঘরে ফিরতে হয়েছে। এতোসব পরেও তিনি তাদের জন্যে সে আবেগপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী দোয়াটি করেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে,

এতো কিছুর পরেও আবার তাঁকে নিজ মালিকের পক্ষ থেকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই প্রভুর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, 'তুমি ধৈর্যধারণ করো যেমন ধৈর্য্য ধারণ করেছে সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী রসূলরা ...... এর দ্বারা একথাই জানানো হয়েছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের রাস্তা অনেক দীর্ঘ ও কঠিন। এ রাস্তা বড়ই কন্টকাকীর্ণ। এই রাস্তায় চলতে গিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)-এর মতো পুন্যাত্মা, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন, ত্যাগ ও পরম ধৈর্যশীল ব্যক্তিকেও ধৈর্যধারণ করতে এবং বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে তড়িঘড়ি ফয়সালা কামনা না করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

সন্দেহ নেই যে এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হলে, এই পথের তিক্ততা হজম করতে হলে পরস্পর সহানুভূতির রহমত ও দয়ার প্রয়োজন আছে।

ধৈর্যের এই নির্দেশ কেবলই নির্দেশ নয়; বরং এর মাধ্যমে নবীকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তাঁর মনোবলকে আরো দৃঢ় করা হয়েছে, তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, সহমর্মিতা জানানো হয়েছে এবং সর্বোপরি তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। তাই পরের আয়াতেই বলা হয়েছে, 'ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হতো, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।'

অর্থাৎ পরকালের পূর্বে তারা পৃথিবীতে যে জীবনটি কাটাচ্ছে তা অত্যন্ত সংকীর্ণ দিনের এক প্রহরের চেয়ে বেশী নয়। এই ক্ষণস্থায়ী জীবন খুবই তুচ্ছ ও নগণ্য। এই জীবন তার পেছনে যা রেখে যায় তার আবেদন ও প্রভাবের স্থায়িত্ব দিনের এক প্রহরের চেয়ে কোনো অংশেই বড় নয়। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে আসবে চূড়ান্ত ও অমোঘ পরিণতি যার স্থায়িত্ব হবে অসীম ও অনন্তকালের জন্যে। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তটি হচ্ছে কেবলই অবগতি ও সতর্কতার জন্যে যেন ধ্বংস ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হওয়ার আগেই সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয়। তাই বলা হয়েছে, 'এটা সুস্পষ্ট অবগতি, এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যারা গোনাহগার।'

না, আল্লাহ তায়ালা কখনও তাঁর বান্দাদের প্রতি অবিচার করেন না, এটা হতেই পারে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কারণ, কষ্টের মুহূর্তগুলো দিনের এক প্রহরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। এরপর যা হবার তা হবেই।

সূরা মোহাম্মদ

আয়াত ৩৮ রুকু ৪

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ① وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ
كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا
الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۚ
حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ

রুকু ৪

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (সমগ্র) কর্মই বিনষ্ট করে দিয়েছেন। ২. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, মোহাম্মদ-এর ওপর আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছে– যা একান্তভাবে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের জীবনের সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন। ৩. এ (সব কিছু) এ জন্যে হবে, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তারা মূলত মিথ্যারই অনুসরণ করে, (অপর দিকে) যারা ঈমান আনে তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে পাওয়া সত্য বিষয়ের অনুসরণ করে; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা (এদের) জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ৪. অতএব (যুদ্ধের ময়দানে) যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো, অতপর (এভাবে) তাদের যখন তোমরা হত্যা করবে তখন (বন্দীদের) তোমরা শক্ত করে বেঁধে রাখো, এরপর বন্দীদের মুক্ত করে দেবে কিংবা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে (এটা একান্তই তোমাদের ব্যাপার), তবে যতোক্ষণ যুদ্ধ তার

تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ

لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ

أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

(অস্ত্রের) বোঝা ফেলে না দেবে (ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও অস্ত্র সংবরণ করো না), অথচ আল্লাহ তায়ালা এটা চাইলে (যুদ্ধ ছাড়াই) তাদের পরাজয়ের শাস্তি দিতে পারতেন, তিনি একদলকে দিয়ে আরেক দলের পরীক্ষা নিতে চাইলেন; যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম কখনো বিনষ্ট হতে দেবেন না। ৫. তিনি (অবশ্যই) তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের (সার্বিক) অবস্থাও তিনি শুধরে দেবেন, ৬. (এর বিনিময়ে) তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের কাছে (আগেই) করিয়ে রেখেছেন। ৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদের (দুনিয়া আখেরাতে) সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায় এ যমীনের বুকে) তিনি তোমাদের পা সমূহকে মযবুত রাখবেন। ৮. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে (রয়েছে) নিশ্চিত ধ্বংস, আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মই বিনষ্ট করে দেবেন। ৯. এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা (তাদের জন্যে) যা কিছু পাঠিয়েছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন। ১০. এ লোকগুলো কি আল্লাহর যমীনে পরিভ্রমণ করে দেখতে পারে না, (বিদ্রোহের পরিণামে) তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি অবস্থা হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ধ্বংস (কর আযাব) পাঠিয়েছেন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যেও সেই একই ধরনের (আযাব) রয়েছে। ১১. এর কারণ হচ্ছে, যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে– আল্লাহই হন তাদের (একমাত্র) রক্ষক, (প্রকারান্তরে) যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাদের (কোথাও) কোনো সাহায্যকারী থাকে না।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي
أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ
كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ
الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن
كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً
حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

রুকু ২

১২. যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে; কাফেররা জীবনের ভোগবিলাসে মত্ত, জন্তু জানোয়ারদের মতো তারা নিজেদের উদর পূর্তি করে, (এ কারণে) জাহান্নামই হবে তাদের জন্যে শেষ নিবাস! ১৩. (হে নবী,) তোমার (এই) জনপদ– যারা (এক সময়) তোমাকে বের করে দিয়েছিলো, তার চাইতে অনেক শক্তিশালী বহু জনপদ ছিলো, সেগুলোকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, (সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারীই ছিলো না। ১৪. যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল নিদর্শনের ওপর রয়েছে, তার সাথে এমন ব্যক্তির তুলনা কি ভাবে হবে যার (চোখের সামনে তার) মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। ১৫. আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে; সেখানে নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, রয়েছে পানকারীদের জন্যে সুধার (সুপেয়) নহরসমূহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) রয়েছে সব ধরনের ফলমূল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা, সর্বোপরি), সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো– যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে (ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۛ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা তোমার কথা শোনে, কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বাইরে যায় তখন যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এমন সব লোকদের কাছে এসে বলে– 'এ মাত্র কি (যেন) বললো লোকটি?' (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং (এ কারণেই) এরা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে। ১৭. যারা সৎপথে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ (সৎপথে) চলা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদের (অন্তরে) তিনি তাঁর ভয় দান করেন। ১৮. হঠাৎ করে কেয়ামতের ক্ষণটি তাদের ওপর এসে পড়ুক তারা কি সে অপেক্ষায় দিন গুনছে? অথচ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, আর একবার যখন কেয়ামত এসেই পড়বে তখন তারা কিভাবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে! ১৯. (হে নবী,) জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁর কাছেই নিজের গুনাহ খাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, (ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার সাথী) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (যেমন) তোমাদের গতিবিধির খবর রাখেন, (তেমনি তিনি) তোমাদের নিবাস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন!

রুকু ৩

২০. যারা ঈমান এনেছে তারা (অত্যন্ত উৎসাহের সাথে) বলে, কতো ভালো হতো যদি (আমাদের প্রতি জেহাদের আদেশ সম্বলিত) কোনো সূরা নাযিল করা হতো! অতপর যখন সেই (ঈপ্সিত) সূরাটি নাযিল করা হয়েছে, যাতে (তাদের প্রতি) জেহাদের আদেশ দেয়া হলো, তখন যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে (তারা এটা শুনে) তোমার দিকে মৃত্যুর ভয় ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো, অতপর তাদের জন্যেই রয়েছে শোচনীয় পরিণাম।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۚ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

২১. (অথচ আদেশের) আনুগত্য করা এবং সুন্দর কথা বলাই ছিলো (তাদের জন্যে) উত্তম। যখন (জেহাদের) সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে তখন তাদের জন্যে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকার পূরণ করাই ছিলো ভালো। ২২. অতএব, তোমাদের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কি প্রত্যাশা করা যাবে যে, তোমরা (একবার) যদি এ যমীনের শাসন ক্ষমতায় বসতে পারো তাহলে আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং যাবতীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে। ২৩. (মূলত) এরা হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, তিনি তাদের বোবা করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কথা বলতে পারে না) এবং তাদের তিনি অন্ধ করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কি তা দেখতেও পায় না)। ২৪. তবে কি এরা কোরআন সম্পর্কে (কোনোরকম চিন্তা) গবেষণা করে না! না কি এদের অন্তরসমূহের ওপর তার তালা ঝুলে আছে। ২৫. যাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের মন্দ কাজগুলো (ভালো লেবাস দিয়ে) শোভনীয় করে রাখে এবং তাদের জন্যে নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে। ২৬. এমনটি এ জন্যেই (হয়েছে), (মানুষের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না– এরা তাদের বলে, আমরা (ঈমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তায়ালা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন। ২৭. (সেদিন) তাদের (অবস্থা) কেমন হবে– যেদিন আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে (প্রচন্ড) আঘাত করতে করতে তাদের মৃত্যু ঘটাবে। ২৮. এটা এ জন্যে, তারা এমন সব পথের অনুসরণ করেছে যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট, আল্লাহর সন্তুষ্টি তারা কখনো পছন্দ করেনি, (এ কারণেই) আল্লাহ তায়ালা এদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ أَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۖ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

রুকু ৪

২৯. যেসব মানুষের মনে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তারা কি এ কথা বুঝে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিদ্বেষজনিত আচরণ (অন্যদের সামনে) প্রকাশ করে দেবেন না! ৩০. আমি তো ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারি, অতপর তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনে নিতে পারবে, তুমি তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে তাদের অবশ্যই চিনে নিতে পারবে (যে, এরাই হচ্ছে আসল মোনাফেক); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কার্যের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো– যতোক্ষণ না আমি একথা জেনে নেবো, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে) আল্লাহর পথের মোজাহেদ– আর কে তোমাদের মধ্যে (জেহাদের ময়দানে) ধৈর্য ধারণকারী (অবিচল), যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের খোঁজ খবর (ভালো করে) যাচাই বাছাই করে না নেবো (ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার এ পরীক্ষা চলতে থাকবে)। ৩২. যারা কুফরী করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথে আসা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও যারা আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনো আল্লাহ তায়ালার কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না; (বরং এ কারণে) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন। ৩৩. হে (মানুষ), যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর আনুগত্য করো, (শর্তহীন) আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (বিদ্রোহ করে) কখনো তোমরা নিজেদের কাজকর্ম বিফলে যেতে দিয়ো না। ৩৪. যারা (নিজেরা) আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) যারা আল্লাহর পথে আসা থেকে ফিরিয়ে রাখে, অতপর এ কাফের অবস্থায়ই তারা মরে যায়, আল্লাহ তায়ালা এসব লোকদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝٣٥ إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝٣٦ إِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۝٣٧ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا أَمْثَالَكُمْ ۝٣٨

৩৫. অতএব তোমরা কখনো হতোদ্যম হয়ে পড়ো না এবং (কাফেরদের) সন্ধির দিকে ডেকো না, (কেননা) বিজয়ী তো হচ্ছো তোমরাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না। ৩৬. অবশ্যই এ বৈষয়িক দুনিয়ার জীবন হচ্ছে খেলাধুলা ও হাসি তামাশামাত্র, (এতে মত্ত না হয়ে) তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং (সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের (যথার্থ) বিনিময় প্রদান করবেন এবং (এর বদলে) তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কোনো) ধন সম্পদ চাইবেন না। ৩৭. যদি (কখনো) তিনি (তোমাদের কল্যাণের জন্যে) তোমাদের ধন-সম্পদ (-এর কিছু অংশ) দাবী করেন, অতপর এর জন্যে তিনি যদি তোমাদের ওপর প্রবল চাপও প্রদান করেন, তাহলেও তোমরা তা দিতে গিয়ে কার্পণ্য করবে, (ফলে) তোমাদের বিদ্বেষ (-জনিত আচরণ)-গুলো তিনি বের করে দেবেন। ৩৮. হাঁ, এ হচ্ছো তোমরা! তোমাদেরই তো ডাকা হচ্ছে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার জন্যে, (অতপর) তোমাদের একদল লোক কার্পণ্য করতে শুরু করলো, অথচ যারা কার্পণ্য করে তারা (প্রকারান্তরে) নিজেদের সাথেই কার্পণ্য করে; কারণ আল্লাহ তায়ালা তো (এমনিই যাবতীয়) প্রয়োজনমুক্ত এবং তোমরাই হচ্ছো অভাবগ্রস্ত, (তা সত্ত্বেও) যদি তোমরা (আল্লাহর পথে) ফিরে না আসো, তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য (কোনো) এক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতপর তারা (কখনো) তোমাদের মতো হবে না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। এ সূরার আরেক নাম সূরা 'আল কেতাল'। এই নামটিই সূরার আসল নাম। কারণ এর আলোচ্য বিষয়ই কেতাল বা যুদ্ধ। যুদ্ধই এর প্রধান উপাদান। যুদ্ধই এর বক্তব্য এবং যুদ্ধই এর মূল সুর।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় যে যুদ্ধ তা এর সূচনা থেকেই স্পষ্ট। আক্রমণাত্মক ভাষায় কাফেরদের পরিচয় দান এবং সম্মানজনক ভাষায় মোমেনদের পরিচয় দানের মাধ্যমে সূরার শুরুতেই কাফেরদেরকে আল্লাহর দুশমন ও মোমেনদেরকে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। এভাবে সূরার শুরু থেকেই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর মূল্যায়নে উভয় গোষ্ঠীর এই পরিচয়ই হচ্ছে চিরন্তন ও শাশ্বত। অন্য কথায় বলা চলে যে, সূরার প্রথম শব্দ থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত সৎ কাজগুলোকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং বিশেষত মোহাম্মদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছে– কেননা তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল পাপ মোচন করে দিয়েছেন এবং তাদের মনকে পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ কাফেররা বাতিলের অনুসারী আর মোমেনরা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যের অনুসারী। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই মানুষের কাছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।' (আয়াত ১-৩)

কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার পর মোমেনদের দ্ব্যর্থহীনভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। এ আদেশ দেয়া হয়েছে অত্যন্ত দৃপ্ত অথচ সুললিত ছন্দময় কণ্ঠে। সেই সাথে রণাঙ্গনে সর্বাত্মক লড়াই ও হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর আটক যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী করণীয়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে হত্যা করবে। যখন তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলবে। তারপর হয় তাদেরকে অনুগ্রহ দেখাবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ বিরতি হয়। এ আদেশ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। ... (আয়াত ৭)

এই সাথে কাফেরদেরকে কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে, আর মোমেনদের জন্যে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহর সর্বাত্মক সাহায্য ও অভিভাবকত্বের আশ্বাস। আরো ঘোষিত হয়েছে যে, কাফেরদেরকে চরম লাঞ্ছনা, ধ্বংস ও অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে, 'তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না? করলে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের কী শোচনীয় পরণতি হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিধ্বস্ত করে ছেড়েছেন। সকল কাফেরের জন্যে অনুরূপ পরিণতিই অপেক্ষা করছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই।'

অনুরূপভাবে রসূল (স.)-কে যে মক্কা নগরী বহিষ্কার করেছিলো তাকেও হুমকি দেয়া হয়েছে, 'যে নগরী তোমাকে বহিষ্কার করেছিলো, তার চেয়েও শক্তিশালী অনেক নগরী ছিলো। আমি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি। সেগুলো কোনো সাহায্যকারী ছিলো না। (আয়াত ১৩)

এরপর ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত হুমকি উচ্চারণের পর আলোচনা সামনে এগিয়ে

চলে। মোমেনের পবিত্র হালাল জীবিকা উপভোগ করা ও কাফেরের পশুর মতো নানারকমের মজাদার খাদ্য খাওয়ার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান। আর কাফেররা কেবল ভোগ করে এবং পশুর মতো খাওয়া দাওয়া করে। দোযখই তাদের বাসস্থান।' ... (আয়াত ১২)

তারপর মোমেনরা জান্নাতে যে সকল মজাদার খাদ্য ও পানীয় উপভোগ করবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে খাঁটি ও নির্মল পানীয়, স্বাদ বিকৃত হয়নি এমন দুধ, মজাদার মদ এবং স্বচ্ছ ও নির্মল মধু। আর এসব তারা বহমান নদী খালের আকারে পাবে। সেই সাথে তারা উপভোগ করবে রকমারি ফলমূল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমার ন্যায় মহাদানও। এসব বলার পর জিজ্ঞেস করা হয়েছে,

'যে সব মোমেন ও সৎকর্মশীল বান্দা এসব নেয়ামত উপভোগ করবে তারা কি দোযখে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী ও দোযখের গরম পানি খেয়ে নাড়িভুড়ি ছিন্ন হয়ে যাওয়া কাফেরদের মতো?'

কাফের ও মোমেনদের সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়ার পর মোনাফেকদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এসব মোনাফেক ও ইহুদীরা মদীনায় নবগঠিত ইসলামী সমাজের জন্যে এমন হুমকি হয়ে বিরাজ করছিলো যে, তা একই সময়ে মক্কায় ও তার আশপাশে অবস্থানকারী মোশরেকদের হুমকির চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। সূরায় উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই সূরার সময়কাল ছিলো বদর যুদ্ধের পরে ও খন্দক যুদ্ধের আগে– যখন ইহুদীদের শক্তি ও প্রতাপ ক্রমে খর্ব ও মোনাফেকদের কেন্দ্র ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছিলো। (সূরা আহযাবে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি।)

এ সূরায় মোনাফেকদের সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তাতে প্রথম থেকেই যুদ্ধ ও আক্রমণের দামামা বাজানো হয়েছে, কাফেররা কিভাবে রসূল (স.)-এর কথা শোনা এড়িয়ে চলতো, মোনাফেকরা তাঁর মজলিসে বসেও তাঁর কথা একাগ্রতার সাথে শুনতে ও বুঝতে চেষ্টা করতো না– তা এ আলোচনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সবশেষে বলা হয়েছে, তাদের বিপথগামিতা ও কুফরির কারণে তাদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে, তোমার কথা শোনে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে বের হয়েই জ্ঞানীজনদেরকে জিজ্ঞেস করে, মোহাম্মদ এই মাত্র কী বললো? আসলে আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়ের ওপর সিল মেরে দিয়েছেন এবং তারা প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে থকে।' (আয়াত ১৬)

এরপর তাদেরকে কেয়ামতের হুশিয়ারী জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন তাদের সম্বিত ফিরে আসার কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না। 'তবে কি তারা কেয়ামতের অপেক্ষায় রয়েছে যা তাদের কাছে হঠাৎ এসে পড়বে? তার আলামতগুলো তো এসেই গেছে। কেয়ামত এসে গেলে তাদের আর উপদেশ গ্রহণের সুযোগ কোথায়?'

এরপর মোনাফেক ও দুর্বল মোমেনদের সেই কাপুরুষতা ও অস্থিরতার বিবরণ দেয়া হয়েছে, যে দুর্বলতা যুদ্ধের আদেশ দেয়ার সময় কিছু কিছু দেখিয়েছিলো,

'মোমেনরা' বলে থাকে একটা সূরা নাযিল হয় না কেন? কিন্তু যখনই একটা অকাট্য সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়, অমনি তুমি দেখতে পাও যে, যাদের মনে মোনাফেকীর ব্যাধি রয়েছে, তারা তোমার দিকে মৃত্যুর ভয়ে সংজ্ঞা হারানো লোকের মতো তাকায়।....'

এরপর পরবর্তী তিনটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অনুগত হওয়া, সত্যাশ্রয়ী হওয়া ও ঈমানের ওপর স্থিতিশীল হওয়ার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের হীনতা ও নীচতার নিন্দা করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ও অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে, 'অতএব তাদের জন্যে উত্তম হলো আনুগত্য ও ভালো কথা বলা। যখন জেহাদের ফয়সালা করা হয়, তখন তারা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিতো, তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হতো। অতএব, তোমরা যদি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও, তবে কি তোমাদের পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে? আর তোমরা কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তাদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং বধির ও অন্ধ করে দিয়েছেন। (আয়াত ২১-২৩)

এরপর তাদের শয়তানের বন্ধুত্ব গ্রহণ ও ইহুদীদের সাথে দহরম মহরম পাতিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। তারা যে মুসলিম সমাজের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখে, অথচ তারা সে সমাজের সদস্য নয়। সেই সমাজের সামনে তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে অপমানিত করে দেয়া এবং সেই অপমানিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করানোর হুমকিও দেয়া হয়েছে। এই সমাজে বসবাস করেও তারা শুধু যে সেই সমাজের সদস্য নয়, তাই নয়– বরং তারা সেই সমাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তেও লিপ্ত। একথাই বলা হয়েছে ২৫ থেকে ৩১ নং আয়াতে,

'নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সত্য পথ পরিষ্কার হওয়ার পরও তা থেকে পিছিয়ে যায়, শয়তান তাদের এ কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ...'

তৃতীয় ও শেষ পর্বে কোরায়শ বংশীয় কাফের ও ইহুদীদের প্রসংগ পুনরায় আলোচিত হয়েছে এবং এই দুই গোষ্ঠীর কঠোর নিন্দা করা হয়েছে, 'সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার পর যারা কুফরী করেছে, অন্যদেরকে সত্য দ্বীন গ্রহণে বাধা দিয়েছে এবং রসূল (স.)–এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাদের সৎকর্মগুলোকে অচিরেই বাতিল করে দেবেন।'

এ পর্বে মোমেনদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের (ভুলভ্রান্তির কারণে) তাদের ওপরও যেন তাদের শত্রুদের ওপরে আপতিত শাস্তির মতো কোনো শাস্তি নেমে না আসে। বলা হয়েছে, হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কৃত সৎকর্মগুলোকে নষ্ট করো না।' সেই সাথে অমুসলিমদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মুখে নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা বহাল রাখার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা ভগ্ন হৃদয় হয়ো না। গায়ে পড়ে কাফেরদের সাথে আপোষ করতে যেওনা। কেননা শেষপর্যন্ত তোমরাই বিজয়ী হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা কখনোই তোমাদের সৎকর্মগুলোকে নষ্ট করবেন না।'

এই অংশে আরো একটা বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং তা হচ্ছে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ এবং দুনিয়ার ওপর সব সময় আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে দুনিয়ার সকল সহায় সম্পদকে বর্জন করতে হবে সে কথা বলা হয়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তিনি যদি তাদেরকে আল্লাহর পথে আরো বেশী সম্পদ ব্যয় করতে পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে তারা মনে কতো সংকীর্ণতা ও কষ্ট অনুভব করবে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'দুনিয়ার জীবন খেলাধূলা ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যদি ঈমান আনো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে

তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তোমাদের ধন সম্পদ চাইবেন না। তিনি যদি তোমাদের সম্পদ চেয়ে পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে তোমরা কার্পণ্য করবে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন।'

সূরার শেষ আয়াতে এই বলে মুসলমানদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে, তিনি তাদের জায়গায় অন্য কোনো জাতির উত্থান ঘটাবেন

'তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করে। যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে, সে নিজের ক্ষতি সাধনের জন্যেই কার্পণ্য করে। আল্লাহ তায়ালা ধনী, তোমরা দরিদ্র। তোমরা যদি ব্যয় করতে না চাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না।'

এভাবে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নাগাড়ে কেবল যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। এর সর্বত্রই যুদ্ধের পরিবেশ, ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এর প্রত্যেকটা আয়াতেই বলতে গেলে যুদ্ধের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সূরার শুরু থেকেই প্রত্যেকটা আয়াতের শেষে এমনভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে যেন প্রত্যেকটাই এক একটা ভারী ক্ষেপণাস্ত্র। যেমন– আ'মালাহুম, বা'লাহুম, আমছালাহুম, আহওয়াআহুম, আখবারাকুম। এমনকি আয়াত শেষের যে শব্দগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা, সেগুলোও শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা তরবারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন, আওয়ারাহা, আমছালাহা ইত্যাদি।* তাছাড়া এখানে শব্দের ঝংকারে যে ধরনের কঠোরতা রয়েছে, শব্দ দ্বারা যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, তাহলো, 'তোমরা যখন কাফেরদের মোকাবেলায় আসবে তখন তাদের গর্দান মারবে।' আর হত্যা ও গ্রেফতারীকেও ভয়াবহ করে চিত্রিত করা হয়েছে, 'যখন তোমরা ভালোমতো তাদের রক্তপাত সম্পন্ন করবে, তখন শক্ত করে তাদের বেঁধে ফেলো।' অনুরূপভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যে বদদোয়া করা হয়েছে তাও করা হয়েছে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতাবোধক শব্দ দিয়ে। যেমন, 'যারা কুফরী করেছে তারা নিপাত যাক এবং তাদের সৎ কাজগুলো বিনষ্ট হয়ে যাক।' অতীতের কাফেরদের ধ্বংসের বিবরণটাও দেয়া হয়েছে এমন ভাষায় যা শাব্দিক ও ভাব উভয় দিক দিয়েই ভয়াবহ। যেমন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিন এবং কাফেরদের জন্যেও অনুরূপ।' আর দোযখের আযাবের ছবিটা এখানে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে দেখুন, 'তাদেরকে গরম পানি খাওয়ানো হবে। ফলে সে পানি তাদের নাড়িভুড়িকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে।' মোনাফেকদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার দৃশ্যও দেখানো হয়েছে এভাবে, 'তারা তোমার দিকে তাকায় মৃত্যুর ভয়ে বেহুশ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো।' এমনকি জেহাদ থেকে পিঠটান দেয়ার বিরুদ্ধে মোমেনদেরকে প্রদত্ত হুশিয়ারীও এসেছে কঠোরতম ও চূড়ান্ত ভাষায়, 'যদি তোমরা পিঠটান দাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতিকে আনবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।' (আয়াত ৩৮)

এভাবেই সূরাটির আলোচ্য বিষয়, তার দৃশ্য ও ছবি, তার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ এবং তার সুর ও ঝংকার সবই পরস্পরের সাথে সুসমন্বিত ও সংগতিপূর্ণ।

---

* কোরআনের এই অপূর্ব ভাষা শৈলী শুধু তারাই বুঝতে পারবেন যাদের আরবী ভাষায় বিশাল সাহিত্য ভান্ডার সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে।–সম্পাদক

তাফসীর

'যারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল সৎকাজকে বিপথগামী করে দেবেন, আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে ... ।' (আয়াত ১-৩)

কোনো পূর্ব ঘোষণা বা হুমকি হুশিয়ারী ছাড়া সম্পূর্ণ আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করলে যে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, এই সূরার সূচনাও হয়েছে তদ্রূপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে, অনেকটা ভূমিকাহীনভাবে। 'যারা কুফরী করেছে এবং নিজেদেরকে বা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের যাবতীয় সৎকাজকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী করে দেবেন'– অর্থাৎ সেগুলোকে তিনি ব্যর্থ ও বিনষ্ট করে দেবেন। তবে এই বিনষ্ট ও বাতিল হওয়াটা একটু সক্রিয় ধরনের। যেন আমরা এই সৎকাজগুলোকে উদভ্রান্তভাবে চলতে চলতে অবশেষে ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যেতে দেখতে পাই। এই সৎকাজগুলোকে সজীব প্রাণীর রূপ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে বিপথগামী ও ধ্বংস করা হয়েছে। এখানে এমন একটা যুদ্ধের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যে যুদ্ধে জনগণ থেকে সৎ কাজগুলোকে এবং সৎকাজগুলো থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা হবে–যার পরিণামে ধ্বংস ও বিপথগামিতা অনিবার্য হয়ে উঠবে।

মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাওয়া এই সৎকাজগুলো দ্বারা সম্ভবত সেই কাজগুলোকেই বুঝানো হয়েছে যার পেছনে কাফেরদের সদুদ্দেশ্য নিহিত থাকে এবং যাকে বাহ্যত মহৎ কাজ বলেই মনে হয়। কিন্তু যেহেতু ঈমান ছাড়া সৎকাজের কোনো মূল্য নেই, তাই এই সদুদ্দেশ্য প্রবণতা নিতান্তই বাহ্যিক ও লোক দেখানো। এর অন্তরালে কোনো বাস্তব ও সার পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। কাজের পেছনে যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে, সেটাই আসল বিবেচ্য বিষয়, কাজের শুধু বাহ্যিক রূপ বিবেচ্য বিষয় নয়। এই প্রেরণা ও উদ্দীপনা ভালো হতে পারে। তবে প্রেরণা ও উদ্দীপনার ভিত্তি ও উৎস যদি ঈমান না হয়, তাহলে তা একটা ক্ষণস্থায়ী ও তাৎক্ষণিক ভাবাবেগ বা হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগ এমন কোনো শাশ্বত আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নয়, যার চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনের সাথে বা সৃষ্টি জগতের মৌল নিয়ম বা বিধির সাথে যোগসূত্র রয়েছে। সুতরাং যে মূল উৎস থেকে মানব সত্ত্বার উৎপত্তি, তার সাথে মানব সত্ত্বাকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে ঈমান অপরিহার্য। ঈমান আনার মাধ্যমে এই উৎসের সাথে তার বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে মানব সত্ত্বার সকল দিক বিকশিত হবে এবং তার সব রকমের আবেগ অনুভূতির ওপর ঈমানের প্রভাব পড়বে। তখনই সৎ কাজ হবে অর্থবহ ও তাৎপর্যবহ। তখনই সৎ কাজের শুধু সুনির্দিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে। তখনই তার সৎ কাজ স্থিতিশীল ও স্থায়ী হবে, আর তখনই তা হবে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সকল অংশ ও অংগকে সুসংহতকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী শাশ্বত আল্লাহর বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ, আর তখনই এই ঈমান মোমেনের প্রত্যেকটা কাজ ও প্রত্যেকটা তৎপরতার জন্যে এই বিশ্বজগতের অবকাঠামোতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেবে এবং তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

অপরদিকে 'যারা ঈমানদার ও সৎ কাজে লিপ্ত এবং মোহাম্মাদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছে– কেননা তা তাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত প্রকৃত সত্য ...' এখানে দু'বার ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঈমানে যদিও মোহাম্মদের ওপর নাযিল করা ওহীর ওপর ঈমান আনা অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পরবর্তীতে পুনরায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে তাকে

অধিকতর স্বচ্ছতা দান করা হয়েছে এবং তার প্রকৃত বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকৃত বৈশিষ্ট হলো এই যে, ওটাই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একমাত্র প্রকৃত সত্য বিধান মোমেনের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল। এই ঈমানের পাশাপাশিই অবস্থান করে তার সৎ কাজ, যা তার বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এই সৎ কাজ তার ঈমানেরই ফল ও ফসল। এই সৎকাজই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে এবং তা সর্বক্ষণ তাকে সৎকাজের প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগাচ্ছে।

সৎকর্মে উদ্দীপ্ত এই ঈমানদারদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেবেন। অথচ কাফেরদের কার্যকলাপ বাহ্যত সৎকর্ম বলে মনে হলেও তার অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। কাফেরদের কাজগুলো সৎকাজ হলেও তা বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মোমেনদের কাজগুলো পাপ কাজ হলেও তা মাফ করে দেয়া হবে। এ দু'টো সম্পূর্ণ পরস্পরের বিরোধী। এ কথা বলে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, আল্লাহর কাছে ঈমানের মূল্য ও কদর কতো বেশী। শুধু আল্লাহর কাছেই নয়– জীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেও ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা অত্যাধিক। তাই বলা হয়েছে 'এবং তিনি তাদের মনকে সংশোধন করে দেবেন।'

মনের সংশোধন এতো বড় একটা নেয়ামত যে, এর সুফল, গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি বিবেচনা করে এটিকে ঈমানের পরেই স্থান দেয়া হয়েছে। মনকে সংশোধন করার তাৎপর্য এই যে, ঈমানের মাধ্যমে মন পরিপূর্ণ প্রশান্তি, বিশ্রাম, আত্মবিশ্বাস, সন্তোষ ও শান্তি লাভ করে থাকে। মন যখন পরিশুদ্ধ হয়, চিন্তা ও চেতনা তখন সুষ্ঠ ও সরল হয়, হৃদয় ও বিবেক সন্দেহ-সংশয় ও জড়তা থেকে মুক্ত হয়। স্নায়ু ও অনুভূতি নিখুঁত ও নির্মল হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে মানবসত্ত্বা পূর্ণ আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হয়। এরপর আর কোনো নেয়ামত ও সম্পদ আর কী হতে পারে? বস্তুত এটাই মনুষত্বের উজ্জ্বলতম ও মহত্তম স্তর।

মোমেন ও কাফেরের এই বিপরীতধর্মী অবস্থার কারণ কী? এর কারণ কোনো স্বজনপ্রীতি নয়, এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় এবং কোনো বিবেচনাহীন স্বেচ্ছাচারিতাও নয়। এর পেছনে শাশ্বত মৌল সত্যের সম্পর্ক রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে আল্লাহর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে চলে আসা চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। সত্যকে তিনি সে দিন থেকেই সব কাজের ভিত্তি বানিয়েছেন।

'কেননা কাফেররা বাতিলের অনুসারী আর মোমেনরা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যের অনুসারী।' এই মহাবিশ্বে বাতিলের কোনো শেকড় নেই। তাই বাতিল ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আর যারা বাতিলের অনুসারী এবং বাতিলের ওপর ভিত্তি করে যে সব মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে তাও মরণশীল ও ধ্বংসশীল। আর কাফেররা যখন বাতিলের অনুসারী, তখন তাদের যাবতীয় নেক আমল নষ্ট হতে বাধ্য এবং তার কিছু আর অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

অপরদিকে সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত। সত্যের ওপর আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। সত্যের শেকড় গাথা রয়েছে সমগ্র মহাবিশ্বের পরতে পরতে, গভীর থেকে গভীরে। এ জন্যে যা কিছুই সত্যের সাথে যুক্ত ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা চিরন্তন, শাশ্বত ও অবিনশ্বর। আর মোমেনরা যখন সত্যের অনুসারী, তখন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করবেন। বস্তুত সত্য এটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জিনিস। সত্য তার স্থায়ী শেকড়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার উপাদানসমূহ অবিনশ্বর। সত্য কখনো ক্ষণস্থায়ী নয়, কাকতালীয় নয় এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।

'এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে তাদের উদাহরণসমূহ তুলে ধরেন।' আর এভাবেই তাদের জন্যে সেই মৌলিক নীতিমালা রচনা করেন, যার আলোকে তারা নিজেদেরকে ও নিজেদের কার্যকলাপকে সংগঠিত করে। ফলে তারা কোন আদর্শ ও উদাহরণের আওতাধীন, তা তাদের কাছে পরিচিত ও চিহ্নিত থাকে। তারা আদর্শহীন হয় না এবং জীবন যাপনের মূলনীতি নিয়ে তারা দিশেহারা হয় না।

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

সূরার প্রথম আয়াত যে মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই মোমেনদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়। সেই মূলনীতি হলো এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে যে বিধান নাযিল হয়েছে, সেটাই চিরন্তন ও শাশ্বত মহা সত্য। সেই মহাসত্য পৃথিবীতে শুধু টিকে থাকার জন্যে নয়- বরং মানব জাতির জীবন ও মূল্যবোধের ওপর তার আধিপত্যশীল ও পরাক্রান্ত হবারও অধিকার রয়েছে, যাতে সমগ্র মানবজাতি সত্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে তারা গড়ে তোলে। আর যারা কুফরি করেছে, তারা বাতিল ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বাতিল ও মিথ্যার উৎখাত হওয়া উচিত। মানব জীবনের ওপর তার তাদের কোনো প্রভাব বিস্তার আদৌ সমীচীন নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর যখনই তোমরা কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখনই তাদের গর্দান মারতে থাকবে। যখন তোমরা তাদেরকে ভালো মতো হত্যা করে সারবে, তখন বাদবাকীদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলো তারপর হয় অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের ছেড়ে দিও, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিও- যতক্ষণ যুদ্ধ বিরতি না হয় ততক্ষণ....।'

এখানে মুখোমুখী হওয়া দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুখোমুখী হওয়া বুঝানো হয়েছে, নিছক মুখোমুখী হওয়া নয়। কেননা এই সূরা নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আরব উপদ্বীপে মোশরেকরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো, যুদ্ধরত ও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ। তখনো সূরা তাওবা নাযিল হয়নি, যা মোশরেকদের মেয়াদী চুক্তিকে মেয়াদ পর্যন্ত ও অমেয়াদী চুক্তিকে চার মাস পর্যন্ত সীমিত করে দিয়েছিলো এবং সেই মেয়াদের পর মোশরেকদেরকে আরব উপদ্বীপের যেখানেই পাওয়া যাক, ইসলাম গ্রহণ না করলে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলো। কেননা সূরা তাওবা নাযিল হয়েছিলো ইসলামের কেন্দ্রীয় ভূখণ্ড আরব উপদ্বীপকে একমাত্র ইসলামের আবাস ভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে।(১১)

মুখোমুখী হবার পর গর্দান মারা তথা হত্যা করার যে নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে, সেটা স্বভাবতই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া ও তা তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যানের পরই কার্যকর হবে- তার আগে নয়। সূরার পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে এখানে হত্যার কার্যক্রমটিকে প্রত্যক্ষভাবে ও অনুভবযোগ্য করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বলা হয়েছে 'যখন তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে হত্যা করে সারবে, তখন বাদ বাকীদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলো। ... আয়াতে 'ইছখান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, ব্যাপক ও চরমভাবে হত্যা করা, যতক্ষণ না শত্রুর শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয় এবং পুনরায় আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা আর না থাকে, একমাত্র তখনই, তার আগে নয়।

(১১) মনে রাখতে হবে, সূরা তাওবার এই বিধান আরব উপদ্বীপের বাইরের মোশরকদের ওপর প্রযোজ্য নয়। সেখানে মোশরেকরা জিযিয়া দিয়ে বসবাস করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে।-সম্পাদক

যারা জীবিত ধরা পড়বে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে এবং কঠোরভাবে গ্রেফতার করা হবে- যতক্ষণ শত্রুর শক্তি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খতম করাই হবে এই হত্যার উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ মোফাসসেরের মতে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এই আয়াত ও সূরা আনফালের সেই আয়াতের বক্তব্যে কোনো বিরোধ থাকে না, যে আয়াতে রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে বদর যুদ্ধে বেশী করে যুদ্ধবন্দী গ্রহণের জন্যে ভর্ৎসনা করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহর দৃষ্টিতে আরো বেশী সংখ্যক মোশরেককে হত্যা করাই ছিলো শ্রেয়। সূরা আনফালের সেই দু'টো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

কোনো নবীর পক্ষে এটা সংগত নয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর শত্রুদের নিপাত না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী গ্রহণ করবে।' (আয়াত ৬৭-৬৮)

সুতরাং সর্বপ্রথম কাজ হলো, শত্রুর শক্তি ধ্বংস করা ও তার প্রতাপ খর্ব করার জন্যে হত্যা ও রক্তপাত করা, এরপর গ্রেফতারী। এর যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। কেননা যুদ্ধের প্রথম উদ্দেশ্যই হলো, ইসলামের প্রতি বৈরী আগ্রাসী শক্তিকে ধ্বংস করা, বিশেষত যখন সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানদের শক্তি কম ছিলো এবং মোশরেকরা সংখ্যাগুরু ছিলো। সে সময়ে একজন যুদ্ধরত অমুসলিমকে হত্যা করা শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় ছিলো। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের শক্তি ধ্বংস করা ও তাদেরকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় অক্ষম করে দেয়ার জন্যে যখন যতোটা জরুরী, তখন ততোটা নিপাত করার পক্ষে যে আদেশ সর্বকালেই প্রযোজ্য। তবে এরপর যাদেরকে বন্দী হিসাবে গ্রহণ করা হবে, তাদের ব্যাপারে কী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, সেটা সূরা মোহাম্মদের এই আয়াতে স্থির করে দেয়া হয়েছে। কারআনের একমাত্র এ আয়াতেই বন্দীদের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। সে নীতি হলো, 'হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে, নতুবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে।'

অর্থাৎ হয় কোনো বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, নচেত কোনো অর্থ, কাজ বা মুসলিম বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।

আয়াতে তৃতীয় কোনো নির্দেশনা নেই। অর্থাৎ মোশরেক বন্দীদেরকে দাস হিসাবে গ্রহণ বা হত্যা করা বা অন্য কোনো কিছু করার অবকাশ নেই। তবে বাস্তবে এরূপ ঘটেছে যে, রসূল (স.) ও খলীফারা কোনো কোনো বন্দীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কিছু বন্দীকে তারা হত্যাও করেছেন।

এখানে আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিশিষ্ট হানাফী ইমাম আবু বকর আল জাসসাসের গ্রন্থ 'আহকামুল কোরআন'-এ ও তার টীকায় বর্ণিত কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃতির পর আমি নিজের মতামতও ব্যক্ত করবো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখন গর্দান মারতে থাকবে ...' এ প্রসংগে ইমাম আবু বকর বলেন, আয়াতের এ অংশটির সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, এই সময়ে কাফেরদেরকে হত্যা করা জরুরী। অবশ্য ব্যাপক হত্যাকান্ড ঘটানোর পরের কথা স্বতন্ত্র। এ ধরনের কথা আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন,

'কোনো নবীর পক্ষে সমীচীন নয় যে, পৃথিবীতে ব্যাপক হত্যাকান্ড না ঘটানো পর্যন্ত বন্দী গ্রহণ করবে। ...'

এ বক্তব্য সঠিক, সুতরাং উভয় আয়াতে কোনো বিরোধ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এটা বদর যুদ্ধের দিনের ব্যাপার। তখন মুসলমানরা সংখ্যায় ছিলো কম। পরে যখন তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলো এবং তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি জোরদার হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বন্দীদের সম্পর্কে নাযিল করলেন, 'হয় অনুগ্রহ করো, নচেত মুক্তিপণ গ্রহণ করো' এ সময় আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে সুযোগ দিলেন হয় তাদেরকে হত্যা করে ফেলুক, নচেত দাসদাসীতে পরিণত করুক, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিক। আবু ওবায়েদ নামক জনৈক বর্ণনাকারী বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ থাকায় আমরাও ওটা বর্জন করেছি। তবে বন্দীদেরকে হত্যা করার কোনো বৈধতা আয়াতে পাওয়া যায় না। আয়াতে কেবল অনুগ্রহ প্রদর্শন অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তিদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সুদ্দীর মতে, 'হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দাও, এ আয়াত 'মনসুখ (রহিত) 'মোশরেকদের যেখানে পাও হত্যা করো' সূরা তাওবার এ আয়াত দ্বারা ওটা রহিত হয়ে গেছে। আবু বকর বলেন, 'যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখন গর্দান মারতে থাকো।' 'কোনো নবীর পক্ষে এটা সংগত নয় যে, তার হাতে বন্দীরা থাকবে, যতক্ষণ না ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত করে ...' এবং 'তাদেরকে যদি যুদ্ধের ভেতরে পাও, তবে তাদেরকে ও তাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দাও'– এ তিনটি আয়াতের হুকুম রহিত নাও হতে পারে এবং এটা স্থায়ী নির্দেশ হতে পারে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের সর্বতোভাবে দমন ও পরাজিত না করা পর্যন্ত ব্যাপকভাবে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং বন্দী হিসাবে তাদের আটক করতে নিষেধ করেছেন। এ আদেশ আল্লাহ তায়ালা তখনই দিয়েছেন যখন মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিলো এবং তাদের শত্রু মোশরেকদের সংখ্যা বেশী ছিলো। মোশরেকদেরকে যখন হত্যা করে ও বিতাড়িত করে সম্পূর্ণভাবে দমন ও পরাস্ত করা সম্পন্ন হবে, তখন অবশিষ্টদেরকে বন্দী করা যাবে। সুতরাং ইসলামের প্রথম যুগের মতো অবস্থায় মুসলমানরা কখনো পতিত হলে তখন তাদের জন্যে এই নির্দেশকে বহাল রাখা কর্তব্য। আমার মতে, 'মোশরেকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো' এ আদেশ কেবল আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু সূরা মোহাম্মদের নির্দেশটি সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেশময় সর্বাত্মক হত্যা ও দমন অভিযান পরিচালিত হওয়ার পর অবশিষ্ট শত্রুদেরকে বন্দী করা যাবে। সূরা তাওবার নাযিলের পর রসূল (স.)-এর খলিফারা স্বভাবত এটাকেই এ ব্যাপারে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে ছাড়া বন্দীদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। সেই ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ অবস্থাগুলোর বিবরণ পরে আসছে।

মুক্তিপণ প্রসংগে ইসলাম

এবারে দেখা যাক, 'পরে হয় অনুগ্রহ দেখিও, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিও' এ আদেশটির তাৎপর্য কী। বাহ্যত এ আদেশের দাবী হচ্ছে দুটো বিষয়ের যে কোনো একটা। হয় অনুগ্রহ সহকারে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দাও, নচেত মুক্তিপণ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে মুক্তিদান করো। এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, বন্দীদেরকে হত্যার কোনো বৈধতা নেই। অতীতের মনীষীরা এ ব্যাপারে কিছু ভিন্নমত পোষণ করেছেন। যেমন হযরত হাসান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বন্দী হত্যা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন, হয় অনুগ্রহ দেখাও, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। আশয়াস বলেন, আমি আতা'কে বন্দী হত্যার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হয় অনুগ্রহ দেখাও, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রসূল (স.) বদরের

যুদ্ধবন্দীদের সাথে যা করেছেন, তাই করা হবে, হয় অনুগ্রহ করা হবে, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসতাখার অঞ্চলের অন্যতম প্রভাবশালী একজনকে হত্যা করার জন্যে তাঁর কাছে সোপর্দ করা হয়। কিন্তু তিনি হত্যা করতে অস্বীকার করলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ হত্যা করার বৈধতা আয়াতে নেই বলে তিনি মনে করেন। মোজাহেদ ও মোহাম্মাদ, ইবনে সিরিন থেকেও বর্ণিত আছে যে, তারা বন্দী হত্যা পছন্দ করতেন না। সুদ্দী থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে, 'হয় অনুগ্রহ দেখাও, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও' এ আদেশ 'মোশরেকদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর' দ্বারা রহিত। ইবনে জুরাইয থেকেও বর্ণিত যে, এটা রহিত। তিনি বলেন, রসূল (স.) বদর যুদ্ধের দিন ওকবা ইবনে আবু মুইতকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করেন। আবু বকর বলেন, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমরা বন্দী হত্যার বৈধতা সম্পর্কে একমত। রসূল (স.) যে বন্দী হত্যা করিয়েছিলেন, বিশেষত বদর যুদ্ধের দিন ওকবা ইবনে আবি মুইতকে ও নাযার ইবনুল হারেসকে সে সম্পর্কে এতো বেশী বর্ণনা এসেছে, যা অবিশ্বাস করা অসম্ভব। ওহুদ যুদ্ধের দিনও তিনি বন্ধী কবি আবু ইযযতকে হত্যা করেছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মোয়াযের রায় মোতাবেক তিনি বনু কোরায়যার বয়স্ক পুরুষদের হত্যা ও তাদের সন্তানদেরকে দাস দাসী বানান। তাদের মধ্য থেকে যোবায়র বিন বাতাকে কৃপা প্রদর্শন করেন। খয়বরের একাংশকে শক্তি প্রয়োগ ও অপর অংশকে আপোষে জয় করেন। ইবনে আবিল হাকীককে অংগীকারাবদ্ধ করেন যে, সে কোনো তথ্য গেপন করবে না। কিন্তু পরে তার বিশ্বাসঘাতকতা ও তথ্য গোপন প্রকাশ হয়ে পড়লে তাকে হত্যা করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি হিলাল বিন খাতাল, মিকয়াস বিন হুবাবা, আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ ও আরো কয়েকজনকে হত্যা করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, এই লোকগুলোকে কাবা শরীফের পর্দা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় পেলেও হত্যা করবে। তিনি মক্কাবাসীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাদের ধন সম্পদকে গনীমতে পরিণত করেননি।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, 'আমি যেদিন ফুজায়াতে গিয়েছিলাম, সেদিন তাকে পুড়িয়ে না মেরে তাকে মুক্ত অবস্থায় হত্যা করা কিংবা নিরাপদে মুক্ত করে দেয়াটাই আমি পছন্দ করতাম।' হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সুস নগরীর জনৈক কৃষক সরদার যখন একদল লোকের প্রাণের নিরাপত্তা চাইলো এবং তাদের মধ্যে সে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করলো না, তখন তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদত্তদের অন্তর্ভুক্ত করলেন না এবং হত্যা করলেন। রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে উদ্ধৃত এইসব বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বন্দীকে হত্যা করা বা বাঁচিয়ে রাখা উভয়ই জায়েয আছে এবং এ ব্যাপারে সকল অঞ্চলের আলেমরা একমত। (হত্যার বৈধতা আয়াত থেকে নয় বরং রসূল (স.) ও কতিপয় সাহাবীর দৃষ্ঠান্ত থেকে গৃহীত। যে পরিস্থিতিতে এই হত্যাকান্ডগুলো ঘটেছে, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব হত্যাকান্ডের জন্যে সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও ব্যতিক্রমী কার্যকারণ দায়ী, নিছক যুদ্ধ বা বন্দীদশাই এর একমাত্র কারণ নয়। যেমন নাযার ইবনুল হারেস ও ওকবা ইবনে আবু মুইত উভয়েই রসূল (স.) ও তাঁর আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো। কবি আবু ইযযতের অবস্থাও অনুরূপ। বনু কোরায়যারও বিশেষ ভূমিকা ছিলো এবং তার আগেই সা'দ বিন মোয়াযকে শালিশ মেনেছিলো।

এভাবে আমরা সকল ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমধর্মী কারণ ও পটভূমি দেখতে পাই, যা দ্বারা জানা যায় যে, এই আয়াতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণসহ বা মুক্তিপণ ছাড়া মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে যে সাধারণ আদেশ রয়েছে, এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

ইমামদের মধ্যে মুক্তিপণ নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। হানাফী মাযহাবের ইমামরা সবাই এই মর্মে একমত যে, বন্দীকে অর্থ সম্পদের বিনিময়ে ছাড়া যাবে না এবং যুদ্ধরত কাফেরদের সন্তানদেরকে গোলামী বাঁদী বানানোর পর তাদেরকে বিক্রি করাও জায়েয নয়। কেননা তাতে আশংকা আছে যে, তারা একদিন পুনরায় যুদ্ধ করতে আসবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বন্দীদেরকে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়েও ছাড়া যাবে না– যাতে তাদের দ্বারা আর কখনো যুদ্ধ শুরু হতে না পারে। আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ (র.) বলেন, মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে মোশরেক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়াতে কোনো দোষ নেই। ইমাম ছাওরী ও আওযায়ীর অভিমতও এটাই। আওযায়ী বলেন, যুদ্ধরত অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা দাসদাসীতে পরিণত হয়েছে তাদেরকে বিক্রি করা জায়েয। তবে তাদের পুরুষদেরকে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে ছাড়া বিক্রি করা যাবে না। মাযানী ইমাম শাফেয়ীর মত উদ্ধৃত করেন যে, মুসলিম শাসক বিজিতদেরকে ক্ষমাও করতে পারেন, তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিতেও পারেন। মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে বা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিদানের প্রবক্তারা এই আয়াত দিয়ে যুক্তি দেখান যে, 'হয় অনুগ্রহ দেখাও, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও।' এ আদেশ স্পষ্টই দাবী করে যে, অর্থকড়ি অথবা মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া বৈধ। তারা এ যুক্তিও দেখান যে, রসূল (স.) অর্থকড়ি নিয়ে বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে যে অমুসলিম বন্দীদেরকে ছাড়া বৈধ, তার সপক্ষে তারা ইবনুল মোবারকের বর্ণনা থেকে প্রমাণ দেন। এই বর্ণনায় আছে যে, বনু সাকীফ রসূল (স.)-এর দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে। আর বনু আমের বিন সা'সায়া গোত্রের একজনকে বন্দী করেন রসূল (স.)-এর সাহাবীরা। শেষোক্ত বন্দী দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো এমতাবস্থায় রসূল (স.) তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে রসূল (স.)-কে ডাকলো। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কি কারণে বন্দী করা হয়েছে। রসূল (স.) বললেন, তোমার মিত্রদের (বনু সাকীফ) অপরাধে। বন্দী বললো, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। রসূল (স.) বললেন, তুমি স্বাধীন অবস্থায় যদি এ কথা বলতে, তাহলে তুমি সর্বাত্মক সফলতা লাভ করতে। (অর্থাৎ তোমার কথা গ্রহণযোগ্য হতো) এরপর রসূল (স.) চলে যেতে লাগলেন। তখন লোকটি তাঁকে আবারও ডাকলো। তিনি এগিয়ে এলেন। সে বললো, আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে খেতে দিন। রসূল (স.) বললেন, এটা তোমার প্রয়োজন। অতপর রসূল (স.) তাকে বনু সাকীফ কর্তৃক আটক করা দু'জন মুসলমানের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তি দিলেন। আমার মতে, অর্থকড়ি বা মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারী ইমাম জাসসাসের সাথীদের যুক্তির চেয়ে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়ার প্রবক্তাদের যুক্তি অধিকতর অগ্রগণ্য।

ইমাম জাসসাস তাঁর হানাফী সমমনা ফকীহদের মতকে অগ্রগণ্যতা দিয়ে তার যুক্তির সমাপ্তি টেনেছেন। তিনি বলেন, আয়াতে অনুগ্রহ প্রদর্শন ও মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়ার পক্ষে যে বক্তব্য রয়েছে এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, তা সূরা তাওবার এ আয়াত, 'মোশরেকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো ...' দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, আমরা এ কথা সুদ্দী ও ইবনে জুরাইয থেকেও বর্ণনা করেছি। তা ছাড়া সূরা তাওবার এ আয়াত দ্বারাও তা রহিত বুঝা যায়, 'যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ...

যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে বিনীতভাবে জিযিয়া না দেয়।' অতএব এ দুটো আয়াতে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজেব বলা হয়েছে। অর্থকড়ি নিয়ে বা অন্য কিছুর বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়া এর পরিপন্থী। তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা তাওবা সূরা মোহাম্মদের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং সূরা তাওবার আদেশ দ্বারা সূরা মোহাম্মাদের আদেশ রহিত হওয়া অনিবার্য। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, সূরা তাওবায় মোশরেকদেরকে হত্যার যে আদেশ রয়েছে, তা কেবল আরব উপদ্বীপের মোশরেকদের মধ্যে সীমিত। এর বাইরের মোশরেক ও আহলে কেতাবদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যায়। আত্মসমর্পণের সময় জিযিয়া গ্রহণ করলেই যে মুসলমানদের হাতে তার আর কোনো বন্দী থাকতে পারবে না এমন কোনো কথা তো নেই। বন্দী থাকলে এই বন্দীদের কী উপায় হবে? আমি বলবো, মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তি দিতে পারবে– যদি তারা এতোটা প্রতাপশালী থাকে যে, এখনো আত্মসমর্পন করেনি এবং জিযিয়াও দিতে রাযি নয়। জিযিয়া দিতে রাযি হলে তো সমস্যা আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যায়। এটা একটা ভিন্ন অবস্থা। কাজেই যখন জিযিয়া দিতে সম্মত না হওয়ার কারণে সমস্যা থেকে যায়, তখন বন্দীদের বিধান বলবত থেকে যায়।

সারকথা এই যে, কোরআনের এই ভাষ্যই বন্দীদের বিধানসম্বলিত একমাত্র কোরআনী ভাষ্য। এ ছাড়া কোরআনের আর যতো ভাষ্য রয়েছে, তাতে বন্দীদশা ছাড়া অন্যান্য অবস্থার বিধানসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। এ ভাষ্যটি হচ্ছে এ সংক্রান্ত স্থায়ী মূলনীতি। এ মূলনীতির বাইরে যা কিছু কার্যত ঘটেছে, তা বিশেষ ও সাময়িক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যেই ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো কোনো বন্দীকে হত্যার ঘটনা নিতান্তই ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার নযীর সব সময়ই থাকতে পারে। তাদেরকে হয়তো বন্দী করা হয়েছে পূর্বেকার কোনো অপরাধের জন্যে নিছক যুদ্ধ করতে আসার কারণে নয়। হয়তো সে একজন গুপ্তচর ছিলো, তখন বন্দী হয়ে এসেছে। ফলে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধেই তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে– বন্দী হিসাবে নয়। বন্দী হিসাবে আটক করাটা ছিলো তাকে পাকড়াও করার ওসিলা মাত্র।

দাসপ্রথা প্রসংগ

এখন বাকী থেকে যাচ্ছে দাসত্বের বিষয়টি। এই তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে আমি বলেছি যে, একটা বিশ্বজনীন পরিস্থিতি ও যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে বিরাজমান কিছু সার্বজনীন প্রথা ও ঐতিহ্যের মোকাবেলা করতে গিয়েই আমাদের এটা অবলম্বন করতে হয়েছে। 'যুদ্ধবন্দীদেরকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে বিনা মুক্তিপনে ছেড়ে দেয়া অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার' এই মূলনীতিটা সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত করা ইসলামের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশেষত যখন ইসলামের শত্রুরা মুসলিম বন্দীদেরকে নির্বিচারে দাস দাসীতে পরিণত করেছে। এ জন্যেই রসূল (স.) এ মূলনীতিটাকে কোনো কোনো অবস্থায় বাস্তবায়িত করেছেন এবং কিছু বন্দীকে অনুগ্রহপূর্বক কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিয়েছেন, আবার কতককে মুসলিম বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছেন। কতককে আবার আর্থিক পণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু ভিন্ন পরিস্থিতিতে বন্দীদেরকে দাস দাসী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। কারণ বিরাজমান পরিস্থিতিতে তার অন্য কোনো সমাধান সম্ভবপর ছিলো না।

এমন যদি কখনো ঘটে যে, যুদ্ধরত সকল পক্ষ এই মর্মে একমত হয় যে, বন্দীদেরকে দাস দাসী করা হবে না, তাহলে তখন ইসলাম তার একমাত্র ইতিবাচক মূলনীতিতে অর্থাৎ 'হয় অনুগ্রহপূর্বক বিনা পণে মুক্তি– নচেত মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়া–এর নীতিতে ফিরে আসবে।

কেননা তখন দাসত্বের অনুকূল বিশ্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। বস্তুত দাসত্ব কোনো অপরিহার্য বিধানও নয়, যুদ্ধবন্দী সমস্যার সমাধানের এটা কোনো ইসলামী মূলনীতিও নয়। পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি ও বিভিন্ন বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাবলীর আলোকে আমার কাছে যে মতটা সঠিক মনে হয়েছে, সেটাই আমি এখানে তুলে ধরলাম। প্রকৃত পক্ষে কোনোটা সঠিক ও নির্ভুল মত তার সন্ধান কেবল আল্লাহ তায়ালাই দিতে পারেন।

এই সাথে এ কথাও বুঝে নেয়া ভালো যে, আমি যে মতটা তুলে ধরেছি, কোরআনের বাণী ও বিরাজমান বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমি এটাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি। এমন নয় যে, আমি বন্দীদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করাকে একটা কলংক মনে করি এবং তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি! এমন ধারণা আমার অন্তরে কখনোই স্থান পায়নি। ইসলাম যদি এই মতকেই গ্রহণযোগ্য মনে করে, তবে তাই ভালো। কেননা কোনো কৃষ্টিবান মানুষই এমন দাবী করতে পারে না যে, সে যে মত পোষণ করে, সেটাই আল্লাহর সর্বোত্তম পছন্দসই মত। আমি শুধুমাত্র কোরআনী ভাষ্য ও তার অন্তর্নিহিত ভাবধারারই অধীন এবং কোরআনের ভাষ্যের আলোকেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আর এই যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যাকান্ড, বন্দী আটক করা এবং বন্দীদের ব্যাপারে এই নীতি অবলম্বন ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকবে যতক্ষণ 'যুদ্ধের অবসান না ঘটবে।'

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম ও তার শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান না ঘটে। সুতরাং এটা হচ্ছে একটা চিরস্থায়ী মূলনীতি। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, জেহাদ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। (আবু দাউদ) অর্থাৎ যতক্ষণ আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না হয়, ততদিন চলতে থাকবে।

জেহাদ একটি পরীক্ষা

কাফেরদের ওপর নিজের দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী বলে তাদের তিনি ওপর এই জেহাদ ফরয করেননি এটা মোটেই ঠিক নয়।। আসলে আল্লাহ তায়ালা কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাফেরদেরকে একাই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তিনি জেহাদের হুকুম দিয়ে কেবল তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের আলোকে তাদের মান ও মর্যাদা নির্ণয় করতে চান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা চাইলে (যারা কাফের) তাদের ওপর (নিজ ক্ষমতাবলেই বিজয়ী হতে পারেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের কাউকে দিয়ে কাউকে পরীক্ষা করতে। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের কৃতকর্মকে তিনি কখনো বৃথা করে দেবেন না ...।'

এই সমস্ত লোক যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং সর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র তাদেরই মতো যতো আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারী ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী রয়েছে, যারা অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরা করে এবং তাদের অনুসারীদের সামনে নিজেদেরকে দোর্দন্ড প্রতাপশালীরূপে যাহির করে–এরা সবাই আল্লাহর মুষ্টিমেয় নগণ্য সৃষ্টি মাত্র। এরা পৃথিবী নামক আল্লাহর এই বিন্দুতুল্য জায়গাটায় বসবাস করে। এতোসব গ্রহ নক্ষত্র, নিহারিকা, ছায়াপথ এবং আরো অসংখ্য জগতের মাঝখানে এই পৃথিবী অবস্থিত, যেসবের সংখ্যা ও আয়তন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। এসব জগত এতো বড় মহাশূন্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে যে, এগুলোকে কতকগুলো কণা বা বিন্দুর মতো মনে হয় এবং এগুলোকে আল্লাহ তায়ালাই সামাল দিয়ে রাখেন, নিয়ন্ত্রণ করেন ও এগুলোর ভেতরে সমন্বয় সাধন করেন।

এই বিশাল মহাশূন্যে বিচরণকারী বিন্দুবত এই পৃথিবীতে বসবাসকারী এই লোকগুলো- তাদের অনুসারীরা এক কথায় গোটা পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্র পিঁপড়ের সমতুল্য। বরঞ্চ সত্যি বলতে গেলে তারা ধূলিকণার মতো। আরো সত্য করে বলতে গেলে, তারা আল্লাহর শক্তির সামনে কোনো পদার্থই নয়।

আল্লাহ তায়ালা যখন মোমেনদেরকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার আদেশ দেন, তাদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাভূত ও শায়েস্তা করার পর আটক করার আদেশ দেন, তখন আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে নিজের শক্তির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছা করলে কাফেরদেরকে প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। যেমন কোনো কোনো জাতিকে বন্যা, ঝড় ও বিকট ধ্বনি দিয়ে করেছেন। এমনকি এ সবের সাহায্য না নিয়েও তাদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন। তবে তিনি তার মোমেন বান্দাদের কল্যাণ কামনা করেন, তাই তাদেরকে পরীক্ষা করেন, তাদেরকে লালন পালন করেন, সংশোধন করেন এবং তাদের জন্যে বড় বড় পুন্যকর্মের সহজ পথ দেখিয়ে দেন।

তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন, আর এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মোমেনদের অন্তরে মহৎ ভাবাবেগ ও মনোবল সৃষ্টি করে দেন। যে সত্যের প্রতি সে ঈমান আনে, তাকে নিজের জীবনের চেয়েও মূল্যবান ও মর্যাদাবান মনে করার চেয়ে মহত্তর ভাবাবেগ আর কিছুই হতে পারে না। এরূপ মনে করার কারণেই সে সেই সত্যের জন্যে লড়াই করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। এই সত্যের জন্যে সে বাঁচে ও মরে বিধায় এর ব্যাপারে সে কোনো আপোস করে না, এই সত্যকে ছাড়া বেঁচে থাকতে চায় না এবং এর অধীনে ছাড়া সে বেঁচে থাকা পছন্দই করে না।

তিনি তাঁর মোমেন বান্দাদেরকে লালন পালন করতে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় করতে চান। এ জন্যে তাদের মন থেকে তিনি পৃথিবীর সহায় সম্পদের লোভ লালসা দূর করে দিতে চান। অথচ তাদের পক্ষে এই লোভ লালসা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় দুর্বলতাকে সবলতায় ও অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করতে চান এবং তাদের মনের সকল কলুষতাকে দূর করতে চান। যাতে তাদের সমস্ত লোভ লালসা থাকবে এক পাল্লায়, আর আল্লাহর জেহাদের দাওয়াত গ্রহণ ও তার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা থাকবে অপর পাল্লায়। এই শেষের পাল্লাটি তার আগের পাল্লার চেয়ে ভারী হবে। তখন আল্লাহর কাছে প্রমাণিত হবে যে, তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হলে তারা ভালো পথকে গ্রহণ করে, তারা না জেনে না বুঝে বাধ্য হয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করে না, বরং বুঝে শুনে স্বাধীনভাবে যা কল্যাণকর তাই গ্রহণ করে।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সংশোধন করতে চান। আল্লাহর পথে জেহাদে প্রতি মুহূর্তে যে কষ্ট ও যন্ত্রণায় ভুগতে হয় এবং প্রতি মুহূর্তে যেভাবে মৃত্যুর ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়, তাতে মানুষের মনে এ ধরনের ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করার অভ্যাস জন্মে। মৃত্যুভীতি সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন, চরিত্র, মূল্যবোধ ও বিচার বিবেচনার মানদন্ড সম্পর্কে অত্যাধিক সতর্ক ও দায়িত্বশীল করে তোলে, যাতে মৃত্যু থেকে সে রক্ষা পেতে পারে। অথচ যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ঝুকির সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত, তার কাছে মৃত্যু কোনো ভয়ের বিষয় বলেই মনে হয় না, এটা তার কাছে নিতান্ত সহজ ব্যাপার হয়ে যায়। সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাক অথবা মৃত্যুর কবলে পড়ুক দুটোই তার কাছে সমান। বান্দা যদি সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখে ও তার প্রতি মনোযোগী থাকে, তবে তার এই সার্বক্ষণিক স্মরণ ও আল্লাহমুখিতা তার ওপর এতোটা তীব্রভাবে কার্যকর হয়, যতোটা হয় বস্তুর ওপর বিদ্যুতের। এই সার্বক্ষণিক স্মরণ ও আল্লাহমুখিতা তাকে মৃত্যু ও আখেরাতের ভাবনার

অত্যন্ত কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং মৃত্যুর ভয় তার মন থেকে দূর করে দেয়। সুতরাং আল্লাহর পথে জেহাদ বলতে গেলে মানুষের অন্তরাত্মাকে নতুন রঙে রংগিন করে এবং তাকে পরিশুদ্ধ স্বচ্ছ ও নির্মল করে।

জেহাদের সাথে সম্পৃক্ততা শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের বিবেক ও মনের পরিশুদ্ধিই সাধন করে না, বরং গোটা মানব সমাজে সংস্কার ও সংশোধনেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কেননা যে মোজাহেদরা এর নেতৃত্ব দেন, তারা থাকেন দুনিয়ার যাবতীয় লোভ লালসা ও ভোগ বিলাসের উর্ধ্বে। তারা অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। আল্লাহর পথে থেকে তারা সর্বক্ষণ পরকাল ও মৃত্যু চিন্তায়ই সময় কাটান, যা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা থেকে ও তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বা উদাসীন করে রাখতে পারে না। এ ধরনের লোকদের হাতে যখন নেতৃত্ব থাকে, তখন গোটা পৃথিবীই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর গোটা পৃথিবীর অধিবাসীরাই হয়ে যায় পরিশুদ্ধ, শান্তশিষ্ট ও মার্জিত। তাদের পক্ষে এই নেতৃত্বের পতাকা কুফরি শক্তি, নৈরাজ্যবাদী শক্তি ও বিপথগামী শক্তির হাতে সমর্পণ করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এই পতাকাকে তারা জেহাদ করে বহু প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিলো এবং নিজেদের জন্যে নয়, বরং আল্লাহর জন্যে এই পতাকাকে হস্তগত করতে তারা নিজেদের প্রতিটি মূল্যবান সম্পদকে বিসর্জন দিয়েছিলো।

জেহাদের আরো একটা বৈশিষ্ট এই যে, আল্লাহ তায়ালা যাদের কল্যাণ চান, তাদের জন্যে তারা সন্তুষ্টি ও সীমাহীন পুরস্কার লাভের জন্যে এটাকে অত্যন্ত সহজ করে দেন। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা যাদের অকল্যাণ চান, তাদের জন্যে সমুচিত গযব ও আযাব লাভেরও এটা একটা সহজ উপায় হয়ে যায়। প্রত্যেক বান্দার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা সেই পথ সহজ করে দেন, যার জন্যে তার সৃষ্টি হয়েছে। আর কে কিসের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে তা আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন। এ জন্যেই আল্লাহর পথে যারা জেহাদ করে নিহত হয়েছে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে–

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের সৎকাজগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কখনো বিপথগামী করে দেবেন না। তিনি তাদেরকে সুপথগামী করবেন, তাদের মনকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের কাছে আগেই তুলে ধরেছেন।' 'তাদের সৎকাজগুলোকে কখনো বিপথগামী করবেন না।' লক্ষণীয় যে কাফেরদের সম্পর্কে ঠিক এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে, 'যারা কুফরি করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎ কাজগুলোকে বিপথগামী করে দেবেন। মোমেনদের সৎ কাজগুলো সুপথগামী হবার অর্থ এই যে, সেগুলোর উদ্দেশ্য সফল হবে, সেগুলো মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে যাবে এবং যে মহাসত্য থেকে তার উদ্ভব ঘটেছে, তার সাথে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে। বস্তুত সমস্ত সৎকাজেরই উদ্ভব ঘটেছে পৃথিবীর বুকে সত্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। তাই সৎকাজগুলো চিরস্থায়ী ও সুরক্ষিত। তা কখনো নষ্ট হয় না। কেননা তার উৎস সত্য, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। কখনো তা নষ্ট হতে পারে না।

এরপর আমরা আরো একটা মহা সত্যের সম্মুখীন হই। সেটি হলো, আল্লাহর পথে শাহাদাতপ্রাপ্তদের অনন্ত জীবন। এ সত্য ইতিপূর্বে আল্লাহর আরো একটা উক্তি থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাকে তোমরা মৃত বলো না, বরঞ্চ তারা জীবিত। তবে তোমার তা বুঝতে পার না।' অবশ্য এখানে এর বর্ণনাভংগী নতুন ও

অভিনব। অর্থাৎ পৃথিবীতে সে যেমন হেদায়াত, সুপথগামিতা ও পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতো, তেমনি মৃত্যুর পরেও সে হেদায়াতের পথেই তার অভিযাত্রা অব্যাহত রাখবে, গোমরাহী তাকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুপথগামী করবেন এবং তাদের মনকে পরিশুদ্ধ করবেন।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের প্রভু। এই প্রভুর জন্যেই তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলো, আর তিনিই তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, শাহাদাত লাভের পরও তারা হেদায়াতের পথে থাকবে, শাহাদাতের পরও তাদের অন্তর সংশোধিত হবে, তাদের আত্মা পৃথিবীর অবশিষ্ট সমস্ত নোংরামি থেকেও পবিত্র হবে, অথবা অধিকতর পবিত্রতা অর্জন করবে, যাতে যে ফেরেশতাদের জগতে সে স্থান লাভ করেছে সেখানে যেন সে তাদের মতেই পবিত্র ও পুন্যময় হয়ে অবস্থান করতে পারে। বস্তুত শহীদদের ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং তা একটা অখণ্ড ও নিরবিচ্ছিন্ন জীবন। কেবল দুনিয়ার সাধারণ মানুষ তা দেখবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত বিধায় দেখতে পায় না। সেটা এমন এক জীবন, যার চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাকে অধিকতর পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা, ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য দান করেন এবং অধিকতর হেদায়াত দান করেন। সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে। সবশেষে তাদের সেই প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়ন করেন, যার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আর তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচিতি তাদের কাছে (আগেই) তুলে ধরেছেন।'

ইমাম আহমদ কর্তৃক স্বীয় মোসনাদে উদ্ধৃত একটি হাদীসে তার উল্লেখ রয়েছে। 'রসূল (স.) বলেছেন, শহীদের ছয়টা বৈশিষ্ট, রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, সে বেহেশতে কোথায় থাকবে তা দেখতে পায়, হুরদের সাথে তার বিয়ে হয়। কেয়ামতের ভয়াবহ আতংক ও কবরের আযাব থেকে সে রক্ষা পাবে এবং ঈমানের পোশাক পরিধান করবে।' ইমাম আহমদ একই বক্তব্যসম্বলিত আরো একটা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহীদ বেহেশতে যাওয়ার অনেক আগেই সে বেহেশতে তার থাকার জায়গা দেখতে পাবে।

এটাই হলো আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক শহীদদের কাছে জান্নাতের পরিচয় তুলে ধরার মর্ম। এটা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত বা সুপথগামিতারই ধারাবাহিকতা। শহীদদের পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পরও তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের এই ধারা চালু থাকবে।

আল্লাহর পথে শহীদদের এই দুর্লভ সম্মান, এই সন্তুষ্টি, এই তদারকী এবং এই উচ্চতর মর্যাদা লাভের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে আল্লাহর জন্যে সর্বতোভাবে নিবেদিত হতে এবং পার্থিব জীবনে তার দ্বীনের বিজয়ে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। আর এই সাহায্যের বিনিময়ে তাদেরকে জেহাদের ময়দানে মযবুত কদমে টিকে থাকা ও তাঁর শত্রুদেরকে বিপর্যস্ত ও বিপথগামী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'হে মোমেনরা, তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলোকেও টিকিয়ে রাখবেন, আর যারা কাফের, তাদের ধ্বংস সাধিত হবে, তাদের সৎকাজগুলো বৃথা ও বিপথগামী হবে। কেননা তারা আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে অপছন্দ করেছিলো। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎকর্ম নষ্ট কর দিয়েছেন।'

আল্লাহকে সাহায্য করা বলতে কী বুঝায়

এখন প্রশ্ন এই যে, মোমেনরা আল্লাহকে কিভাবে সাহায্য করবে, যাতে এই সাহায্য করার প্রতিদান হিসাবে তারা আল্লাহর সাহায্য পেতে পারে এবং দ্বীনের দাবী পূরণের সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে? এর জবাব এই যে, আল্লাহর জন্যে তাঁর বান্দারা জানমালসহ যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করবে, তার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ধরনের শেরেকে লিপ্ত না হোক, তাঁর নিজের জানমাল ও যাবতীয় প্রিয়বস্তুর চেয়ে আল্লাহ তায়ালাই তার কাছে প্রিয় হোক। তার চলন, বলন, আবেগ, অনুভূতি আশা আকাঙ্খা ও কামনা বাসনায় আল্লাহ তায়ালাই তার সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তদাতা হোক। এটা স্বভাবতই প্রত্যেক বান্দার কাছে আল্লাহর প্রাপ্য ও কাম্য, আর এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বান্দা কর্তৃক আল্লাহর সাহায্য অর্থাৎ আল্লাহর দাবী পূরণ।

মানুষের পার্থিব জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহর একটা আইন ও বিধান রয়েছে, যার ভিত্তি গোটা বিশ্বজগত ও জীবন সংক্রান্ত বিশেষ দৃষ্টিভংগী, আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর সেই আইন ও জীবনবিধানকে সাহায্য করলেই এবং কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে সর্বময় কর্তৃত্ব দান করলে ও বাস্তবায়িত করলেই সামষ্টিক জীবনে আল্লাহকে সাহায্য করা হবে।

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়' এবং 'তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো' আল্লাহর এই দুটো উক্তির মর্ম সম্পর্কে আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।

এখানে সুস্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, নিহত হওয়া ও সাহায্য করা উভয় অবস্থার সাথেই 'আল্লাহর' কথা যুক্ত রয়েছে। সুতরাং এই দুটোই আল্লাহর পথে ও আল্লাহর জন্যে হওয়া জরুরী। কিন্তু ঈমানের দুর্বলতায় আচ্ছন্ন কোনো কোনো প্রজন্ম এই মানে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। ফলে শাহাদাত, শহীদ, জেহাদ ইত্যাকার শব্দগুলো তাদের আসল ও একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

জেহাদ হবে শুধু আল্লাহর পথে

মনে রাখতে হবে, জেহাদ যখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে, মৃত্যু যখন একমাত্র আল্লাহর পথেই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য ও বিজয় যখন একমাত্র আল্লাহর জন্যেই অর্জিত হবে– ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রে কেবল তখনই আল্লাহর কাছে জেহাদ ও শাহাদাত গ্রহণযোগ্য হবে এবং কেবল তখনই তার প্রতিদান হবে জান্নাত, যখন জেহাদের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করা। আল্লাহর আইনকে মানুষের হৃদয়ে, বিবেকে, চরিত্রে ও আচরণে সর্বময় কর্তৃত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচারবিভাগসহ সকল রাষ্ট্রীয় অংগনে শরীয়তকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের আসনে আসীন করার উদ্দেশে হলেই কেবল জেহাদকে যথার্থ জেহাদ ও শাহাদাতকে প্রকৃত শাহাদাতরূপে গণ্য করা হবে এবং তখনই জান্নাত হবে তার প্রতিদান।

হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রসূল (স.)-কে এমন তিন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, যাদের একজন বীরত্বের খাতিরে লড়াই করেছিলো, দ্বিতীয়জন হঠকারিতা ও প্রতিহিংসার বশে লড়াই করেছিলো এবং তৃতীয়জন লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই করেছিলো। জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, এ তিন জনের মধ্যে কোন জন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে? রসূল (স.) জবাব দিলেন, যে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হোক এ উদ্দেশ্যে লড়াই করেছে, সেই একমাত্র আল্লাহর পথের যোদ্ধা। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ)

একমাত্র এই উদ্দেশ্য ও এই পতাকার খাতিরে ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ও পতাকা এমন নেই, যার জন্যে কেউ জেহাদ করলে বা জেহাদ করে নিহত হলে তার জন্যে আল্লাহর বেহেশত প্রদানের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। ইসলামের আসল নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত প্রজন্মগুলোর কাছে যুদ্ধ বিগ্রহের যে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধারণভাবে প্রচলিত, তার ভেতরে আর যা কিছুই হোক, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার বাসনা অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

যারা ইসলামের দাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত, তাদের এই স্বতসিদ্ধ ও সহজবোধ্য কথাটা উপলব্ধি করা দরকার। দ্বীনের দাওয়াতকে তাদের অন্তরে এতোটা নির্ভেজাল ও নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন, যেন তার সাথে বিদ্যমান পরিবেশ ও বিপথগামী প্রজন্মের লোকদের বিকৃত চিন্তাধারা এবং কোনো অনৈসলামিক ধ্যান ধারণার মিশ্রণ না ঘটতে পারে।

বস্তুত যে জেহাদ আল্লাহর আদর্শকে সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী আদর্শে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, তা কোনো জেহাদ নয়। মন মানসিকতায় ও বিবেকে, চরিত্রে ও আচরণে, সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, এক কথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ও লেনদেনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধানই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ হবে– একমাত্র এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধ বিগ্রহ ও লড়াই সংগ্রামই আল্লাহর পথের জেহাদ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। এ ছাড়া আর যে উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ বিগ্রহ বা সংগ্রাম পরিচালিত হোক তা আল্লাহর পথে বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত জেহাদ নয়। তা শুধু শয়তানের পথের লড়াই। সে লড়াইতে কেউ নিহত হলে সে নিহত শহীদ নয়। সে মৃত্যু শাহাদাতও নয়, তার প্রতিদান জান্নাতও নয় এবং তার প্রতিদানে কোনো সাহায্য বিজয় বা ময়দানে টিকে থাকার শক্তির যোগানও আসবে না। এ ধরনের লড়াই নিছক ভাঁওতা, ভন্ডামি, বিপথগামিতা ও ভুল চিন্তার ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

যারা দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত নয়, তারা যদি এই ভাঁওতা ভন্ডামি ও কু চিন্তা থেকে মুক্ত হতে নাও পারে, তাহলে অন্ততপক্ষে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের মন মগয বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনাকে সমকালীন সমাজে প্রচলিত এই সব অপযুক্তি থেকে মুক্ত রাখা উচিত। কেননা তা আল্লাহর প্রথম ও যৌক্তিক শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে

বস্তুত এটা হলো আল্লাহর আরোপিত শর্ত যা তিনি মোমেনদের ওপর আরোপ করেছেন। আর এর বিনিময়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য, বিজয় ও সংগ্রামের ময়দানে দৃঢ়তা ও মনোবল অটুট রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কখনো যদি কিছু কালের জন্যে এই প্রতিশ্রুতির বিপরীত কিছু ঘটে, তবে তা হবে অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সংঘটিত পরিকল্পিত ও নির্ধারিত ব্যাপার, যা সাহায্য ও দৃঢ়তা দানের ওয়াদার সাথে সাথে বাস্তবায়িত হয়। এ ব্যাখ্যা তখনই প্রযোজ্য, যখন এটা সঠিক প্রমাণিত হবে যে, মোমেনরা তাদের সাধ্যমতো শর্ত পূরণ করেছে এবং তা সত্তেও আল্লাহর সাহায্য আসেনি।

এখানে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়তা দান করবেন এ কথাটা একটু গভীর চিন্তা ভাবনার দাবী রাখে।

প্রাথমিকভাবে এ রকম ধারণা জন্মে যে, আল্লাহর সাহায্য আসার আগেই দৃঢ়তা অর্জিত হয় এবং দৃঢ়তার মাধ্যমেই সাহায্য ও বিজয় আসে, এ ধারণাই সঠিক। কিন্তু আয়াতে দৃঢ়তার উল্লেখ হয়েছে পরে এবং এ দ্বারা মনে হয়, এখানে দৃঢ়তার তাৎপর্য কিছুটা ভিন্নতর। অর্থাৎ বিজয় ও তার

দায় দায়িত্ব বহনে দৃঢ়তা। (অর্থাৎ বিজয়কে ও তার সুফলকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে ঈমানী দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা আল্লাহ তায়ালা দান করবেন) বস্তুত কুফরী ও ঈমানের মধ্যে এবং সত্য ও গোমরাহীর মধ্যে যে লড়াই চলে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের মাধ্যমে সে লড়াই শেষ হয়ে যায় না। সাহায্য ও বিজয়ের ফলে বিজয় লাভকারীর ওপর ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায় দায়িত্ব যেমন অর্পিত হয়, তেমনি সামাজিকভাবেও কিছু দায় দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হয়। উপরন্তু বিজয়ের জন্যে অহংকারে মত্ত না হওয়া এবং এর শৈথিল্য আসতে না দেয়াও একটা দায়িত্ব। বিপদ মুসিবতে ও নির্যাতনে অনেকেই দৃঢ়তা দেখাতে পারে, কিন্তু বিজয় ও প্রাচুর্য লাভের পর অনেকেই দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অর্জনের পর সত্যের ওপর মনের দৃঢ়তা, দায়িত্ব ও পরিশুদ্ধি অব্যাহত রাখাটা খোদ বিজয়েরও উর্ধ্বের একটা ধাপ বা স্তর। সম্ভবত এ আয়াতে সে দিকেই ইংগিত দেয়া হচ্ছে। প্রকৃত তত্ত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

কাফেরদের চরম ব্যর্থতা

'আর যারা কুফরী করে তারা ব্যর্থ হোক এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎকাজগুলোকে বিপথগামী করে দেবেন।' এটা বিজয় ও দৃঢ়তার বিপরীত। ব্যর্থ হোক বলে যে বদদোয়া করা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সব কর্মকান্ড নিস্ফল করে দেয়ার সিদ্ধান্তই ঘোষিত হয়েছে। এরপর পুনরায় সৎকাজগুলোকে বিপথগামী করার উল্লেখ দ্বারা তার পুরোপুরি ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের কথাই বলা হয়েছে।

'এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৎ কাজগুলোকে বাতিল করে দিয়েছেন।'

মহান আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর ওপর যে কোরআন, শরীয়ত, জীবন বিধান ও সদুপদেশ নাযিল করেছেন, তার প্রতি কাফেরদের মনে যে বিরাগ ও অসন্তোষ বিরাজ করতো, এখানে তারই ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই বিরাগ ও অসন্তোষই তাদেরকে কুফরি, হঠকারিতা, বিদ্বেষ ও গোয়ার্তুমির দিকে ঠেলে দিতো। আল্লাহর সেই নিখুঁত ও নির্ভুল বিধানের প্রতি যারা স্বভাবগতভাবেই বিদ্বেষ ও আক্রোশ পোষণ করে এবং এই বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার দরুণ যাদের অন্তরে ভেতরে ভেতরেই দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে, এখানে তাদেরই মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সাক্ষাত সকল যুগে ও সকল স্থানেই পাওয়া যায়। এ ধরনের লোকেরা ইসলাম ও ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের প্রতি এতো বেশী বিদ্বিষ্ট ও উন্নাসিক হয়ে থাকে যে, এর নাম শুনতেই তারা বিচ্ছু দংশিত মানুষের ন্যায় আতংকে দিশেহারা হয়ে যায়। তাই কোনো আলাপ আলোচনায় ইসলামের কোনো উল্লেখ এমনকি আভাস ইংগিতও যাতে না হতে পারে, সে জন্যে তারা সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করে। একটু লক্ষ্য করলেই এ ধরনের একটা অবস্থা বোধ হয় আমাদের চোখের সামনে খোলামেলাভাবেই প্রত্যক্ষ করা যাবে!

আর আল্লাহর নাযিল করা বাণীর প্রতি এই বিরাগ ও বিদ্বেষের ফল এই হয়েছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত সৎকর্ম বাতিল ও নস্যাত করে দিয়েছিলেন, সৎকর্মগুলোকে বাতিল করা কোরআনের একটা সুপরিচিত পরিভাষা। এ পরিভাষা দ্বারা কোরআন একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার বিবরণ দেয়। কেননা মূল আয়াতে 'আহবাতা' (বাতিল করা অর্থে) যে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, 'তার মূল হলো 'হুবুত'। আভিধানিক অর্থে এক ধরনের বিষাক্ত ঘাস খাওয়ার দরুণ গবাদি পশুর পেট ফুলে যাওয়াকে 'হুবুত' বলা হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বিষাক্ত ঘাস খেয়ে এসব পশু

যেভাবে পেটফুলে মরে, কাফেরদের ওহীবিদ্বেষ ও ইসলামবিরাগী মানসিকতার কারণে তাদের সৎকাজগুলোও সেইভাবে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এভাবে এটা যেন একটা ধ্বংস প্রক্রিয়ার জীবন্ত ছবি। আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে অপছন্দ করার পরিণামে তাদের বড় বড় সৎ কাজ বিষাক্ত ঘাস খাওয়া গবাদি পশুর পেটের ন্যায় ফুলে ফেঁপে এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়!

ইতিহাসের শিক্ষা

এরপর পুনরায় আল্লাহ তায়ালা তাদের মুখকে তাদের পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ইতিহাস দর্শনের জন্যে সজোরে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন,

'তারা কি দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো? আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে এ ধরনের পরিণামই অপেক্ষা করছে।' এটা ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো একটা জোরদার ঝাঁকুনি। এর ভেতরে একটা প্রচন্ড ধাক্কা ও ধমক রয়েছে। পূর্ববর্তী যে সব জাতি শুধু নিজেরাই ধ্বংস হয়নি, বরং তাদের যাবতীয় সহায় সম্পদ ও আশপাশের যাবতীয় স্থাপনা বিধ্বস্ত হয়ে একটা ধ্বংসপুরীর রূপ ধারণ করেছিলো এবং তারা ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো, এখানে তাদেরই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। আয়াতে এমনভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে যে, তার উচ্চারণেও সেই ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভীত বিহ্বল আর্ত চিৎকারের বিকট ধ্বনি নিনাদিত ও অনুরণিত হয়েছে।

এই প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াল দৃশ্য দেখিয়ে উপস্থিত কাফেরদেরকে এবং অনুরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী সকলকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে ধরনের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ তাদেরকে ধ্বংস্তূপের নীচে চাপা দিয়ে রাখবে, তা তাদের জন্যেও অপেক্ষা করছে। বলা হয়েছে, 'অনুরূপ পরিণতি সকল প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।'

এ ধরনের আতংকজনক ঘটনা যা কাফেরদের জন্যে ধ্বংস ও মোমেনদের জন্যে বিজয়বার্তা বহন করে আনে, তার ব্যাখ্যা হিসাবে এই চিরন্তন ও শাশ্বত মূলনীতিটাই তুলে ধরা হচ্ছে—

'এর কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অভিভাবক এবং কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই।'

আল্লাহ তায়ালা যার অভিভাবক ও সাহায্যকারী, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তার ওপর যদি কোনো বিপদ মুসিবতও আসে, তবে তা তার জন্যে হয় পরীক্ষাস্বরূপ, যার পেছনে তার জন্যে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ ধরনের বিপদ মুসিবত আসার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তার অভিভাবকত্ব ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করার যে ওয়াদা তিনি দিয়েছেন, তা তিনি ভংগ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যার অভিভাবক হননি, তার কোনোই অভিভাবক থাকে না। সে যদি দুনিয়ার তাবত জ্বিন ও মানুষকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, তবুও তাতে কোনো লাভ হবে না। কেননা অক্ষমদের এই অভিভাবকত্ব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য চাই মানব সমাজে পরিচিত যাবতীয় শক্তির উপকরণ ও প্রতিরক্ষার সাজ সরঞ্জামই সে সংগ্রহ করুক না কেন।

শেষ বিচারে মোমেন ও কাফেরদের অবস্থা

ঝগড়া লড়াই ও দ্বন্দ্ব সংঘাতে কাফের ও মোমেন এই দুই গোষ্ঠীর ভূমিকা বর্ণনা করার পর, এক্ষণে এই দুই গোষ্ঠীর ভোগ বিলাস ও প্রাপ্তিযোগের তুলনা করা হচ্ছে। এই উভয় গোষ্ঠীর ভোগ ও প্রাপ্তিতে যে আকাশ পাতালের ব্যবধান, তাও এই সাথে তুলে ধরা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ

তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়। আর যারা কাফের, তারা পশুর মতো ভোগ বিলাস ও খাওয়া দাওয়ায় মত্ত এবং দোযখই তাদের ঠিকানা।'

এ কথা সত্য যে, সৎকর্মশীল ঈমানদার ব্যক্তিরাও কখনও কখনও পবিত্রতম সম্পদের প্রাচুর্য উপভোগ করে থাকেন। তবে এখানে যে তুলনাটা করা হচ্ছে তা হলো, জান্নাতে মোমেনদের জন্যে যে বিশাল ও অকল্পনীয় চিরস্থায়ী ভোগ বিলাস নির্ধারিত রয়েছে এবং পৃথিবীতে কাফেরদের জন্যে যে ক্ষণস্থায়ী একমাত্র সুখ সমৃদ্ধি বরাদ্দ রয়েছে, এই দুই সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে তুলনা।

মোমেনদের জন্যে জান্নাতে যে সুখ শান্তি বরাদ্দ রয়েছে, তা তারা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করবে এবং তাদের জান্নাতের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করাবেন। তাদের ঈমান ও নেক আমলগুলো যেমন উৎকৃষ্ট ও মহান, আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত তাদের ঈমান ও নেক আমলগুলোও তেমন উৎকৃষ্ট। আর কাফেরদের জন্যে দুনিয়ায় যে সুখ সম্ভোগ বরাদ্দ রয়েছে, তা পশুদের সুখ সম্ভোগের মতোই। এখানে একটা পূর্ণাংগ ও নিখুঁত ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যাতে এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের সেই ভোগের উপকরণে কোনো মানবীয় বৈশিষ্টের ছাপ নেই, বরং নিছক পাশবিক ভোগোপকরণের ছাপ ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ হচ্ছে ঘৃণ্য অরুচিকর, অপবিত্র ও নোংরা ভোগ বিলাস। এতে কোনো নিয়মনীতি ও নিয়ন্ত্রণের বালাই নেই, বিবেক বিবেচনা, আল্লাহভীতি ও ন্যায় অন্যায়ের বাছ বিচারও নেই।

মোমেন ও কাফেরদের বৈশিষ্ট

একথা সত্য যে, উচ্চাংগের রুচিবোধ ও নানা বৈচিত্র ও প্রীতিসহকারে যে ভোগ বিলাস ও খাওয়া দাওয়া করা হয়, তাতেও পাশবিকতার স্ফূরণ ঘটে, যেমন উচ্চতর বিত্তশালী পরিবারের সন্তানদের বেলায় ঘটে থাকে। তবে এখানে সেটা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তাহলো নিজের ইচ্ছা ও বিচার বিবেচনার ওপর নিয়ন্ত্রণশীল মানুষের সংবেদনশীলতা, জীবন জীবিকা সংক্রান্ত বিশেষ মূল্যবোধ ও ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যবোধ। সে স্বেচ্ছায় আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে কেবল পবিত্র হালাল ও ন্যায়সংগত জীবিকাই বেছে নেয়া। এ ব্যাপারে সে কোনো লোভ লালসার কাছে নতি স্বীকার করে না। জীবনকে সে কেবল উদ্দেশ্যহীন ও লাগামহীন রসনা তৃপ্তির একটা খাবার টেবিল মনে করে না এবং বৈধ অবৈধ নির্বিশেষে সব রকমের ভোজ্য দ্রব্য দিয়ে উদরপুর্তি করে না।

মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, মানুষ একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং জীবন সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা পোষণ করে। জীবন সম্পর্কে তার এই বিশেষ ধারণা জীবনের স্রষ্টা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্ভুল নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সে যদি এসব নীতিমালা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য হারিয়ে বসে, তাহলে বুঝতে হবে, মানুষের যে গুণ বৈশিষ্টের দরুণ সে পশু থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ, সেই গুণ বৈশিষ্টই সে হারিয়ে ফেলেছে।

কাফের ও মোমেনদের তুলনামূলক বৈশিষ্ট আলোচনার ধারাবাহিকতার এই পর্যায়ে রসূল (স.)-কে বহিষ্কারকারী মক্কানগরীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও তাঁর সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর তুলনা করা হয়েছে। অথচ সে সব জনপদ মক্কার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলো,

'যে নগর তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তার চেয়ে শক্তিশালী কতো নগর ছিলো! আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কোনো সাহায্যকারীও ছিলো না।'

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটা রসূল (স.)-এর মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে হিজরত করে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে নাযিল হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধকারী সেসব দোর্দন্ত প্রতাপশালী মোশরেকদের দর্প খর্ব করা, যারা মুসলমানদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতন চালিয়ে তাদের মাতৃভূমি, ঘরবাড়ী ও সহায়সম্পদ ত্যাগ করে কেবল ঈমান বাঁচাতে বিদেশে হিজরত করতে বাধ্য করেছিলো।

এরপর এই দুই গোষ্ঠীর তুলনামূলক পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কেন মোমেনদের অভিভাবক হয়েছেন? কেন তাদেরকে ইহকালীন জীবনে বিজয় ও সম্মান দানের পর আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করান, কেনই বা কাফেরদের কোনো অভিভাবক থাকে না এবং তারা দুনিয়ার জীবনে অত্যন্ত জঘন্য ধরনের পাশবিক জীবন যাপনের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত ও আখেরাতে জাহান্নামের চির অধিবাসী হয়, তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি সেই ব্যক্তির সমান, যার কাছে তার পাপ কাজগুলোকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে?' বস্তুত উভয় গোষ্ঠীর অবস্থান, আদর্শ ও চরিত্রে এটাই আসল পার্থক্য। যারা ঈমান এনেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সত্যকে দেখেছে ও তাকে চিনে নিয়েছে। তার উৎস সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হবার জন্যে তাদের প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার কাছ থেকে সুনিশ্চিত তথ্য লাভ করেছে এবং সেই তথ্যের ওপর তাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। এ ব্যাপারে তারা কোনো প্রতারণা বা বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। পক্ষান্তরে যারা কুফরি অবলম্বন করেছে, তাদের অসৎ কর্মগুলোকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। ফলে তা খারাপ হওয়া সত্তেও তাদের কাছে সুন্দর লেগেছে। সত্যকে তারা দেখেওনি, বিশ্বাসও করেনি। তারা কেবল তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে।' তাদের কোনো নীতিও নেই আদর্শও নেই, যার আলোকে তারা হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে পারে।

এই শেষোক্ত গোষ্ঠী কি প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর মতো? তারা চিন্তা চেতনায়, জীবনাদর্শে, দৃষ্টিভঙ্গীতে ও স্বভাব চরিত্রে পরস্পর থেকে ভিন্ন। সুতরাং তাদের মূল্যবোধ ও মানদন্ড যেমন এক রকম নয়, তেমনি কর্মফল ও পরিণামেও তারা সমান নয়। পরিণতি ও কর্মফলে যে তারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার বিবরণ এ রকম যে, সেখানে কতগুলো ঝর্ণা আছে বিশুদ্ধ পানির, কতগুলো ঝর্ণা আছে অপরিবর্তনীয় স্বাদযুক্ত দুধের। কতগুলো ঝর্ণা আছে পানকারীদের জন্যে খুবই মজাদার মদে ভর্তি, কতগুলো ঝর্ণা আছে স্বচ্ছ মধুর, তাদের জন্যে সেখানে থাকবে হরেক রকমের ফলমূল এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি সেই অনন্তকাল দোযখে বসবাসকারীদের মতো, যাদেরকে ফুটন্ত পানি খেতে দেয়া হবে? সেই পানি তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে।'

সুখ ও আযাবের এরূপ অনুভবযোগ্য দৃশ্য কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কখনো কখনো পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দৃশ্যও আসে। অনুরূপভাবে আদৌ অনুভবযোগ্য নয় এমন সুখ ও আযাবের দৃশ্যও কোনো কোনো জায়গায় পরিলক্ষিত হয়।

যে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে বেশী অবগত। কিভাবে কথা বললে তাদের হৃদয় গলবে, কোন জিনিস তাদের জন্যে অধিকতর শিক্ষণীয় কোনো জিনিস তাদের সুখ ও আযাবের জন্যে অধিকতর উপযোগী, সে

ব্যাপারে তিনিই বেশী অভিজ্ঞ। মানুষ অনেক রকমের, মানুষের মনেরও অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। তাদের স্বভাব প্রকৃতিও অনেক ধরনের। মানুষের সহজাত সত্ত্বায় এর সব কটারই সমাবেশ ঘটে। তারপর প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অনুপাত তার ভেদাভেদ ঘটে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে তার নিখুঁত ও নির্ভুল জ্ঞান অনুপাতে তাদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমর সুখ ও দুঃখ কিংবা আযাব ও নেয়ামতের ব্যবস্থা করেন।

কিছু লোক এমন রয়েছে, যাদের শিক্ষা ও লালনের জন্যে, কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, প্রতিদান ও প্রতিফল দেয়ার জন্যে এবং তাদের মনকে খুশী করার জন্যে জান্নাতে বিশুদ্ধ পানির নহর থাকা প্রয়োজন, কারো জন্যে অপরিবর্তনীয় স্বাদযুক্ত দুধের নহর উপযোগী। কারো জন্যে স্বচ্ছ মধুর নহর উপযোগী। কারো জন্যে মজাদার মদের নহর প্রয়োজন, কারো জন্যে রকমারি ফলমূল দরকার। কারো জন্যে আবার ক্ষমা আবশ্যক যা দোযখ থেকে মুক্তি ও জান্নাতের বিচিত্র উপাদেয় নেয়ামত নিশ্চিত করে। এভাবে যাদের শিক্ষার জন্যে যা দরকার এবং যাদের কর্মফলের জন্যে যা বাঞ্ছনীয়, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তারই ব্যবস্থা করেন।

এবাদাতের ধরন

কিছু লোক সঠিক এমনও রয়েছে যারা শুধু আল্লাহর অগণিত নেয়ামতের শোকর আদায়ের জন্যে অথবা শুধু তার প্রতি ভালোবাসার তাগিদে ও তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর এবাদাত করে। তারা তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে বন্ধুর সাথে বন্ধুর যে ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন, সেই ঘনিষ্ঠতা জন্মাতেই সচেষ্ট থাকে বেশী। কেউ কেউ শুধু এই লজ্জার খাতিরেই আল্লাহর এবাদাত করে– আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে কোনো অনভিপ্রেত অবস্থায় না দেখে ফেলেন। এ ছাড়া আর কোনো বেহেশত বা দোযখের চিন্তা তাদের মনে স্থান পায় না। কোনো আযাব বা নেয়ামতের কথাও তারা আদৌ ভাবে না। তাদের শিক্ষার জন্যে এবং তাদের পুরস্কৃত করার জন্যে আল্লাহর একথাটা বলাই যথেষ্ট, 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে অচিরেই ভালোবাসা বরাদ্দ করবেন।' তাদের পক্ষে এ কথা জানাও যথেষ্ট হতে পারে যে, 'তারা মহা ক্ষমতাধর বাদশাহর কাছে সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত হবে।'

একটি হাদীসে আছে যে, নামায পড়তে পড়তে যখন রসূল (স.)–এর পা ফুলে গেলো তখন হযরত আয়শা (রা.) বললেন, 'হে রসূল, আল্লাহ তায়ালা আপনার আগের ও পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া সত্তেও আপনি এরূপ করেন?' রসূল (স.) জবাব দিলেন, 'হে আয়েশা, তাই বলে কি আমি তাঁর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?'

রাবেয়া আদভিয়া বলেন, 'বেহেশত ও দোযখ যদি না থাকতো, তাহলে কি কেউ আল্লাহর এবাদত করতো না এবং আল্লাহকে কেউ ভয় করতো না?' সুফিয়ান ছাওরী (রা.) রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার ঈমানের রহস্য কী? তিনি জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর দোযখের ভয়ে বা তার বেহেশতের লোভে তার এবাদাত করিনি। এবাদাত করেছি কেবল তাঁকে পাওয়ার জন্যে।'

উপরোক্ত হাদীসে রসূল (স.)–এর দৃষ্টান্তে এবং পরবর্তী রেওয়ায়াতে হযরত রাবেয়ার বক্তব্যে যে দু'ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পেলো, তা ছাড়াও আরো বহু ধরনের অনুভূতি ও মানসিকতা বিদ্যমান রয়েছে। এর সবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ে দুনিয়ায় চরিত্র গঠনে ও আল্লাহর কাছে কর্মফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপযোগী ও উপকারী।

সাধারণভাবে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সুদীর্ঘ মেয়াদকালে প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে শ্রোতাদের যতই উন্নতি হয়েছে, আযাব ও পুরস্কারের দৃশ্য ততই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রোতাদের শ্রেণীভেদে ও অবস্থা ভেদেও শাস্তি ও পুরস্কারের ঘোষণার সচ্ছতা ও স্পষ্টতায় তারতম্য ঘটেছে। সকল যুগে মানব জাতির সকল প্রজন্মেই এসব অবস্থা ও নমুনার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে।

এখানে দু'ধরনের কর্মফল ঘোষিত হলো, একটা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে গুনাহ মাফের পাশাপাশি রকমারি ফলমূল ও রকমারি নহর সম্বলিত জান্নাত প্রাপ্তি। আর অপরটা হলো, 'যে ব্যক্তি চিরদিনের জন্যে দোযখবাসী এবং যাকে এমন গরম পানি খাওয়ানো হবে, যা খেয়ে নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

শেষোক্ত বর্ণনাটা একটা ভয়ংকর আযাবের এমন দৃশ্য, যা ঐকান্তিকভাবে অনুভূত হয়, যা সূরা আল কেতালের (কেতাল অর্থ যুদ্ধ) প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সমকালীন মোশরেকদের চারিত্রিক মনের সাথেও সংগতিপূর্ণ। কেননা তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতো ও পশুর মতো পানাহারে লিপ্ত থাকতো। সুতরাং এখানে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটটা হলো আল্লাহর সাথে শেরেকী ও কুফুরী আর কর্মফলটা হলো গরম পানি পান করা ও তার ফলে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যাওয়া। কেননা তারা পশুদের মতো খেয়ে দেয়ে এই নাড়িভুড়িতেই তা মন্ডিত রাখতো।

আর এই দু'ধরনের মানুষের কর্মফল কখনো এক রকম হবে না। কেননা তারা চরিত্রে ও আদর্শেও এক রকম নয়। এখানে সূরার প্রথম পর্বের সমাপ্তি। এর সূচনা হয়েছিলো যুদ্ধ বিগ্রহের কথা দিয়ে এবং তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়েই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

মোনাফেকদের কুটীল স্বভাব

এই পর্বটিতে মোনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খোদ রসূলুল্লাহ (স.)-এর ক্ষেত্রে তাদের আচরণ কেমন ছিলো, পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে তাদের মনোভাব কেমন ছিলো, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্যে মুসলমানদের ওপর যে জেহাদ ফরয করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে তাদের নীতি কি ছিলো এবং সর্বোপরি ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাকানো ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকা কী ছিলো ইত্যাদি বিষয় এই পর্বে আলোচিত হয়েছে।

মোনাফেক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে মদীনায়। মক্কায় এদের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। সেখানে মোনাফেক সাজার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। কারণ সেখানে মুসলমানরা ছিলো নির্যাতিত। কাজেই তাদের সাথে ভন্ডামী ও মোনাফেকীর আশ্রয় নেয়ার কারো প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু মদীনায় আওস ও খাজরায গোত্রদ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যখন ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেন এং প্রতিটি পরিবারে ও প্রতিটি ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়, তখন কিছুসংখ্যক লোক যারা প্রিয় নবী মোহাম্মদ (স.)-কে মনে মনে ঘৃণা করতো, ইসলামের উত্থান ও বিজয়কে ঘৃণা করতো তারা এই ভন্ডামীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলো। কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও শত্রুতা প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা ও সৎসাহস তাদের ছিলো না। তাই তারা বাধ্য হয়েই মুসলমান হওয়ার ভান করতো, তবে মনে মনে ঠিকই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। শুধু তাই নয়, বরং তারা রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবাদের ক্ষতি করার জন্যে সুযোগের সন্ধানে থাকতো। এই মোনাফেক গোষ্ঠীর শিরোমনি হলো, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল।

মদীনায় প্রথম দিকে যেহেতু ইহুদী সম্প্রদায় সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী ছিলো এবং তারাও রসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাব, তাঁর ধর্মের বিস্তার এবং তার সাহাবাদেরকে সুনযরে দেখতো না, তাই এর দ্বারা মোনাফেকদের উৎসাহ ও সাহস বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ফলে উভয় সম্প্রদায় হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলো এবং কূটচাল চালাতে লাগলো। মুসলমানদের অবস্থা খারাপ দেখলে তখন তারা প্রকাশ্যে তাদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষমূলক আচরণ করতো। আর যখন মুসলমানদেরকে সচ্ছল ও ভালো অবস্থায় দেখতো, তখন তাদের বিরুদ্ধে ওরা ষড়যন্ত্র ও কূটচাল চালাতো গোপনে, রাতের অন্ধকারে। মাদানী যুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ইহুদী মোনাফেক গোষ্ঠী ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে সত্যিকার অর্থেই একটা আপদ ছিলো।

মাদানী সূরাগুলোতে এই মোনাফেক গোষ্ঠীর পরিচিতি, তাদের ষড়যন্ত্র ও কূটচালের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে এসেছে। ওদের ত্রিমুখী নীতি ও চরিত্রের বর্ণনাও এসেছে। ইহুদীদের সাথে ওদের দহরম মহরম, দেন দরবার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকানোর কথাও সেখানে একাধিকবার এসেছে। আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে ওদের আলোচনা এসেছে এবং সেই সাথে ইহুদীদের আলোচনাও এসেছে। এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পাতে, এরপর যখন তোমার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে এই মাত্র তিনি কী বললেন?' (আয়াত নং-১৬)

এই আয়াতে উল্লেখিত 'তাদের' শব্দ দ্বারা সম্ভবত কাফেরদের কথা বলা হয়েছে। কারণ, আগের পর্বে কাফেরদের সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। এখানে মোনাফেকদেরকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে, মোনাফেকরা প্রকৃতপক্ষে কাফেরই। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, ওদের ব্যাপারটা প্রকাশ্য, আর ওদের ব্যাপারটা গোপন। তাই এদের স্বরূপ উদঘাটনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে এদের সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

অথবা 'তাদের' শব্দটি দিয়ে মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, মোনাফেকরা তাদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামের মুখোশ পরে ওরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে যাহির করতো। আর এই বাহ্যিক পরিচিতির ওপর ভিত্তি করে মুসলমানরা ওদের সাথে মুসলমান হিসেবেই আচরণ করতো। কারণ, বাহ্যিক পরিচিতির ওপর ভিত্তি করেই মানুষের সাথে আচরণ করা ইসলামের বিধান।

তবে উভয় অবস্থাই 'তাদের কতক' দ্বারা যাদেরকে বুঝানো হয়েছে তারা মোনাফেক ব্যতীত আর কেউ নয়। আয়াতে বর্ণিত বিশেষণ ও ক্রিয়াকলাপেই তা প্রমাণ করছে। তাছাড়া আলোচ্য পর্বের প্রসঙ্গ ও মোনাফেকদের আলোচনাও সে কথা প্রমাণ করছে।

মনযোগ সহকারে রসূলুল্লাহ (স.)-এর বক্তব্য শুনার পরও তারা জিজ্ঞেস করছে যে, রসূল এই মাত্র কী বললেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, ওরা কেবল শোনার ভান করতো, প্রকৃত পক্ষে ওদের মন থাকতো অন্য দিকে। অথবা ওদের মন ছিলো বিকৃত ও বদ্ধ। অথবা ওদের এ ধরনের প্রশ্নের মাঝে একটা চাপা ও ধূর্ততাপূর্ণ বিদ্রূপ কাজ করতো। এর মাধ্যমে ওরা শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদেরকে এ ধারণা দিতেই চেষ্টা করতো যে, রসূল যা বলেন তা বোধগম্য নয়, অথবা তাঁর কথা কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্য নয় সে কারণেই গভীর মনযোগ সহকারে রসূলের বক্তব্য শোনার পরও তার কোনো মর্ম বুঝতে পারছে না এবং এ থেকে কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারছে না!

এই প্রশ্নের আর একটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আর তা হলো, যে সব শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোক রসূলের বক্তব্য শোনার জন্যে ভিড় করতো এবং গভীর আগ্রহে তার মর্ম অনুধান করতে ও তা মনে রাখতে চেষ্টা করতো তাদের সাথে রং তামাশা করা। বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখনিসৃত প্রতিটি বাক্য মুখস্ত করে ফেলতেন, তাদের সাথেই হাসিঠাট্টা ও রং তামাশার উদ্দেশ্যে ওরা এ জাতীয় প্রশ্ন করতো। যা হোক, ওদের এই আচরণের মাধ্যমে ওদের মনের কপটতা, কদর্যতা, বিকৃতি ও গোপন প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়। তাই ওদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশী মতো চলে।'

এই হচ্ছে মোনাফেকদের অবস্থা। অপরদিকে মোমেনদের অবস্থা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। যেমন, 'যারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎ পথ প্রাপ্তি আরো বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাকওয়া দান করেন।' আয়াত ১৭)

এখানে বক্তব্যের বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করার মতো। যারা সৎ পথের সন্ধান পেয়ে সে পথেই নিজেদেরকে পরিচালিত করেছে, তাদেরকে সৎ পথে টিকে থাকার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আরো শক্তি দান করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্যে পুরস্কারস্বরূপ। এর চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ পুরস্কারও তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দান করেন, আর সেটা হলো তাকওয়া। আর তাকওয়া হচ্ছে মনের এমন একটি অবস্থার নাম যার ফলে মানুষ সব সময় এবং সব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহর নযরদারী অনুভব করে, তাঁর গযবকে ভয় করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে সচেষ্ট থাকে এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাকে দেখুক সেটা সে মনে প্রাণে কামনা করে না। মনের এই সদা জাগ্রত অবস্থার নামই হচ্ছে তাকওয়া। এটা একটা পুরস্কার যা আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর সেই বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন যারা নিজেদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করে।

হেদায়াত, তাকওয়া ও সচেতনতার বিপরীতে আসে কপটতা, মানসিক বিকৃতি ও অচেতনতা- যার উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতে এসেছে। পরবর্তী আয়াতে এই কপট, মানসিক বিকারগ্রস্ত ও অচেতন লোকদের কথা বলা হয়েছে। এরা মোনাফেকের দল। এরাই রসূলুল্লাহ (স.)-এর মজলিস থেকে উঠে যেতো এবং তাঁর বক্তব্যের কোনো মর্মার্থই ওরা অনুধাবন করতে পারতো না। অথচ এই বক্তব্য ছিলো ওদের জন্যে কল্যাণকর, দিকনির্দেশক এবং অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টির মোক্ষম উপায়। তাই ওদের পরিণতি পরকালে কি হতে পারে সে সম্পর্কে ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, 'তারা কি শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কেয়ামত হঠাৎ করে তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কেয়ামতের লক্ষণগুলো তো এসেই পড়েছে। কাজেই, কেয়ামত এসে পড়লে উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ তাদের আর থাকলো কৈ?' (আয়াত ১৮)

এরা কি কেয়ামতের অপেক্ষায় আছে!

এই আয়াতে গাফেল ও মোনাফেক গোষ্ঠীকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমনটি করা হয় নেশায় বিভোর কোনো মদ্যপায়ীকে। এই গাফেলের দল কিসের অপেক্ষায় আছে? রসূলুল্লাহ (স.)-এর মোবারক মজলিসে বসেও এরা কিছু বুঝে না, কিছু স্মরণ করে না, কোনো উপদেশ গ্রহণ করে না। ওরা চায় কী? ওরা কিসের অপেক্ষা করছে? ওরা কি চায়, হঠাৎ করে ওদের সামনে কেয়ামত এসে হাযির হোক এবং ওদেরকে চমক লাগিয়ে দিক।

এই কেয়ামতের জন্যেই কি ওরা অপেক্ষা করছে? অথচ এর লক্ষণগুলো তো ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। এই লক্ষণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে শেষ নবীর আগমন। কারণ, তাঁর আগমনই সতর্ক করে দিচ্ছে, চরম মুহূর্তটির সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে সম্পর্কে খোদ রসূলুল্লাহ (স.) এক হাদীসে বলেছেন, আমার ও কেয়ামতের আগমন পাশাপাশি এরূপ' এ কথা বলার সময় তিনি মধ্যমা ও তার পাশের আঙ্গুল দুটো এক সাথে উঁচু করে দেখালেন। (বোখারী ও মুসলিম)

রসূলুল্লাহ (স.)-এর আবির্ভাবের পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত একটা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও কেয়ামত আসেনি। এর দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর ঘোষিত দিন ও কালের হিসাব আমাদের দিন ও কালের মতো নয়। কাজেই আল্লাহর হিসাব নিকাশ অনুযায়ী কেয়ামতের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে গেছে। এখন এর আকস্মিক আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, কেয়ামত এসে গেলে তখন আর কারো কিছু করার সুযোগ থাকবে না। তাই বলা হয়েছে, 'কাজেই কেয়ামত এসে পড়লে উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ তাদের আর থাকলো কৈ?'

মোমেনদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ

এরপর রসূলুল্লাহ (স.) এবং সঠিক পথের পথিক মোমেন মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে জ্ঞান ও বিদ্যার পথ এবং যেকের ও এসতেগফারের পথ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। সাথে সাথে তাদেরকে অন্তরে আল্লাহর সার্বক্ষণিক নযরদারি ও তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের অনুভূতি জাগ্রত রাখতে বলা হয়েছে এবং অনুভূতি অন্তরে ধারণ করে কেয়ামতের জন্যে সব সময়ই সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে, 'জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিজের ক্রুটির জন্যে এবং মোমেন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।' (আয়াত ১৯)

আলোচ্য আয়াতে প্রথমেই যে সত্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং যে সত্যটির ওপর রসূল (স.)-এর গোটা মিশন প্রতিষ্ঠিত- তা হলো, 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই'... এই সত্যটিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং এর অনুভূতি অন্তরে ধারণ করে যে দ্বিতীয় কাজটি করতে বলা হয়েছে, তা হলো- 'নিজের ক্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো।' বলা বাহুল্য যে, রসূল (স.) ছিলেন নিষ্পাপ। ছোটখাট কোনো ক্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকলেও তা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা হচ্ছে একজন সচেতন, অনুভূতিপরায়ণ মোমেন বান্দার গুণ। সে সব সময়ই নিজের আমলকে ক্রুটিপূর্ণ বলে মনে করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করার পরও ক্ষমা প্রার্থনাকে এক ধরনের এবাদাত ও আল্লাহর শোকরগোযারী বলে মনে করে। তাছাড়া এর মাঝে অন্যদের জন্যে উপদেশও রয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর পর থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যতো মোমেন বান্দা এই পৃথিবীতে আগমন করবে এবং যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় নবীর মর্যাদা কতো জানতে পারবে, তাদের সকলের জন্যে এই আয়াত উপদেশ হিসেবে কাজ করবে। এর দ্বারা তারা বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে কতো বড়ো নেয়ামত। কারণ, তিনি নিষ্পাপ হওয়া সত্তেও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রথমে নিজের জন্যে তারপর সকল মোমেন নর নারীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, আর তিনি যেহেতু আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং তাঁর দোয়াও গ্রহণযোগ্য। তাই মোমেন নর নারীদের জন্যে করা তাঁর দোয়া আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই কবুল করবেন।

আলোচ্য আয়াতের আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।' .... বলা বাহুল্য, এই সত্য কথাটি জানার পর এক মোমেন বান্দার অন্তরে একই সময়ে প্রশান্তিও জন্ম নেয় এবং ভয়ও জন্ম নেয়। প্রশান্তি জন্ম নেয় এই কারণে যে, মোমেন বান্দা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সে আল্লাহর হেফাযতে ও তত্ত্বাবধানে থাকে। আর ভয় জন্ম নেয় এই কারণে যে, আল্লাহর দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে, তার প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত, এমনকি গোপন কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কেও তিনি অবগত।

এ জাতীয় বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দাদের মাঝে সার্বক্ষণিক সচেতনতা ও সাবধানতা, ভয় ভীতি এবং আশা ও আকাঙ্খা সৃষ্টি করতে চান, এই গুণাবলী দিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলতে চান।

জেহাদের ব্যাপারে মোনাফেকদের দৃষ্টিভঙ্গি

পরবর্তী আয়াতে জেহাদের ব্যাপারে মোনাফেকদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিলো, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জেহাদের নাম শুনলে মোনাফেকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তো, ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো, তাদের শক্তি লোপ পেয়ে যেতো এবং মনোবল ভেঙ্গে পড়তো। অর্থাৎ জেহাদের নির্দেশ আসলে তাদের মনের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াত, সে কথা এখানে বলা হয়েছে। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা যদি মোনাফেকীর ওপরই অটল থাকে, জেহাদের নির্দেশের প্রতি আন্তরিক না হয় এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এই নির্দেশ পালন না করে তাহলে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত করুণ ও ভয়াবহ।

আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা মোমেন, তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? এরপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোনো সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, তাদেরকে তুমি মৃত্যু ভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে।' (আয়াত ২০-২৪)

'মোমেন বান্দারা নতুন সূরা নাযিলের অপেক্ষা করতো। এই অপেক্ষা পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের নতুন নতুন সূরার প্রতি তাদের ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে হতো। কেননা প্রতিটি নতুন সূরার মাঝে তারা মনের জন্যে নতুন নতুন খোরাক পেতো। অথবা এই অপেক্ষা ছিলো জেহাদ সংক্রান্ত কোনো সূরার জন্যে। কারণ, জেহাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করতো। আর সে কারণেই তাদের বক্তব্যে অধীর আগ্রহের ভাব ফুটে ওঠেছে। তারা বলছে, 'কেন একটা সূরা নাযিল হয় না?'

এরপর তাদের কাংখিত সূরা নাযিল হওয়ার পর অসুস্থ অন্তরের অধিকারী অর্থাৎ মোনাফেকদের অবস্থা কি হত তা বলা হয়েছে। এখানে মোনাফেকদেরকে অসুস্থ অন্তরের অধিকারী বলা হয়েছে। কারণ, জেহাদের নাম শুনলেই তারা হাত পা ছেড়ে দিতো, তাদের মুখোশ খসে পড়তো, তাদের মনের দুর্বলতা ও আতঙ্ক প্রকাশ পেয়ে যেতো। তারা এমন হাব-ভাব দেখাতো যা পুরুষদের জন্যে শোভা পায় না। তাদের অবস্থাটা পবিত্র কোরআনের নিপুণ বর্ণনায় এমন অপূর্ব রূপে চিত্রায়িত হয়েছে যা চাক্ষুষ ও জীবন্ত বলে মনে হয়। বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তরে রোগ আছে, তাদেরকে তুমি মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবে।'

এই যে নিখুঁত ও নিপুণ বর্ণনা– এর অনুকরণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়, এমনকি অন্য ভাষায় এর যথার্থ অনুবাদও সম্ভব নয়। এখানে ভয়কে আতঙ্কের পর্যায়ে, দুর্বলতাকে প্রকম্পনের পর্যায়ে এবং হীনমন্যতাকে মূর্ছার পর্যায়ে নিয়ে দেখানো হয়েছে। এটাই হচ্ছে ঈমানশূন্য, সুস্থ বিবেকশূন্য এবং লাজ লজ্জাশূন্য প্রতিটি অন্তরের চিরন্তন ও পরিচিত রূপ। অন্তরে রোগ থাকলে বা মোনাফেকী থাকলে এই অবস্থারই সৃষ্টি হয়।

মোনাফেকরা যখন ভয়ে, আতঙ্কে ও হীনমন্যতায় ভেঙ্গে পড়ছিলো তখন তাদের সামনে এমন একটি ওষুধ এনে হাযির করা হলো, যা সঠিকভাবে ও আন্তরিকতার সাথে পান করলে তাদের মনোবল দৃঢ় হতো এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেতো। সেই ওষুধটি সম্পর্কে এইভাবে বলা হয়েছে, 'তাদের আনুগত্য ও মিষ্টবাক্য জানা আছে, অতএব জেহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে।' (আয়াত ২১)

হাঁ, তাদের এই কেলেঙ্কারী, এই কাপুরুষতা, এই আতঙ্ক এবং এই হঠকারিতা ও কপটতার পরিবর্তে 'আনুগত্য ও মিষ্টি কথা' তাদের জন্যে অবশ্যই উত্তম। এই আনুগত্যের মনোভাব থাকলে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং তা পালন করার জন্যে দৃঢ় মনোবল ও আস্থা নিয়ে কাজ করে। আর মিষ্টি কথা বা ভালো কথা মানুষের চিন্তা শক্তিকে নির্মল করে, অন্তরকে সুস্থ ও সুস্থির রাখে এবং বিবেককে পরিষ্কার রাখে। জেহাদের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আসার পর এবং জেহাদের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখা তাদের উচিত। সংকল্পের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস থাকতে হবে, অনুভূতির ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস থাকতে হবে। এর ফলে তাদের মনোবল দৃঢ় হবে, নিজ অবস্থানে অনড় ও অটল থাকতে পারবে। কঠিন কাজ সহজ বলে মনে হবে এবং যে বিপদকে তারা বিরাট দৈত্য বলে মনে করে এবং যার করাল গ্রাসে তাদেরকে গিলে ফেলবে বলে তারা ভয় করছে, তা তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হবে। এ ছাড়াও তাদের জন্যে দুটো উত্তম পরিণতির যে কোনো একটি হবে, হয় মুক্তি ও বিজয় অথবা শাহাদাত ও জান্নাত, আর এটা নিসন্দেহে তাদের জন্যে উত্তম। এটাই মনের সেই প্রকৃত খোরাক যা ঈমানের মাধ্যমে মানুষ লাভ করে এবং এর দ্বারাই মনোবল বৃদ্ধি পায়, নৈতিক সাহস বৃদ্ধি পায়, ভয় ভীতি দূর হয়ে যায়, তার পরিবর্তে জন্ম নেয় দৃঢ়তা ও মানসিক প্রশান্তি।

মোনাফেকদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তাদেরকে লক্ষ্য করে ধমকের সুরে তাদের করুণ ও ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছেন এবং জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের এই পরাজিত ও পলায়নপর মানসিকতা যদি তাদেরকে প্রকাশ্য কুফরীর দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামের পাতলা আবরণটুকুও তাদের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে সেই করুণ ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে তাদেরকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আয়াতে বলা হয়েছে, 'পেছনের দিকে ফিরে গেলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।' (আয়াত ২২)

আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের সম্ভাব্য অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করে দেয়া হচ্ছে এবং জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যে অবস্থায় বিচরণ করছে তা অচিরেই তাদেরকে সেই পূর্বের জাহেলিয়াতের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং পূর্বের ন্যায় তারা আবার দাঙ্গা ফাসাদসহ আপন লোকদের সাথে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এই সাবধানবাণীর পরও যদি তাদের অবস্থার পরিবর্তন না হয় এবং যে অবস্থার আশঙ্কা করা হয়েছিলো সেটাই যদি সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের পরিণতি হবে এই, 'এদের প্রতিই আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, অতপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিহীন করেন। এরা কি কোরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। নাকি তাদের অন্তর তালা বদ্ধ?' (আয়াত ২৩-২৪)

অর্থাৎ যারা আদর্শিক ও মানসিক বিকারগ্রস্ত ও মোনাফেকীর রোগে আক্রান্ত তাদের অবস্থার উন্নতি না হয়ে যদি আরো অবনতি ঘটে, এমনকি ইসলামের বাহ্যিক আবরণটুকু তারা ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাহলে আল্লাহর লানত ও অভিশাপ থেকে তাদের আর রক্ষা নেই। ফলে তারা তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে এবং বধির ও দৃষ্টিহীন হয়ে পড়বে। তাদের চোখ ও কান ঠিকই থাকবে, কিন্তু এর শক্তি লোপ পেয়ে যাবে। ফলে সঠিক পথ দেখার এবং হক কথা শোনার মতো শক্তি তাদের আর থাকবে না। কারণ, তারা এই শক্তিগুলোর যথার্থ ব্যবহার করেনি।

এরপর তাদেরকে নিন্দার সুরে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'এরা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না?'

তারা যদি এ কাজটি করতো তাহলে তাদের মনের অন্ধকার দূর হয়ে যেতো, সত্যের দুয়ার খুলে যেতো, হেদায়াতের নূর তাতে প্রবেশ করতো, তাদের অনুভূতি ও চিন্তা শক্তি চাঙ্গা হতো, তাদের অন্তর জেগে উঠতো, তাদের বিবেক পরিষ্কার হতো এবং তাদের মাঝে নতুন জীবনের সৃষ্টি হতো। এর ফলে তাদের অন্তরলোক আলোকিত ও উজ্জ্বল হতো।

কাদের অন্তর তালাবদ্ধ ?

এরপর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? কারণ, বদ্ধ অন্তরে কখনও কোরআনের আলো ও সত্যের আলো পৌঁছতে পারে না। বদ্ধ অন্তর তালাবদ্ধ দুয়ারের মতোই। কারণ সেখানেও সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না, মুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে পারে না।

মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা এবং তাদের ঔদাসীন্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে জানা গেলো যে, তারা ইহুদীদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদেরকে আনুগত্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় যারা সোজা পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের সামনে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ কেতাব যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে আমরা কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করবো। (আয়াত ২৫-২৬)

সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়টিকে আলোচ্য আয়াতে জীবন্ত ও দৃষ্টিগোচর করে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এটাকে পেছনের দিকে দৌড়ানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এর কারণ হিসেবে শয়তানের প্রলোভন, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা আশ্বাসকে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর সেই প্রকৃত কারণটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যার ফলে শয়তান তাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং তাদেরকে এতোটা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা সৎ পথের সন্ধান পেয়েও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পেছনে ফেলে রেখে আসা সেই ভ্রান্ত ও অন্ধকার পথের দিকেই পুনরায় ফিরে গিয়েছে। নিচের আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে, 'এটা এ জন্যে যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কেতাব অপছন্দ করে তারা তাদেরকে বলে, আমরা কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করবো। (আয়াত ২৬)

ইহুদী সম্প্রদায়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কেতাবকে ঘৃণা বা অপছন্দকারী সম্প্রদায় হিসেবে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা ইহুদী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ নয়। কারণ, মদীনায় একমাত্র ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাই সর্বপ্রথম আল্লাহর কেতাবকে ঘৃণা করে। কারণ, তাদের ধারণা ও আশা ছিলো, শেষ নবী তাদের মধ্য থেকেই আসবে। আর সে কারণেই তারা কাফের মোশরেকদেরকে

সে কথা বলে বেড়াতো এবং তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলতো যে তাদের শেষ নবী আবির্ভূত হলে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে পুনরায় তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্বশালী করে তাদের পূর্বের ক্ষমতা ও রাজত্ব ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন ইহুদী সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে থেকে শেষ নবী প্রেরণ করলেন, তখন সেই ইহুদী গোষ্ঠী সেটাকে অপছন্দ করে। এমনকি শেষ নবীর মদীনায় হিজরতকেও তারা সুনযরে দেখেনি। কারণ এর ফলে সেখানে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো। আর সে কারণেই তারা প্রথম দিন থেকেই শেষ নবীর বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে উঠেছিলো। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে শক্রতা দেখানোর মতো ক্ষমতা তাদের ছিলো না, তাই প্রত্যেক রসূলবিদ্বেষী ও মোনাফেক ব্যক্তিকে তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়ে রসূলের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত রসূল (স.) এদেরকে গোটা আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করেন এবং সেখানে একমাত্র ইসলামের ঝান্ডাকেই উড্ডীন রাখেন।

এই মোনাফেকের দল- যারা সত্য পথের সন্ধান পেয়েও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, তারা ইহুদীদেরকে বলতো, 'আমরা কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করবো' ... এই কিছু কিছু ব্যাপার বলতে তারা ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও কূটচালের কথাই বুঝিয়েছে বলে মনে হয়। এদের এই বক্তব্যের জবাবে পরক্ষণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবগত আছেন।'

বলা বাহুল্য, এটা নিছক একটা মন্তব্যই নয়, বরং এক ধরনের হুমকিও। অর্থাৎ, ইসলাম ও রসূলবিদ্বেষী এই গোষ্ঠী যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, যতই গোপন সলা পরামর্শ করুক-না কেন তাদের কোনোই কাজ হবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন ও দেখেন, তাঁর অপার শক্তি ও ক্ষমতার সামনে এসবের কোনোই প্রভাব নেই, কোনোই কার্যকারিতা নেই। জীবন সায়াহ্নে এই চক্রান্তকারীদের সাথে আল্লাহর সৈনিক ফেরেশতারা কি আচরণ করবে তা খোলামেলা হুমকির ভাষায় এইভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, 'ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে?' (আয়াত ২৭)

এই আয়াতে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা একই সাথে ভয়ঙ্কর এবং লজ্জাকরও। কারণ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় যখন তাদের কোনোই শক্তি সামর্থ থাকবে না সেই অসহায় অবস্থায় তারা এই পার্থিব জীবনের চৌহদ্দী পেরিয়ে পরকালীন জীবনে পা রাখতেই তাদেরকে এক করুণ ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তখন ফেরেশতারা তাদের মুখে আঘাত করতে থাকবে, তাদের পাছায় আঘাত করতে থাকবে। একদিকে মৃত্যুর কঠিন, কষ্টকর ও ভয়ংকর মুহূর্ত, অপরদিকে পশ্চাদদেশে আঘাতের পর আঘাত। কি করুণ পরিণতি। কেন এই পরিণতির শিকার হতে হলো তাদেরকে, তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'এটা এ জন্যে যে, তারা সে বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।' (আয়াত ২৮)

অর্থাৎ ওরা নিজেরাই এই অশুভ পরিণতিকে নিজেদের জন্যে বেছে নিয়েছে এবং পছন্দ করেছে। ওরা নিজেরাই মোনাফেকী, না-ফরমানী এবং আল্লাহর শত্রু, ইসলামের শত্রু ও আল্লাহর রসূলের শত্রুদের সাথে মিলে মিশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার মতো আল্লাহর অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী কাজে নিয়োজিত হয়েছে। তাই এই সন্তুষ্টি লাভের উপযুক্ত কোনো কাজই ওরা করেনি। বরং এমন সব কাজ করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবকেই উচকিয়ে দিয়েছে। কাজেই তিনি তাদের সকল

কাজ ব্যর্থ করে দেন। এসব চক্রান্তমূলক কাজকে তারা নিজেদের জন্যে গর্বের বিষয়, যোগ্যতা ও কৌশলের বিষয় বলে মনে করতো। অথচ তাদের এই চক্রান্ত ছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর সে কারণেই এসব চক্রান্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং এক সময় বিস্ফোরিত হয়ে তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন

মোনাফেকদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহর রসূল (স.)-এর সামনে এবং মুসলমানদের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। ফলে মুসলমান সমাজ জানতে পারবে যে, ওরা প্রকৃত মুসলমান নয়, ইসলামের মুখোশ পরে ওরা এতোকাল সমাজকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে এবং নিজেদের আসল রূপ লুকিয়ে রেখেছিলো। এ প্রসঙ্গে আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতাম। (আয়াত ২৯-৩১)

মোনাফেকদের বড় ভরসাই ছিলো তাদের কপটতার বিভিন্ন কলাকৌশল এবং অধিকাংশ মুসলমানদের কাছ থেকে নিজেদের আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখার যোগ্যতা। তারা মনে করতো যে, তাদের এই কৌশল চিরকাল গোপন থাকবে। কিন্তু পবিত্র কোরআন তাদের এই ধারণাকে বোকামী বলে আখ্যায়িত করছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা হিংসাবিদ্বেষ ও শত্রুতার বিষয়টি ফাঁস করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। এ ব্যাপারে রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, 'আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের সাথে পরিচিত করিয়ে দিতাম।' ... অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তোমার সামনে প্রত্যেক মোনাফেকের নাম ধাম ও বংশ পরিচয় তুলে ধরতাম। ফলে তুমি তাদের কথাবার্তার লক্ষণ দেখেই চিনতে পারতে। (এটা সেই সময়ের কথা ছিলো যখন রসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনে মোনাফেকদের নামধাম প্রকাশ করা হয়নি) অর্থাৎ নামধাম জানা না থাকলেও মোনাফেকদের পরিচয় তাদের বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও রসূলকে সম্বোধন করার সময় উচ্চারণ বিকৃতির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে যেতো। তাই বলা হয়েছে, 'তুমি তাদেরকে অবশ্যই তাদের কথার ভঙ্গিতে চিনতে পারবে।' তবে মানুষের গোটা কর্মকান্ড ও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্য কারো জানার কথা নয়। এর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন।' কাজেই কোনো গোপন বিষয়ই তাঁর অজানা নয়।

আল্লাহর পরীক্ষা

এরপর আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করবেন বলে ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষা হবে গোটা উম্মতের জন্যে। এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে, কারা সত্যিকার অর্থে মোজাহেদ ও ধৈর্যশীল। ফলে তাদের পরিচয় সবার সামনে স্পষ্ট থাকবে, তাদের নিজেদের মাঝে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি থাকবে না এবং মোনাফেকদের ব্যাপারে, ভীরু ও কাপুরুষদের ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতার অবকাশ থাকবে না। তাই বলা হয়েছে, 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যে পর্যন্ত না জানতে পারি তোমাদের মাঝে কারা মোজাহেদ এবং কারা ধৈর্যশীল এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ যাচাই করি। (আয়াত ৩১)

মানুষের অন্তরের ভেদ ও রহস্য আল্লাহ তায়ালা জানেন। তিনিই জানেন অন্তরের গোপন কামনা বাসনা। অন্তরের বর্তমান অবস্থা তিনি যেমন জানেন, ঠিক তেমনিভাবে জানেন এর ভবিষ্যত অবস্থাও। কাজেই, এই পরীক্ষা নেয়ার আবার প্রয়োজন কি? তিনি যা জানেন, তার অতিরিক্ত কিছু ঘটবে তার কি আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে?

আল্লাহর এটা একটা বড় হেকমত যে, তিনি মানুষের ওপর ততোটুকুই দায়িত্ব আরোপ করেন যতটুকু তার সাধ্যকুলায় এবং তার প্রকৃতি ও প্রতিভার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যে গোপন তত্ত্ব ও রহস্যাদি আল্লাহ তায়ালা জানেন, মানুষ তা জানে না। কাজেই তাদের জন্যে এসব তত্ত্ব ও রহস্য উন্মোচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। ফলে তারা এসব জানবে, বুঝবে এবং বিশ্বাস করবে এবং সবশেষে এর দ্বারা তারা উপকৃত হবে। বলা বাহুল্য যে, বিপদ আপদ, সুখশান্তি, দুঃখকষ্ট, আরাম আয়েশ ও অভাব অনটন দিয়ে পরীক্ষা করে অন্তরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এমন অজানা ভেদও জানা যায় যা সে অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিরও থাকে অজানা।

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর জানার অর্থ হচ্ছে, অন্তরের যে বাহ্যিক অবস্থাটা মানুষ দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে সে অবস্থার সাথে আল্লাহর জ্ঞানের যোগসূত্র থাকা।

অন্তরের যে অবস্থাটা মানুষ দেখতে পারে এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে সেটাই তাকে প্রভাবিত করে, তার অনুভূতিকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তার সাধ্যাধীন উপায় উপকরণের মাধ্যমে তার জীবনকে পরিচালিত করে, আর এভাবেই পরীক্ষার পেছনে নিহিত আল্লাহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ সাধিত হয়।

এরপরেও কোনো মোমেন বান্দা আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার কামনা করে না। বরং এর থেকে মুক্তি ও আল্লাহর রহমত কামনা করে। তবে কোনো সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষা এসে গেলে সে ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে। কারণ, এর পেছনে যে হেকমত নিহিত আছে, তা সে বুঝতে পারে। তাই সে এ হেকমতের প্রতি আস্থা ও ভরসা রেখে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সাথে সাথে এই পরীক্ষায় যাতে উত্তীর্ণ হতে পারে সে জন্যে তাঁর রহমত ও তৌফিকও কামনা করে।

বিশিষ্ট সাধক ও বুযুর্গ হযরত ফুযাইল যখন এই আয়াতটি পাঠ করতেন তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, 'হে পরওয়ারদেগার তুমি আমাদের পরীক্ষা নিয়ো না। কারণ তুমি পরীক্ষা নিলে আমাদের সব দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে যাবে, আমাদের সব গোপন ভেদই ফাঁস হয়ে যাবে, আর তখন তুমি আমাদেরকে শাস্তি দেবে।'

আলোচ্য সূরার এই শেষ পর্বের প্রথম অংশে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারা হলো কাফের গোষ্ঠী– যারা আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো এবং সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার পরও তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে নির্যাতন চালিয়েছিলো। এরা খুব সম্ভবত মক্কার মোশরেক সম্প্রদায় যাদের প্রসঙ্গ আলোচ্য সূরার প্রথম দিকে এসেছে। কারণ, ইসলাম বিরোধিতার পরাকাষ্ঠা যারা দেখিয়েছিলো, রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা যারা সৃষ্টি করেছিলো তারা মক্কার মোশরেক গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ নয়। তবে এখানে অন্য কারো কথা হতে পারে। যেমন এর দ্বারা মদীনার ইহুদী ও মোনাফেকসহ ইসলাম বিরোধী ও আল্লাহ তায়ালা বিরোধী যে কোনো ব্যক্তি ও সমাজের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের হুমকি স্বরূপ যে তারা প্রকাশ্যে বা গোপনে এ জাতীয় নীতি অবলম্বন করলে তাদের পরিণতিও মক্কার মোশরেকদের অনুরূপ হবে। তবে অবস্থা ও প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

আলোচ্য পর্বের দ্বিতীয় ও শেষ অংশ থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত মোমেনদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। এখানে তাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্যে আহ্বান

করা হয়েছে এবং তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন এই জেহাদের ব্যাপারে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী কাফেরদের সাথে কোনো চাপের মুখে বা কোনো দুর্বলতার কারণে বা আত্মীয়তার কারণে বা কোনো স্বার্থের কারণে নমনীয়তা ও আপোসকামিতার প্রশ্রয় না দেয়। এই জেহাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে খরচ করতে কোনোরূপ কার্পণ্য না করার উপদেশও তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তবে প্রত্যেকেই তার সামর্থ অনুযায়ী খরচ করবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা সামর্থের বাইরে কাউকে কিছু করার নির্দেশ দেন না। বিশেষ করে ধন সম্পদের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবজাত দুবর্লতার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা বিবেচনায় রাখেন। তারা যদি জেহাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই গৌরবময় দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি দেবেন, বঞ্চিত করবেন এবং তাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে এর জন্যে নির্বাচিত করবেন যারা এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এবং এর মর্যাদা বুঝবে। এটা নিসন্দেহে এক ধরনের ভয়ানক ও মারাত্মক হুমকি যা আলোচ্য সূরার প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই সাথে তৎকালীন মুসলিম সমাজের মোনাফেক ও ব্যধিগ্রস্থ লোকদের মানসিক অবস্থার জন্যে চিকিৎসা স্বরূপও। এটা ঠিক যে, অধিকাংশ মুসলমানের মাঝে ত্যাগ, আন্তরিকতা, বীরত্ব ও কোরবানীর গুণাবলী বিদ্যমান ছিলো যার প্রমাণ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী। তবে মুসলিম সমাজ দুর্বল চিত্তের লোকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে তাদেরকে জেহাদের জন্যে প্রস্তুত করছে।

কাফেররা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না

আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূল (স.)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি তাদের কর্মসমূহকে ব্যর্থ করে দেবেন।' (আয়াত ৩২)

এই আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত ও চূড়ান্ত। কাজেই যারা আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করেছে, সত্যের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, শক্তি প্রয়োগ করে, অর্থের বিনিময়ে অথবা প্রতারণা করে অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে মানুষকে সৎ ও সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, যারা রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিয়ে অথবা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর শত্রুদের দলে ভিড়ে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত ধর্ম, শরীয়ত ও জীবনাদর্শের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁর আদর্শের অনুসারী ও প্রচারকদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তাদেরই আমল বরবাদ হবে। কারণ, তাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তারা এই সত্যকে চিনতে ও জানতে পেরেছিলো। কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর বশবর্তী হয়ে পড়ে, তাদেরকে গোঁয়ার্তুমিতে পেয়ে বসে, ব্যক্তিস্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে ফেলে এবং তারা নগদ সুযোগ সুবিধার পেছনে পড়ে যায়। যার ফলে সত্যকে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় ন।

এরা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, এটা অবধারিত সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা। কারণ, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর ক্ষতি করার মতো শক্তি সামর্থ্য তাদের থাকবে তো দূরের কথা, বরং তারা ক্ষতি করতে পারে, এমন কথা উল্লেখ করাও তাদের ক্ষেত্রে সাজে না। আসলে এখানে স্বয়ং আল্লাহর ক্ষতি সাধনের কথা বলা হয়নি, বরং আল্লাহর দ্বীনের ক্ষতি, আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শের ক্ষতি এবং এর ধারক বাহক ও প্রচারকদের ক্ষতির কথাই বলা হয়েছে। তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তারা কোনো কোনো

মোমেন মুসলমানের ক্ষতি করতে পারলেও এর দ্বারা তারা আল্লাহর অমোঘ বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে আদৌ কোনো হেরফের বা পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না। মুসলমানদের যে ক্ষতি তারা করে থাকে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাময়িক পরীক্ষাস্বরূপ। এর পেছনে আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এটাকে কোনোভাবেই আল্লাহর অমোঘ বিধান, প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি, তাঁর মনোনীত জীবনাদর্শ এবং এই জীবনাদর্শের অনুসারী ও ধারক ও বাহকদের জন্যে প্রকৃত ক্ষতি বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ, যারা এই ক্ষতি করতে আসবে তাদের অশুভ পরিণতি আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'তিনি অচিরেই তাদের কর্মসমূহকে ব্যর্থ করে দেবেন.....' কাজেই তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এদের পরিণাম সেই গবাদি পশুর ন্যায় হবে যে পশু বিষাক্ত লতাপাতা খেয়ে উদরপূর্তি করে।

মোমেনদের প্রতি কিছু নির্দেশনা

আল্লাহর দ্বীনের শত্রু, আল্লাহর রসূলের শত্রু এই কাফের গোষ্ঠীর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করার পর এখন মোমেনদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে, তাদেরকে এই পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে লক্ষ্য করে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূল (স.)-এর আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।' (আয়াত ৩৩)

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তৎকালীন সমাজে এমন কিছু মুসলমানের অস্তিত্বও ছিলো যাদের মাঝে ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অভাব ছিলো, অথবা যাদের জন্যে ইসলামের কোনো কোনো অনুশাসন কষ্টকর ছিলো, অথবা জেহাদের জন্যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করা কঠিন ছিলো। বিশেষ করে সেই সব শক্তিধর ও আগ্রাসী জাতিগুলোর বিরুদ্ধে যারা ইসলামের পথে বাধার সৃষ্টি করতো এবং সব দিক থেকে ইসলামকে কোনঠাসা করতে চেষ্টা করতো। শুধু তাই নয়, বরং যাদের সাথে মুসলমানদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিলো, স্বার্থ জড়িত ছিলো যা চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করা তাদের জন্যে কঠিন ছিলো, অথচ ইসলামের দাবীই ছিলো সেটা।

যারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান ছিলো, তাদের অন্তরে এই নির্দেশ প্রচন্ড কম্পনের সৃষ্টি করে এবং অনেকেই নিজ নিজ আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন নাসর আল মিরওয়াজী আবুল আলিয়ার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর কোনো কোনো সাহাবীরা মনে করতেন যে, কালেমা পাঠ করার পর গোনাহ করলে কোনো ক্ষতি হবে না এবং শেরেক করার পর আমল করলে কোনো লাভ হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি নাযিল করেন, 'তোমরা আল্লাহর ও রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না' ... তখন তারা গোনাহের কারণে আমল বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা সাহাবী সমাজ মনে করতাম যে, ভালো কাজের সব কিছুই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। শেষে এই আয়াতটি নাযিল হয়, 'তোমরা আল্লাহর ও রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।' তখন আমরা বললাম, কোন জিনিস আমাদের আমলকে বিনষ্ট করতে পারে? আমরা নিজেরাই বললাম, 'কবীরা গোনাহ ও অশ্লীলতা' তখন সূরা নেসার এই আয়াতটি নাযিল হয়, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে

শেরেককে ক্ষমা করবেন না এবং এর বাইরে যা কিছু আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।' এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা আমাদের আগের মত ত্যাগ করলাম এবং কবীরা গোনাহ ও অশ্লীলতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আশঙ্কা করতে লাগলাম এবং এর থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আশা পোষণ করতে লাগলাম।

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, নিখাদ ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী বান্দারা কোরআনের মর্মবাণীকে কি মন-মানসিকতা নিয়ে গ্রহণ করতো। কোরআনের আয়াত তাদের হৃদয়ে কি চঞ্চলতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করতো তাতে কি শিহরণ ও প্রকম্পনের সৃষ্টি হতো! কিভাবে তারা নিজেদের জীবনকে কোরআনমুখী করার জন্যে সচেষ্ট থাকতো এবং এর বিপরীতমুখিতা পরিহার করার জন্যে সদা সতর্ক থাকতো। কোরআনের বাণী ও নির্দেশকে যারা এই পর্যায়ের মন মানসিকতা ও আবেগ অনুভূতি নিয়ে গ্রহণ করতো তারাই ছিলো খাঁটি ও নির্ভেজাল মুসলমান।

কাফেরদের পরিণাম

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেই সকল লোকের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন যারা তাঁর দ্বীনকে অস্বীকার করেছে, তাঁর সত্য পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে, তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে এবং এই অবস্থায়ই পৃথিবী হতে বে ঈমান ও কাফের হয়ে বিদায় নিয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ তায়ালা কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না।' (আয়াত ৩৪)

অর্থাৎ ক্ষমার সুযোগ কেবল এই জাগতিক জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যমদূত আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবার দরজা পাপীতাপী ও কাফের মোশরেক সবার জন্যে খোলা থাকবে। কিন্তু আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করতে যাবে তখন আর তাওবারও সুযোগ থাকবে না এবং ক্ষমারও সুযোগ থাকবে না। সুযোগ শেষ। এই সুযোগ আর ফিরে আসবে না।

এ জাতীয় আয়াতের লক্ষ্য কাফের ও মোমেন সবাই। কাফেরদের ক্ষেত্রে হুশিয়ারবাণী হিসেবে বিবেচিত, যেন এর ফলে তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় এবং তাওবা ও ক্ষমার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই তাওবা করে ফিরে আসে। অপরদিকে মোমেনদের ক্ষেত্রে এসব আয়াত সতর্কবাণী ও উপদেশ হিসেবে বিবেচিত হবে, এর মাধ্যমে যেন তারা এমন সব ক্রিয়া কলাপ ও আচার আচরণ পরিহার করে চলতে পারে যা মানুষকে সে বিপদ সঙ্কুল ও অশুভ পথে নিয়ে যায়।

বাতিলের সাথে আপোষ নয়

এই সত্যটি আমরা পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ও বিন্যাস থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের পরিণতির বিপরীতে পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে হীনবল হয়ে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানিও না। তোমরাই হবে বিজয়ী। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না। (আয়াত ৩৫)

এটাই হচ্ছে মোমেনদের জন্যে সাবধানবাণী। এখানে তাদের সামনে রসূলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কাফেরদের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মোমেনরা যেন দূর থেকে এ দানবরূপী পরিণতিকে ভয় করে চলে।

এই সাবধানবাণী ইংগিত বহন করে যে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে এমন বেশ কিছু লোকও ছিলো যাদের জন্যে জেহাদের মতো দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য দায়িত্ব ছিলো একটা বোঝাস্বরূপ। এই বোঝা বহন করতে গিয়ে তারা হীনবল ও ধৈর্যহারা হয়ে পড়তো এবং যুদ্ধ বিগ্রহের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহবোধ করতো। তাছাড়া মোশরেকদের সাথে তাদের অনেকেরই আত্মীয়তার সম্পর্কসহ ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থও জড়িত ছিলো। এসব কারণে তারা সন্ধি ও শান্তিচুক্তির জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠতো। এটাই মানবিক দুর্বলতা। এই দুর্বলতা এবং স্বভাবজাত মনোবৃত্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা অভাবনীয় সফলতা দেখাতে সক্ষমও হয়েছে। তা সত্ত্বেও মাদানী যুগের সেই গোড়ার দিকে দুর্বলচিত্তের কিছু লোকের অস্তিত্ব থাকাটা বিচিত্র ছিলো না। এসব আয়াত তাদেরকেই সংশোধন করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই দুর্বল চিত্তের লোকদের সংশোধন পবিত্র কোরআন কিভাবে করে তা লক্ষণীয়। কোরআনের এ শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মানবীয় দুর্বলতা সব যুগে একই ধরনের থাকে।

আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরাই বিজয়ী হবে, কাজেই হীনবল হয়ে সন্ধি ও শান্তিচুক্তির পেছনে পড়ো না। কারণ তোমরা ওদের তুলনায় জীবন বোধ, বিশ্বাস ও জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে উন্নত, মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর সাথে যোগসূত্রের ক্ষেত্রেও তোমরা উন্নত। আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও তোমরা উন্নত। অর্থাৎ শক্তির দিক থেকে, অবস্থানের দিক থেকে এবং সাহায্য সহযোগিতার দিক থেকে তোমরাই উন্নত ও প্রবল। কারণ তোমাদের সাথে রয়েছেন মহা শক্তিধর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তোমরা একা নও। তোমরা রয়েছো সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমতাধর সত্ত্বার তত্ত্বাবধানে। তিনিই তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের সাথে সর্বদা বিচরণকারী। তিনিই তোমাদের রক্ষক ও সহায়ক। কাজেই যখন আল্লাহ তায়ালা নিজে তোমাদের সাথে রয়েছেন তখন তোমাদের শত্রুরা তোমাদের কি ক্ষতি করতে পারবে? তাছাড়া এই জেহাদের জন্যে তোমরা যা কিছু খরচ করছো, যে শ্রম দিচ্ছ এবং যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছো এর সব কিছুই তোমাদের আমলনামায় লেখা হচ্ছে। এর একটিও বৃথা যাবে না। তাই বলা হয়েছে, 'তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না।' অর্থাৎ তোমাদের কর্মের প্রতিদান, ফলাফল ও বিনিময় থেকে আল্লাহ তায়ালা বিন্দুমাত্র হ্রাস করবেন না।

যার সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন যে সে প্রবল, তার সাথে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা রয়েছে, তার কোনো কর্মই বৃথা যাবে না এবং সে সম্মানিত হবে, সমাদৃত হবে, সাহায্যপুষ্ট হবে এবং পুরস্কৃত হবে, তাহলে এমন ব্যক্তি কি কারণে হীনবল হবে এবং সন্ধি ও শান্তিচুক্তির জন্যে অধীর হয়ে পড়বে?

দুনিয়ার জীবন

এই হচ্ছে প্রথম মর্মবাণী। দ্বিতীয় মর্মবাণী হচ্ছে, এই পার্থিব জীবন তুচ্ছ ও নগণ্য। এই জীবনে মোমেন বান্দারা কখনও কখনও ত্যাগ ও কষ্টের শিকার হতে পারে। তবে পরকালে তাদেরকে এর বিনিময় পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে অথচ এই বিনিময় লাভের জন্যে তাদেরকে বড় অংকের অর্থ খরচ করতে হবে না।

তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধূলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাইবেন না। (আয়াত ৩৬)

অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনের পেছনে যদি কোনো মহৎ ও স্থায়ী উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে এই জীবন নিছক খেলাধুলা ও রং তামাশায় পর্যবশিত হবে। আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই পার্থিব জীবন অতিবাহিত করলে তা খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই হবে না। কারণ সেই জীবন বিধানের ফলে পার্থিব জীবন পরকালের জন্যে শষ্যক্ষেত্রস্বরূপ বলে গণ্য হয়। যারা এই পার্থিব জগতে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে, তারাই পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় অংশে সে কথাই বলা হয়েছে। যেমন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন।' এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, ঈমান ও তাকওয়ার ফলেই পার্থিব জীবন খেল তামাশার পর্যায় থেকে বের হয়ে আসে এবং তাতে যথার্থতার গুণ সৃষ্টি হয়। এই ঈমান ও তাকওয়াই পার্থিব জীবনকে নিছক জৈবিক ভোগের স্তর থেকে তুলে নিয়ে খেলাফতে রাশেদার স্তরে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেয়, যার সম্পর্ক হচ্ছে উর্ধলোকের সাথে। পার্থিব জীবন যখন এই স্তরে উন্নীত হয় তখন মোমেন মোত্তাকী বান্দা এই পৃথিবীর ধন সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করবে তা বৃথা যাবে না। বরং সেটাই হবে তার জন্যে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের পরম পাওনার উপায়। তা সত্তেও আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার গোটা ধন সম্পদ তাঁর রাস্তায় খরচ করার কথা বলেন না। এমন কোনো দায় দায়িত্বও তাদের ওপর চাপিয়ে দেন না যা তাদের জন্যে দুঃসাধ্য। কারণ, তিনি মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতাগুলো জানেন এবং সম্পদের প্রতি তাদের মনের দুর্বলতার কথাও জানেন। তাই তিনি সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু করার দায়িত্ব কাউকে দেন না। তিনি বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়েই তাদেরকে তাদের গোট ধন সম্পদ খরচ করার নির্দেশ দেন না। তিনি জানেন যে, এরূপ নির্দেশ দেয়া হলে সেটা হবে তাদের জন্যে কঠিন এবং তা পালনে তারা কার্পণ্য দেখাবে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি তোমাদের কাছে ধন সম্পদ চাইলে অতপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন।' (আয়াত ৩৭)

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যে যে বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছে, তা হলো মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি যে বিধান তাঁর বান্দাদের জন্যে মনোনীত করছেন তা তাদের স্বভাবের সাথে, তাদের প্রকৃতির সাথে, তাদের যোগ্যতার সাথে, তাদের সামর্থের সাথে এবং তাদের অবস্থার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। বস্তুত এই বিধান হচ্ছে একটি খোদায়ী ও মানবিক নীতির গোড়াপত্তন করা। এই নীতিটি খোদায়ী হবে এই কারণে যে, এর রূপকার হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আর মানবিক হবে এই কারণে যে, এতে মানবীয় শক্তি সামর্থ্য এবং চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু নিজেই স্রষ্টা, কাজেই তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাছাড়া তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞাতাও।

আল্লাহর পথে ব্যয়

এর পরের আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আহ্বানে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব কি ছিলো, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে ধন দৌলতের প্রতি মানবীয় দুর্বলতার চিকিৎসার জন্যে কোরআনের নিজস্ব পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়েছে যেমনটি করা হয়েছে জেহাদের প্রতি ঔদাসীন্যের চিকিৎসার ক্ষেত্রে। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে, 'শোনো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতপর তোমাদের কেউ

কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতি কৃপণতা করছে। আল্লাহ তায়ালা অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।' (আয়াত ৩৮)

আলোচ্য আয়াতে তৎকালীন মুসলিম সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধন সম্পদ ব্যয় করার আহ্বানের প্রতি তারা কি ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিতো, সে কথাও বলা হয়েছে। এখানে কোরআন নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের কেউ কেউ কার্পণ্য দেখাতো। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, তাদের মাঝে এমন অনেকেই ছিলো যারা আদৌ কোনো কার্পণ্যের আশ্রয় নিতো না। এটাই হচ্ছে তখনকার যুগের বাস্তবতা। বিভিন্ন সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় তা জানা যায়। স্বয়ং কোরআন শরীফেই এ সম্পর্কে একাধিক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। সেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর রাস্তায় দান ও ত্যাগের যে দৃষ্ঠান্ত ইসলাম স্থাপন করেছে তা রীতিমতো বিরল ও অভাবনীয়। কিন্তু তা সত্তেও সম্পদের বেলায় কার্পণ্য দেখানোর মতো লোকের অস্তিত্ব থাকাটা অসম্ভব নয়। বরং অনেকের কাছে অর্থ বিসর্জনের চেয়ে প্রাণ বিসর্জন অনেক সহজ। সেই জাতীয় কার্পণ্যের চিকিৎসা করতে গিয়েই সম্ভবত আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা কৃপণতা করবে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করবে।'

বলা বাহুল্য, মানুষ ইহজগতে আল্লাহর পথে যা কিছু খরচ করে তার জমার খাতায় তা সঞ্চয় হিসেবে থাকে; এই সঞ্চয় প্রয়োজনের মুহূর্তে তার কাজে আসবে। সেই মুর্হর্তটি যখন আসবে তখন তা শেষ সম্বল হিসেবে কাজে আসবে। কাজেই মানুষ যদি ইহজগতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে গিয়ে কৃপণতা করে, তাহলে এই কৃপণতা প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সাথেই করছে। কারণ, এর ফলে তার নিজ সঞ্চয়ের ঘাটতি দেখা দেবে, এই সম্পদ তার নিজের জন্যেই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং সে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করবে।

একথা ঠিক যে, আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে তাঁর রাস্তায় খরচ করতে বলেন, তখন এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাদের মঙ্গলই কামনা করে থাকেন, তাদের সচ্ছলতাই কামনা করেন এবং এই দলকে পরকালে তাদের জন্যে বিরাট সঞ্চয় হিসেবে রেখে দেন। এই দান থেকে তিনি নিজে কিছুই লাভ করেন না। কারণ, তিনি তাদের এই দানের আদৌ মুখাপেক্ষী নন। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অভাবমুক্ত আর তোমরা হচ্ছো অভাবী' ... কারণ তিনিই তোমাদেরকে ধন সম্পদ দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের দানকে তোমাদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখে দেন। তিনি দুনিয়াতে তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন সেগুলো থেকেও তিনি বে নিয়ায এবং পরকালের জন্যে যা কিছু তোমাদের হিসেবে সঞ্চয় করে রাখেন, সেগুলো থেকেও তিনি বে নিয়ায। এসবে তার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং উভয় জগতে ও উভয় অবস্থায় তোমরাই তার প্রতি মুখাপেক্ষী। পৃথিবীতে জীবিকার জন্যে তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। কারণ, তিনি জীবিকার ব্যবস্থা না করে দিলে তা যোগান দেয়ার মতো ক্ষমতা ও শক্তি তোমাদের নেই। তেমনিভাবে পরকালেও তোমরা তাঁর প্রতিদানের প্রতি মুখাপেক্ষী। কারণ তিনিই অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তোমাদের নিজের প্রয়োজন মিটানোর মতো ব্যবস্থাই যেখানে তোমাদের নেই, সেখানে পরকালের জন্যে অতিরিক্ত আর কী থাকবে? কাজেই সেখানে যা পাওয়া যাবে তা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে আর এই কার্পণ্য কেন? কেন এই হাত গুটিয়ে রাখা? তোমাদের নিজেদের হাতে যা কিছু আছে এবং তোমাদের দানের বিনিময় হিসেবে যা কিছু পাবে সবই তো আল্লাহর দেয়া এবং তাঁরই অনুগ্রহ!

এরপর শেষ কথাটি বলা হচ্ছে এবং সর্বশেষ একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর সেটি হলো এই, 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও,তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন' ... কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, সম্মান ও দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখন তোমরা যদি নিজেদেরকে এই সম্মান ও অনুগ্রহের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম না হও, এই মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট দায় দায়িত্ব পালনে সক্রিয় না হও এবং তোমাদেরকে যে সম্মান দান করা হয়েছে তার যথাযথ মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম না হও তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতিকে এই সম্মানের জন্যে মনোনীত করবেন যারা এর মর্যাদা বুঝে ও কদর করে।

আলোচ্য আয়াতের এই বক্তব্যের মাঝে এক ধরনের সতর্কবাণী লুকিয়ে আছে। এটা কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন, যারা এই জগতের বুকে আল্লাহর আমানতের বাহক হিসেবে নিজেদের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন, যারা নিজেদের অন্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ধারণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করে, যাদের অস্তিত্বে আল্লাহর নূর উদ্ভাসিত হয়ে আছে এবং যারা নিজ প্রভুর দেয়া গুণ বৈশিষ্ট ধারণ করে চলাফেরা করে।

যে মানুষ একবার ঈমানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে, যে মানুষ অন্তরে ঈমানের এই তাৎপর্যকে ধারণ করে জীবন পরিচালনা করেছে, তার কাছ থেকে যদি এই ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাকে যদি আল্লাহর দরবার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তার মুখের সামনে যদি আল্লাহর সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে তার জন্যে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে, জীবনের আনন্দই যে হারিয়ে ফেলবে। বরং এ জীবন বিশেষ করে তাদের জন্যে এক অসহনীয় নরক হয়ে দাঁড়াবে যারা একবার আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর তা বিচ্ছেদের শিকার হয়েছে।

এটা সন্দেহাতীত সত্য যে, ঈমান হচ্ছে একটা বড় নেয়ামত। দুনিয়াতে কোনো কিছুই এর সমতুল্য হতে পারে না। অপরদিকে জীবন হচ্ছে খুব তুচ্ছ ও নগণ্য। তেমনিভাবে ধন সম্পদও হচ্ছে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। তাই ঈমানকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় রাখা হয় অন্য সব কিছু তাহলে ঈমানের পাল্লাই ভারী থাকবে।

কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মোমেনের জন্যে এটা একটা গুরুতর সতর্কবাণীই বটে।

সূরা আল ফাতাহ্

আয়াত ২৯ রুকু ৪

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ① لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ② وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ④ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ⑤ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে নবী,) নিসন্দেহে আমি তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, ২. যাতে করে (এর দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমার আগে পরের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তোমার ওপর প্রদত্ত তাঁর যাবতীয় অনুদানসমূহও তিনি পূরণ করে দিতে পারেন এবং তোমাকে সবল ও অবিচল পথে পরিচালিত করতে পারেন, ৩. আর (এ ঘটনার মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বড়ো রকমের একটা সাহায্যও করবেন। ৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ঈমানদারদের মনে গভীর প্রশান্তি দান করেছেন, যাতে করে তাদের (বাইরের) ঈমান তাদের (ভেতরের) ঈমানের সাথে মিলে আরও বৃদ্ধি পায়; (তারা যেন জেনে নিতে পারে,) আসমান যমীনের সমুদয় সৈন্য সামন্ত তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল, ৫. (এর মাধ্যমে) তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন এক (স্থায়ী) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে, সেখানে তারা হবে চিরন্তন, তিনি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন; আর (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের) এটা হচ্ছে মহাসাফল্য, ৬. (এর দ্বারা) তিনি মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক

وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ

নারী, আল্লাহর সাথে শরীক করে এমন পুরুষ ও নারী এবং আরো যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানাবিধ খারাপ ধারণা পোষণ করে– তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করবেন; (আসলে) খারাপ পরিণাম তো ওদের চারদিক থেকে ঘিরেই আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর গযব পাঠিয়েছেন, তাদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর তাদের জন্যে তিনি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন; আর জাহান্নাম (তো হচ্ছে অত্যন্ত) নিকৃষ্ট ঠিকানা! ৭. আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় বাহিনী আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং তিনিই হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ৮. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে (মানুষের কাছে) সত্যের সাক্ষী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, ৯. যাতে করে তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর ওপর এবং তাঁর নবীর ওপর (সর্বতোভাবে) ঈমান আনো, (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) তাঁকে সাহায্য করো, (আল্লাহর নবী হিসেবে) তাঁকে সম্মান করো; (সর্বোপরি) সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো। ১০. নিসন্দেহে আজ যারা তোমার কাছে বায়াত করছে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই বায়াত করলো; (কেননা) আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের ওপর, তাদের কেউ যদি এ বায়াত ভংগ করে তাহলে এর (ভয়াবহ) পরিণাম তার নিজের ওপরই এসে পড়বে, আর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে পূর্ণ করে, তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

রুকু ২

১১. (আরব) বেদুইনদের যারা (তোমার সাথে যোগ না দিয়ে) পেছনে পড়ে থেকেছে, তারা অচিরেই তোমার কাছে এসে বলবে (হে নবী), আমাদের মাল সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব তুমি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ

ক্ষমা প্রার্থনা করো (হে মোহাম্মদ, তুমি এদের কথায় প্রতারিত হয়ো না), এরা মুখে এমন সব কথা বলে যার কিছুই তাদের অন্তরে নেই; বরং তুমি (এদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তাহলে কে তোমাদের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে; তোমরা যা যা করছো আল্লাহ তায়ালা কিন্তু সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ১২. তোমরা সবাই মনে করেছিলে, রসূল ও (তাঁর সাথী) মোমেনরা কোনো দিনই (এ অভিযান থেকে) নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে (জীবিত) ফিরে আসতে পারবে না, আর এ ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লেগেছিলো এবং তোমরা তাদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করে রেখেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছো একটি নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ জাতি! ১৩. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর যারা কখনো বিশ্বাস করেনি, আমি (সে) অবিশ্বাসীদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। ১৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব তো (এককভাবে) তাঁরই জন্যে (নির্দিষ্ট, অতএব); তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১৫. (অতপর) যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হাসিল করতে যাবে তখন পেছনে পড়ে থাকা এ লোকগুলো এসে অবশ্যই তোমাকে বলবে, আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও, (এভাবে) তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে চায়; তুমি বলে দাও, তোমরা কিছুতেই (এখন) আমাদের সাথে চলতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা তো আগেই তোমাদের (ব্যাপারে এমন) ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, (একথা শুনে) তারা সাথে সাথে বলে উঠবে, তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো, কিন্তু এ

بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۞ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

লোকগুলো (আসলে) বুঝেই নিতান্ত কম। ১৬. পেছনে পড়ে থাকা (আরব) বেদুইনদের তুমি (আরো) বলো, অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হবে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, (তোমরা যদি) এ নির্দেশ মেনে চলো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন, আর তোমরা যদি তখনও আগের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো (এবং ময়দান থেকে পালিয়ে যাও), তাহলে জেনে রেখো, তিনি তোমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন। ১৭. তবে কোনো অন্ধ ও পংগু কিংবা রুগ্ন ব্যক্তি (জেহাদের ময়দানে না এলে তার) জন্যে কোনো গুনাহ নেই এবং যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, আবার যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।

রুকু ৩

১৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা যখন গাছের নীচে বসে তোমার হাতে (আনুগত্যের) বায়াত করছিলো, (তখন) আল্লাহ তায়ালা (তাদের ওপর খুবই) সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের মনের (উদ্বেগজনিত) অবস্থার কথা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন, তাই তিনি (তা দূর করার জন্যে) তাদের ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং আসন্ন বিজয় দিয়ে তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন, ১৯. (তাছাড়া রয়েছে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে; আল্লাহ তায়ালা অনেক শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ

النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ ﴿٢٠﴾

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ

وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖۚ وَلَنْ تَجِدَ

لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ

بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ

مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۗ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۤءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ

২০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (আরো) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, (আগামীতেও) তোমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকার করবে; এরপরে আল্লাহ তায়ালা এ (বিজয়)-কে তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করেছেন এবং অন্যদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন যাতে করে এটা মোমেনদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার একটা নিদর্শন হতে পারে এবং এর দ্বারা তিনি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন, ২১. এছাড়াও অনেক (সম্পদ) রয়েছে, যার ওপর এখনও তোমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি; আসমান যমীনের সমুদয় সম্পদ, তা তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিবেষ্টন করে আছেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। ২২. (সেদিন) যদি কাফেররা তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (ময়দান থেকে) পালিয়ে যেতো, অতপর তারা কোনো সাহায্যকারী ও বন্ধু পেতো না। ২৩. (এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার (চিরন্তন) নিয়ম, যা আগে থেকে (একই ধারায়) চলে আসছে, তুমি (কোথাও) আল্লাহ তায়ালার এ নিয়মের কোনো রদবদল (দেখতে) পাবে না। ২৪. (তিনিই মহান আল্লাহ,) যিনি মক্কা নগরীর অদূরে তাদের ওপর তোমাদের নিশ্চিত বিজয়দানের পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন; আর তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছিলেন। ২৫. তারা তো সেসব (অপরাধী) মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তোমাদের আল্লাহর ঘর (তাওয়াফ করা) থেকে বাধা দিয়েছে এবং কোরবানীর (উদ্দেশে আনীত) পশুগুলোকে তাদের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছুতে বাধা দিয়েছে; যদি (সেদিন মক্কা নগরীতে) এমন সব মোমেন পুরুষ ও নারী অবস্থান না

تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾

করতো– যাদের অনেককেই তোমরা জানতে না, (তাছাড়া যদি এ আশংকাও না থাকতো যে, একান্ত অজান্তে) তোমরা তাদের পদদলিত করে দেবে এবং এ জন্যে তোমরা (পরে হয়তো) অনুতপ্তও হবে (তাহলে এ যুদ্ধ বন্ধ করা হতো না– যুদ্ধ তো এ কারণেই বন্ধ করা হয়েছিলো যে), এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে আসেন, যদি (সেদিন) তারা (কাফেরদের থেকে) পৃথক হয়ে যেতো তাহলে (মক্কায় অবশিষ্ট) যারা কাফের ছিলো– আমি কঠিন ও মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম। ২৬. যখন এ কাফেররা নিজেদের মনে জাহেলিয়াতের ঔদ্ধত্য জমিয়ে নিয়েছিলো, তখন (তাদের মোকাবেলায়) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর ও (তাঁর সাথী) মোমেনদের ওপর এক মানসিক প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন এবং (এ অবস্থায়ও) তিনি তাদের আল্লাহকে ভয় করে চলার (নীতির) ওপর কায়েম রাখলেন, (মূলত) তারাই ছিলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার) অধিকতর যোগ্য ও হকদার ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই যথার্থ জ্ঞান রাখেন।

রুকু ৪

২৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, (রসূল স্বপ্নে দেখেছিলো, একদিন) অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় নিরাপদে 'মাসজিদুল হারামে' প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ (তখন) থাকবে মাথা মুণ্ডন করা অবস্থায় আবার কেউ থাকবে মাথার চুল কাটা অবস্থায়, তোমাদের (মনে) তখন আর কোনোরকম ভয়ভীতি থাকবে না; (স্বপ্নের) এ কথা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন, যার কিছুই তোমাদের জানা ছিলো না, অতপর (পরবর্তি বিজয়ের) ব্যাপারটি আসার আগেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে এ আশু বিজয় দান করেছেন।

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۛ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৮. তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহর রসূল (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারে, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। ২৯. মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার রসূল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রুকু ও সাজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারায়ও (এ আনুগত্য ও) সাজদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের উদাহরণ যেমন (বর্ণিত রয়েছে) তাওরাতে, (তেমনি) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলেও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ– যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট্ট) কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কান্ডের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারা গাছটির এ অবস্থা তখন) চাষীর মনকে খুশীতে উৎফুল্ল করে তোলে, (এভাবে একটি মোমেন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটা মাদানী। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এটি নাযিল হয়। এতে হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে মুসলমানদের ও তাদের আশপাশের অবস্থা কেমন ছিলো, তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা মোহাম্মাদ কোরআনের ধারাক্রম অনুসারে এই সূরার পূর্বে থাকলেও এই দুই সূরার নাযিল হওয়ার মাঝে প্রায় তিন বছরের ব্যবধান ছিলো। এই তিন বছরে সার্বিক দিক থেকে মদীনার মুসলমানদের অবস্থায় বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিলো। এই পরিবর্তন যেমন সূচিত হয়েছিলো মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে, তেমনি সূচিত হয়েছিলো তাদের শত্রুদের জীবনেও। অনুরূপভাবে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা, ঈমানী দৃঢ়তা ও সুগভীর পরিপক্ক ঈমানের ওপর টিকে থাকার ক্ষেত্রেও তাদের পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছিলো।

সূরাটির পটভূমি

সূরা ও তার পটভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, তার বিবরণ দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এতে করে পুনরায় সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমাদের সামনে ভেসে উঠবে, যা কোরআন নাযিল হবার সময়ে তৎকালীন মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করেছিলো।

একদিন রসূল (স.) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাথে অন্যান্য মুসলমানরা কেউবা চুল কামিয়ে কেউবা চুল ছেটে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করছেন। অথচ হিজরতের পর থেকেই মোশরেকরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো না। এমনকি যে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে জাহেলী যুগের আরবরাও সম্মান করতো, যে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে তারা অস্ত্র সংবরণ করতো এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ও মাসজিদুল হারামে প্রবেশে কাউকে বাধা দেয়া ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করতো, সেই নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিত না। তারা এই মাসগুলোকে এতোই সম্মান করতো যে, নিজ বংশের কোনো নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও তারা বিরত থাকতো। এই মাসগুলোতে কেউ তার পিতা বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখলেও তার ওপর তরবারী তুলতোনাএবং তাকে মাসজিদুল হারামে ঢুকতে বাধা দিতো না। অথচ মুসলমানদের ব্যাপারে তারা তাদের এই অটুট ঐতিহ্যকেও লংঘন করলো এবং হিজরতের পরবর্তী পুরো দু'টা বছর রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করতে দিলো না। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করার পর রসূল (স.) এই স্বপ্নটা দেখলেন। যখন তিনি মুসলমানদেরকে এই স্বপ্নের কথা জানালেন তখন তারা একে একটা শুভ লক্ষণ মনে করে খুশী হলো।

হোদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইবনে হিশামের বর্ণনা সবচেয়ে পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে। সার্বিক বিচারে ইমাম বোখারী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে হাযমের 'জাওয়ামিউস্ সীরাত' গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'অতপর রসূল (স.) রমযান ও শওয়াল মাস মদীনায় অবস্থান করলেন। (বনু মুসতালিকের যুদ্ধ ও তারপর হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাসংক্রান্ত ঘটনার পর) যিলকদ মাসে তিনি ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধের কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিলো না। তিনি মদীনার আশপাশের আরব ও মরুচারী বেদুইনদেরকেও তাঁর সাথে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কারণ তিনি আশংকা করছিলেন যে, কোরায়শ তার সাথে পূর্বেকার

মতোই আচরণ করবে, তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে অথবা তাকে কাবা শরীফে প্রবেশে বাধা দেবে। বেদুইনদের অনেকেই তাঁর সাথে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলো না। অগত্যা রসূল (স.) তাঁর সাথী মোহাজের আনসার ও তাঁর সাথে যোগদানকারী আরবদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সাথে কোরবানীর জন্তুও হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন ও ওমরার এহরাম বাঁধলেন, যাতে মক্কাবাসী তাঁর যুদ্ধের ইচ্ছা নেই ভেবে আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করে এবং নিশ্চিত হয় যে, তিনি শুধু কা'বা শরীফের যেয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এসেছেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশো।

যুহরী বলেন, রসূল (স.) যাত্রা করে যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হলেন, তখন তার সাথে বিশর বিন সুফিয়ান আল কাবী সাক্ষাত করলো। সে বললো, হে রসূল! কোরায়শ আপনার যাত্রার খবর পেয়ে গেছে। খবর পেয়ে তারা সদলবলে বেরিয়েছে। এমনকি তাদের সাথে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীনী মহিলারাও বেরিয়ে এসেছে। সবাই বাঘের চামড়া পরেছে এবং যী তুবাতে যাত্রা বিরতি করেছে। তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনাদেরকে কখনো মক্কায় ঢুকতে দেবে না। খালেদ বিন ওলীদ তাদের অধিনায়ক হয়ে আসছে। তারা কুরাউল গামীমে পৌছে গেছে। (উসফান থেকে আট মাইল সামনে অবস্থিত জায়গার নাম) রসূল (স.) এ কথা শুনে বললেন, ধিক কোরায়শকে! যুদ্ধ তাদেরকে গিলে খেয়ে ফেলেছে। আমাকে সমগ্র আরব জাতির সাথে একটা বুঝাপড়া করতে দিলে তাদের অসুবিধা কোথায়? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দেয়, তাহলে তো তারা যা চায় সেটাই হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে তারা দলে দলে ইসলামে যোগদান করবে। আর তা না হলে তারা আমার সাথে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে। তাহলে কোরায়শের ভাবনাটা কি? আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েই যাবো–যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিজয়ী করেন অথবা আমার এই গর্দান থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন, এখানে এমন কে আছে, যে আমাদেরকে এমন পথে মক্কায় নিয়ে যেতে পারে মক্কাবাসীরা যেপথ দিয়ে আসছে তার থেকে ভিন্ন?

ইবনে ইসহাক বলেন, বনু আসলাম গোত্রের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি পারবো আপনাদেরকে সে রকম একটা পথ দিয়ে নিয়ে যেতে। অতপর সে মুসলমানদেরকে একটা দুর্গম প্রস্তরময় পাবর্ত্য পথ ধরে নিয়ে চললো। এ পথ ধরে চলা মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো। একসময়ে তারা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সমভূমিতে উপনীত হলো। রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি। তারা তৎক্ষণাত তা বললো। তখন রসূল (স.) বললেন, বনী ইসলাঈলকেও এই কথার সমার্থক 'হিততাতুন' বলতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বলেনি।

ইবনে শিহাব আয যুহরী বলেন, এরপর রসূল (স.) জনগণকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা হিম্‌যের ভেতর দিয়ে মিরারের সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চলের হোদায়বিয়ার সমভূমি অভিমুখে এগিয়ে যাও। (মক্কার অদূরে একটা গ্রামের নাম হোদায়বিয়া) এরপর মুসলমানরা সেই পথ ধরে এগিয়ে চললো। কোরায়শ বাহিনী যখন মুসলমানদের পথের উড়ন্ত ধুলো দেখতে পেয়ে বুঝলো যে, তারা যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা তা থেকে ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা ত্বরিতগতিতে কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। এদিকে রসূল (স.) তার দলবল নিয়ে এগিয়ে

যেতে লাগলেন। তারা মিরারের পাহাড়ের কাছে যেতেই রসূল (স.)-এর উটনীটা শুয়ে পড়লো, তা দেখে মুসলমানদের অনেকেই বলে উঠলো, উটনীটা গোয়ার্তুমি শুরু করেছে। রসূল (স.) বললেন, গোয়ার্তুমি করছে না এবং এটা তার স্বভাবও নয়। আসলে আবরাহার হস্তি বাহিনী মক্কায় প্রবেশে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো, এ উটনীটা সেই একই বাধার সম্মুখীন। আজ কোরায়শ আমাকে রক্তসম্পর্ক বজায় রাখার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাবই দেবে, আমি তা মেনে নেবো। (বোখারীর বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বললেন, যে আল্লাহ তায়ালার হাতে আমার জীবন তার শপথ, আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাপেক্ষে কোরায়শ আমার কাছে যে দাবীই জানাবে আমি তা মেনে নেব।) তারপর রসূল (স.) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা এখানে যাত্রাবিরতি করো। তাঁকে বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ! এই প্রান্তরে পানি নেই। রসূল (স.) নিজের একটি তীর বের করে জনৈক সাহাবীকে দিলেন। সে সাহাবী তৎক্ষণাত সামান্য বৃষ্টির পানি ধারণকারী একটা নীচু জায়গায় তীরটা গেড়ে দিতেই তা পানিতে ভরে উঠলো।

এভাবে রসূল (স.) নিশ্চিন্ত হলে, তখন তার কাছে বুদাইল বিন ওয়ারকা খাযায়ীর নেতৃত্বে বনু খাযায়া গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল এসে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? রসূল (স.) তাদেরকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি, কেবল কা'বা শরীফ যেয়ারত করতে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছেন। তারপর তিনি বিশর বিন সুফিয়ান আল কা'বীকে যা বলেছিলেন, একইরকম কথা তাদেরকেও বললেন। তারপর এই প্রতিনিধি দল কোরায়শের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ, তোমরা মোহাম্মদের ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। আসলে মোহাম্মদ যুদ্ধ করতে আসেনি। সে এসেছে কা'বা যেয়ারত করতে। কিন্তু কোরায়শ তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা বরং খাযায়ীদেরকেই পক্ষপাতিত্বের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বললো, আল্লাহ তায়ালার কসম, যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছা নিয়ে নাও এসে থাকে, তবুও সে আমাদের শহরে জোর করে ঢুকতে পারবে না এবং আরবরা আমাদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারুক তা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না।

খাযায়া গোত্রের কাফের ও মুসলমান নির্বিশেষে সবাই রসূল (স.)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাংখী ছিলো। মক্কায় যা কিছুই ঘটতো, তা তারা রসূল (স.)-এর কাছে গোপন করতো না। খাযায়ী প্রতিনিধি দলের পর কোরায়শ বনু আমের বিন লুয়াই গোত্রের মুকারেয বিন হাফসাকে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো। তাকে আসতে দেখে রসূল (স.) দূর থেকেই বললেন, এক বিশ্বাসঘাতক আসছে। তখন তিনি বুদাইল ও তার সাথীদেরকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন। সে কোরায়শের কাছে ফিরে গিয়ে রসূল (স.) যা জানিয়েছেন তা জানালো। এরপর কোরায়শ হুলায়স বিন আলকামাকে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো। সে আহাবিশ নামক মরু অঞ্চলীয় গোত্রের সরদার ছিলো। এই গোত্রটি বনু হারেস গোত্রের একটা শাখা। তাকে আসতে দেখে রসূল (স.) বললেন, এই লোকটি একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। ওকে তোমরা আমাদের কোরবানীর জন্য নিয়ে আসা পশুগুলোকে দেখিয়ে দাও। সে যখন কোরবানীর পশুগুলোকে মাঠে চরে বেড়াতে দেখলো এবং এও দেখলো যে, দীর্ঘদিন আটক থাকার কারণে পশুগুলোর দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে পশম ঝরে গেছে, তখন সে রসূল (স.)-এর কাছে না এসেই কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। কেননা যে দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে সে বুঝেছে যে, যথার্থই তিনি কা'বার যেয়ারত করতে এসেছেন। সে যখন কোরায়শকে এ কথা বললো, তখন কোরায়শ বললো, 'তুমি একজন বেদুঈণ। এ বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই।'

ইবনে ইসহাক বলেন, কোরায়শ নেতাদের মুখ থেকে এ কথা শুনে হুলায়স রেগে গিয়ে বললো, হে কোরায়শ জনতা, তোমাদের সাথে আমাদের যে মৈত্রী চুক্তি হয়েছিলো, তার ভেতরে এ বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিলো না যে, ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ঘরের প্রতি সম্মান জানাতে আসে, তাকে কি তা থেকে প্রতিহত করা হবে? হুলায়সের জন্ম মৃত্যু যার হাতে, সেই আল্লাহ তায়ালার কসম, তোমরা যদি মোহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছে, তা তাকে করতে না দাও, তাহলে আমি সমস্ত আহাবিশীদেরকে নিয়ে চলে যাবো। একথা শুনে কোরায়শ নেতারা বললো, 'হে হুলায়স, আমরা যা পছন্দ করি, তা করতে আমাদেরকে বাধা দিও না।'

ওরওয়া বিন মাসুদের আগমন

যুহরী বলেন, এরপর কোরায়শ রসূল (স.)-এর কাছে পাঠালো বনু সাকীফ গোত্রের নেতা ওরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীকে। সে বললো, শোনো কোরায়শ, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যাকেই মোহাম্মাদের কাছে পাঠাচ্ছ, সে ফিরে এলে তাকে তোমরা অনেক ভর্ৎসনা করছো ও কটু কথা বলছো। তোমরা তো জানো, আমি তোমাদের সন্তান এবং তোমরা আমার বাবা। (তার মা কোরায়শের শাখা বনু আব্দুশ শামসের মেয়ে ছিলো) তোমাদের ওপর কী বিপদ এসেছে, তা আমি শুনেছি। সে জন্যে আমার গোত্রের যারা আমার অনুগত তাদেরকে সমবেত করেছি এবং তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।' কোরায়শ বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা তোমার ওপর কোনো দোষারোপ করিনি। তারপর সে রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সামনেই বসলো। তারপর বললো, হে মোহাম্মাদ, তুমি তো বিরাট একদল মানুষ জমায়েত করে তোমারই গোত্রের লোকদেরকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছো, তাই না? তবে শুনে রাখো, কোরায়শ তোমাকে যুদ্ধে হারাতে তাদের সন্তানসম্ভবা নারী ও দুধ খাওয়ানো মায়েদেরকে পর্যন্ত সাথে নিয়ে বাঘের চামড়া পরে বেরিয়ে এসেছে। তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমাকে কোনো ক্রমেই বলপ্রয়োগে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। আল্লাহ তায়ালার কসম, হয়তো আগামীকাল আমিও তাদের সাথে থাকবো এবং তোমার কাছে তাদের উপস্থিতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে। একথা বলার সময় হযরত আবু বকর (রা.), রসূল (স.)-এর পেছনে বসেছিলেন। তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আমরা কি রসূল (স.)-কে পর্যুদস্থ হতে দেবো? ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মাদ এ লোকটি কে? তিনি বললেন, এ হচ্ছে ইবনে আবি কোহাফা। সে বললো, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমার যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন না হতো, তাহলে আমি এর প্রতিশোধ নিতাম। সেই প্রয়োজনের কারণে এটা সহ্য করলাম। এরপর সে রসূল (স.)-এর দাঁড়ি বিলি দিতে দিতে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলো। ওদিকে হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)তখন লৌহ শিরস্ত্রান পরে রসূল (স.)-এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে যখনই তাঁর দাঁড়ি বিলি দিচ্ছিলো, তখনই তিনি তার হাতে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, রসূল (স.)-এর মুখ থেকে তোমার হাত সরাও। নচেত এই অস্ত্র দিয়ে ওটা সরানো হবে।' ওরওয়া বললো, ধিক তোমাকে। তুমি কতো কর্কশভাষী! রসূল (স.) মুচকি হাসলেন, তখন ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মদ, এ ব্যক্তি কে? রসূল (স.) বললেন, এ তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শোবা। সে বললো, ওহে বিশ্বাসঘাতক! মাত্র সেদিনও তো আমি তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করেছি।'

ইবনে হিশাম বলেন, ওরওয়া তার এই কথা দ্বারা যা বুঝাচ্ছিলো তা হলো, কোনো এক বিরোধ নিয়ে মুগীরা ইসলাম গ্রহণের আগে বনু মালেক বিন সাকীফের ১৩ জনকে হত্যা করেছিলেন। এতো বনু মালেক ও মুগীরার পক্ষ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ওরওয়া দশটা দিয়ত (রক্তপণ) দিয়ে এই উত্তেজনা প্রশমিত করেছিলো ও বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন, রসূল (স.) পূর্ববর্তীদেরকে যা যা বলেছিলেন, ওরওয়াকেও অবিকল তাই বললেন। তাকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। এরপর সে কোরায়শের কাছে ফিরে গেলো। সে দেখে গিয়েছিলো যে রসূল (স.) ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি এবং তিনি থুথু ফেললে তাঁর থুথু নেয়ার জন্য তার শিষ্যরা কিভাবে পাল্লা দেয়। তার চুল পড়লেও তা নেয়ার জন্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। সে কোরায়শকে গিয়ে বললো, ওহে কোরায়শ! আমি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যার রাজ্যে পারস্য, আবিসিনিয়া ও রোমের সম্রাটের মতো দোর্দন্ড ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী। আল্লাহ তায়ালার কসম, মোহাম্মাদের সাথীরা তার যেমন আনুগত্য করে, তেমন কোনো রাজাকেও তার প্রজাদের আনুগত্য পেতে দেখিনি। আমি নিশ্চত যে, মোহাম্মাদের সাথীরা কোনো অবস্থাতেই তাকে কারো হাতে সমর্পণ করবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখো কী করবে।

রসূল (স.)–এর পক্ষ থেকে মক্কায় দূত প্রেরণ

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) তাঁর উদ্দেশ্য জানানোর জন্যে খাররাশ বিন উমাইয়া খাযায়ীকে নিজের উটে চড়িয়ে মক্কায় কোরায়শের কাছে পাঠালেন, কিন্তু রসূলের সেই উটটাকে তারা হত্যা করলো। তারা খাররাশকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আহাবিশীয়রা তা করতে দেয়নি, বরং তাকে রসূল (স.) কাছে ফিরে আসতে দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক আরো বলেন, কোরায়শ চল্লিশ বা পঞ্চাশ জনের একটা দলকে রসূল (স.)–এর বাহিনীর পাশ দিয়ে চক্কর দিতে ও সাহাবীদের কোনো একজনকে ধরে নিতে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তারা সবাই গ্রেফতার হয়ে রসূল (স.)–এর কাছে নীত হয়। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ও ছেড়ে দেন। অথচ তারা রসূল (স.)–এর বাহিনীকে লক্ষ করে পাথর ও তীর ছুঁড়েছিলো।

এরপর তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে ডাকলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে কোরায়শ নেতৃবৃন্দকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। ওমর (রা.) বললেন, হে রসূল (স.), আমি কোরায়শদের পক্ষ থেকে আমার জীবনাশংকা বোধ করছি। আমার গোত্র বনু আদির এমন কোনো লোক মক্কায় নেই যারা আমার পক্ষ নেবে। তাছাড়া কোরায়শের বিরুদ্ধে আমি যে কট্টর শত্রুতার মনোভাব পোষণ করি, তা তারা জানে। তবে আমার চেয়েও কোরায়শদের ওপর বেশী প্রভাবশালী একজনের সন্ধান আপনাকে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। অগত্যা রসূল (স.) হযরত ওসমান ইবনে আফফানকে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কোরায়শ নেতার কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পবিত্র কা'বার যেয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে এসেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, অতপর হযরত ওসমান (রা.) মক্কা চলে গেলেন। সেখানে আব্বান বিন সাঈদ ইবনুল আস তার সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাকে আশ্রয় দিলো। হযরত ওসমান (রা.) তার কাছে রসূল (স.)–এর বার্তা পৌঁছালেন। বার্তা পৌঁছানোর পর তারা হযরত ওসমানকে বললো, তুমি যদি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে চাও, তাওয়াফ করো। হযরত ওসমান বললেন, রসূল (স.) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি করবো না। অতপর কোরায়শ হযরত ওসমানকে আটক করলো। ওদিকে রসূল (স.) ও সাহাবীদের কাছে খবর পৌঁছলো যে, হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বাইয়াতুর রেদোয়ান

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ওসমান নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে রসূল (স.) বললেন, 'মোশরেকদের সাথে লড়াই না করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।' অতপর রসূল (স.) সকল মুসলমানকে বাইয়াত (অংগীকার) করার আহবান জানালেন। এটাই ছিলো গাছের নীচে বসে সম্পাদিত 'বাইয়াতুর রেদওয়ান' বা 'আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইয়াত।' এ আয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মন্তব্য ছিলো এই যে, রসূল (স.) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইয়াত করিয়েছেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, রসূল (স.) মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার বাইয়াত নয়, বরং আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্যে বাইয়াত করিয়েছেন। এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালমা গোত্রের সদস্য জাদ্দ বিন কায়েস ছাড়া আর কেউ রসূল (স.)-কে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলতেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, জাদ্দ বিন কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেলো। তারপর রসূল (স.)-এর কাছে এসে জানালো যে, হযরত ওসমানের ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে, তা মিথ্যে।

ইবনে হিশাম বলেন, রসূল (স.) হযরত ওসমানের জন্য হাতের ওপর হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক যুহরীর বরাত দিয়ে বলেন, এরপর কোরায়শ বনু আমের গোত্রের সোহায়েল বিন আমরকে পাঠালো। তাকে তারা বললো, তুমি মোহাম্মাদের কাছে গিয়ে সন্ধি চুক্তি করো। এই সন্ধিতে একথা থাকা চাই যে, মোহাম্মদ এ বছর অবশ্যই হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে যাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা থাকতে মোহাম্মাদ জোরপূর্বক মক্কায় ঢুকেছে একথা আরবরা বলাবলি করবে সেটা আমরা কখনো হতে দেব না। অতপর সোহায়েল রসূল (স.)-এর কাছে এলো। রসূল (স.) তাকে দেখেই বললেন, কোরায়শ যখন এই ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে, তখন সন্ধীর উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছে। সোহায়েল রসূল (স.)-এর কাছে এসে দীর্ঘ আলোচনা চালালো। অতপর উভয়ের মধ্যে চুক্তির সিদ্ধান্ত হলো।

যখন সন্ধির প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো এবং চুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকলো না, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ভীষণ লম্ফঝম্ফ শুরু করলেন। তিনি প্রথমে হযরত আবু বকরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

ওমরঃ হে আবু বকর, তিনি কি আল্লাহর রসূল নন?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ ওরা কি মোশরেক নয়?

আব বকরঃ অবশ্যই।

ওমরঃ তাহলে কিসের জন্যে আজ আমরা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

আবু বকরঃ হে ওমর, রসূলের আদেশ মেনে চলো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল।

ওমরঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল।

তারপর তিনি রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন,

হে রসূলুল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রসূল নন?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ ওরা কি মোশরেক নয়?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ হাঁ।

ওমরঃ তাহলে আমরা কিসের জন্যে আজ দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

রসূলুল্লাহ (স.)ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রসূল। আমি কোনোক্রমেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ লংঘন করতে পারবো না। তিনি আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না।

ইবনে ইসহাক বলেন, পরবর্তী জীবনে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, আমি সদকা দেয়া, নামায পড়া, রোযা রাখা ও দাস মুক্ত করা অব্যাহত রেখেছি, যাতে আমার সে দিনের আচরণের পাপ মোচন হয় এবং ভালো হবে মনে করে যে কথা বলেছি তার গুনাহ যেন মাফ হয়।

সন্ধি লেখার ঘটনা

এরপর রসূল (স.) হযরত আলী ইবনে তালেব (রা.)-কে বললেন, লেখো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' কিন্তু সোহায়েল বললো, এটা আমি মানি না। লেখো, বিসমিকা আল্লাহুম্মা। (অর্থাৎ তোমার নামে হে আল্লাহ) রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে, বিসমিকা আল্লাহুম্মা লেখো। হযরত আলী (রা.) তাই লিখলেন। পুনরায় তিনি বললেন, লেখো, 'এ হচ্ছে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে আল্লাহ তায়ালার রসূল মোহাম্মাদের সম্পাদিত চুক্তি।' সোহায়েল বললো, আমি যদি তোমাকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকারই করতাম, তাহলে তো তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। শুধু তোমার নাম ও তোমার বাবার নাম লেখো। অগত্যা রসূল (স.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, লেখো, 'এ হচ্ছে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি। তারা উভয়ে জনগণকে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ থেকে নিরাপত্তা দানের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এই সময়ে জনগণ নিরাপদে থাকবে। একে অপরের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। কোরায়শ থেকে যে কেউ মোহাম্মদের কাছে আসবে, তাকে কোরায়শের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর মোহাম্মদের কাছ থেকে যে কেউ কোরায়শের কাছে আসবে, তাকে কোরায়শ মোহাম্মদের কাছে ফেরত দেবে না। আমাদের ভেতরে একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। একপক্ষ অপরপক্ষের ওপর আক্রমণও করবে না, কেউ কারো সম্পদ অপহরণও করবে না এবং কেউ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করবেনা। যে ব্যক্তি মোহাম্মদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে চাইবে, হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কোরায়শের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে চাইবে, হতে পারবে। এক পর্যায়ে বনু খাযায়া গোত্রটি মোহাম্মদ (স.)-এর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। এবার তুমি মোহাম্মদ (স.) আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাবে, 'মক্কায় প্রবেশ করবে না। আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো এবং তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে প্রবেশ করবে, মক্কায় তিন দিন থাকবে, তোমাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারী থাকবে। তরবারী ছাড়া প্রবেশ করবে না।'

রসূল (স.) ও সোহায়েলের সামনে এই চুক্তি লেখা চলছে এমতাবস্থায় সোহায়েলের ছেলে আবু জান্দাল শেকলবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হলো। সে রসূল (স.)-এর কাছে পালিয়ে এসেছিলো। এ সময়ে রসূলের সাহাবীদের মানসিক অবস্থা ছিলো খুবই নাযুক। রসূলের স্বপ্নের কারণে তারা মক্কা বিজয় নিশ্চিত জেনেই মদীনা থেকে বেরিয়েছিলো। পরে যখন তারা সন্ধি হওয়া ও ওমরা না করেই ফিরে যাওয়ার বিষয়টিও বুঝতে পারলো । আরো কয়েকটা অসহনীয় ব্যাপার রসূল (স.)-কে সহ্য করতে দেখলো, তখন মুসলমানদের মন এতো খারাপ হয়ে গেলো যে, সে অবস্থাটা তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য মনে হচ্ছিলো। সোহায়েল আবু জান্দালকে দেখা মাত্রই তার দিকে ছুটে গিয়ে তার কলার টেনে ধরে চপেটাঘাত করলো তারপর সে বললো, হে মোহাম্মদ, সে আসার আগেই তোমার ও আমার মাঝে বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। রসূল (স.) বললেন, তোমার কথা সত্য। তারপর সোহায়েল আবু জান্দালকে কলার ধরে সজোরে টেনে মক্কায় নিয়ে যেতে লাগলো। আবু জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'ওহে মুসলমান ভাইয়েরা আমাকে কি মোশরেকদের কাছে ফেরত পাঠানো হচ্ছে? ওরা তো আমাকে নির্যাতন করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মনের দুঃখ ও যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেলো। রসূল (স.) বললেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ করো ও ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখো। মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য ও তোমার দুর্বল সাথীদের জন্যে অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আমরা মোশরেকদের সাথে একটা আপোস রফা করেছি এবং সে ব্যাপারে আমরা পরস্পরের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আমরা তাদের সাথে ওয়াদাখেলাপী করতে পারি না।' ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এগিয়ে গিয়ে আবু জান্দালের সাথে সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে ওমর নিজের তরবারীর মুঠো আবু জান্দালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ করো। ওরা মোশরেক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান।' ওমর (রা.) বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম যে, সে তরবারী তুলে নিয়ে তার বাবাকে আঘাত করবে।' কিন্তু লোকটা তার বাবার প্রতি দুর্বলতা দেখালো এবং চুক্তিটা কার্যকরী হয়ে গেলো।[১]

চুক্তিটা লেখা সম্পন্ন হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ও অমুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে সাক্ষী করা হলো। এই সাক্ষীরা হলেন, আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ইবনুল খাত্তাব, আব্দুর রহমান বিন আওফ, আব্দুল্লাহ বিন সোহায়েল বিন আমর, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ বিন মাসলামা, মুকাররায বিন হাফস (তিনি তখনো মোশরেক ছিলেন) ইবনে আবি তালেব। হযরত আলী (রা.) ছিলেন চুক্তিপত্রের লেখক।

যুহরী বলেন, চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা এখন ওঠো, কোরবানী করে মাথার চুল কামাও।' যুহরী বলেন, রসূল (স.)-এর আদেশে সাড়া দিয়ে কেউ উঠল না। ফলে রসূল (স.) তাঁর আদেশ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপরও কেউ উদ্যোগী হলো না দেখে রসূল (স.) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছে গেলেন। সাহাবীদের পক্ষ থেকে তিনি যে আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাকে জানালেন। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি চান সবাই কোরবানী করুক? যদি চান- তাহলে তাদের কারো সাথে আর একটা কথাও না বলে নিজের উট কোরবানী করে ফেলুন এবং আপনার চুল কামানেওয়ালাকে

(১) বর্ণিত আছে যে, আবু জান্দাল তার বাবার প্রতি দুর্বলতার কারণে নয়, বরং রসূল (স.)-এর চুক্তিরক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে তার বাবাকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছিলো।-সম্পাদক

ডেকে আনুন, সে আপনার চুল কামিয়ে দিক।' রসূল (স.) তৎক্ষণাত বেরিয়ে গেলেন, কাউকে কিছু না বলে কোরবানীর কাজটা নিজ হাতেই সমাধা করলেন এবং চুল কামানেওয়ালাকে ডাকলেন। সে তাঁর চুল কামিয়ে দিলো। সাহাবীরা যখন এটা দেখলেন, তখন তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, কোরবানী করলেন এবং তারা একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। তাদের মানসিক অবস্থা তখনো এমন ছিলো যে, তারা মনের দুঃখে ও ক্ষোভে (একে অপরের চুল কামাতে গিয়ে) একে অপরকে হত্যা করে বসতে পারেন, এমন আশাংকা দেখা দিয়েছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির দিনে কিছু মুসলমান চুল কামায় এবং মুসলমান চুল ছোট করে ছাঁটেন। এরপর রসূল (স.) বললেন, 'যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন।' সাহাবীরা বললেন, হে রসূলুল্লাহ (স.) যারা চুল ছেটেছে? তিনি বললেন, যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। সাহাবীরা আবারো বললেন, হে রসুলুল্লাহ (স.), যারা চুল ছেঁটেছে? তিনি বললেন, যারা চুল কামিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর রহমত করুন। তৃতীয়বার যখন সাহাবীরা বললেন, হে রসূল (স.), যারা চুল কামিয়েছে? তিনি বললেন, যারা চুল ছেঁটেছে তাদের ওপরও আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। তারা বললেন, হে রসূলুল্লাহ (স.), আপনি যারা চুল কামিয়েছে, তাদের জন্যে যারা চুল ছেটেছে তাদের চেয়ে বেশী রহমত কামনা করলেন কেন? রসূল (স.) বললেন, তারা সন্দেহ করেনি। (অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির যথার্থতা সম্পর্কে তারা সন্দেহ করেনি)

সূরা ফাতাহর নাযিল শুরু

যুহরী বললেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স.) যাত্রা শুরু করলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছুলে সূরা 'আল ফাতাহ'নাযিল হলো।

ইমাম আহমদ মুজাম্মা বিন হারিসা আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মুজাম্মা) বলেছেন, আমরা হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। যখন সেখান থেকে যাত্রা করলাম, লোকেরা তাদের উটগুলোকে জোরে জোরে হাকাতে শুরু করলো। তা দেখে অন্যরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ব্যাপার কি? ওরা এ রকম করছে কেন? বলা হলো, রসূল (স.)-এর কাছে ওহী এসেছে। একথা শুনে আমরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ছুটলাম। দেখলাম, কারাউল গামীমে রসূল (স.) তাঁর বাহন জন্তুটির ওপর বসে আছেন। মুসলমানরা তার চারপাশে সমবেত হলো। তিনি তাদের সামনে পাঠ করলেন, 'ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা .... ('আমি তোমাকে একটা সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি।' এ সময় জনৈক সাহাবী বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ, ওটা কি বিজয়?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আল্লাহর কসম, ওটা বিজয়।'

ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, আমরা একটা সফরে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাকে একটা কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ওহে খাত্তাবের ছেলে, তোর মরণ হোক, তুই রসূলুল্লাহ (স.)-কে তিনবার জিজ্ঞেস করলি তিনি একবারও জবাব দিলেন না! তারপর আমি আমার উটের পিঠে চড়ে বসলাম, উটকে তাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল হয় কিনা। হঠাৎ দেখলাম, একজন আমাকে ডাকছে। আমি ভাবলাম, হয়তো আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে। আমি ফিরে এলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, গতকাল আমার ওপর এমন একটা সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় ধন সম্পদের চেয়ে প্রিয়। তা হচ্ছে সূরা আল ফাতাহ। রসূল (স.) সূরার প্রথম দু'টি আয়াত পড়লেন। (বোখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

এই হলো সেই পটভূমি, যার মধ্যে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ পটভূমিতে রসূল (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সিদ্ধান্তকে নিশ্চিন্ত মনে ও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি শুধু এই ওহীভীত্তিক ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছায় ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হননি। অন্য সকল ইচ্ছা ও আকাংখাকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে ও প্রতিটি উদ্যোগে তিনি এই ঐশী সিদ্ধান্ত দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তা থেকে কারো প্ররোচনা তাকে ফেরাতে পারেনি, তাই সে প্ররোরচনা মোশরেকদের পক্ষ থেকে আসুক অথবা তার সেসব সাহাবীর পক্ষ থেকে আসুক, যাদের মন মোশরেকদের ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী দাওয়া ও জাহেলী মানসিকতা থেকে উদ্ভুত হঠকারিতাকে মেনে নেয়ায়, সন্তুষ্টি হতে পারেনি। পরে আল্লাহ তায়ালা তাদের মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা এনে দিয়েছেন। আর এর ফলে তারা সন্তোষ, প্রত্যয় ও আন্তরিকতাপূর্ণ আনুগত্যের পথে ফিরে এসে তাদের সেই ভাইদের সমান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন, যারা প্রথম থেকেই একনিষ্ঠ আনুগত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যার আত্মা এক মুহূর্তের জন্যও রসূল (স.)-এর আত্মার সাথে প্রত্যক্ষ ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও যোগাযোগ হারায়নি। এ জন্যই তাঁর মন মগয সব সময়ই স্থির ও শান্ত ছিলো এবং কখনো তা শান্তি ও স্থিরতা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এ কারণে সূরার শুরুতে রসূল (স.)-এর জন্যে এমন সু সংবাদ এসেছে, যা পেয়ে তার হৃদয় সুগভীর তৃপ্তি ও আনন্দে বিভোর হয়েছে, বলা হয়েছে আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি। যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমার আগের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করেন। (আয়াত-১- ৩)

অনুরূপভাবে, সূরার প্রথম ভাগেই মোমেনদেরকে শান্তি ও স্থিরতা প্রদান করে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমান আনয়নে তাদের অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে ক্ষমা ও সওয়াবের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৪, ৫) সেই সাথে মোশরেক ও মোনাফেকদের জন্যে নির্ধারিত আযাব ও গযবের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। (আয়াত ৬)

এরপর রসূল (স.)-এর বাইয়াত গ্রহণের উল্লেখ এবং সেই বায়াতকে স্বয়ং আল্লাহর বাইয়াত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবে মোমেনদের মনকে সরাসরি সেই আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। (আয়াত ৭- ৮-৯-১০)

আবার হোদায়বিয়ায় মোমেনদের অবস্থা প্রসংগে আলোচনা সম্পূর্ণ করার আগেই বাইয়াত ও তা লংঘন প্রসংগে বেদুইনদের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। তারা যেসব ওযর বাহানা করে বাড়ী থেকে বের হয়নি। সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি যে খারাপ ধারণা ছিলো, তা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তারা রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের জন্যে যে খারাপ পরিণতির প্রত্যাশা করতো, তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রসূল (স.)-কে তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে কি ধরনের নীতি অবলম্বন করা উচিত, সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এসব নির্দেশ এমনভাবে দেয়া হয়েছে, যা দ্বারা মোমেনদের দৃঢ়তা ও যারা অভিযানে বের হয়নি, তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এও প্রকাশ পায় যে, যারা ঈমানের দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে থাকে ও অভিযানে রসূল (স.)-এর সাথে আসেনি, তারা গনিমত ও বিজয়ের লোভে লালায়িত। (আয়াত ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃত)

এই প্রসংগে যারা অভিযানে বের হয়নি এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে অব্যাহতি দানের স্বপক্ষে একটিমাত্র গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত ওযরের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হলো,

'অন্ধের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, খঞ্জের ওপর কোনো বাধ্যকতা নেই এবং রোগীর ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' (আয়াত-১৭)

এই দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্যের পর পুনরায় মোমেনদের ও তাদের মানসিক দ্বিধাদ্বন্ধের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এ আলোচনার সবটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি, স্বচ্ছতা ও সম্মান প্রদর্শন মূলক। এতে একনিষ্ঠ ও দৃঢ় ঈমানধারী ও আত্মোৎসর্গিত মোমেনদেরকে যাবতীয় আশ্বাস বানী শোনানো হয়েছে। এ আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাদেরকে নানা রকমের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে বিভিন্ন নেয়ামতে ভূষিত করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা যখন গাছের নীচে বসে বাইয়াত গ্রহণ করছিলো। তখন তিনি তাদের ওপর খুশী ছিলেন এবং তাদের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের মনের কথা জানেন, তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাদের জন্যে সাহায্য বিজয় ও গনিমত বরাদ্দ করেছেন এবং এর সব কিছুকেই তিনি সৃষ্টি জগতের শাশ্বত নিয়ম ও বিধির সাথে সমন্বিত করেছেন।

সমগ্র সৃষ্টিজগতের অবস্থান এই বিধানেরই পক্ষে। সমগ্র সৃষ্টি এর পক্ষে সাক্ষ দিচ্ছে এবং এর পরতে পরতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে সেই বিরাট ও বিরল ঘটনা। (আয়াত ১৮ পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃতি)

সূরার শেষাংশে আল্লাহর প্রিয় সেই মহান মানব গোষ্ঠীর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাওরাত ও ইঞ্জিলেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারপর সবার শেষে তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে। (আয়াত ২৯ দ্রষ্টব্য)

এভাবে সূরার সমগ্র ভাষা খুবই স্পষ্ট প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু তার অবতরণের প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ। কোরআনের সুনির্দিষ্ট শৈল্পিক ভংগীতে এই পটভূমিকে সবচেয়ে জোরদারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন কোনো ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে না। তবে তা থেকে যথার্থ শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ এবং একটা একক ঘটনাকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মূলনীতির আওতায় প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরে। বিশেষ ঘটনাকে সংযুক্ত করে সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের সাথে, আর এক অসাধারণ পন্থা ও পদ্ধতিতে মানুষের মনকে সম্বোধন করে।

আগের সূরার সাথে এই সূরার মিল

সূরার মূল পাঠ তার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ এবং কোরআনের সংকলনী ধারাবাহিকতায় এ সূরাটিকে পূর্বেকার সূরা মোহাম্মদের সাথে তুলনা করলে বুঝা যায়, এ দুই সূরার নাযিল হওয়ার মধ্যবর্তী তিন বছরে মুসলমানদের স্বভাব চরিত্রে, আচরণে, অবস্থানে এবং আদর্শিক ও নৈতিক মানে কতো গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনই দুই সূরার নাযিল হওয়ার সময়ের পার্থক্য ও ব্যবধান স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এ দু'টি সূরার তুলনা করলে এও জানা যায় যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও রসূল (স.)-এর নির্ভুল ও নিখুঁত প্রশিক্ষণ মহানবী ও কোরআনের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠো এই সৌভাগ্যশালী মানব গোষ্ঠীটির নৈতিক মানের কতো উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং এর ফলে সুদীর্ঘ কালের মানবেতিহাসে কতো অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

আসলে সূরা 'আল ফাতাহ'-এর নাযিল হওয়ার পটভূমি ও শিক্ষা থেকে আমাদের চোখের সামনে এমন একটা দলের ভাবমূর্তি ভেসে ওঠে, যাদের মন মগযে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের উপলব্ধি যথাযথ পরিপক্কতা লাভ করেছে। যাদের ঈমানী মান প্রায় উচু পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যাদের মন ও বিবেক ইসলামের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণে পরিপূর্ণ সন্তোষ ও ব্যকুলতা সহকারে সম্মত হয়েছে। জান ও মালের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে তাদেরকে আর কোনো প্রেরণা ও উৎসাহ যোগানোর প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ যাদের আবেগ উদ্দীপনা ও জযবাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তেজস্বীতা ও দুঃসাহসিকতাকে সীমার ভেতরে সামাল দিয়ে রাখা, দাওয়াত ও আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার আলোকে কখনো কখনো শান্তি ও আপোসের স্বার্থে লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজন পড়ে।

এ সূরা যখন নাযিল হয়, তখন মুসলমানরা এতোটা অনগ্রসর ছিলো না যে, তাদেরকে (সূরা মোহাম্মদের) এ কথা বলার দরকার হবে, 'তোমরা যখন শান্তির দিকে আহ্বান জানাচ্ছ, তোমরাই যখন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদেরই সাথে রয়েছেন, তখন দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না, আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের নেক কাজগুলোকে বাতিল করবেন না। তাদেরকে (সূরা মোহাম্মদের) এ কথাও বলার আবশ্যকতা ছিলো না যে, 'তোমরাই তো সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়, অতপর তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করে ... আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে অন্য এমন এক দলকে নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।'

এ সময়ে মুসলমানদেরকে শহীদদের দৃষ্টান্ত ও আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে উচ্চ মর্যাদা বরাদ্দ করে রেখেছেন, তার উল্লেখ করে জেহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত করারও প্রয়োজন ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো না সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকর দিকগুলো বর্ণনা করার, যেমনি সূরা মোহাম্মদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লড়ায়ের এ নির্দেশ রইলো। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তোমাদের পক্ষ হতে নিজেই প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তোমাদের কতককে দিয়ে কতককে পরীক্ষা করার জন্যেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাদের সৎকাজ ব্যর্থ করবেন না। ...'

এ সূরায় বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের মনে যে স্বস্তি ও স্থিরতা নাযিল করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের আবেগ উত্তেজনাকে প্রশমিত করা এবং তাদের মনকে আল্লাহর হুকুম মানানো, আপোস মীমাংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর রসূলের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রস্তুত করা। এর পাশাপাশি সূরার শেষভাগে গাছের নীচে বসে বাইয়াত গ্রহণকারীদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টিরও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরার শেষ ভাগে রসূল (স.) ও তার সাথীদের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে!

অবশ্য এ সূরার একটা আয়াতে বাইয়াতের শর্তাবলী পূরণ ও তার লংঘনের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা তোমার কাছে বাইয়াত করে, তারা আল্লাহর কাছেই বায়াত করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত। আর যে ব্যক্তি তা লংঘন করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই লংঘন করে। ...' তবে লক্ষণীয় যে, এখানে বাইয়াত গ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বায়াতের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিতই অপেক্ষাকৃত প্রবল। বাইয়াতের লংঘন বিষয়ক কথাবার্তা বেদুইনদের পশ্চাদপসারণের প্রসংগেই এসেছে। অনুরূপভাবে মোনাফেক নারী পুরুষদের ব্যাপারেও সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া হয়েছে, যা এই গোষ্ঠীর ঈমানী

দুর্বলতার বিপরিতে মদীনার মুসলমানদের ঈমানী পরিপক্কতার প্রমাণ বহন করে। মোটকথা, এটা এতো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা সূরা মোহাম্মদের মোনাফেক সংক্রান্ত আলোচনার ন্যায় গুরুত্ব লাভ করেনি। সেখানে মোনাফেকদের ও তাদের মিত্র গোষ্ঠী ইহুদীদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, এটা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যে মানসিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যশীল একটা বহির্মুখী অগ্রগতি।

এ সূরার আয়াত ও পটভূমিতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে মুসলমানদের শক্তি ও প্রতিপত্তি মোশরেকদের শক্তি ও প্রতিপত্তির সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে গনীমত প্রাপ্তির সম্ভাবনাসকল ধর্ম ও মতাদর্শের ওপর ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। এসব কিছু থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ দুই সূরার নাযিল হবার মধ্যবর্তী মেয়াদে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

মধ্যবর্তী এই সময়টাতে মুসলমানদের মনোবলে, সামষ্টিক অবস্থায় এবং পারিপার্শিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনে নবীজীবনের যে ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করলে এ অগ্রগতি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ অগ্রগতি অত্যন্ত মূল্যবান। এর দ্বারা মুসলিম জাতি কোরআনের শিক্ষা ও নবীর প্রশিক্ষণ দ্বারা কতো লাভবান হয়েছিলো এবং তা তাদের জীবনে কতোবড় বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার ও পরিবর্তন সাধন করেছিলো তা বুঝা যায়। এই অগ্রগতি থেকে বুঝা যায়, যারা মানবীয় সংগঠনে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে, তারা কিভাবে অটুট মনোবল বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সংগঠনে কিছু লোকেরা দুর্বলতা, অপরিপক্কতা, অতীতের জড়তা ও পশ্চাদপদতা, পরিবেশের কু-প্রভাব, পার্থিব স্বার্থের মোহ এবং রক্ত মাংসের সৃষ্ট দুর্বলতা দেখে তারা ঘাবড়ে যায় না এবং তাদের মনোবল ভেংগে যায় না। সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব উপসর্গ খুবই শক্তিশালী ও প্রবল থাকে। কিন্তু অব্যাহত চেষ্টা সাধনা, প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং ধৈর্যের সাথে প্রতিকার ও নিরাময়ের চেষ্টা চালালে অবশ্যই পরিস্থিতির উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। ক্রমাগত অভিজ্ঞতা অর্জন ও দুর্ভোগ পোহানো এই উন্নতি ও অগ্রগতিকে আরো নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করে। এতে করে প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে রক্ত মাংস ঘটিত দুর্বলতা, পরিবেশের কূ-প্রভাব এবং অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে আগত জড়তা সবই দূর হয়ে যায়। মন উচ্চতর মার্গে উন্নীত হতে থাকে এবং আলোকিত পরিবেশে আল্লাহর নূরের সাক্ষাৎ পায়। কেননা আমাদের জন্যে আল্লাহর নবীর জীবনে রয়েছে সুন্দর আদর্শ এবং কোরআনের বিধানে রয়েছে নির্ভুল ও সোজা সরল পথ।

তাফসীর

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তোমার জন্যে একটা প্রকাশ্য বিজয় সূচিত করেছি, যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, তার নেয়ামতকে তোমার ওপর সম্পূর্ণ করে দেবেন এবং তোমাকে সহজ সরল সঠিক পথে চালিত করবেন।' (আয়াত ১, ২ ও ৩)

আল্লাহর রসূলের ওপর তাঁর যেক'টা বিরাট অনুগ্রহের বার্তা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সূরাটির উদ্বোধন করা হয়েছে, তা হলো প্রকাশ্য বিজয়, সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক ক্ষমা, পূর্ণাংগ নেয়ামত, চিরস্থায়ী পথনির্দেশ ও সুদৃঢ় সাহায্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত দিক নির্দেশনা পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা, তার শিক্ষা, সূক্ষ্ম আভাস ইংগিতের কাছে পূর্ণ সন্তোষ সহকারে আত্মসমর্পণ করা, সর্বপ্রকার পার্থিব কামনা বাসনাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা ও আল্লাহর সদয় তত্ত্বাবধানের প্রতি

অগাধ বিশ্বাসের প্রতিদান বা পুরস্কার হিসাবেই রসূল (স.)-কে এগুলো প্রদান করা হয়েছে। তিনি একটা স্বপ্ন দেখেই স্বপ্নের ইংগিত অনুযায়ী সক্রিয় হয়ে উঠলেন। যখন উটনী শুয়ে পড়লো এবং লোকেরা তা নিয়ে চিৎকার শুরু করলো যে, 'উটনীটা গোয়ার্তুমি শুরু করেছে', তখন তিনি বললেন, 'না সে গোয়ার্তুমি শুরু করেনি, সেটা তার স্বভাবও নয়। বরঞ্চ আবরাহার হাতিগুলো যে বাঁধা পেয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলো, ওকেও সেই বাধা থামিয়ে দিয়েছে। আজকে কোরায়শ রক্ত সম্পর্কের দোহাই দিয়ে আমার কাছে যাই চাইবে, আমি তা-ই দেবো।' হযরত ওমর (রা.) যখন আবেগোদ্দীপ্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কেন তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?' তখন তিনি জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও রসূল, আমি কোনোক্রমেই তাঁর আদেশ লংঘন করবো না। তিনি আমাকে কিছুতেই ব্যর্থ করবেন না।' আর যখন গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে তখন রসূল (স.) বললেন, 'কোরায়শের সাথে লড়াই না করে স্থান ত্যাগ করবো না।' অতপর তিনি জনগণকে (মুসলমানদেরকে) বাইয়াতের আহ্বান জানালেন। এর ফলে সেই ঐতিহাসিক 'বাইয়াতুর রেদওয়ান' সম্পাদিত হলো, যার ফলে বাইয়াতকারীরা সর্বাত্মক কল্যাণ লাভ করলেন ও সৌভাগ্যশালী হলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মুসলমানদের বিজয়

মূলত এটাই ছিলো বিজয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির আকারে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিলো, এটা তার অতিরিক্ত! হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বিভিন্ন আকারে আরো বহু বিজয় এসেছিলো। প্রথমত ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারে অভাবনীয় বিজয় সূচিত হয়েছিলো। ইমাম যুহরী বলেন, এর আগে ইসলাম কখনো এর চেয়ে বড় কোনো বিজয় অর্জন করেনি। ইতিপূর্বে মুসলমান ও মোশরেকদের যখনই কোথাও সাক্ষাৎ হতো, যুদ্ধ বেধে যেতো। যখন সন্ধি হলো, যুদ্ধাবস্থা থেমে গেলো, লোকেরা পরস্পর থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো, তখন আর সাক্ষাৎ মাত্রই যুদ্ধ বাধেনি। তখন ইসলাম, নিয়ে এখানে সেখানে আলাপ আলোচনা ও বিতর্ক চলতে থাকে। এ সময় ইসলাম নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কেউ ইসলামের কোনো বিষয় বুঝতে পারলেই ইসলাম গ্রহণ করতো। ফলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী দু'বছরে যে বিপুলসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যার সমান বা বেশী ছিলো।

ইবনে হিশাম বলেন, যুহরীর উক্তির যথার্থতার প্রমাণ হলো, রসূল (স.) যখন হোদায়বিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার চার শো। এর দু'বছর পর যখন তিনি মক্কা বিজয়ের জন্য বের হন, তখন দশ হাজার সাহাবী নিয়ে বের হন। এই সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে খালেদ ইবনে ওলীদ ও আমর ইবনুল আসরও ছিলেন।

এ বিজয় ভৌগলিকভাবেও সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। কেননা মুসলমানরা কোরায়শের দিক থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়ার কারণে রসূল (স.) ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কোরায়যা থেকে অব্যাহতি লাভ করার পর খয়বর থেকেও তাদেরকে বিতাড়িত করেন। এখানে তাদের মযবুত ঘাঁটি ও বহু দুর্গ ছিলো এবং এর কারণে মুসলমানদের সিরিয়া যাতায়াতের রাস্তা বিপন্ন ও ঝুকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। আল্লাহ তায়ালা খয়বরকে মুসলমানদের দখলে এনে দিলেন এবং তারা বিপুল ধন সম্পদ গনিমত হিসাবে লাভ করলেন। রসূল (স.) এই ধন সম্পদ শুধু হোদায়বিয়াতে যারা উপস্থিত ছিলো, তাদেরকে দিয়েছিলেন।

মদীনার মুসলমানরা মক্কার কোরায়শ ও মক্কার আশপাশে অন্যান্য মোশরেকদের সাথে সম্পর্ক ও অবস্থানের ব্যাপারেও এ বিজয় স্বার্থক প্রমাণিত হয়।

অধ্যাপক ইযযত দোরোযা তাঁর 'সীরাতুর রাসূল সুয়ারুম মুকতাবাসাম মিনাল কোরআনিল কারীম'-এ বলেন ইসলামের ইতিহাসে এটি ইসলামের শক্তিবৃদ্ধির দিক দিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কোরায়েশ সর্বপ্রথম রসূল (স.) ও ইসলামের শক্তি ও অস্তিত্ব স্বীকার করে। রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে তারা নিজেরদের সমান প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। সত্য বলতে কি, যে কোরায়শ দু'বছরের ভেতরে দু'বার মদীনা আক্রমণ করেছিলো, তারা হোদায়বিয়াতে মুসলমানদেরকে ঠেকালেও সর্বোত্তম পন্থায় তথা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঠেকিয়েছে। তারা এক বছর আগে মদীনায় সর্বশেষ যে আক্রমণ চালায়, সেটা ছিলো এক বিশাল বাহিনীর সর্বনাশা আক্রমণ। এ বাহিনীতে স্বয়ং কোরায়শ এবং তাদের সকল মিত্র গোত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ আক্রমণের লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা। এ আক্রমণ মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বেশী পেরেশান ও আতংকিত করে তুলেছিলো। কারণ আক্রমণকারীদের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য এবং তারা অস্ত্রবলেও ছিলো দুর্বল। এ জন্যে সাধারণ আরবদের মধ্যেও এর বিরাট প্রভাব পড়েছিলো। এ ঘটনায় তারা কোরায়শকে আরবের প্রধান কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী মেনে নিয়েছিলো এবং তাদের ইসলামবিরোধী নীতি দ্বারা প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত ছিলো। আর যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, বেদুইনরা ধরে নিয়েছিলো, রসুল (স.) ও মুসলমানরা এই অভিযান থেকে (হেদায়বিয়া অভিযান) নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে না, আর মোনাফেকরাও খুবই জঘন্য ধারণা পোষণ করছিলো, তখন আমাদের সামনে এই বিজয়ের গুরুত্ব ও সুদূর প্রসারী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

'ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, রসূল (স.) যা করেছেন, সে ব্যাপারে তার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত সুপ্ত প্রত্যাদেশ তথা এলহাম সত্য ও সঠিক ছিলো (অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে তার এলহামভিত্তিক সিদ্ধান্ত সঠিক ও নির্ভুল ছিলো) সেই সিদ্ধান্তকে কোরআনও সমর্থন করেছে। উপরন্তু এর দ্বারা যে বিরাট বস্তুগত, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক উপকার মুসলমানরা অর্জন করেছে, তাও পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সকল গোত্রের চোখে তারা কোরায়শের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হয়েছে। যেসব বেদুইন তাদের হোদায়বিয়া পর্যন্ত অভিযানে অংশ নেয়নি, মুসলমানরা ফিরে আসার পর তারা রসূল (স.)-এর কাছে এসে নানারকমের ওযর পেশ করতে থাকে। আর মদীনায় মোনাফেকদের আওয়াযও স্তিমিত হয়ে আসে। এই সময় দূর দূরান্ত থেকে আরবদের প্রতিনিধি দল রসূল (স.)-এর কাছে আসতে শুরু করে। রসূল (স.) খয়বর, সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানের রাস্তার আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পল্লীগুলোতে ইহুদীরা যে দাপট ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছিলো, তা চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হন। উপরন্তু তিনি নাজদ, ইয়েমেন ও বালকা প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করতে সক্ষম হন। এমনকি মাত্র দু'বছর পর তিনি মক্কায় সফল অভিযান চালাতে সক্ষম হন। এটা ছিলো চূড়ান্ত বিজয়। এরপরই নাযিল হয় সূরা আন নাসর, এই সূরায় বলা হয় 'যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং জনগণকে তুমি দলে দলে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।'

আমি পুনরায় জোর দিয়ে বলছি যে, এসব বিজয় ও সাফল্যের পাশাপাশি আরো একটা বিজয় অর্জিত হয়েছিলো, যাকে মনস্তাত্বিক বিজয় বলা যেতে পারে। 'বাইয়াতুর রেদওয়ান'-এর মধ্য দিয়ে এ বিজয় প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই বায়াতকারীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কোরআনে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং সূরার শেষ আয়াতে এই সন্তুষ্টির আলোকে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন গুণে ভূষিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মোহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সাথী তারা কাফেরদের ওপর কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল.......।'

সুতরাং এটা (হোদায়বিয়ার সন্ধি) এমন এক বিজয়, যা আন্দোলন ও বিপ্লবের ইতিহাসে নযীরবিহীন। এর অবদান অপরসীম এবং পরবর্তীকালের গোটা ইতিহাস এ দ্বারা প্রভাবিত ছিলো।

রসূল (স.) এ সূরা নাযিল হওয়ায় খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তার ওপর ও তার সহচর মোমেনদের ওপর আল্লাহ তায়ালার এ অসামান্য অনুগ্রহে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। প্রকাশ্য বিজয়, সর্বাত্মক ক্ষমা, পূর্ণাংগ নেয়ামত ও সেরাতুল মুস্তাকিমের পথ নির্দেশনা পেয়ে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন মহাপরাক্রান্ত ও মহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও মোমেনদের প্রতি তার সন্তোষের নিশ্চয়তা পেয়ে তিনি এতো আনন্দিত হয়েছিলেন যা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়, তিনি চমৎকারভাবে তা বর্ণনাও করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, রসূল (স.) বলেছিলেন, গতকাল আমার ওপর এমন সূরা নাযিল হয়েছে, যা সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের চেয়ে উত্তম।' অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, 'আজ রাতে আমার ওপর এমন এক সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যের কিরণ দ্বারা আলোকিত যাবতীয় জিনিসের চেয়ে উত্তম।' আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন পরিপুর্ণ হয়ে ওঠে। এই কৃতজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লম্বা লম্বা নামায পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, রসূল (স.) এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে উঠতো। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে ডেকে বলতেন, হে রসূলুল্লাহ, আপনি এরূপ করছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনার পুর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রসূল (স.) জবাব দিলেন, হে আয়েশা, তাই বলে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

মানসিক প্রশান্তি একটি আল্লাহর নেয়ামত

উদ্বোধনী তিনটি আয়াত ছিলো বিশেষভাবে রসূল (স.)-এর জন্য বরাদ্দকৃত। এরপর এই বিজয় দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কি কল্যাণ সাধন করেছেন ও তাদের ওপর কিরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, তাদের অন্তরে কি ধরনের প্রশান্তি এনে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে আখেরাতে কিরূপ ক্ষমা সাফল্য ও সমৃদ্ধি করে রেখেছেন, তার বিবরণ দিয়ে পরবর্তী কয়েকটি আয়াত আসছে,

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি মোমেনদের অন্তরে, প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যাতে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়'। (আয়াত ৪,৫)

'সাকীনাহ' (প্রশান্তি) শব্দটা ব্যাপক অর্থবোধক। এটি যখন আল্লাহ তায়ালা কারো অন্তরে নাযিল করেন, তখন তার অর্থ হয় নিশ্চিন্ততা, প্রশান্তি, প্রত্যয়, দৃঢ়বিশ্বাস, স্থিতি ও স্থিরতা, সন্তোষ ও আত্মসমর্পণ।

হোদায়বিয়ার ঘটনায় মোমেনদের অন্তরে নানা ধরনের ভাবাবেগ ও নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। রসূল (স.)-এর স্বপ্নের কথা শুনে তারা এই স্বপ্ন কখন স্বার্থক হবে, কখন

মাসজিদুল হারামে প্রবেশের সুযোগ আসবে, তার অপেক্ষায় ব্যাকুলভাবে প্রহর গুণছিলো। তারপর যখন কোরায়শের সিদ্ধান্ত জানা গেলো, সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে রসূল (স.) যখন এ বছরের জন্যে কা'বা শরীফে না গিয়ে ফিরে যেতে রাযি হলেন এবং এহরাম বাঁধা ও কোরবানীর জন্তু সাথে করে নেয়ার পরও এটা ঘটলো, তখন তা মেনে নিতে মুসলমানদের কষ্ট হচ্ছিলো, এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর হযরত আবু বকরের কাছে খুবই উত্তেজিত অবস্থায় এসেছিলেন। তখন তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, আমরা এ ঘটনা সংক্রান্ত প্রধান বর্ণনায় ইতিপুর্বে তা উল্লেখ করেছি, আরো কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হলো

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.) কি আমাদেরকে বলেছিলেন না যে, আমরা শীঘ্রই কা'বা শরীফে উপস্থিত হবো এবং তার তওয়াফ করবো? রসূল (স.)-এর হৃদয়ের সাথে যার হৃদয় একীভূত হয়ে গিয়েছিলো এবং রসূলের হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে যার হৃদয় স্পন্দিত হতো, সেই হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হাঁ, তবে তিনি কি তোমাকে বলেছেন যে, তুমি এ বছরই কাবায় হাযির হতে পারবে? হযরত ওমর বললেন, না।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তাহলে জেনে রেখো, তুমি সেখানে যেতে পারবে এবং তওয়াফও করতে পারবে।

এরপর ওমর (রা.) হযরত আবু বকরের কাছ থেকে রসূল (স.)-এর কাছে গেলেন। তারপর নিম্নরূপ কথোপকথন হলো,

হযরত ওমর, হে রসূল, আপনি কি বলেছিলেন না যে, আমরা কা'বা শরীফে যেতে পারবো ও তওয়াফ করতে পারবো? রসূল (স.)ঃ হাঁ, বলেছিলাম। তবে আমরা এ বছরই সেখানে যাবো, এ কথা কি বলেছিলাম?

হযরত ওমরঃ না।

রসূল (স.)ঃ নিশ্চিন্ত থাকো, তুমি সেখানে যেতে পারবে, তওয়াফও করতে পারবে।

এই কথোপকথন থেকে বুঝা যায়, কি ধরনের ভাবাবেগের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিলো মুসলমানদের মনে।

কোরায়শদের পক্ষ থেকে এ বছর ওমরা করতে না দেয়ার ব্যাপারটা মেনে নেয়া যেখানে এতো কষ্টকর ছিলো, সেখানে আরো কয়েকটা শর্ত তাদের মর্ম যাতনাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। যে ব্যক্তি মক্কা থেকে মদীনায় রসূল (স.)-এর কাছে আসবে ও ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে ফেরত দিতে হবে, 'রাহমানির রহীম' শব্দ দুটো প্রত্যাখ্যান করার জাহেলিয়াতসুলভ গোয়ার্তুমি এবং 'আল্লাহর রসূল' শব্দটা চুক্তিতে উল্লেখ করতে অসম্মতি। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ শব্দটা লেখার পর তা সোহায়ল বিন আমরের দাবী মোতাবেক মুছে ফেলতে হযরত আলী (রা.) রাযি হননি। তাই রসূল (স.) নিজে তা মুছে ফেলেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি তো জানো যে, আমি তোমার রসূল।'

সামষ্টিক বায়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মোশরেকদের সাথে লড়াই করার জন্য মুসলমানদের মনে ইসলামী জযবা ও বীরত্বের প্রচন্ড জোয়ার বহমান ছিলো। অথচ সন্ধিচুক্তি সেই জযবাকে ঠান্ডা করে দিলো এবং আপোস ও প্রত্যাবর্তন মেনে নিতে বাধ্য করলো। এটা মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিলো না যে, ব্যাপারটা এতোদূর গড়াবে। তাদের চুল কামানো ও কোরবানী দিতে গড়িমসি করার মধ্য দিয়ে মনের এই দুঃসহ অবস্থাটা ফুটে উঠেছে। এমনকি রসূল (স.)-কে এ আদেশ তিনবার দিতে হয়েছে। অথচ রসূলের আদেশের আনুগত্যে তাদের কোনো

জুড়ি ছিলো না। যেমন কোরায়শের প্রতিনিধি ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী তাদের সেই আনুগত্য ও ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখে গিয়ে তা তাদের কাছে বর্ণনাও করেছিলো। স্বয়ং রসূল (স.) কোরবানী না করা ও চুল না কামানো পর্যন্ত তারা চুল কামাতে ও কোরবানী করতে উদ্যোগী হয়নি। রসূল (স.) কথায় তাদের সক্রিয় করতে পারেননি, শুধু তাঁর কাজই তাদেরকে সক্রিয় করতে পেরেছিলো। এরপর তারা আগের মতোই আনুগত্যে ফিরে গিয়েছিলো।

মুসলমানরা মক্কা থেকে বেরিয়েছিলো ওমরার নিয়তে, যুদ্ধের নিয়তে নয়। এর জন্য তারা মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিলো না, বাস্তবভাবেও নয়। তারপর সহসা তারা কোরায়শের উগ্র নীতির মুখোমুখি হয়। হযরত ওসমানের শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পরে এবং একদল মোশরেক মুসলমানদের দলের ওপর পাথর ও তীর নিক্ষেপ করে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে যখন রসূল (স.) লড়াই এর সংকল্প করেন এবং সে জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন, তখন একযোগে বাইয়াত অংশ নেয়। তবে এ দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, তাদের মন যার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কিছুর আকস্মিক প্রয়োজন হলে মত পাল্টানো যাবে না। এটাও তাদের অনেকের বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার একটা কারণ ছিলো। এসময় কোরায়শ তাদের বাড়ীতে ছিলো। আর ১৪শ মুসলমান পথে বেরিয়ে এসেছিলো। বেদুইন ও অন্যান্য মোশরেকরা কারো পক্ষই অবলম্বন করেনি। (তাই সম্ভবত মুসলমানরা একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলো মনে করেছিলো।)

এই দৃশ্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে আল্লাহ তায়ালার এই উক্তির মর্ম বুঝা যায়, 'তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি মোমেনদের হৃদয়ে প্রশান্তি নাযিল করেছেন....' এ দ্বারা সেদিনের পরিস্থিতি ও পটভূমিও হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাদের অন্তরে শান্তি কিভাবে ফিরে এলো, তাও অনুভব করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা চাইলেই বিজয় আসে

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সেদিনকার মোমেনদের মনের প্রকৃত অবস্থা জানতেন এবং বুঝতেন যে, তাদের মনে যে ভাবাবেগের উদ্ভব হয়েছে, তা ঈমান থেকেই হয়েছে। ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধই তার উৎস। অন্য কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থও নয় এবং কোনো জাহেলী মানসিকতাও নয়, তখন তাদেরকে এই প্রশান্তি দান করেন, 'যাতে তাদের ঈমান আরো বাড়ে।' বস্তুত প্রশান্তি হচ্ছে আত্মমর্যাদাবোধ ও বীরত্বের পরবর্তী একটা ধাপ। এতে দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, যা কখনো উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয় না। এতে এমন সন্তোষ থাকে, যা বিশ্বাসের প্রভাবে শান্ত ও স্থির থাকে।

এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, বিজয় ও সাহায্য সেদিন কঠিন ও সুদূর পরাহত ছিলো না, বরং আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবী যদি এই হতো যে, মোমেনরা যা চাইছিলো, সেটাই সেদিন সংঘটিত হোক, তাহলে তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য ছিলো। কেননা আল্লাহ তায়ালার অগনিত সৈন্য সামন্ত রয়েছে, যাদেরকে কখনো পরাজিত করা যায় না। যখনই আল্লাহ তায়ালা চান, তিনি বিজয় এনে দিতে পারেন, 'আল্লাহ তায়ালার জন্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৈন্য সামন্ত, তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।' বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারাই সব কিছু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত করে থাকেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকেই 'মোমেনদের মনে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমান বেড়ে যায়।' যাতে তাদের জন্যে বরাদ্দ করা নেয়ামত ও সাফল্য বাস্তবায়িত হয়,

'যাতে তিনি মোমেনদেরকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করান, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত ...। (আয়াত ৫)

এটা যখন আল্লাহ তায়ালার বিবেচনায় বিরাট সাফল্য, তখন মাপকাঠি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এ সাফল্য পাওয়াও মোমেনদের জন্যে বিরাট সাফল্য। আল্লাহ তায়ালা সেদিন মোমেনদের জন্যে যা বরাদ্দ করেছেন, তা পেয়ে তারা অবশ্যই আনন্দিত হয়েছে। তারা সূরার উদ্বোধনী আয়াতগুলো শুনে উদগ্রীব ছিলো ও জানতে পেরেছিলো আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর কী করুণা ধারা বর্ষণ করেছেন। তারা তাদের নিজেদের প্রাপ্য সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিলো। যখন তা শুনলো ও জানলো, তখন তাদের অন্তর সন্তুষ্টি, আনন্দ ও প্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে গিয়েছিলো।

মোনাফেকদের স্বভাব

এরপর এই ঘটনায় আল্লাহ তায়ালার বরাদ্দকৃত বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ও হেকমতের আরো একটা দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন। তা হচ্ছে, তাঁর পক্ষ থেকে মোনাফেক ও মোশরেকদের অপকর্মের প্রতিফল দান,

'আর তিনি মোনাফেক নারী ও পুরুষদের এবং মোশরেক নারী ও পুরুষকে শাস্তি দেবেন ...।' (আয়াত ৬,৭)

এ আয়াত ক'টিতে মোনাফেক ও মোশরেকদের কয়েকটা সম্মিলিত বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ, মোমেনদের প্রতি তাঁর সাহায্যে অবিশ্বাস, তাদের উভয় গোষ্ঠীর ওপর অবধারিত অমংগলের আবর্তন, যা তাদের ওপর ক্রমাগত আবর্তন করতে থাকে ও পড়তে থাকে। তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার চিরস্থায়ী গযব ও অভিশাপ এবং তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ভয়ংকর খারাপ পরিণতি। কেননা মোনাফেকী এমন একটা জঘন্য দোষ, যা নিকৃষ্টতায় শেরেকের চেয়ে কোনো অংশ কম নয়, বরঞ্চ তা তার চেয়েও খারাপ। তাছাড়া মোমেনদেরকে মোনাফেকরা যতো কষ্ট দেয় ও নির্যাতন চালায়, তা মোশরেকদের নির্যাতনের চেয়ে কম নয়, যদিও তার পদ্ধতি ও প্রকারে বিভিন্নতা থাকতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকে মোনাফেক ও মোশরেকদের সম্মিলিত দোষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তখন মোমেনের মন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধারণা পোষণকারী হবে এবং সে তার কাছ থেকে সবসময় কল্যাণই কামনা করবে। সুখেই হোক, দুঃখেই হোক, আল্লাহর কাছ থেকে সে ভালোর আশাই করে। সে ঈমান রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা উভয় অবস্থায় তার কল্যাণই চান। এর নিগুঢ় রহস্য এই যে, মোমেনের অন্তর সব সময় আল্লাহ তায়ালার সাথে সংযুক্ত থাকে। আর আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে কল্যাণের স্রোতধারা কখনো বন্ধ হয় না। যখনই তার সাথে তাঁর অন্তর সংযুক্ত হয়, তখন সে এই মূল তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং এটিকে প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করে। পক্ষান্তরে মোনাফেক ও মোশরেকদের বন্ধন আল্লাহ তায়ালার সাথে ছিন্ন থাকে। তাই তারা এই তত্ত্ব কখনো উপলব্ধি করে না। ফলে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে তাদের ধারণা খারাপ হয়ে যায়, তাদের হৃদয় শুধু বাহ্যিক জিনিসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তার ভিত্তিতেই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যখনই বাহ্যিক লক্ষণাদি থেকে

খারাপ সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই তারা নিজেদের ও মোমেনদের জন্য কেবল খারাপ পরিণতিই কামনা করে। কেননা আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও আল্লাহ তায়ালার অদৃষ্ট তত্ত্বে তাদের কোনো বিশ্বাস থাকে না, থাকে না আল্লাহ তায়ালার গোপন ও সুক্ষ্ম ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের, কয়েকরকম অবস্থা ও কয়েকরকম পরিণতির উল্লেখ করেছেন। তারপর তার অসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার বিবরণ দিয়ে উপসংহার টেনেছেন।

'আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৈন্য সামন্ত। আল্লাহ তায়ালা মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।' তাই তার কাছে কোনো কিছুই দুর্বোধ্য জটিল ও দুঃসাধ্য নয়, তাঁর কাছে তাদের কোনো কিছুই অজ্ঞাত নয় এবং তার জন্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৈন্য সামন্ত, তিনি হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী।

রসূলের দায়িত্ব ও মুসলমানদের কর্তব্য

এরপর পুনরায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে সম্বোধন করেছেন, তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করেছেন, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবহিত করেছেন, মোমেনদেরকেও তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে সরাসরি তাদের বায়াতের দিকে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং যখন তারা রসূল (স.)-এর হাতে বায়াত করেছেন, তখন যে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তায়ালার কুদরাতি হাতে বায়াত করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রসূল (স.)-এর বাইয়াতকে সম্মানিত করাই এর উদ্দেশ্য।

'আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি ....।' (আয়াত ৮, ৯, ১০)

বস্তুত রসূল (স.) গোটা মানব জাতির ওপর সাক্ষী। তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তাদের কাছে যে বানী পৌঁছানোর জন্যে আদিষ্ট ছিলেন, তা পৌঁছে দিয়েছেন। অতপর তারা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফরী করেছে, আবার কেউ হয়েছে মোনাফেক। তাদের কেউ সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করেছে, আবার কেউ অরাজকতা ছড়িয়েছে। এভাবে তিনি নিজের রেসালাতের দায়িত্ব পালনের মতো সাক্ষ্য দানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি কল্যাণের, ক্ষমার, সন্তুষ্টির, অনুগত মোমেনদের শুভ প্রতিদানের সুসংবাদদাতা এবং কাফের, মোনাফেক, অরাজকতা বিস্তারকারী ও অবাধ্য লোকদের জন্য খারাপ পরিণতি, গযব, লানত ও শাস্তির দুঃসংবাদদাতা।

এই হচ্ছে রসূলের দায়িত্ব। এরপর মোমেনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের কাছে রেসালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, ঈমানের দাবী অনুযায়ী কর্তব্য পালনের চেষ্টা সাধনা করে, আল্লাহ তায়ালার বিধান ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ করে ও প্রশংসা করে। সকাল সন্ধ্যা দ্বারা পুরো দিনকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা দিনের দুই প্রান্ত পুরো দিনকেই ধারণ করে রাখে। আসল লক্ষ্য হলো, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার স্মরন মনে রাখা। এ হচ্ছে ঈমানের ফল, যা রসূলকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণের মাধ্যমে মোমেনদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়।

মোমেনদেরকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা ও তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার এমন বাইয়াত করিয়ে দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য, যা রসূল (স.)-এর তীরোধানেও বিচ্ছিন্ন হবে না। কেননা তিনি যখন তাদের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করান, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই বাইয়াত করান, 'যারা তোমার সাথে বাইয়াত করে, তারা আল্লাহ তায়ালার সাথেই বাইয়াত করে। তাদের হাতের ওপর আল্লাহ তায়ালার হাত রয়েছে।' মোমেনদের সাথে রসূল (স.)-এর বাইয়াতের এ এক অত্যন্ত মহিয়ান ও মর্মস্পর্ষী চিত্র। তাদের প্রত্যেকে অনুভব করেন যে, তাদের হাতের ওপর মহান আল্লাহ তায়ালার হাত রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বাইয়াতের সময় উপস্থিত থাকেন আল্লাহই বায়াতের আসল মালিক ও গ্রাহক। তাঁর হাত বায়াতকারীদের হাতের ওপরে। একদিকে মানুষের হাত, আর একদিকে আল্লাহ তায়ালার হাত। কী অপূর্ব ব্যাপার।

এ দৃশ্য মন থেকে বাইয়াত লংঘনের সকল চিন্তা দূর করে দেয়-চাই রসূল (স.) বিদায় হয়ে যান। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো উপস্থিত। তিনি তো কোথাও চলে যান না। এ বাইয়াত তো তিনিই নিচ্ছেন। তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক।

'অতপর যে ভংগ করবে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই ভংগ করবে।'

অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তায়ালা ও তার মাঝে সম্পাদিত লাভজনক চুক্তি ভংগ করলে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার চুক্তি বহাল থাকলে বান্দাই লাভবান হয়। আল্লাহ তায়ালার তো লাভ লোকসান কিছুই হয় না। তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ করলে বান্দা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার গযব ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। কেননা বায়াত ভংগ করাকে তিনি ঘোরতর অপছন্দ করেন ও তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তিনি ভালোবাসেন কেবল ওয়াদা পূরণকে ও ওয়াদাপূরণকারীকে।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে কৃত চুক্তি বহাল রাখে, তাকে তিনি বিরাট পুরস্কার দেবেন।'

'বিরাট পুরস্কার' বলেই ক্ষ্যন্ত থাকা হয়েছে। সে পুরস্কারের আকার বা পরিমাণের কোনো উল্লেখ নেই। সেটা এমন পুরস্কার যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাকে বিরাট বলছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মানদন্ডে, বিচার বিবেচনায় তা বিরাট, আর আল্লাহ তায়ালার বিবেচনা এতো উচচাংগের হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর মরণশীল সৃষ্টি তা কল্পনাও করতে পারে না।

দ্বীনের ডাকে যারা সাড়া দেয় না

বাইয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করা, তা পালন ও ভংগ করার পরিণতি বর্ণনা করার পর সেই সব বেদুইন আরবদের প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। যারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের সাথে অভিযানে অংশ গ্রহণ না করে বাড়ীতে থেকে গিয়েছিলো। এর কারণ ছিলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের খারাপ ধারণা এবং মোমেনদের ক্ষতি হবে ও অকল্যাণ হবে মনে করা। কেননা যে কোরায়শ দুই দুইবার মদীনার ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে, সরাসরি তাদের রাজধানী মক্কায় গিয়ে নিরাপদে ফিরে আশা মোমেনদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না বলে তারা মনে করেছিলো। রসূল (স.)-কে তাদের প্রসংগে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তিনি ও তাঁর সাথী মোমেনরা সহী সালামতে ফিরে আসার পর তারা এসে নানারকমের ওযর পেশ করবে। কোরায়শ যে রসূলের সাথে শান্তিচুক্তি করেছে, যুদ্ধ করেনি, যে শর্তের বিনিময়েই হোক তারা যে তার সাথে চুক্তি সম্পাদন

করেছে এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোরায়শ তাদের নীতি থেকে পিছু হটেছে এবং মোহাম্মাদ (স.)-কে তাদের এমন এক সমকক্ষ শক্তি বলে স্বীকার করেছে, যার শত্রুতা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করা উচিত ও যার সাথে আপোস রফা করা উচিত। এই বেদুইনরা প্রকৃতপক্ষে কোন কারণে তাদের সাথে যায়নি, তা এখানে ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) ও মোমেনদের সামনে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে যারা অভিযানে গিয়েছিলো তাদের জন্য দেয়া হয়েছে সুসংবাদ। আসল কারণ হলো, তারা নিকটবর্তী স্থান ও সহজে অর্থ সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে অবশ্যই তাঁর সাথে যেতো। এই সব পশ্চাদপসরণকারী বেদুইন আরবরা এ ধরনের সহজ ও লাভজনক অভিযানে যেতে চাইবে। সে ধরনের সুযোগ আসলে তখন তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে ও কি জবাব দিতে হবে, তা এখানে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এ ধরনের সহজ অভিযানে আর কখনো সাথে নেয়া চলবে না বরং শুধুমাত্র হোদায়বিয়া গমনকারীদেরকেই নিতে হবে। তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আরো কিছু কষ্টদায়ক অভিযানের সুযোগ আসবে। তারা যদি অভিযানে শরীক হতে চায়, তবে তখন যেন শরীক হয়। তখন তাদের ভাগ্যবরাতে আল্লাহ তায়ালা যা বরাদ্দ করেন তাই হবে। তারা যদি রসূলের আনুগত্য করে, তবে তার বিরাট পুরস্কার পাবে। আর যদি অবাধ্যতা করে, তবে তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে,

পেছনে থাকা লোকদের অবস্থা

'পিছিয়ে থাকা বেদুইনরা তোমাকে বলবে, আমাদের ধন সম্পদ ও পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিলো, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তারা মুখে যা বলে তাদের মনে তা থাকেনা ....।' (আয়াত ১১ থেকেত ১৬)

কোরআন শুধু পেছনে পড়ে থাকা বেদুইনদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ও তার জবাব দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। বরং এর সাথে সাথে অন্যান্যদের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন প্ররোচনা, দুর্বলতা ও বিপথগামিতার উল্লেখ করে তার চিকিৎসার পথ দেখিয়েছে। সেই সাথে চিরন্তন সত্য ও চিরস্থায়ী নীতিমালারও বিবরণ দিয়েছে এবং অনুভূতি ও আচরণের নীতি শিক্ষা দিয়েছে।

পিছিয়ে থাকা এসব বেদুইন গোত্রগুলো ছিলো গেফার, মোযায়না, আশজা, আসলাম প্রভৃতি। এরা সবাই মদীনার পার্শবর্তী গোত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কেননা, তারা বলবে, আমাদের ধন সম্পদ ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিলো।' এটা কোনো ওযর নয়। সব মানুষেরই ধন সম্পদ ও পরিবার থাকে। এগুলো যদি যথার্থই ঈমানী কর্তব্য পালনে বাধা দিতো তাহলে কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারতো না। তারা আরো বলবে, 'আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' অথচ তারা ক্ষমা প্রার্থনায় আন্তরিক নয়। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলে দিচ্ছেন, 'তারা মুখে তাই বলে যা তাদের মনে থাকে না।'

অতপর সেই অবধারিত লাভ বা ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে, যা থেকে পেছনে পড়ে থাকলেও বাঁচা যায় না কিংবা এগিয়ে গেলেও অর্জন করা যায় না। সেই আল্লাহ তায়ালার শক্তির কথা বলা হচ্ছে, যা সকল মানুষকে ঘেরাও করে রেখেছে এবং তাদের ভাগ্য বরাদ্দকে যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি করেন। সেই পূর্ণাংগ খোদায়ী জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, যার আলোকে তিনি তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, 'বলো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষতি বা কল্যাণ করতে চাইলে তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত থেকে কে বাঁচাবে?

এই প্রশ্নের মাঝে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত তাকদীরের কাছে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্যের ভাবটি ফুটে উঠেছে। কারণ, দ্বিধা দ্বন্দ্ব কখনও অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না এবং মঙ্গলকে পিছিয়েও দিতে পারে না। তাছাড়া মিথ্যা ওজুহাত দাঁড় করিয়েও কোনো লাভ হয় না। কারণ, আল্লাহ তায়ালার কাছে কোনো কিছুই অজানা নয়। তাই এসব ওজুহাত তাঁর বিচারকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তিনি নিজের অপার জ্ঞান অনুসারে ন্যায্য বিচারই করবেন। বলা বাহুল্য, কোরআনের এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দান করা। সময়, পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে এ জাতীয় উপদেশ দান করা পবিত্র কোরআনের নিজস্ব একটা নিয়ম।

মোনাফেকদের ধ্বংসের কারণ

আয়াতে বলা হয়েছে, 'বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মোমেনরা তাদের বাড়ী ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিলো' (আয়াত ১২)

এখানে অত্যন্ত নগ্নভাবে ও জনসমক্ষে ওদের মনের গোপন কথাটি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ওদের কুধারণাটি প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। ওদের ধারণা ছিলো, আল্লাহ তায়ালার রসূল ও তাঁর সাহাবীরা মরণ ফাঁদের দিকে পা বাড়াচ্ছে। কাজেই, তারা আর কখনও মদীনায় আপনজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। ওদের ভাষ্য হলো, যাদের সাথে লড়াই করে নিজেদের ভিটেমাটি মদীনায়ই মার খেতে হয়েছে, তাদের সাথেই আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে ওরা!.... একথা বলে ওরা ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের কথাই বুঝাতে চেয়েছে। কিন্তু কথাটি বলতে গিয়ে ওরা ভুলেই গিয়েছিলো যে, যারা আল্লাহ তায়ালার খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দা, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নযর থাকে। তাছাড়া ওদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়ার কারণে এবং ওদের অন্তর ঈমান ও বিশ্বাসের উষ্ণতাশূন্য হওয়ার ফলে তারা অনুধাবনই করতে পারেনি যে, দায়িত্বের বোঝা যতো ভারীই হোকনা কেন, দায়িত্ব দায়িত্বই। আল্লাহ তায়ালার রসূলের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে এ দায়িত্বভার বহন করতেই হবে। এখানে বাহ্যিক লাভ লোকসানের হিসেব কষলে চলবে না। দায়িত্ব যখন এসেই গেছে তখন এর পরিণামের দিকে না তাকিয়ে তা পালন করতেই হবে।

ওরা নিজেদের মতো করেই এই ধারণা করেছিলো। তাদের এই ধারণা এতো প্রবল ছিলো যে, অন্য কিছু দেখার বা ভাবার ফুরসৎ হয়নি ওদের। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করার দৃষ্টান্ত। ওদের অন্তরলোক উজাড় ও শুন্য বলেই ওরা এ জাতীয় ধারণা পোষণ করতে পেরেছে। এই বর্ণনা ভঙ্গীটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময়। এখানে শূন্য ও পতিত জমির সাথে ওদের হৃদয়ের শূন্যতাকে তুলনা করা হয়েছে। ওদের অন্তরই কেবল শূন্য নয়, বরং ওদের গোটা অস্তিত্বই শূন্য ও মৃত। তাতে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, উর্বরতা নেই, নেই কোনো সারবত্তা। যে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধারণা নেই, সে অন্তর শূন্য হবে না তো কি? কারণ, এ জাতীয় অন্তর পরমাত্মার সাথে যোগসূত্রহীন। কাজেই তা শূন্য, মৃত এবং এর পরিণতি ধ্বংস ও বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোমেনদের দুঃসময়ে মোনাফেকদের ভূমিকা

মোমেনদের সম্পর্কে যারা এ জাতীয় ধারণা পোষণ করে তাদের হৃদয়ও বেদুইন সম্প্রদায়ের মত পরমাত্মার সাথে সম্পর্কহীন। এদের অন্তরও শূন্য ও মৃত। এই শ্রেণীর লোকেরা মোমেনদের

সম্পর্কে সবসময় এই ধরনের ধারণাই পোষণ করে থাকো বিশেষ করে যখন বাতিলের পাল্লাকে ভারী দেখতে পায়, পৃথিবীর বাহ্যিক শক্তিকে ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট লোকদের অনুকূলে দেখতে পায় এবং মোমেনদেরকে সংখ্যা বা প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে দুর্বল দেখতে পায় তখন এমন খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকে, আর তাই তখনকার যুগের বেদুইনরা এবং তাদের বর্তমান যুগের প্রেতাত্মারা যখনই মোমেনদেরকে বাহ্যিক শক্তি ও বাহাদুরীতে মত্ত কোনো বাতিল সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হতে দেখেছে– তখনই তাদের সম্পর্কে এই জাতীয় ধারণা পোষণ করেছে। শুধু তাই নয়, বরং নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে তখন তারা মোমেনদের সংশ্রবও ত্যাগ করে তারা ভাবতে থাকে এই বোকার দল তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের দাওয়াতী কাজও শেষ হয়ে যাবে, এ কারণে তারা এই ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের এই ভুল ধারণা ব্যর্থ করে দেন, এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। কারণ, ক্ষমতার পাল্লা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার শক্ত মুঠোর মাঝে রয়েছে। তাই তিনি কখনও কোনো জাতিকে উর্ধে তোলেন, আবার কখনও অধপতিত করেন। এই সত্যটি কেবল সেই মোনাফেক গোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পারে না।, যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে না।

ক্ষমার সঠিক মানদন্ড

পরবর্তী আয়াতে পরকালে ক্ষমার মানদন্ড কি হবে সেদিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তায়ালারই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।' (আয়াত ১৩-১৪)

ওরা জায়গা জমি ও ছেলে মেয়ের বাহানায় জেহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি যদি ওদের ঈমানই না থাকে তাহলে পরকালের সেই কঠিন শাস্তির সময় এসব জায়গা জমি ও ছেলেমেয়ে তাদের কোন কাজে আসবে? এখন কোন পাল্লাটি তারা গ্রহণ করবে সেটা সম্পূর্ণভাবে তাদের বিশ্বাসের ব্যাপার। তবে পরকালে কার কি পরিণাম হবে সে সম্পর্কে যিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানাচ্ছেন তিনি কিন্তু এই আসমান ও যমীনের একক মালিক। কাজেই তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এই অধিকার ও ক্ষমতা তাঁর আছে।

এটা ঠিক যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের আমল অনুসারেই তাকে প্রতিদান দেবেন। তবে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। তিনি কারও কাছে দায়বদ্ধ নন। এ সত্যটি তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিচ্ছেন যেন তা মানুষের মনে গেঁথে যায়। তাই বলে আল্লাহ তায়ালার এই স্বাধীন ইচ্ছা কর্মের ওপর ভিত্তি করে প্রতিদান নির্ধারণ করার নীতির বিপরিত নয়। বরং তার প্রতিদান নির্ধারণের এই নীতিও সে স্বাধীন ইচ্ছারই আওতাধীন।

আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়া হচ্ছে অত্যন্ত কাছের বস্তু। কাজেই যারা এই ক্ষমা ও দয়া লাভ করতে চায় তাদেরকে এখনই সে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় পরকালে কাফেরদের জন্য জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তাদের সেই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে কারণ এটা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা। এই ওয়াদা পূরণ করা হবেই।

খয়বর বিজয় সম্পর্কিত কথা

পরের আয়াতে মোমেনদের জন্যে কি উত্তম প্রতিদান রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এমন বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে যা সেই প্রতিদানকে খুব নিকটের বলে প্রকাশ করছে।

যেমন, 'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলো, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ তায়ালার কালাম পরিবর্তন করতে চায় ....।' (আয়াত ১৫)

অধিকাংশ মোফাসসের মনে করেন আলোচ্য আয়াতটি খয়বর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই যুদ্ধ হোদায়বিয়া সন্ধির কিছুকাল পরেই সংঘটিত হয়েছিলো, অর্থাৎ সপ্তম হিজরীর মোহাররম মাসে। হোদায়বিয়া সন্ধি এই যুদ্ধের দেড় দুই মাস আগে স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। এই যুদ্ধে প্রচুর পরিমানে গনিমতের মাল পাওয়া গিয়েছিলো। খয়বরের কেল্লাগুলো আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত ইহুদী সম্প্রদায়ের সর্বশেষ আশ্রয় কেন্দ্র ছিলো। এই কেল্লাগুলোতেই বনু নাযীর ও বনু কোরাইযা নামক দু'টো ইহুদী গোত্রের লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিলো।

মোফাসসেরদের এই রায়টি ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে যে, যারা হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় বাইয়াত গ্রহণ করেছিলো তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা খয়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মালামাল এককভাবে দান করার ওয়াদা করেন। অবশ্য আমি এই রায়ের পক্ষে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাইনি। তবে প্রকৃত ঘটনা তখন যা ঘটেছিলো, খুব সম্ভবত সেটার ওপর ভিত্তি করেই মোফাসসেররা উল্লেখিত রায়টি গ্রহণ করেছেন। কারণ গনিমতের গোটা মালামালই রসূলুল্লাহ (স.) হোদায়বিয়ায় বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবাদের মাঝে বন্টন করে দেন, তাতে আর কাউকে তিনি শরীক করেননি।

যা হোক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে বেদুইন নও মুসলিমদের বক্তব্যের জবাব দিতে বলেছেন। সাথে সাথে তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, গনিমতের মালামালের লোভে প্রকৃত ও নিবেদিতপ্রাণ মোমেনদের সাথে যাওয়ার জন্য তারা যে আবদার করছে তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের পরিপন্থী। রসূলকে আরো জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ওদেরকে যেতে নিষেধ করা হলে ওরা বলে উঠবে, 'তোমরা আমাদের সাথে হিংসা করছো, তোমরা চাওনা আমরা গনিমতের মালের কোনো হিস্যা পাই।' আল্লাহ তায়ালা ওদের এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এই বক্তব্য মূলত আল্লাহ তায়ালার হেকমত ও তকদীর সম্পর্কে ওদের অজ্ঞতার কারণেই এসেছে। অন্যথায় ওদের জানা উচিত ছিলো, জেহাদের ময়দানে যারা কেবল গনিমতের মালামালের জন্য লালায়িত থাকে তারা আল্লাহ তায়ালার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়, আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করে এবং সব ধরনের লোভ লালসার উর্ধে থাকে তারাই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়, তাদের ভাগ্যেই গনিমতের মাল জোটে। কারণ, জেহাদের ময়দানের কঠিন মুহূর্তগুলো তাদের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে কোনোরূপ পিছপা হয়নি।

মোমেনদের জন্যে আল্লাহর পরীক্ষা

এরপর ওদেরকে একটি বিষয় জানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন। বিষয়টি হলো, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকগুলোকে একটা দুর্ধর্ষ জাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তাদের পরীক্ষা নেবেন। এই পরীক্ষায় তারা যদি সফলতা দেখাতে পারে তাহলে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, আর যদি পুনরায় তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে এবং জেহাদ থেকে পিছিয়ে থাকে তাহলে এটাই হবে তাদের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষা। এ প্রসঙ্গে আয়াতে বলা হয়েছে, 'ঘরে বসে থাকা মরুবাসীদের জানিয়ে দাও, আগামীতে

তোমাদের এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাকা হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন করো, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। ...... (আয়াত ১৬)

এই দুর্ধর্ষ জাতি বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়, এরা কি রসূলের যুগের কোনো জাতি, না খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের কোনো জাতি, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে খুব সম্ভবত এরা রসূলের যুগের কোনো জাতিই ছিলো। পরীক্ষাস্বরূপ এদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করার জন্য তৎকালীন মদীনার আশেপাশে মরুবাসীদেরকে আহ্বান করা হয়েছিলো।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো তা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পদ্ধতি। এখানে দুর্বল চিত্তের লোকদের চিকিৎসার জন্য একটা মোক্ষম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। একদিকে রয়েছে উপদেশ ও নির্দেশ, আর অপরদিকে রয়েছে বাস্তব পরীক্ষা। এর মাধ্যমে ওদের মনের প্রকৃত অবস্থা ওদের কাছেও ধরা পড়বে অনুসরণীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ, সঠিক আচরণবিধি এবং ঈমানী চেতনারও সন্ধান পাবে।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সবাইকে জেহাদের জন্য বের হওয়াটা সে পরীক্ষার অন্যতম দাবী ছিলো। তাই পরবর্তী আয়াতে সেই সব লোকের কথা বলা হচ্ছে যাদের জন্য বাস্তব অসুবিধার কারণে বাড়ীতে অবস্থান করা বৈধ হবে। এ কারণে তাদের কোনো পাপও হবে না এবং কোনো অপরাধ নেই। বলা হয়েছে যে কেউ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্না প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।' (আয়াত ১৬)

যারা অন্ধ ও খঞ্জ তাদের অপারগতা স্থায়ী। অপরদিকে যারা অসুস্থ, তাদের অপারগতা অস্থায়ী। কাজেই এই শ্রেণীর লোকদের জন্য জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে।

এখানে জেহাদের যে নির্দেশ এসেছে তাতে দু'টো দিকই রয়েছে, একটি হচ্ছে নির্দেশটি পালন করা, আর অপরটি হচ্ছে নির্দেশটি পালন না করা। উভয় দিকই মূলত মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। কাজেই যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের নির্দেশ পালন করবে, তারা জান্নাত লাভ করবে। অপরদিকে যারা নির্দেশ পালন করবে না, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। কাজেই এখন তারা নিজেরাই তুলনা করে দেখুক, জেহাদের কষ্টের পর যে উত্তম প্রতিদান লাভ করা যাবে সেটা লাভ– না জেহাদের না গিয়ে ঘরে বসে আরাম আয়েশ করার পর যে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, সেটা ভালো। এখন তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে তারা কোনটি গ্রহণ করবে।

এই গোটা পর্বটি মোমেনদের সম্পর্কে ও মোমেনদের সাথে আলোচনায় পরিপূর্ণ। এই সৌভাগ্যবান দলটি হচ্ছে তাদের যারা গাছের নীচে বসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে হাত দিয়ে আনুগত্য ও সাহায্যের শপথ নিয়েছিলেন। শপথ গ্রহণের এই দৃশ্যটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দেখেছেন। তিনি এর সাক্ষী ছিলেন এবং এর অনুমোদন ও সত্যায়নকারীও তিনিই ছিলেন। যেন তিনি নিজে তাদের হাতের ওপর হাত রেখে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। এই সৌভাগ্যবান দলটি হচ্ছে তাঁদের যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে শপথ করলো। আল্লাহ তায়ালা অবগত

ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিলো। ...... (আয়াত, ১৮) তখন এদের সম্পর্কে তিনি বলে উঠলেন, 'আজ তোমরাই হচ্ছ পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম'। (বোখারী বর্ণিত হাদীস ১৬৮৫)

এই সৌভাগ্যবান দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের সাথে আলাপ করছেন। আবার সাথে সাথে সেই দলটির সাথেও আলাপ করছেন। এই আলাপের মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, তাদের জন্য কোন কোন বিজয় ও কি কি মাল সম্পদ রাখা হয়েছে, এই যুদ্ধ যাত্রায় তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কি কি সাহায্য সহযোগিতা রয়েছে এবং সবশেষে তাদের জন্যে কোন বিজয়ের আনন্দ রয়েছে। এই আলাপের মাধ্যমে তিনি কাফের গোষ্ঠীর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন এবং সে বছর সন্ধি ও আপোস করার পেছনে নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে আরও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মাসজিদুল হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত রসূলের স্বপ্ন সত্য হবে এবং মোমেনরা নিরাপদে ও নির্ভয়ে সেখানে প্রবেশ করবে। শুধু তাই নয়, বরং গোটা বিশ্বে তাঁর মনোনীত একমাত্র এ বিধানের বিজয় অবশ্যই হবে।

পরিশেষে এই সৌভাগ্যবান ও অনন্য দলটির পরিচয় ও গুণাবলী তুলে ধরা হচ্ছে। এসব গুণাবলী নতুন কিছু নয়, বরং এর উল্লেখ পূর্ববর্তী আসমানী কেতাব তাওরাতেও এসেছে। এরপর তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির সনদপত্র

আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে শপথ করলো ....।'

আজ আমি চৌদ্দশত বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই শুভ ও পবিত্র মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করছি, যে মুহুর্তটি সেদিন গোটা সৃষ্টিজগত প্রত্যক্ষ করেছিলো। কারণ, এই মুহূর্তেই সৌভাগ্যবান মোমেন দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে এই মহা সুসংবাদটি জানিয়েছিলেন। সে মুহূর্তে গোটা সৃষ্টিজগত এবং এর সুপ্তবিবেক তথা সৌভাগ্যবান মোমেন দলটি সম্পর্কে উচ্চারিত ঐশী শুভ সংবাদে কতটুকু উদ্বেলিত হয়েছিলো সেটাও আমি অনুভব করার চেষ্টা করছি। শুধু তাই নয়, বরং খোদ সে সৌভাগ্যবান দলটির মনের অবস্থাও অনুভব করার চেষ্টা করছি- যারা নিজ কানে সে ঐশী সংবাদটি শুনছিলো এবং বুঝতে পেরেছিলো যে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে ঘোষণা দিচ্ছেন তারা অন্য কেউ নয়, স্বয়ং তারাই। এই শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থান ও অবস্থার বিবরণও দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে শপথ করেছিলো।' ...... শুভ সংবাদ তারা অন্য কারো কাছ থেকে শুনেনি, বরং শুনেছিলো তাদের সত্য ও সত্য বলে ঘোষিত নবীর কাছ থেকে, আর তিনি সংবাদটি পেয়েছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে।

এই ঐশী শুভ সংবাদটি গ্রহণ করার আনন্দঘন মুহূর্তে সেই সৌভাগ্যবান দলের অবস্থা কি ছিলো তা কি আপনারা বলতে পারবেন? সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা নিজেই যেন তাদের প্রত্যেককে ইংগিত করে বলছিলেন, তুমিই সেই ব্যক্তি যার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমিই গাছের নীচে রসূল (স.)-এর কাছে শপথ নিয়েছিলে, তোমার অন্তরের খবর আমি জানি, তাই তোমার প্রতি আমি শান্তি বর্ষণ করেছি।

আমরা যখন পাঠ করি, 'আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বন্ধু' তখন খুশী হয়ে চিন্তা করি এবং কামনা করি আমরা যেন মোমেনদের দলে শামিল থাকতে পারি। আবার যখন পড়ি, 'নিশ্চয়ই

আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন'.... তখন আমাদের আনন্দ আসে এবং মনে মনে বলি, আমরা কি সে ধৈর্যশীলদের দলভুক্ত হওয়ার আশা করতে পারি না? অপরদিকে সৌভাগ্যবান মোমেন দলটির প্রত্যেকেই সুনিশ্চিতভাবে জেনে গিয়েছিলো যে, ঐশী শুভসংবাদে খোদ তাদের কথাই বলা হয়েছে এবং জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের প্রত্যেকের প্রতিই আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়েছেন ও তাদের অন্তরের উদ্দেশ্য ও বাসনা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

কি মহান সে ঘটনা!

আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের অন্তরে কী ছিলো, তা তিনি জেনেছিলেন' ......অর্থাৎ দ্বীনের প্রতি তাদের যে দরদ ছিলো সেটা তিনি জানতে পেরেছিলেন এবং উস্কানি ও উত্তেজনাকর মুহূর্তে তাদের মাঝে যে সংযম ও ধৈর্য ছিলো সেটাও তিনি জানতে পেরেছিলেন। রসূল (স.)-এর নির্দেশ পালন কবতে গিয়ে তারা যে সাহসিকতা, সংযমশীলতা ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলো সেটাও তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'তাদের প্রতি তিনি প্রশান্তি বর্ষণ করলেন' এখানে প্রশান্তিকে বৃষ্টির রূপে দেখানো হয়েছে যা তাদের প্রতি ধীরে ধীরে, নিশব্দে ও অনুত্তাল ধারায় বর্ষিত হচ্ছে এবং তাদের তেজদীপ্ত, উদ্দীপিত, উত্তেজিত হৃদয়কে সিক্ত করে তাতে শীতলতা শান্তি, স্থিতি ও অনাবিল আনন্দের ধারা প্রবাহিত করছে।'

বিজয়ের সুস্পষ্ট ওয়াদা

এরপর বলা হয়েছে, এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন' ....। এখানে প্রথমে হোদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এই সন্ধির মাধ্যমেই তাদের কাংখিত বিজয়ের সূচনা হয়েছিলো। এই বিজয়ের একটি হচ্ছে খায়বার যুদ্ধের বিজয়। এই বিজয়কেই অধিকাংশ সূচনা হয়েছিলো। এই বিজয়ের একটি হচ্ছে খয়বর যুদ্ধের বিজয়। এই বিজয়কেই অধিকাংশ মোফাসসেররা 'আসন্ন বিজয়' এর ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হোদায়বিয়া সন্ধির পর পরই আল্লাহ তায়ালা এটা মোমেনদেরকে দান করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে' .... এই বিপুল পরিমাণের যুদ্ধলব্ধ মালামাল হয় তারা বিজয়ের সাথে সাথে লাভ করবে। (যেটা খায়বার যুদ্ধের সময় তারা লাভ করেছিলো) অথবা হোদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তীকালে লাভ করবে। যদি এখানে বিজয় বলতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এই হবে তার অর্থ। কারণ, এই সন্ধির পর মুসলমানরা বেশ কিছু যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে পেরেছিলো ফলে তাদের পক্ষে একাধিক যুদ্ধে বিজয় লাভ করার সুযোগ হয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' এই মন্তব্যটি পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মর্মার্থের সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, সন্তুষ্টি, বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ মালামালের প্রতিশ্রুতির মাঝে শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তদ্রূপ এসব বিষয়ে প্রজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও প্রকাশ পায়। কারণ এ দু'টো গুণ না থাকলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারতেন না।

আগের আয়াতগুলোতে রসূলের হাতে হাত মিলিয়ে শপথ গ্রহণকারী সৌভাগ্যবান মোমেনদের সম্পর্কে রসূলকে অবহিত করার পর এখন স্বয়ং সেই মোমেনদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তায়ালা কথা বলছেন, এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করছেন এবং সেই বিজয় সম্পর্কেও আলোচনা করছেন, যে বিজয় লাভ করতে গিয়ে তাদেরকে ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছিলো। আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন ....। (আয়াত ২০-২১)

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষিত এই শুভসংবাদটি মোমেন বান্দারা নিজ কানে শুনেছিলো এবং তা তারা বিশ্বাস করেছিলো। এর মাধ্যমে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য বিপুল পরিমাণের যুদ্ধলব্ধ মালামাল ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছেন। যতোদিন তারা জীবিত ছিলো ততোদিন তারা এই ওয়াদার সত্যতার প্রমাণ নিজ চোখে দেখেছে। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সে যুদ্ধলব্ধ মালামাল অতিসত্বরই দান করবেন। তাই বলা যায়, হোদায়বিয়ার সন্ধিই এখানে তাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ মালামালহিসেবে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে এই ব্যাখ্যাটিই বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাও তাই সাক্ষ্য দেয় এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)-এর একটি হাদীসও এই মতটিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিপূর্বে হাদীসটি আমরা উল্লেখ করেছি। অথবা বলা যায়, যুদ্ধলব্ধ এই মালামাল বলতে খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে লব্ধ মালামাল বুঝানো হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটা মত বিশিষ্ট তাবেয়ী মোজাহেদ এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, হোদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে কাছাকাছি যুদ্ধটি ছিলো খায়বার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল লাভ করেছিলো। তবে প্রথম মতটিই সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের প্রতি তাঁর অন্যতম কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে বলছেন যে, তিনি তোমাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আসলেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে মক্কার মোশরেকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী আরো অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকেও তিনি তাদেরকে রক্ষা করেছেন। শত্রুদের তুলনায় তাদের সংখ্যা সব সময়ই কম ছিলো। কিন্তু তা সত্তেও তারা নবীর সাথে করা শপথ পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বও পুরোপুরি পালন করেছে। আর তাই আল্লাহ তায়ালা ও তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে, 'যাতে এটা মোমেনদের জন্য একটা নিদর্শন হয়' .... অর্থাৎ যে হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রথম তাদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়েছিলো এবং তাদের মনের ওপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেটা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পরবর্তীতে সেটা তাদের জন্য একটা নিদর্শন হয়ে থাকবে এবং এর মাঝেই তাদের শুভ পরিণতি ও উত্তম প্রতিদান নিহিত থাকবে। যেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি তাদের আনুগত্য ও আত্মনিবেদন প্রকাশ পাবে, তাই এর পরিণতি ও প্রতিদান শুভ হবে উত্তম হবে। এই সত্যটি জানার পর তাদের মনে শান্তি বিরাজ করবে, স্থিতি ফিরে আসবে এবং বিশ্বাস ও আস্থা জন্মাবে।

আলোচ্য আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে, এবং তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন' .... অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, সততা ও নিষ্ঠার প্রতিদানস্বরূপ তোমাদেরকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করবেন, আর এভাবেই তারা নিজেদের আনুগত্য ও সততার প্রতিদানস্বরূপ গনীমতের মালামালও লাভ করবে এবং সৎ পথের সন্ধানও পাবে। ফলে সবদিক থেকেই তারা লাভবান হবে। এর দ্বারা বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা একথাই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাঁর ইচ্ছা ও পছন্দই হচ্ছে চূড়ান্ত, আর বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে এই ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং তা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো একটি সুসংবাদ

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আর একটি অনুগ্রহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আর সেটা হচ্ছে একটি বিজয়ের সুসংবাদ। এই বিজয় লাভ করা মোমেনদের ক্ষমতাবলে সাধ্যাতীত ছিলো। কিন্তু

আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে এবং নিজ শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের জন্যে এ বিজয়টি এনে দেন। আয়াতের নিজস্ব ভাষায় বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তায়ালা তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (আয়াত ২১)

আলোচ্য আয়াতে কোনো বিজয়টির কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন, এটি হলো মক্কা বিজয়ের ঘটনা। কেউ বলেন, খায়বার বিজয়ের ঘটনা। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা পারস্য ও রোম বিজয়ের সুসংবাদ। আবার অনেকে মনে করেন, এর দ্বারা হোদায়বিয়া সন্ধি পরবর্তী সকল বিজয়ের কথাই বুঝানো হয়েছে।

তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রায়টি হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। কারণ, মক্কা বিজয়ের ঘটনা এই সন্ধি চুক্তি লংঘন করার কারণেই ঘটেছিলো। উল্লেখ্য যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি দুই বছরের বেশী টিকেনি। দুই বছরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই মুসলমানরা মক্কা জয় করে নেয়। অথচ এই মক্কা জয় করা ছিলো তাদের জন্য একটা কঠিন বিষয়। এই মক্কাতেই তারা কাফেরদের আক্রমণ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলো। হোদায়বিয়ার সন্ধির বছরে সেখান থেকেই তাদেরকে ফিরে আসতে হয়েছিলো। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই মক্কাকে যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দেন। কারণ, তিনি সব কিছুই পারেন এবং সব কিছুই তাঁর ক্ষমতার আওতাধীন। আসলে এখানে সুসংবাদটিকে রহস্যময় করে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট করে ও খোলাসা করে কিছুই বলা হয়নি। কারণ, এই সুসংবাদসম্বলিত আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন বিষয়টি ছিলো সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্য। কাজেই এখানে সেটা আকারে ইংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ফলে বিষয়টির প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জন্ম নেবে। সাথে সাথে মোমেনদের অন্তরে একধরনের সান্ত্বনা ও প্রশান্তিও জন্ম নেবে। হোদায়বিয়া সন্ধির ফলে মোমেন বান্দারা তাৎক্ষণিকভাবে এবং ভবিষ্যতে কি কি ফল লাভ করবে তা উল্লেখ করার পর প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এই চুক্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মোমেনদেরই বিজয় হয়েছে। তারা দুর্বল এবং প্রতিপক্ষ শক্তিশালী বলে এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিপক্ষ কাফেরের দল যদি মোমেনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো তাহলে সেই কাফেরের দলই হেরে যেত। কারণ, এটাই আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন নিয়ম। যখনই কোনো চূড়ান্ত মুহূর্তে মোমেন ও কাফেররা মুখোমুখি হয়েছে তখনই এই নিয়ম অনুসারে কাফেরদের পরাজয় ঘটেছে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো, তবে অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালিয়ে যেতো। তখন তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতো না। এটাই আল্লাহ তায়ালার নীতি যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। তুমি আল্লাহ তায়ালার নীতিতে আদৌ কোনো পরিবর্তন পাবে না।' (আয়াত ২২-২৩)

আর এই অপরিবর্তনীয় নীতির ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়েছে মোমেনদের বিজয় ও কাফেরদের পরাজয়। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এই নীতিটি যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছিলো তখন মোমেনদের অন্তরে কি ধরনের বিশ্বাস, আস্থা ও প্রশান্তি জন্ম নিয়েছিলো?

হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে চিরন্তন ও শাশ্বত নীতি। তবে এর বাস্তবায়নে মাঝে মধ্যে বিলম্ব ঘটে থাকে। এর পেছনে অবশ্য অনেক কারণ থাকতে পারে। এই কারণ কখনও সঠিক পথ ও সঠিক

নীতির ওপর অটল থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। আবার কখনও মোমেনদের বিজয় আর কাফেরদের পরাজয় নিশ্চিত করার মতো পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বা না করার সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে। এসব কারণ সম্পর্কে সঠিকভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন। তবে আল্লাহ তায়ালার এই শাশ্বত ও চিরন্তন নিয়মের ব্যত্যয় অবশ্যই ঘটে না। কারণ আল্লাহ তায়ালার কথা কখনও অসত্য হতে পারে না। আর তিনিই বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালার নীতিতে তুমি কখনও পরিবর্তন পাবে না।'

আল্লাহ তায়ালার আরেকটি অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সামনে তাঁর আর একটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছেন, আর সেটা হলো, কাফেরদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা আল্লাহর ওয়াদা। এটা ঘটেছিলো কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর যখন মোমেনদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয়ী করেছিলেন তখন। এই আয়াত দ্বারা মক্কা বিজয়ের সময় ঘটে যাওয়া একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, চল্লিশজন বা এর কম ও বেশীসংখ্যক মোশরেক মুসলমানদের শিবিরে ঢুকে তাদের ক্ষতি করতে চেয়েছিলো। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলে এবং তাদেরকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনে নিয়ে হাযির করে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কেই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর'। (আয়াত ২৪)

ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং সবাই তা জেনেও নিয়েছে। তারপরও আল্লাহ তায়ালা সে ঘটনাটি এই বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চান এবং প্রমাণ করতে চান যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে ও হচ্ছে তার পেছনে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও তদবীর কার্যকর। এই সত্যটি জানার পর মোমেন বান্দার মনে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে, সে তখন বিশ্বাস করবে যে, সব কিছু আল্লাহই করেন, তিনিই তাকে চালান, তিনিই তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই তাঁর প্রতিই পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাঁর হাতেই নির্দ্বিধায় নিজেকে সঁপে দিতে হবে, তাঁর মনোনীত বিধানেই তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে, গোটা আবেগ অনুভূতি নিয়ে, হৃদয় মন দিয়ে এবং সকল ধ্যান ধারণা দিয়ে এই ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, হুকুমদাতা একমাত্র আল্লাহই, আল্লাহ তায়ালার পছন্দই সঠিক পছন্দ, তার নির্ধারিত তকদীর ও ইচ্ছা অনুযায়ী তার পছন্দ ও অপছন্দমাফিক মানুষকে চালানো হয়, তবে তিনি সব সময়ই মানুষের মঙ্গল চান। তাই মানুষ যখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার হাতে সঁপে দেয় তখন খুব সহজেই সে মঙ্গলের পথে ধাবিত হয়। তিনি মানুষের সব বিষয় সম্পর্কে অবগত। তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ই দেখেন ও জানেন। তাই যখন তিনি তাদের জন্য কোনো কিছু মনোনীত করেন তখন তা জেনে ও বুঝেই করেন। তিনি এর দ্বারা কখনও তাদের অমঙ্গল কামনা করেন না। তিনি যা ফয়সালা করেন তা জেনে ও বুঝেই করেন। তিনি এর দ্বারা কখনও তাঁর বান্দাদের অমঙ্গল কামনা করেন না এবং তাদের কোনো প্রাপ্যই তিনি ব্যর্থ যেতে দেন না। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা কিছু করো তা আল্লাহর তায়ালা দেখেন।'

আল্লাহর কাছে বিধর্মীদের স্থান

পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের শত্রুদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার মাপকাঠিতে তাদের স্থান কোথায় তা বলা হয়েছে। এদের কার্যকলাপ, মুসলমানদের সাথে এদের আচরণ এবং আল্লাহ তায়ালার ঘর থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার মতো যে জঘন্য কাজ এরা করে তা আল্লাহ তায়ালা কোনো দৃষ্টিতে দেখেন সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। খোদ মোমেনদের আল্লাহ তায়ালা কোনো দৃষ্টিতে দেখেন সেটাও এখানে আলোচিত হয়েছে। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারাই তো কুফরী করেছে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে ....।' (আয়াত ২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে ও তাঁর মাপকাঠিতে ওরা প্রকৃতভাবেই কাফের ও বেঈমান। তাই তিনি তাদের জন্য এই ঘৃণ্য ও অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন যে, 'ওরাই তো কুফরী করেছে'– এই মন্তব্য দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন– এই বিশেষণের উপযুক্ত একমাত্র ওরাই এবং এই বিশেষণ যেন ওদের অস্থি মজ্জায় মিশে রয়েছে। কাজেই তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য জাতি। কারণ, তিনি কুফরীকে ঘৃণা করেন এবং কাফেরদেরকেও ঘৃণা করেন। ওদের আরো একটি ঘৃণ্য কাজের কথা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। আর তাহলো আল্লাহর মোমেন বান্দাদেরকে তাঁরই ঘর থেকে ওরা ফিরিয়ে রাখে এবং কোরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছার পথে ওরা বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালার ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া এবং কোরবানীর পশুগুলোকে কোরবানীর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা জাহেলী যুগেও বিরাট পাপের বিষয় ছিলো এবং ইসলামেও তা জঘন্য পাপ বলে বিবেচিত। শুধু তাই নয়, বরং তখনকার আরব উপদ্বীপে প্রচলিত ও পরিচিত সকল ধর্ম, প্রথা ও রীতি নীতিতেও তা ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত ছিলো। অর্থাৎ মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিতেই কাজটি ঘৃণ্য কাজ হিসেবে গণ্য। তাহলে বুঝা গেলো যে, কাফেরদের হাত থেকে মোমেনদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য কেবল তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই নয়, বরং এর পেছনে আরো একটি মহান উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সেটার প্রতি ইংগিত করে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, যদি সেদিন মক্কা নগরীতে এমন কিছু মোমেন নরনারী না থাকতো– যাদেরকে তোমরা জানতেন। তাছাড়া এই আশংকা যদি না হতো যে, না জেনে তাদেরকে পদদলিত করার পর তোমরা অনুতপ্ত হবে তাহলে এ যুদ্ধ কিছুতেই বন্ধ করা হতো না।

আয়াতে বলা হয়েছে যে, মক্কায় বেশ কিছু অসহায় ও দুর্বল মুসলিম নরনারী ছিলো যারা তখনও মদীনায় হিজরত করতে পারেনি। মোশরেকদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলো। যদি মক্কা বিজয়ের দিন যুদ্ধ বেধে যেতো, আর মুসলমানরা মক্কায় আক্রমণ করতো তাহলে মক্কার সেই অজ্ঞাত ও অপরিচিত মুসলমানদের ওপরও তারা চড়াও হতো এবং তাদেরকে হত্যা করতো। তখন মানুষ বলাবলি করার সুযোগ পেতো যে, মুসলমানরা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, বরং পরবর্তীতে এই ভুলবশত হত্যার জন্য তাদেরকে রক্তপণও দিতে হতো। এখানে আরো একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আর তাহলো, যেসব কাফেরও ছিলো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, এরা পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। এখন যদি এই লোকগুলো আসল ও

প্রকৃত কাফেরদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতো এবং তাদের ভিন্ন কোনো পরিচয় থাকতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিতেন। আর তখন তারা কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে পারতো। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যেন আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখেল করে নেন। যদি তারা সরে যেতো, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।'

কাফেরদের অহংকার ও গোড়ামী

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনোনীত, অনন্য ও সৌভাগ্যবান মোমেন বান্দাদের সামনে তাঁর কর্ম ও সিদ্ধান্তের পেছনে লুকায়িত রহস্য ও উদ্দেশ্যবলীর দু'একটি দিক তুলে ধরেছেন। এরপর পুনরায় কাফেরদের স্বভাব চরিত্র ও তাদের মন মানসিকতার প্রতি ইংগিত করে বলেন, 'কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে জাহেলী যুগের জেদ পোষণ করত।' (আয়াত ২৬)

বলা বাহুল্য, তাদের এই জেদ কোনো বিশ্বাস বা মতাদর্শের কারণে ছিলো না। বরং এই জেদ ছিলো নিতান্তই অহংকার, গোঁড়ামী ও গোয়ার্তুমীর কারণে। এই জেদের বশবর্তী হয়েই তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সাহাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ঘরে প্রবেশে বাধা দিয়েছে এবং কোরবানীর জন্য আনীত পশুগুলোকে কোরবানীর নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে দেয়নি। আর এই কাজগুলো করতে গিয়ে তারা প্রচলিত সব ধরনের রীতিনীতি ও আদর্শের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে। তাদের এই মুর্খতা ও বর্বরতাপূর্ণ আদর্শের খাতিরে তারা সব ধরনের প্রথাবিরোধী ও ধর্মবিরোধী জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং এর খাতিরে তারা সেই পবিত্র ঘরটির পবিত্রতা নষ্ট করেছে যার পবিত্রতার দোহাই দিয়ে তারা মক্কায় নিরাপদে বসবাস করছিলো। এমনকি তারা এই বর্বরতাপূর্ণ আদর্শের খাতিরে সেই নিষিদ্ধ মাসগুলোর পবিত্রতাও নষ্ট করেছে যার পবিত্রতা জাহেলী ও বর্বর যুগেও রক্ষিত হয়েছে এবং ইসলামী যুগেও রক্ষিত হয়েছে। তাদের এই জেদ কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ছিলো না, বরং যারাই তাদেরকে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাথীদেরকে আল্লাহ তায়ালার ঘরে প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য মন্দ বলেছে, তাদের বিরুদ্ধেও ছিলো। এই জেদের কারণেই তারা সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই সোহায়ল বিন আমরকে রসূলের হাতে সমর্পণ করতে, চুক্তিনামায় আল্লাহ তায়ালার নাম লিখতে এবং মোহাম্মাদ 'রসূলুল্লাহ' (স.) লিখতে আপত্তি জানায়। অহেতুক গোঁড়ামী ও মূর্খতাপূর্ণ জেদের বশবর্তী হয়েই তারা এসব করেছিলো।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে ওদের অন্তরে সত্যকে মেনে নেয়ার মত উদারতা নেই এবং সত্যের সাথে আপোস করার মতো যোগ্যতাও ওদের মাঝে নেই, তাই ওদের মনে এ জাতীয় জেদ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। অপরদিকে এ জাতীয় জেদ থেকে মোমেনদেরকে মুক্ত রেখেছিলেন। এর পরিবর্তে বরং তাদের মনে শান্তি, স্বস্তি ও আল্লাহভীতির গুণ সৃষ্টি করেছিলেন। এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও মোমেনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্যে সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিলো এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।

'সাকীনাহ' শব্দ দ্বারা এখানে স্থিরতা ও গাম্ভীর্য বুঝানো হয়েছে। আর 'তাকওয়া' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সতর্কতা ও আনুগত্য। আর এ দু'টো গুণ কেবল সেসব অন্তরের জন্যই প্রযোজ্য

যে অন্তর বিশ্বাসী ও স্রষ্টার সাথে যুক্ত এবং আস্থা ও স্থিতিশীলতার গুণে গুণান্বিত। যে দু'টো গুণ কেবল সেই অন্তরেই থাকতে পারে যে অন্তর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে নিজ প্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করে, যে অন্তরে কোনো অহংকার নেই, দম্ভ নেই। যে অন্তর নিজের জন্য নয়, বরং নিজ ধর্ম ও নিজ স্রষ্টার জন্য রাগান্বিত হয়। তাই এই জাতীয় অন্তরকে শান্ত ও স্থির হওয়ার নির্দেশ দিলে তা পালন করে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

আর সে কারণেই মোমেন বান্দাদেরকে তাকওয়া ও সংযমের জন্য অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রভুর পক্ষ থেকে দেয়া এটা হচ্ছে তাদের জন্য আর একটি বিশেষণ। আল্লাহ তায়ালার বিচারে ও তাঁর মাপকাঠিতে মোমেন বান্দারা এই বিশেষণসহ অপরাপর বিশেষণের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এটা নিসন্দেহে তাদের জন্য একটা অতিরিক্ত সম্মান। তিনি বান্দাদের সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন বলেই এই ঘোষণা দিয়েছেন। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'

দ্বীনের বিজয় সুনিশ্চিত

ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর দেখা সত্য স্বপ্নের সুসংবাদ পেয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে এসেছিলো তাদের কারো কারো মনে আশংকা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, এই স্বপ্নের ফলাফল খুব সম্ভবত সেই বছরেই বাস্তব হয়ে দেখা দেবে না এবং তাদেরকে হয়তো আল্লাহ তায়ালার ঘর ওমরাহ না করেই ফিরে আসতে হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, রসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেই এবং সবার মনের আশা পূর্ণ হবেই। কেবল আল্লাহ তায়ালার ঘরে প্রবেশ করেই তারা ক্ষান্ত হবে না বরং এর চেয়েও বড় একটা একটা কাজ সেদিন তারা সমাধা করবে। আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তোমরা অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, নিরাপদে মাথা মুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতপর তিনি জানেন যা তোমরা জানোনা। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।' (আয়াত ২৭)

আলোচ্য আয়াতে দুটো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এর একটি হলো, রসূলের স্বপ্ন সত্য বলে প্রমাণিত হওয়া, নিরাপদে আল্লাহ তায়ালার ঘরে প্রবেশ করা এবং নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে হজ্জ বা ওমরাহ আদায় করার পর মাথা মুন্ডানো অথবা চুল কাটা। এই সুসংবাদটি এক বছর পরেই ফলেছিলো। আর দ্বিতীয় সুসংবাদটি হলো মক্কা বিজয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির মাত্র দু' বছর পরই এটিও মহা সমারোহে ও অত্যন্ত ঘটা করে ফলেছিলো। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে গোটা আরব জাহানে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনেরও বিজয় সুচিত হয়।

'ইনশাআল্লাহ' বলা

আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমরা অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে' এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে ঈমানী শিষ্টাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। কারণ, কাবাঘরে প্রবেশ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত ও সুনির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও এখানে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে শর্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দাদের অন্তরে এই সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে, তাঁর ইচ্ছা অবাধ, শর্তহীন ও নিরঙ্কুশ

এবং এই ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এই সত্যটিকে পবিত্র কোরআন বারবার তুলে ধরে, এমনকি যেখানে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এই ইচ্ছার শর্তটি আরোপ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার কখনও বরখেলাপ হয় না। তবে এই ওয়াদার সাথেও তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার সম্পর্ক চিরন্তন। এই সত্যটিকে মোমেনদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা গেঁথে দিতে চান, যেন এটাকে তারা ইসলামের অন্যতম শিষ্টাচার হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

ঘটনার মূল প্রেক্ষাপট

এখন আমরা মূল ঘটনার দিকে যাচ্ছি। একাধিক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পরের বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে রসূলুল্লাহ (স.) হোদায়বিয়াতে বায়াত গ্রহণকারী সাহাবাদেরকে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন। তিনি 'যুল হোলাইফা' নামক মিকাত থেকে এহরাম বাঁধেন এবং কোরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে যান, যেমনটি তিনি এর আগের বছর করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর সাথে 'তালবিয়া' পড়তে পড়তে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) যখন 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানের কাছে পৌঁছলেন, তখন ঘোড়া ও অস্ত্রসহ মোহাম্মদ বিন মাসলামাকে মক্কা পাঠিয়ে দিলেন। মক্কার মোশরেক বাসিন্দারা তাকে দেখে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (স.) তাদের ওপর আক্রমণ করবেন। তারা আরো মনে করলো যে, দশ বছর মেয়াদী যুদ্ধবিরতির যে চুক্তি তাঁর সাথে করা হয়েছিলো তা তিনি ভঙ্গ করেই মক্কায় আক্রমণ করতে এসেছেন। তাই তারা মক্কার সকল বাসিন্দার কাছে এই আক্রমণের খবর পৌঁছে দিলো। রসূলুল্লাহ (স.) মাররুয্‌যাহরানে যখন পৌঁছলেন, সেখান থেকে তিনি তখন আল্লাহ তায়ালার ঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি সকল অস্ত্রসস্ত্র ও তীর ধনুক ইয়াজেজ নামক উপত্যকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং খাপবন্দি তলোয়ার সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। মক্কার দিকে চলার সময় কোরায়শ নেতারা তাঁর কাছে মেকরায বিন হাফ্‌স নামক একজন লোককে পাঠায়। সে রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে বললো, 'মোহাম্মাদ! তুমি কখনও চুক্তি ভঙ্গ করেছো বলে আমাদের জানা নেই। তখন রসূলুল্লাহ (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?' সে বললো, 'তুমি অস্ত্রশস্ত্র ও তীর ধনুক নিয়ে আমাদের এখানে প্রবেশ করেছো। উত্তরে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'তোমার কথা ঠিক নয়, আমাদের অস্ত্রগুলো ইয়াজেজ উপত্যকায় পাঠিয়ে দিয়েছি ..... তখন লোকটি বললো, 'এটাই আমরা জানতাম, কারণ তুমি একজন সৎ ও নীতিবান লোক।'

রসূলের আগমনের খবর পেয়ে মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফেররা অত্যন্ত ক্রোধ ও ক্ষোভ নিয়ে রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের দেখার জন্য রাজপথে বের হয়ে এলো। মক্কার সাধারণ নারী পুরুষ ও শিশুরা রাস্তার দু'ধারে এবং বাড়ীর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে রসূল (স.)-এর আগমনের জন্য অপেক্ষ করছিলো। রসূলুল্লাহ (স.) মক্কায় প্রবেশ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম তালবিয়া পড়তে পড়তে তাঁর সামনে চলছিলেন। কোরবানীর পশুগুলো 'যী-তুয়া' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির দিন আল্লাহর রসূল (স.) যে উটে আরোহণ করেছিলেন, আজও সেই একই উটে আরোহণ করে মক্কায় প্রবেশ করলেন। উটটির লাগাম ছিলো আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনসারী (রা.)-এর হাতে। তিনিই উটটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আর এভাবেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর স্বপ্ন সত্য হয় এবং আল্লাহ তায়ালার দেয়া ওয়াদাও পূর্ণ হয়। মক্কা বিজিত হয়, আল্লাহ তায়ালার দ্বীন বিজয়ী হয় এবং গোটা আরব উপদ্বীপে এর প্রসার

ঘটে। এরপর আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ ওয়াদাও বাস্তবায়িত হয়। সে ওয়াদাটা হলো এই, 'তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত জীবন বিধানের ওপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।' (আয়াত ২৮)

আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবয়িত হয়েছে। সত্য দ্বীনের জয় হয়েছে। এই বিজয় কেবল আরব উপদ্বীপ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং অর্ধ শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যেই গোটা পৃথিবীতে এর বিস্তার ঘটে। গোটা পারস্য সম্রাজ্যে এর বিস্তার ঘটে, রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় এর বিস্তার ঘটে। এমনকি ভারত ও চীনসহ দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ (ইন্দোনেশিয়া) পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ ও গোটা ষষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে এসব এলাকাতেই আবাদ ছিলো।

আল্লাহ তায়ালার এই সত্য বিধানের বিজয় এখনও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি এর বিজিত অধিকাংশ এলাকায় বিশেষ করে ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোতে এর রাজনৈতিক পতনের পরও এবং গোটা বিশ্বে অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলিম জাতির প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া সত্তেও ইসলামের প্রাধান্য অব্যাহতই রয়েছে।

এটা মানতেই হবে যে, জীবন বিধান হিসেবে পৃথিবীর বুকে অন্যসব মতাদর্শের তুলনায় ইসলামের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতা এখনও অম্লান রয়ে গেছে। কারণ, মূল হিসেবে এটা একটা শক্তিশালী ব্যবস্থা এবং প্রকৃতির দিক থেকেও এটা একটা শক্তিশালী বিধান। এই বিধান তলোয়ার বা কামানের জোরে চলে না। বরং চলে এর অন্তর্নিহিত শক্তি, বৈশিষ্ট ও স্বভাবমুখীতার গুণে। এই বিধানের মাঝে দেহ ও আত্মার প্রয়োজন মেটানোর মতো যোগ্যতা রয়েছে। এর মাঝে জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়োজন মেটানোর মতো যোগ্যতা রয়েছে এবং সকল পরিবেশ ও সকল শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মত যোগ্যতাও রয়েছে। এই বিধানে কুঁড়েঘরে বসাবাসকারী একজন দরিদ্র মানুষের চাহিদা মেটানোর উপাদান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাসকারী একজন বিত্তশালীর চাহিদাও।

কোনো বিধর্মী বিদ্বেষমুক্ত হয়ে এটাকে জানার চেষ্টা করে তাহলে সে এর যথার্থতা, এর অন্তর্নিহিত শক্তি, এর দিকদর্শনের ক্ষমতা এবং মানুষের বহুবিধ ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর যোগ্যতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। তাই বলা হয়েছে, এসব বিষয়ের স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট .... ।

আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা বাহ্যিক রাজনৈতিক রূপে প্রকাশ পেয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওত লাভের পর থেকে এক শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার আগেই। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা এখনও বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তি রূপে। অন্যান্য ধর্মের ওপর এই সত্য ধর্মের প্রাধান্য এখনও অব্যাহত আছে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ইসলামই একমাত্র শ্বাশ্বত জীবন বিধান যা সব ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করতে এবং নেতৃত্বদানে সক্ষম।

আমার মনে হয় ইসলামের এই বাস্তব গুণটি আজ যারা অনুধাবন করতে পারছে না তারা স্বয়ং এই দ্বীনের অনুসারীরা। অন্যথায় বিধর্মীরা এটা ঠিকই অনুধাবন করতে পারে, ইসলামকে তারা ভয়ও করে এবং সে কারণেই তাদের প্রতিটি পলিসি ও নীতি নির্ধারণের সময় ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখে।

সাহাবায়ে কেরামদের গুণাবলী

এখন আমরা আলোচ্য সূরার শেষ দিকে এসে গেছি। এখানে আমরা সাহাবায়ে কেরামের একটা উজ্জ্বল ও অনন্য রূপের সন্ধান পাচ্ছি যা কোরআনের অনুপম বর্ণনায় জীবন্ত ও চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দীপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান এই দলটির ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে পবিত্র কোরআন বলছে, 'মোহাম্মাদ আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং তাঁর সহচরদের বৈশিষ্ট হলো যে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখতে পাবে। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন ....।' (আয়াত ২৯)

পবিত্র কোরআনের অনুপম বর্ণনাশৈলীতে সাহাবায়ে কেরামের কি অপূর্ব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই চিত্রে সাহাবায়ে কেরামের প্রধান কয়েকটি অবস্থার প্রতিকৃতি ধরা পড়েছে। এখানে তাদের প্রকাশ্য অবস্থাও ধরা পড়েছে এবং গোপন অবস্থাও ধরা পড়েছে। এখানে কাফেরদের সাথে তাদের আচরণের দিকটিও এসেছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কের দিকটিও এসেছে। বলা হয়েছে, 'কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল' অপরদিকে এবাদাত বন্দেগীতে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে' ....অপরদিকে এই এবাদাত বন্দেগী তাদের স্বভাব চরিত্রে, আচার আচরণে এবং তাদের বাহ্যিক অবয়বে কি প্রভাব ও চিহ্ন রাখে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন' এবং তাদের এই বিশেষ চিহ্নটির বর্ণনা তাওরাত ও ইঞ্জিলেও এসেছে। বিশেষ করে ইঞ্জিলে তাদের পরিচিতিটা এভাবে এসেছে, 'তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মযবুত হয় এবং কান্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় চাষীদেরকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।'

শেষের এই আয়াতগুলোয় প্রথমেই মোহাম্মাদ (স.)-এর প্রধান পরিচয় 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সোহায়ল বিন আমর সহ অন্যান্য মোশরেকের দল হোদায়বিয়ার চুক্তিনামায় এই বিশেষণটি যোগ করার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষণটি আরো জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে সাথে অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গিতে সাহাবায়ে কেরামের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি অংকন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মোমেনদের অবস্থা ও পরিস্থিতির বিভিন্ন রূপ ছিলো। তবে এখানে তাদের সর্বাধিক পরিচিত অবস্থাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জীবনের এই প্রধান প্রধান অবস্থাগুলো উল্লেখ করে প্রকারান্তরে তাদের প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মানের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কারণটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সহানুভূতিশীল' ...... কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ কাফের পিতামাতা, ভাই বোনদের, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের প্রতি কঠোর হওয়া। তাই দেখা যায়, কুফরির কারণে তাঁরা আপনজনদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো। অপরদিকে তারা পরস্পর ছিলো সহানুভূতিশীল ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্ব রক্তের নয়, বরং আদর্শের। তাদের কঠোরতা ছিলো আল্লাহ তায়ালার খাতিরে এবং সহানুভূতি ও মমত্ববোধও ছিলো আল্লাহর খাতিরেই। তাদের জিঘাংসা ছিলো আদর্শের খাতিরে এবং উদারতাও ছিলো আদর্শের খাতিরে।

তাদের নিজের জন্য কিছু ছিলো না এবং নিজেদের স্বার্থেও কিছু ছিলো না। তারা একমাত্র আদর্শের জন্যেই নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো এবং এই আদর্শের জন্যেই নিজেদের আচার আচরণ ও সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করতো। এই আদর্শের কারণেই তারা শত্রুদের প্রতি কঠোর হতো এবং এই আদর্শের কারণেই পরস্পরের প্রতি সদয় হতো। মোটকথা আমিত্ব বলতে তাদের মাঝে কিছুই ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো জন্য তারা আবেগ প্রবণ হতো না। আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের যে বন্ধন ছিলো সেটাই ছিলো অপরাপর সকল বন্ধনের মাপকাঠি।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি যে বিশেষ সম্মান দেখানো হয়েছে তার আর একটি কারণ হচ্ছে, একনিষ্ঠ এবাদাত বন্দেগী। বলা হয়েছে, 'তাদেরকে তুমি রুকু ও সেজদারত দেখতে পাবে' এখানে যে বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, তারা যেন সকল অবস্থায় ও সকল স্থানে এবাদাত বন্দেগীতেই মত্ত আছে। রুকু ও সেজদা শব্দ দুটো সামগ্রিক এবাদাতের অর্থ প্রকাশ করছে। আর এবাদতের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য ও দাসত্ব। তাই এ শব্দ দুটো দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মনের প্রকৃত অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোটা জীবনটাই কেটেছে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত বন্দেগী ও আনুগত্যের মধ্য দিয়ে।

সাহাবায়ে কেরামের তৃতীয় যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে সেটি হচ্ছে তাদের মনজগতের চিত্র। এ চিত্র সামগ্রিক আবেগ অনুভূতির স্থায়ী চিত্র। এ চিত্র তাদের আশা আকাংখা ও কামনা বাসনার প্রকৃত চিত্র। কারণ, তাদের একমাত্র কামনা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। এই অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির বাইরে তাদের আর কিছুই চাওয়ার ছিলোনা, তাই তাদের সকল চিন্তা এবং তাদের সকল চাওয়া পাওয়া এই অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো।

সাহাবায়ে কেরামের চতুর্থ চিত্রটি হচ্ছে তাদের এবাদত বন্দেগীর বাহ্যিক প্রভাবের চিত্র। এই চিত্রে আমরা তাদের মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা দেখতে পাই। আরো দেখতে পাই এবাদত রিয়াযতের ফলে সৃষ্ট শুভ্র ও স্নিগ্ধ দ্যুতি। এটা কপালের সেই কালো চিহ্ন নয় যা 'সেজদার কারণে' শব্দটি পাঠ করার সাথে সাথে মনে আসে। এখানে সেজদা বলতে সামগ্রিক এবাদত বুঝানো হয়েছে। আর যেহেতু সেজদার মাঝে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয়, ভক্তি, বিনয় আনুগত্য ও দাসত্বের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়, তাই এবাদাত বন্দেগীর অর্থ প্রকাশ করার জন্য এই সেজদা শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চেহারায় সেজদার চিহ্ন বলতে এই ভয় ভক্তি ও বিনয়ের চিহ্নই বুঝায়। তাই যারা মনে প্রাণে আল্লাহ তায়ালার এবাদাত বন্দেগী করে তাদের চেহারায় অহংকার, দাম্ভিকতা ও রুঢ়তার ভাব থাকে না। বরং এর পরিবর্তে চেহারায় জন্ম নেয় ভদ্রতাসুলভ বিনয়, নির্মল স্বচ্ছতা, স্নিদ্ধ দীপ্তি এবং হাল্কা বিমর্ষতা যার ফলে মোমেনের চেহারায় উজ্জ্বল্য কোমলতা ও ভদ্রতা আরও বৃদ্ধি পায়।

এই দৃশ্যগুলোতে যে চির ভাস্বর রূপটি ফুটে উঠেছে তা নতুন কিছু নয়, বরং তা চিরন্তন ও আদি। আর সে কারণেই এ চিত্রটির সন্ধান তাওরাতেও পাই। আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের এই বৈশিষ্ট ও গুণাবলী তাদের আবির্ভাবের আগেই মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল করা কেতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তাদের আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

ইঞ্জিল কেতাবেও মোহাম্মাদ (স.)-এর আগমন ও তাঁর সাহাবাদের গুন বৈশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন গুণাবলী ও চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে সাহাবাদের এই

জামায়া'ত একটা মযবুত বাড়ন্ত চারাগাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এই চারাগাছ থেকে কচি পাতা জন্ম নেয়। কিন্তু তাতে করে চারাগাছটি দুর্বল হয় না, বরং আরো শক্ত হয়, মযবুত হয়, ভরাট হয় এবং নিজ কান্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কোনো বক্রতা থাকে না এবং কোনোরূপ ত্রুটিও থাকে না।

আলোচ্য আয়াতে চিত্রায়িত দৃশ্যটির এটাই হচ্ছে বাহ্যিক রূপ। কিন্তু যারা কৃষিকার্যে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, যারা জানে কোনটি বাড়ন্ত চারা, আর কোনটি রুগ্ন চারা তারা এ দৃশ্যটি দেখে আনন্দিত হয়, অভিভূত হয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যা চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে'......এখানে চাষী শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ (স.)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, ইসলাম নামক বাগানে তিনি যে চারা লাগিয়েছিলেন, সেই চারা বড় শক্তিশালী হয়ে এবং পুষ্ট হয়ে বাগানের শোভা বর্ধন করেছিলো। এই শক্তিশালী বৃক্ষরাজী সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউ নয়। তাই এদেরকে দেখে প্রিয়নবী আনন্দিত হন। অপরদিকে এই শস্য শ্যামল ও সমৃদ্ধ বাগান দেখে কাফেরদের মনে হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাতে আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন'.....এখানে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা সেই কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এই বাগান মূলত আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তার রসূলের হাতে আবাদ করা বাগান, আর এই বাগান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর শত্রুদের মনে ক্ষোভ ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

এই দৃষ্ঠান্ত আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোনো বিষয় নয়, বরং এর অস্তিত্ব তকদিরের পাতায়ই রয়ে গেছে। এরপরও রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবাদের আগমনের অনেক আগেই পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নাযিল করা কেতাবে এর উল্লেখ এসেছে। ইঞ্জিলে রসূল (স.)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদানের পাশাপাশি তাঁর সাহাবাদের গুণাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অমর গ্রন্থ আল কোরআনে রসূল (স.)-এর পুন্যাত্মা সাহাবাদের মনোনীত দলটির গুণাবলীর উল্লেখ করে তাদের স্মৃতিকে অমর ও অক্ষয় করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে তাদের স্মৃতি গোটা সৃষ্টিজগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং যতোদিন আল্লাহ তায়ালার এই অমরবাণী পাঠ করা হবে ততোদিন কুলমাখলুক এই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে এবং তা স্মরণ রাখবে। শুধু তাই নয়, বরং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এই স্মৃতি একটা আদর্শ হয়ে টিকে থাকবে এবং তাদের মাঝেও অনুরূপ গুণাবলী সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে, ফলে তাদের মাঝে ঈমানের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, তার চেয়েও বড় আর একটি সম্মান তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। আর সেটা হলো, 'ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।' যদিও আয়াতে এই ক্ষমা ও প্রতিদানের ওয়াদা ঈমান ও সৎকাজের গুণে গুণান্বিত সকলের জন্য করা হয়েছে, তারপরও সাহাবায়ে কেরামরাই সর্বপ্রথম এই ওয়াদার ফল ভোগ করবেন। কারণ, ঈমান ও সৎকাজের গুণ তাদের মাঝে ছিলো পূর্ণাংগরূপে। ক্ষমা ও মহা প্রতিদান নিজেই একটা বড় সম্মানের বিষয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিও একটা বড় সম্মানের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দান তো অসীম, তাঁর অনুগ্রহ তো অসীম।

দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর পর আমি আবার সেই সৌভাগ্যবান দলটির চেহারা ও তাদের মনের অবস্থাটা অনুভব করতে চেষ্টা করছি। আল্লাহর রহম, সন্তুষ্টি, সম্মান ও মহান ওয়াদার ধারা একের পর এক যখন তাদেরকে প্লাবিত করছিলো, তখন তাদের অবস্থাটা কী ছিলো, সেটাই আমি অনুভব করার চেষ্টা করছি। যখন আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে, আল্লাহ তায়ালার মাপকাঠিতে এবং আল্লাহ তায়ালা কেতাবে নিজেদের মান মর্যাদার কথা তারা জানতে পারছিলো, শুনতে পাচ্ছিলো তখন তাদের মনের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিলো, সেটাই আমি এই চৌদ্দশত বছর পরে অনুভব করতে চেষ্টা করছি। আমি আমার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তারা হোদায়বিয়া থেকে ফিরছে, আর তখনই তাদের সামনে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, সাথে সাথে তাদেরকে তা পড়ে শুনানো হলো, তার মাঝে তারা নিজেদের মন, আত্মা, আবেগ ও অনুভূতি এবং বৈশিষ্ট ও স্বকীয়তার পূর্ণ ছাপ দেখতে পাচ্ছে। এরপর তারা একজন আর একজনের চেহারার দিকে তাকাচ্ছে এবং যে নেয়ামতের প্রভাব মনের মাঝে অনুভব করছে সেটাকে নিজের গোটা অস্তিত্বের মাঝেই দেখতে পাচ্ছে।

সাহাবায়ে কেরাম উর্ধজগতের যে মহা উৎসবের মাঝে বিচরণ করেছিলেন সেই আনন্দঘন ও পবিত্র মুহূর্তগুলো আমি এখানে বসে অনুভব করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু সশরীরে যে মানুষটি সেই উৎসবে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি, তার পক্ষে সেই অপার্থিব আনন্দ অনুভব করা কি করে সম্ভব? তাই দূরে বসে শুধু কল্পনাই করা। তবে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের গুণে গুণান্বিত করেন তাদের জন্য এই দূরত্ব ও ব্যবধান অপসারিত করে দেন।

তাই মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কায়মন বাক্যে ফরিয়াদ জানাচ্ছি, হে মাবুদ! তুমি জানো, আমি গোনাহগার, আমি তোমার এই পাথেয়র দিকেই তাকিয়ে আছি!

সূরা আল হুজুরাত

আয়াত ১৮ রুকু ২

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ
اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٢ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٣ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُوْنَ ۝٤ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে (কখনো) অগ্রণী হয়ো না এবং (সর্বদা) আল্লাহকে ভয় করে চলো; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন। ২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কখনো নিজেদের আওয়ায নবীর আওয়াযের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু (গলায়) আওয়ায করো— নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াযে কথা বলো না, এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমাদের সব কাজকর্ম (এ কারণেই) বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না। ৩. যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের গলার আওয়ায নিম্নগামী করে রাখে, তারা হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের মন (মগয)-কে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে যাচাই বাছাই করে নিয়েছেন; এমন ধরনের লোকদের জন্যেই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও অসীম পুরস্কার। ৪. (হে নবী,) যারা তোমাকে (সময় অসময়) তোমার কক্ষের বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ লোক। ৫. যতোক্ষণ তুমি তাদের কাছে বের হয়ে না আসো, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো, তাহলে এটা তাদের জন্যে হতো খুবই উত্তম; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۞ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۞ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি কোনো দুষ্ট (প্রকৃতির) লোক তোমাদের কাছে কোনো তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরখ করে দেখবে (কখনো যেন আবার এমন না হয়), না জেনে তোমরা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে এবং অতপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হলো! ৭. তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রসূল মজুদ রয়েছে; (আর) আল্লাহর রসূল যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা (এর ফলে) সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের কাছে তিনি ঈমানকে প্রিয় বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে রেখে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় অনাকাংখিত বিষয় করে দিয়েছেন; এরাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসারী, ৮. (আসলে এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার এক মহা অনুগ্রহ ও নেয়ামত, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। ৯. মোমেনদের দুটো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের এক দল যদি আরেক দলের ওপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা লড়াই করো– যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি (সম্পূর্ণত) আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হাঁ, একবার) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটো দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ

১০. মোমেনরা তো (একে অপরের) ভাই বেরাদর, অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে।

রুকু ২

১১. ওহে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে (নিয়ে) কোনো উপহাস না করে, (কেননা) এমনও তো হতে পারে, (যাদের আজ উপহাস করা হচ্ছে) তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের চাইতে অনেক ভালো। (আরো মনে রাখবে), একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, (কারণ) ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড়ো ধরনের অপরাধ, যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা হবে (সত্যিকার) যালেম। ১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো, (কেননা) কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরী করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না; তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে– আর (অবশ্যই) তোমরা এটা অত্যন্ত ঘৃণা করো; (এসব ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুল করে এবং তিনি একান্ত দয়ালু। ১৩. হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) বেশী ভয় করে,

اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ ﴿۱۳﴾ قَالَتِ الۡاَعۡرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلۡ لَّمۡ تُؤۡمِنُوۡا وَلٰكِنۡ قُوۡلُوۡۤا اَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ الۡاِيۡمَانُ فِىۡ قُلُوۡبِكُمۡ ؕ وَاِنۡ تُطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ لَا يَلِتۡكُمۡ مِّنۡ اَعۡمَالِكُمۡ شَيۡـــًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُوۡا وَجٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوۡنَ ﴿۱۵﴾ قُلۡ اَتُعَلِّمُوۡنَ اللّٰهَ بِدِيۡنِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۱۶﴾ يَمُنُّوۡنَ عَلَيۡكَ اَنۡ اَسۡلَمُوۡا ؕ قُلۡ لَّا تَمُنُّوۡا عَلَىَّ اِسۡلَامَكُمۡ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ اَنۡ هَدٰٮكُمۡ لِلۡاِيۡمَانِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ غَيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۸﴾

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন। ১৪. এ (আরব) বেদুইনরা বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি; তুমি বলো, না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান আনোনি, তোমরা (বরং) বলো, আমরা (তোমাদের রাজনৈতিক) বশ্যতাই স্বীকার করেছি মাত্র, (কারণ, যথার্থ) ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি; যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মফলের সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে পরম ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়ালু। ১৫. সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার বিধানে) সামান্যতম সন্দেহও তারা পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে; এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ। ১৬. (যারা তোমার কাছে এসেছে তাদের) তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের 'দ্বীন' সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করতে চাও; অথচ এই আকাশমন্ডলী এবং এ যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন। ১৭. এরা তোমার কাছে প্রতিদান চায় এ জন্যে, তারা (তোমার) বশ্যতা স্বীকার করেছে; তুমি (তাদের) বলো, তোমাদের এ বশ্যতা স্বীকার করার প্রতিদান চাইতে আমার কাছে এসো না, বরং যদি তোমরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত (করে তোমাদের ধন্য) করেছেন। ১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন, এ যমীনে তোমরা যা করে বেড়াও তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মাত্র আঠারোটি আয়াতে সমাপ্ত এই সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও আইনগত বিধি-বিধানের বেশ কিছু প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বিশ্বজগত এবং মানুষ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। সেই তথ্যগুলো মানুষের মনমগযে এক সুদূরপ্রসারী দিগন্ত ও সুউচ্চ জগত তুলে ধরে, মানুষের হৃদয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকে উচ্চকিত করে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার নিয়ম-বিধি, সৃষ্টিজগতের লালন, বিকাশ ও পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর আইন ও বিধানের বহু মূলনীতি এতে আলোচিত হয়েছে। এ সব মূল্যবান বিষয় আলোচনার ফলে সূরাটির আকৃতি তার আয়াত সংখ্যার তুলনায় শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূরাটি আমাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা গবেষণার আহবান জানায়।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি এই সূরা অধ্যয়নের সময় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এই যে, এটি একটি পূর্ণাংগ মহৎ, উদার, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল সমাজের বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত করে। যে স্বতন্ত্র বিধি-বিধান, নীতিমালা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই সমাজটি গড়ে ওঠে, যে বিধিমালা এ সমাজের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, সেই বিধিমালা ও নীতিমালা এই সূরায় আলোচিত হয়েছে। এ সমাজ শুধু সমাজ নয়, একটি স্বতন্ত্র জগত বা একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব। এ বিশ্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে ও আল্লাহর উদ্যোগেই আবির্ভূত এবং আল্লাহরই অনুগত। এ জগত ও এ সমাজের অধিবাসীদের হৃদয় নির্মল, আবেগ-অনুভূতি পরিচ্ছন্ন এবং ভাষা ও ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও সংযত। এ সমাজের মানুষ আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রসূল (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন, অন্যের সম্মান ও মর্যাদার রক্ষক এবং নিজের চিন্তায় ও চালচলনে নিয়মানুবর্তী। সেই সাথে এ সমাজ স্বীয় শৃংখলা রক্ষায় ও স্বীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণে নিজস্ব আইন-কানুনের অনুসারী যা উপরোক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি থেকেই উদ্ভূত। ফলে এ সমাজের ভেতর ও বাইর পরস্পরে সুসমন্বিত, এর আইন-কানুন ও আবেগ-অনুভূতি পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,এর উদ্বুদ্ধকারী ও সতর্ককারী নীতি ও বিধিসমূহ ভারসাম্যপূর্ণ এবং এর চেতনা-অনুভূতি ও বাস্তব পদক্ষেপ পরস্পরে একাত্ম। এরূপ পরিপূর্ণ সমন্বয় ও একাত্মতা সহকারে এ সমাজ আল্লাহর প্রতি অনুরাগী ও আল্লাহর দিকে অগ্রসরমান। এ সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ শুধুমাত্র বিবেকের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা-আবেগ-অনুভূতির পরিচ্ছন্নতার ওপর নির্ভরশীল নয়। অনুরূপ তা শুধুমাত্র আইন, শাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপরও নির্ভরশীল নয়। বরং উভয়টির সুষ্ঠু সমন্বয়ের ওপরই নির্ভরশীল। এ সমাজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চেতনা ও সাধনা অথবা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ম-বিধি ও পদক্ষেপসমূহের ভিত্তিতে গঠিত হয় না ও টিকে থাকে না। বরং এ সমাজে রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও তৎপরতা পূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

এ সমাজ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.)-এর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর বাণীর বাহক রসূল (স.)-এর সামনে বান্দার তৎপরতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার দৃষ্টান্ত এ সূরার প্রথম আয়াতেই লক্ষণীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু করো না। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সাবধান হও। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন।' অর্থাৎ কোনো আদেশ বা নিষেধ জারী করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের সীমা অতিক্রম করা কোনো মোমেন বান্দার পক্ষে সংগত নয়। কোনো

রায় দান বা ফয়সালা ঘোষণার বেলায়ও তাঁর সামনে অনাহূতভাবে স্ব-উদ্যোগে কোনো প্রস্তাব পেশ করা বৈধ নয়। তিনি যা আদেশ করেন বা যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা লংঘন করাও বৈধ নয়। আল্লাহর মোকাবেলায় নিজের কোনো মত বা ইচ্ছা পোষণ করাও জায়েয নেই। আল্লাহর ভয়, লজ্জা ও আদব তথা সম্মানের তাগিদেই এই অগ্রণী হওয়ার মনোভাব তাকে ত্যাগ করতে হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, রসূল (স.)-এর সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও বিশেষ আদব মেনে চলতে হবে। যেমন দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দিও না। আর নিজেরা পরস্পরে যেরূপ চড়াগলায় কথা বলে থাকো, রসূল (স.)-এর সাথে সেরূপ চড়াগলায় কথা বলো না, পাছে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎ কাজগুলো বাতিল হয়ে না যায়। .... আল্লাহ তায়ালা দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।'

এ সমাজের আরো একটা বৈশিষ্ট এই যে, এ সমাজের কারো কথা ও কাজ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। আর এই নীতিও আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত। এ ছাড়া আল্লাহর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কোনো কাজ না করা এবং কোনো অনাহূত প্রস্তাব না দেয়ার বাধ্যবাধকতা তো রয়েছেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার তদন্ত করো ও নিশ্চিত হও। ......আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'

এই সমাজে যে সব কলহ, কোন্দল সংঘটিত হয় এবং যার মীমাংসা না করলে সমাজে বিভেদ-বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান। যে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ দ্বারা এই সব কলহ-কোন্দলের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা হয়, তার ভিত্তি হলো মোমেনদের মধ্যকার সৌভ্রাতৃত্বের নীতি, ন্যায়বিচার ও মীমাংসার নীতি এবং আল্লাহভীতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ কামনা করার নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মোমেনদের দুই দল যদি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের বিবাদ মিটিয়ে দাও .... আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় যে, তোমরা অনুগ্রহভাজন হবে।'

এ সমাজে পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে কিছু মনস্তাত্ত্বিক রীতিনীতি রয়েছে। পরস্পরের সাথে আচরণেরও কিছু নীতিমালা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'হে মোমেনরা! কোনো গোষ্ঠীর উচিত নয় অপর কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রূপ করা .....যারা তাওবা করে না তারাই যালেম।'

এ সমাজ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরিচ্ছন্ন মনোভাব পোষণকারী। এখানে প্রত্যেকের সম্মান নিরাপদ। কেউ কারো অসাক্ষাতে নিন্দা করে না, কেউ নিছক ধারণার বশে কাউকে অভিযুক্ত করে না, কারো নিরাপত্তা, সম্মান ও ব্যক্তি স্বাধীনতা একেবারেই ক্ষুণ্ন হয় না। এরশাদ হচ্ছে, 'হে মোমেনরা, তোমরা বেশী ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। .... আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু।'

এ সমাজে মানব জাতির ঐক্যের পূর্ণাংগ ও পরিপক্ক ধারণা বিদ্যমান এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নিখুঁত ও নির্মল মানদন্ড নির্দিষ্ট রয়েছে, যা দিয়ে সে সকল মানুষের মূল্যায়ন করে এবং বহু জাতিক মানব সমাজকে এক জাতিতে পরিণত করে। এরশাদ হয়েছে, 'হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি....... আল্লাহর চোখে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।'

উল্লেখিত নির্মল, নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন ও মহৎ সমাজের বড় বড় বৈশিষ্টের উল্লেখ করার পর সূরাটি এবার ঈমানের আলামতসমূহ নির্দেশ করছে। আর এই ঈমানের নামেই মোমেনদেরকে উল্লিখিত সমাজ গঠনের ডাক দেয়া হয়েছে। এজন্যে কয়েকবারই 'হে মোমেনরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধন প্রত্যেক মোমেনের কাছে এতো প্রিয় যে, এর কারণে তার কাছে ইসলামের জন্যে যে কোনো কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হযে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বেদুইনরা বলেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি ......আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে জ্ঞানী।'

সবার শেষে সূরায় যে জিনিসটি তুলে ধরা হয়েছে, তা এই যে, ঈমান আল্লাহর একটা বিরাট বড় অনুগ্রহ, যারা এর যোগ্য, তিনি তাদেরকেই এই অনুগ্রহ দান করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, বলে তোমার কাছে কৃতিত্বের দাবী করে। তুমি বলে দাও, ইসলাম গ্রহণের জন্যে কৃতিত্বের দাবী করো না। বরং আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন সে জন্যে তিনিই কৃতিত্বের দাবীদার ....।'

সূরার দ্বিতীয় যে বৈশিষ্টটি সূরাটি অধ্যয়ন ও এর আনুষংগিক ঘটনাবলী পর্যালোচনাকালে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা এই যে, কোরআনের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে এবং রসূল (স.)-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মহৎ সমাজ গঠনের জন্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও অপ্রতিহতভাবে অত্যন্ত জোরদার ও আপোসহীন চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ সমাজ পৃথিবীতে এক সময় আবির্ভুত হয়েছিলো এবং চালু ছিলো। সুতরাং ইসলামের কাংখিত এই সমাজ ও এই বিশ্ব কোনো অবাস্তব আকাশ কুসুম কল্পনা নয়।

ইতিহাসের কোনো এক যুগে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শ সমাজটি আকস্মিকভাবে ও রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন একটি গাছের বীজ সুনির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করার পর বিরাট গাছে পরিণত হয়। এ জন্যে গাছের পেছনে অনেক দীর্ঘ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের প্রয়োজন হয়। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হতেও বহু দিনের ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এই সমাজকে তার আমানত বহনের জন্যে মনোনীত করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছিলেন। সেই যুগের সেই প্রজন্মের মধ্যে এ কাজের যোগ্যতা নিহিত ছিলো এবং সেই সময়কার পরিস্থিতি ও পরিবেশে এ কাজ সুসম্পন্ন করার ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন। এ সব উপাদানের সম্মিলন ঘটার কারণেই সেই অতুলনীয় সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো।

এবার আমি সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো।

তাফসীর

'হে মোমেনরা' সম্বোধন দ্বারা সূরাটির সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহকে না দেখেও যারা তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই ঈমানের গুণটি দ্বারাই মুসলমানরা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। ঈমান এমন একটি গুণ, যা মুসলমানদের অন্তরে এই চেতনার সৃষ্টি করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের জন্যেই, তারা তারই ব্যাজ বহনকারী, এই উপগ্রহে তারা তার অনুগত গোলাম ও সৈনিক। এ পৃথিবীতে তাদের আগমন শুধু তাদের মনিবের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপদানের জন্যে। তিনিই তাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়ে ধন্য ও অনুগৃহীত করেছেন। সুতরাং তাদের জন্যে এটাই বাঞ্ছনীয় যে, তিনি যা চেয়েছেন, সেটাই তারা করবে, যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করবে, যে অবস্থায় রেখেছেন, সে অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

মোমেনদের নৈতিক শিষ্টাচার

'হে মোমেনরা! আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কিছু করো না। আল্লাহর সম্পর্কে সতর্ক হও। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' অর্থাৎ হে মোমেনরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা বা আল্লাহর রসূলের কাছে অযাচিতভাবে কোনো প্রস্তাব দিও না। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও না, আশপাশের কোনো ব্যাপারেও না, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজে স্বীয় রসূলের মাধ্যমে কিছু বলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নির্দেশের সন্ধান না করে নিজেরা কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিও না।

কাতাদা বলেন, কিছু কিছু লোক বলতো, আমাদের সম্বন্ধে এ রকম নির্দেশ নাযিল হলে ভালো হতো। আল্লাহ তায়ালা এ কথাটা পছন্দ করেননি। আওফী বলেন, রসূল (স.)-এর সামনে বসে কথাবার্তা বলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোজাহেদের মতে এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের মাধ্যমে কোনো কিছু না জানানো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে নিজের মত অযাচিতভাবে ব্যক্ত করা। যাহোক বলেন, এর অর্থ এই যে, তোমরা শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-এর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করো না। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো বক্তব্য পেশ করো না।

এটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে আচরণের মনস্তাত্ত্বিক আদব বা রীতি। এটা শরীয়তের আদেশ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিও। তা ছাড়া এটা আইন প্রণয়ন ও কাজ করার একটা মূলনীতিও বটে। এর উৎস হচ্ছে আল্লাহর ভয় যা আল্লাহকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ বলে জানার ও মানার ফলে জন্ম লাভ করে। একটি ক্ষুদ্র আয়াতে এতগুলো বড় বড় তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।

এভাবেই মোমেনরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদব শিখেছেন। ফলে কোনো মুসলমান কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের নির্দেশের অপেক্ষা না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতো না।

হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) মায়ায বিন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিসের আলোকে বিচার-ফয়সালা করবে?' মায়ায বললেন, আল্লাহর কেতাবের আলোকে। রসূল (স.) বললেন, সেখানে যদি না পাও, তাহলে? মায়ায বললেন, রসূলের সুন্নাহর আলোকে। রসূল (স.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানেও যদি না পাও?' মায়ায বললেন, তাহলে আমি নিজের মতের আলোকে ইজতেহাদ করবো। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি তাঁর রসূলের দূতকে রসূল (স.)-এর পছন্দ মোতাবেক কাজ করার যোগ্যতা দান করেছেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা) এমনকি রসূল (স.) যখন তাদেরকে হুজ্জাতুল বিদার দিন স্থান ও দিনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তারা তার জবাব জানা সত্তেও বলতে সংকোচ বোধ করেন। কেননা, এটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কথা বলার পর্যায়ে পড়তে পারে বলে আশংকা ছিলো। তাই তারা এভাবে জবাব দেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন।

হাদীসে আছে যে, বিদায় হজ্জে রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন মাস? সবাই বললো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। রসূল (স.) খানিকক্ষণ চুপ থাকলেন। সবাই মনে করলো যে, রসূল (স.) বোধ হয় এর কোনো নতুন নাম রাখবেন। অতপর বললেন, এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? সবাই বললো, হাঁ।

অতপর রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন শহর? সবাই বললো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এবারও তিনি খানিকটা থামলেন। সবাই মনে করলো যে, তিনি বোধ হয় এর কোনো নতুন নাম রাখবেন। অতপর বললেন, এটা কি পবিত্র শহর নয়? সবাই বললো, হাঁ। অতপর তিনি পুনরায় বললেন, এটা কোন দিন? সবাই বললো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) ভালো জানেন। অতপর তিনি থামলেন। সবাই ভাবলো, তিনি বোধ হয় এ দিনটির কোনো নতুন নাম রাখবেন। অতপর তিনি বললেন, এটা কি কোরবানীর দিন নয়? সবাই বললো, হাঁ।

এ হচ্ছে মুসলমানদের অর্জিত আল্লাহভীতিমূলক আদব বা সম্মানের একটি রূপ।

আদব বা সম্মানের দ্বিতীয় রূপটি হচ্ছে রসূল (স.)-এর সাথে কথাবার্তায় ও সম্বোধনে অনুসৃত আদব বা শ্রদ্ধাপূর্ণ রীতি এবং তাদের অন্তরে রসূলের প্রতি এরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করা, যা তাদের আচরণে ও কণ্ঠস্বরে পর্যন্ত প্রকাশ পায় এবং তাদের মধ্যে রসূল (স.)-এর উপস্থিতি ও উপবেশনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। আল্লাহ তায়ালা এই আদবের আহবানই জানিয়েছেন এ আয়াতে, 'হে মোমেনরা! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেমন চড়া গলায় কথা বলে থাকো, তাঁর সাথে সেভাবে কথা বলো না, পাছে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎ কাজগুলো নষ্ট হয়ে না যায়।'

এখানে প্রকারান্তরে এ কথাই বলা হয়েছে যে, তোমরা যখন ঈমানদার, তখন যে নবী তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডেকেছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো, নচেৎ তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎ কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমানদের হৃদয়ে এই আহবান খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

ইমাম বোখারী বর্ণিত এক হাদীসে আবু মুলায়কা বলেন যে, রসূল (স.)-এর সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তি আবু বকর ও ওমরের সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। একবার বনু তামীমের একটি কাফেলা রসূল (স.)-এর কাছে এলে (৯ম হিজরীতে) তাদের একজন রসূল (স.)-কে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন বনু মোজাশে গোত্রের আকরা বিন হাবেস (রা.)-কে কাফেলার নেতা বানান। আর অপরজন এসে অপর এক ব্যক্তিকে (মতান্তরে কা'কা ইবনে মাবাদকে) নেতা বানাতে পরামর্শ দিলেন। আবু বকর (রা.) ওমর (রা.)-কে বললেন, তুমি শুধু আমার বিরোধিতাই করতে চেয়েছো। ওমর (রা.) জবাব দিলেন, আমি তোমার বিরোধিতা করতে চাইনি। এভাবে দু'জনে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হলে তাদের কণ্ঠস্বর চড়া হয়ে গেলো। এই ঘটনা উপলক্ষেই এ আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর রসূল (স.)-এর কোনো কথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) তা ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতেন। আর হযরত আবু বকর (রা.) রসূল (স.)-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি আপনার সাথে ফিসফিস করে কথা বলবো।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সাবিত ইবনে কায়েস অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি বললেন, আমিই তো রসূল (রা.)-এর সামনে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতাম, আমি তো দোযখবাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছি। আমার সমস্ত সৎ কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। অতপর তিনি নিদারুণ মর্মাহত অবস্থায় নিজ গৃহে বসে রইলেন। ওদিকে রসূল (স.) তাকে খুঁজতে লাগলেন। কেউ কেউ সাবেতকে গিয়ে জানালো যে, রসূল (স.) তোমাকে খুঁজছেন। তোমার হয়েছে কী? সাবেত বললেন, আমি রসূল (স.)-এর সামনে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতাম। আমার সৎকাজ বরবাদ হয়ে গেছে এবং আমি দোযখবাসী রূপে চিহ্নিত হয়ে

গিয়েছি। লোকেরা রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে তার কথা জানালো। রসূল (স.) বললেন, না, 'সে বরং জান্নাতবাসী।' হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, আমরা তাকে আমাদের আশপাশে দেখতাম এবং জানতাম যে, সে এক জান্নাতবাসী।

এভাবেই তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছিলো উক্ত আয়াতের প্রভাবে। নিজেদের অজান্তে করা সকল সৎকাজ বাতিল হয়ে যাওয়ার ভয়ে রসূল (স.)-এর সামনে এরূপ আদব রক্ষা করে চলতেন। তাদের জ্ঞাতসারে ব্যাপারটা হলে তারা আগে ভাগেই এর ব্যবস্থা করে রাখতেন। এই অজানা আশংকা তাদেরকে সর্বাধিক ভীত করে রাখতো।

পক্ষান্তরে যারা সংযত কণ্ঠস্বরে কথা বলতো, তাদের প্রশংসা করা হয় পরবর্তী আয়াতে, 'যারা রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর সংযত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে খোদাভীতি দ্বারা পূর্ণ করার জন্যে বেছে নিয়েছেন। .....'

এ থেকে বুঝা যায় যে, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এমন একটা মর্যাদাপূর্ণ নেয়ামত যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক একমাত্র উপযুক্ত হৃদয়কেই বাছাই করেন। যারা রসূল (স.)-এর সামনে সংযতভাবে কথা বলে, তাদের হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন এবং উক্ত দান গ্রহণের যোগ্যতা দিয়েছেন। এ ছাড়া ক্ষমা ও বড় বড় পুরস্কারও তাদেরকে দান করবেন।

এভাবে ভয়ংকর ভীতি প্রদর্শনের পর আকর্ষণীয় পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েই আল্লাহ তায়ালা তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজের জন্যে প্রস্তুত করেন।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে দুই ব্যক্তির চড়া আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাত মসজিদের ভেতরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান যে, তোমরা কোথায় আছো? তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা বললেন, আমরা তায়েফের অধিবাসী। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা যদি মদীনার লোক হতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে পিটুনি দিতাম।

আলেমরা বলেন যে, রসূল (স.)-এর কবরের কাছেও উচ্চকণ্ঠে কিছু বলা বা পড়া মাকরূহ, যাতে তাঁর প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত হয়।

পরবর্তী আয়াতে নবম হিজরীতে রসূল (স.)-এর কাছে আগত বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর এই বছর আরবের সকল অঞ্চল থেকে এতো প্রতিনিধিদল রসূল (স.)-এর কাছে এসেছিলো যে, বছরটিকে 'আমুল উফুদ' বা প্রতিনিধি দলসমূহের বছর বলা হয়। এই সমস্ত প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করতে আসতো। বনু তামীমের উক্ত প্রতিনিধি দলটিতে কিছু মূর্খ ও অমার্জিত ধরনের লোক ছিলো। যেহেতু রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের কক্ষগুলোকে মসজিদে নববী থেকে দেখা যায়, তাই এই প্রতিনিধিদল মসজিদ থেকেই এভাবে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলো, 'হে মোহাম্মদ, আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন!' এই বিব্রতকর ও অমার্জিত আচরণ রসূল (স.)-এর পছন্দ হয়নি। তাই নাযিল হলো পরবর্তী আয়াত, 'যারা তোমাকে বাড়ীর বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ।........' এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের অধিকাংশকে নির্বোধ আখ্যায়িত করলেন এবং এই বেয়াদবী ও অসম্মানজনক হাঁক-ডাক রসূল (স.)-এর সুমহান ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই নয়, তাও জানিয়ে দিলেন। সেই সাথে এও জানিয়ে দিলেন যে, তারা যদি রসূল (স.)-এর স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো, তাহলে ভালো হতো। আয়াতের শেষ ভাগে তাদেরকে তাওবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা করতে বলা হয়েছে।

মুসলমানরা এই উচ্চ মানের আদব বা ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণকে রপ্ত করেছে যে, তা শুধু রসূল (স.) পর্যন্ত সীমিত থাকেনি, বরং প্রত্যেক আলেমের সাথে এরূপ আচরণ করেছে। নিজে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কাউকে বিরক্ত করতো না এবং না ডাকলে তার কাছে আসতো না। বিশিষ্ট আলেম আবু ওবাদ বলেছেন যে, আমি কোনো আলেমের কাছে যখনই গিয়েছি, তিনি নিজের নির্দিষ্ট সময়ে বের না হওয়া পর্যন্ত কখনো তার দরজায় করাঘাত করিনি।

তথ্যের সত্যতা যাচাই করা

'হে মোমেনরা, তোমাদের কাছে কোনো ফাসেক কোনো খবর আনলে তার সত্যাসত্য যাচাই করো।'

বিশেষভাবে ফাসেকের উল্লেখ করার কারণ এই যে, তার সম্পর্কে মিথ্যার ধারণা প্রবল হয়ে থাকে। ফাসেকের কথা উল্লেখ করার আর একটি কারণ এই যে, মুসলিম সমাজে ও সংগঠনে প্রচারিত কোনো খবর নিয়ে যেন সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। এমনটি হলে তার তথ্য প্রবাহে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। বস্তুত মোমেনদের দলে মৌলিক আকাংখিত জিনিস হলো তার সদস্যদের বিশ্বস্ততা এবং তাদের প্রচারিত খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা। শুধুমাত্র ফাসেকই সন্দেহজনক থাকবে-যতক্ষণ তার খবর প্রমাণিত না হয়। ইসলামী সমাজ ও সংগঠনের কাছে যখন কোনো খবর পৌঁছবে, তখন তার প্রশাসন উক্ত খবর গ্রহণ ও বর্জনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। ফাসেকের খবরের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে তাড়াহুড়া করবে না, যাতে অজ্ঞতাবশত কারো বিরুদ্ধে অন্যায় ও অবিচারমূলক পদক্ষেপ গৃহীত না হয় এবং পরিণামে আল্লাহর ক্রোধোদ্দীপক কাজ করে অনুশোচনা করতে না হয়।

নাযিলের পটভূমিকা

বহু সংখ্যক মোফাসসের উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াত ওলীদ বিন ওকবার উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। রসূল (স.) তাকে বনু মুসতালেকের যাকাত আদায় করে আনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন, ওলীদ ফিরে এসে জানালো যে, বনুল মুসতালিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে (কাতাদার মতে তারা ইসলামও ত্যাগ করেছে বলে সে জানিয়েছিলো।) রসূল (স.) তাদের কাছে খালেদ বিন ওলীদকে পাঠালেন এবং তাকে আদেশ দিলেন, যেন তিনি তাড়াহুড়া না করেন, বরং ধীরস্থিরভাবে সত্যাসত্য যাচাই করেন। খালেদ তাদের কাছে রাতের বেলায় পৌঁছলেন এবং তার প্রধান প্রধান সহচরদেরকে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা ফিরে এসে খালেদকে জানালো যে, গোত্রটি ইসলামের ওপর অবিচল আছে এবং তারা তাদের আযান ও নামায শুনেছে। সকাল বেলা খালেদ নিজে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি রসূল (স.)-এর কাছে ফিরে এসে প্রকৃত ব্যাপার জানালেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন। কাতাদা বলেছেন যে, রসূল (স.) বলতেন, ধৈর্যের সাথে সত্যাসত্য যাচাই করা আল্লাহর প্রেরণা থেকে উদ্ভূত কাজ আর তাড়াহুড়া করা শয়তানের প্ররোচিত কাজ। (ইবনে কাসীর)

আয়াতের বক্তব্য ব্যাপক ও সর্বাত্মক। ফাসেকের খবর প্রমাণ সাপেক্ষ, আর সৎ মোমেন বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, মোমেনদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক ও মূলকথা। ফাসেকের খবর ব্যতিক্রম, আর সৎ লোকের খবর বিশ্বাস করা সত্যাসত্য যাচাই করার নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা, সৎ লোক সঠিক খবরের অন্যতম উৎস। সকল খবরে ও সকল খবরদাতায় সন্দেহ প্রকাশ করা মুসলমানদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বস্ততার সাধারণ নীতির পরিপন্থী এবং তাতে

সমাজের সাধারণ জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। ইসলাম সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত না করে তাকে তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেয়ার পক্ষপাতী। সে যে সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কড়াকড়ি আরোপ করে, তা কেবল তার নিরাপত্তার জন্যেই করে। তাকে একেবারে অচল করে দেয়ার জন্যে নয়। খবরের সূত্র ও উৎস সম্পর্কে সাধারণ নীতি ও ব্যতিক্রমী নীতির মূলকথা এটাই।

সম্ভবত ওলীদ বিন ওকবার খবর শুনে মুসলমানদের কতকের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তারা রসূল (স.)-কে ত্বরিত পদক্ষেপ নিয়ে বনু মুসতালেককে শাস্তি দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলো। এ পরামর্শের কারণ ছিলো এই যে, উত্তেজিত গোষ্ঠীটি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ ছিলো এবং যাকাত না দিতে চাওয়ায় ক্রোধে অধীর হয়ে পড়েছিলো। এ জন্যে পরবর্তী আয়াতে তাদের কাছে বিদ্যমান এক দুর্লভ নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তারা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি করে এবং সর্বদা তার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এই নেয়ামতটি আর কিছু নয়–স্বয়ং রসূলুল্লাহর অস্তিত্ব।

'জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন।' এটি এমন একটি সত্য যা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কেননা, এটি বিদ্যমান ও দৃশ্যমান। তবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এটি একটি গরুত্বপূর্ণ সত্য, যা সহজে উপলব্ধি করা যায় না। মানুষ মহান আল্লাহর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা যখন তখন মানুষের সাথে কথা বলবেন, তাদের গোপন ও প্রকাশ্য খবর জানবেন, তাদের ভুলত্রুটি শুধরে দেবেন, তাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন, তাদের কে কি করলো, কে কি বললো, কে মনের কোন কথা গোপন করলো, তা আল্লাহ তায়ালা জেনে তাঁর রসূলকে জানাবেন এবং তাকে যা করা দরকার তা করতে বলবেন–এটা কি সহজ ব্যাপার? নিশ্চয়ই নয়। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। রসূলকে যারা হাতের কাছে ও নাগালের মধ্যে পেয়েছে, তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি নাও করতে পারে। এ জন্যেই রসূল (স.)-এর বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে এভাবে সাবধান করা হয়েছে যে, 'জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন।' অর্থাৎ এই দুর্লভ নেয়ামতের যথাযথ কদর করো। কেননা, এ এক অসাধারণ নেয়ামত।

এই অসাধারণ নেয়ামতের অন্যতম দাবী এই যে, মুসলমানরা যেন আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে কোনো কাজ না করে। এই নির্দেশকে অধিকতর স্পষ্ট ও জোরদার করা হয়েছে এই বলে যে, রসূল (স.) আল্লাহর ওহী ও এলহাম দ্বারা তাদের জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা করেন, তাতেই তাদের কল্যাণ, অনুগ্রহ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে তারা নিজেরা যে জিনিসকে ভালো মনে করে, তার জন্যে তারা যদি রসূলকে পরামর্শ দেয় এবং রসূল (স.) যদি তাদের পরামর্শ খুব বেশী মেনে চলেন, তাহলে তারা কষ্টে পতিত হবে। কেননা, তাদের কিসে ভালো হবে, তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।' আর তাঁর রসূল মুসলমানদের জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা করেন ও মনোনীত করেন, তা তাদের জন্যে আল্লাহর এক অনুগ্রহ বলা হয়েছে, 'তিনি যদি তাদের পরামর্শের খুব বেশী আনুগত্য করেন, তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে।'

এখানে পরোক্ষভাবে এ কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের উচিত তাদের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের হাতে ন্যস্ত করা। পুরোপুরি ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করা। আল্লাহর ফয়সালা ও ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁকে পরামর্শ না দিয়ে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করা।

রেসালাতের অতুলনীয় নেয়ামত

অতপর মোমেনদের দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন ঈমানের ন্যায় অমূল্য নেয়ামতের প্রতি, যার দিকে তিনি তাদেরকে পথ-প্রদর্শন করেছেন, তার প্রতি তাদের হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা ও আসক্তি সৃষ্টি করেছেন, তার সৌন্দর্য ও মহত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীকে তাদের কাছে অপছন্দনীয় করেছেন। এ সবই আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। বলা হয়েছে, 'কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে তাকে সুন্দর করেছেন ......।'

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর এক দল বান্দার বক্ষকে ঈমানের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া, ইসলামকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে দিয়ে তার দিকে তাদের মনকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামের কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে দেয়া আল্লাহর অসাধারণ নেয়ামত ও অনুগ্রহ। অন্য সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহ তার সামনে তুচ্ছ। এমনকি জীবন ও জগতের মতো বিরাট ও বিশাল নেয়ামতও ঈমানের চেয়ে তুচ্ছ জিনিস। এ সম্পর্কে আলোচ্য সূরার শেষাংশে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

এখানে যে জিনিসটি পাঠককে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে, তা হলো এই যে, আল্লাহই যে তাদের জন্যে এই কল্যাণ কামনা করেছেন এবং তিনিই যে তাদের মনকে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানী থেকে মুক্ত করেছেন, সেই কথা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তিনিই নিছক অনুগ্রহের বশে তাদেরকে সুপথগামী করেছেন, আর এসবই ছিলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত। আর এ কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে বান্দাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ ও পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পন। এর ভেতরে যে কল্যাণ রয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং স্বকল্পিত কল্যাণের জন্যে পরামর্শ দান, তাড়াহুড়া করা ও উত্তেজিত হওয়া থেকে বিরত হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে যা সিদ্ধান্ত নেন তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহর রসূল এই কল্যাণের দিকে বান্দাদেরকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে রয়েছেন। এটাই এ আয়াতের মূল বক্তব্য।

মানুষ তাড়াহুড়া করতে অভ্যস্ত। অথচ সে তার প্রতি পদক্ষেপের পরিণাম জানেনা। মানুষ নিজের জন্যে ও অন্যের জন্যে পরামর্শ দেয়। অথচ সে জানে না তার পরামর্শে কতটুকু কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মানুষ কল্যাণের জন্যে যেমন প্রার্থনা করে, অকল্যাণের জন্যেও তেমনি করে। মানুষ বড়ই দ্রুততাপ্রিয়।' মানুষ যদি পুরোপুরিভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতো এবং বুঝতো যে, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন, তা তার নিজের পছন্দের চেয়ে কল্যাণকর ও উপকারী, তাহলে সে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারতো। পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র জীবনে সে সুখী হতে পারতো। কিন্তু এই সুখও আল্লাহর দান, যাকে তা দেন সেই তা পায়।

পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার নীতিমালা

'দুটি মোমেন দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আপোস করিয়ে দাও।'

এ হচ্ছে ইসলামী সমাজকে শত্রুতা ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার বাস্তব বিধান। ফাসেকের খবরের সত্যাসত্য যাচাই এবং উত্তেজনাবশত ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত বক্তব্যের পরই এ বিষয়টির আগমন ঘটলো।

বিভিন্ন রেওয়ায়াতের বক্তব্য অনুসারে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা থাকুক, অথবা এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে এ বিধি জারী হয়ে থাকুক–উভয় অবস্থাতেই মুসলিম জাতি এ আয়াতটিতে, রাষ্ট্র, সমাজ বা সংগঠনকে দলাদলি ও সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। অতপর সত্য, ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠায় এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর ভয় ও অনুগ্রহের আশা পোষণেও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

মোমেনদের যে কোনো দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কোরআন নাযিল হওয়ার সময় দেখা দিয়ে থাকতে পারে অথবা কোরআন এর সম্ভাবনা আঁচ করে থাকতে পারে। আর দুই দলের এরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সত্তেও তাদের উভয়ের একটি অপরটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়া সত্তেও অথবা উভয় দলেরই কোনো না কোনো দিক দিয়ে বিদ্রোহী হওয়া সত্তেও তাদের উভয়ের মধ্যে ঈমান বহাল থাকা সম্ভব বলে কোরআন স্বীকার করে।

এরূপ পরিস্থিতিতে সংঘাত-সংঘর্ষের সাথে যারা জড়িত নয় সেই সাধারণ মুসলমানদের ওপর সে এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, তারা যেন সংঘর্ষে লিপ্ত দল দুটির বিবাদ মিটিয়ে দেয়। কিন্তু দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি এই মীমাংসা না মানে ও হক পথে ফিরে আসতে রাযী না হয় অথবা উভয় পক্ষই সন্ধি বা মীমাংসা অগ্রাহ্য করে এবং বিবদমান বিষয়ে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে, তাহলে অমান্যকারী উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করা মুসলমানদের কর্তব্য। যতক্ষণ তারা আল্লাহর বিধান মেনে নিতে সম্মত না হয়, ততক্ষণ এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে আল্লাহর বিধান বলতে বুঝায় মোমেনদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধের কারণ ঘটিয়েছে সে বিষয়ে, আল্লাহর নির্দেশ ও ফয়সালা মেনে নেয়া। সংর্ঘষে লিপ্তরা যখন আল্লাহর ফয়সালা ও নির্দেশ মেনে নেবে, তখন মুসলমানদের কর্তব্য হবে সূক্ষ্ম ইনসাফের ভিত্তিতে স্থায়ী মীমাংসার ব্যবস্থা করা যাতে আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি লাভ নিশ্চিত হয়। কেননা, 'আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

সংঘর্ষ বন্ধ করা ও স্থায়ী মীমাংসা করিয়ে দেয়ার এই আহবান জানানো ও নির্দেশ দানের পর মোমেনদের হৃদয়ে আবেগ ও উদ্দীপনা সঞ্চার, তাদের ভেতরকার অটুট বন্ধনকে পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর ভয় দ্বারা তাঁর যে রহমত লাভ করা যায় তার আশার সঞ্চার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

মোমেনরা পরস্পর ভাই

'মোমেনরা তো পরস্পরের ভাই ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই (বিবদমান) ভাই-এর মধ্যে আপোস করিয়ে দাও, আর আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে আশা করা যায় যে, তোমরা আল্লাহর রহমত পাবে।'

এই ভ্রাতৃত্বের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই যে, পারস্পরিক মমত্ব সম্প্রীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্য মুসলিম জাতি, সমাজ ও দলের মূল অবস্থা হিসাবে বিরাজ করবে। মতোভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহ যদি ঘটেই, তবে তা ঘটবে ব্যতিক্রম ও দুর্ঘটনা হিসাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে মূল অবস্থায় ফিরে যাওয়া অপরিহার্য কর্তব্য রূপে গণ্য হবে। মুসলিম ভাইদের মধ্যে যারা এতো জেদী ও হটকারী হবে যে, কোনোক্রমেই আপোস মীমাংসা মেনে নিতে রাযী নয়, তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা ঐক্য ও মীমাংসার পথে ফিরে আসে। যে কোনো মূল্যে মূল অবস্থার এই ব্যত্যয় ও ব্যতিক্রমের অবসান ঘটাতেই হবে। এটি একটি অপরিহার্য কঠোর ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হবে।

এই বিধানের স্বাভাবিক দাবী এই যে, বিদ্রোহ ও সংঘাত অবসানের এই যুদ্ধে কোনো পক্ষের আহত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। বন্দীকে হত্যা করা যাবে না, যুদ্ধ ছেড়ে ও অস্ত্র ফেলে পলায়নরতদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না এবং বিদ্রোহীদের ধন সম্পদকে গনীমত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তাদেরকে ধ্বংস করা নয়, বরং শুধু ঐক্য ও আপোসের পথে ফিরে আসতে বাধ্য করা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত করা।

মুসলমানদের একক নেতৃত্ব

মুসলিম জাতির মূলনীতি এই যে, পৃথিবীর সকল অঞ্চল জুড়ে একই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিরাজ করবে এবং কোনো একজন নেতা বা শাসকের প্রতি সমর্থন দিয়ে তাকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার পর শাসন ক্ষমতার দ্বিতীয় দাবীদারকে হত্যা করা ওয়াজেব হবে। এই ব্যক্তি ও তার সাথীদেরকে বিদ্রোহী গণ্য করতে হবে এবং মূল নেতার ও শাসনের সেনাদলে যোগ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। এই মূলনীতির আলোকেই হযরত আলী (রা.) উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী ও মর্যাদাশীল সাহাবীরা তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে ওসামা ইবনে যায়েদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরসহ কিছু সংখ্যক সাহাবী অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। এর কারণ এও হতে পারে যে, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে কোন পক্ষ সত্যের ওপরে আছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেননি এবং ঘটনাটাকে একটা ফেতনা বা পরীক্ষা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। ইমাম জাসসাসের মতানুসারে এর কারণ এও হতে পারে যে, তাঁরা ভেবেছেন, হযরত আলী (রা.) নিজের জন্যে তাঁর সংগী সাথীদেরকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। তাই তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকাকে বৈধ মনে করেছেন।

তবে প্রথমোক্ত মতটিই অগ্রগণ্য। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক এই যুদ্ধে অংশ না নেয়ার জন্যে পরবর্তীকালে অনুশোচনা প্রকাশ করা থেকে বুঝা যায় আগের মতটিই সঠিক।

এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত আছে মেনে নিলেও কোরআনের এই বিধানের প্রয়োগ সর্বাবস্থায় সম্ভব। এমনকি মুসলিম অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ও বহু দূরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশে একাধিক শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেও কোরআনের এই বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব। এ সব ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন শাসকের পক্ষে যুদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য। অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, এমন দলগুলো যখন পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহী তথা আপোস প্রচেষ্টা অমান্যকারী পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ তারা আল্লাহর হুকুম মানতে তথা আপোস মীমাংসা মানতে সম্মত না হয়। এভাবে কোরআনের এ বিধি সর্বাবস্থায় কার্যকর করা সম্ভব।

মীমাংসা করে দেয়া এবং মীমাংসা অমান্যকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা যতক্ষণ সে মীমাংসা মানতে সম্মত না হয় এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা এই পথে পরিচালিত সকল মানবীয় চেষ্টা সাধনার ওপর কালগত দিক দিয়ে অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। মানুষের সীমিত অভিজ্ঞতার পরিসরে তার পরিচালিত সকল চেষ্টা তৎপরতার মধ্যে এই ব্যবস্থাটা নিখুঁতও বটে। বিশেষত এই ব্যবস্থাটা পরিচ্ছন্নতা, বিশ্বস্ততা ও সর্বাত্মক ইনসাফের গুণেও গুণান্বিত। কেননা, এখানে আল্লাহর বিধানের আলোকে মীমাংসার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যা সকল স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তির লালসা ও ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধে। মানুষের সামনে এই নিখুঁত ও নির্ভুল পথ থাকা সত্ত্বেও সে যখন মনগড়া পন্থায় সমস্যাবলীর সমাধান করতে চায়, তখন তা হয় ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত।

মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট

'হে মোমেনরা! কোনো গোষ্ঠীর উচিত নয় অপর গোষ্ঠীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।......।'

কোরআনের পথনির্দেশিকা অনুসারে ইসলাম যে মহান সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সে সমাজে একটা উন্নত মানের কৃষ্টি ও আচরণ-রীতি বিরাজ করে। সে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি এমন মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে যা অলংঘনীয়। ব্যক্তির সম্মান তার চোখে সমষ্টির সম্মানেরই অংশ এবং ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ ও অসদাচরণ সমষ্টির প্রতি অসদাচরণেরই অংশ। কেননা, সমাজ একটি অখন্ড একক এবং তার মর্যাদাও অখন্ড।

কোরআন এখানে আবার সেই প্রিয় সম্বোধনটির পুনরাবৃত্তি করেছে, 'হে মোমেনরা'! অতপর তাদেরকে পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে, চাই তা পুরুষ কিংবা স্ত্রী যেই হোক না কেন। কেননা, যাকে বিদ্রূপ করা হয় সে আল্লাহর দৃষ্টিতে বা মূল্যায়নে বিদ্রূপকারী বা বিদ্রূপকারিণীর চেয়ে ভালোও হয়ে যেতে পারে।

এখানে পরোক্ষভাবে এ কথাই বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নিজেদের মধ্যে যে সব জিনিসকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড মনে করে থাকে, সেগুলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপ করার প্রকৃত মানদন্ড নয়। শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপ করার আরো কিছু মানদন্ড থাকতে পারে, যা হয়তো মানুষ জানে না, শুধু আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং তা দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে মূল্যায়ন করে থাকেন। কখনো ধনী পুরুষ দরিদ্র পুরুষকে, সবল পুরুষ দুর্বল পুরুষকে, সুঠাম ও সুদর্শন পুরুষ কুৎসিত পুরুষকে, মেধাবী, চতুর ও দক্ষ মানুষ অমেধাবী সাদাসিধে ও অদক্ষ মানুষকে, সন্তানধারী মানুষ নিসন্তান মানুষকে এবং যার পিতামাতা আছে সে পিতৃমাতৃহীনকে উপহাস করে থাকে। আবার সুন্দরী রমণী কুশ্রী রমণীকে, যুবতী বৃদ্ধাকে, সর্বাঙ্গ সুগঠিত নারী বিকলাংগ নারীকে এবং ধনী নারী দরিদ্র নারীকে ব্যংগ-বিদ্রূপ করে থাকে। কিন্তু এসব উপকরণ পার্থিব উপকরণ মাত্র–মানদন্ড নয়। এ সব উপকরণ ছাড়াই আল্লাহর মানদন্ডে মূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে।

হিংসা অপবাদ বিদ্বেষ সম্পর্কিত হুশিয়ারী

কিন্তু কোরআন শুধু এই পরোক্ষ উক্তি করেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আবেগ জাগিয়ে তুলেছে এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, যাদেরকে দোষারোপ করা হয়, তারা আসলে আপন লোক। তাদেরকে দোষারোপ করলে নিজেদেরকেই দোষারোপ করা হয়। তাই কোরআন বলছে, 'তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ করো না।' 'লাম্‌য্' শব্দটার অর্থ দোষ। তবে এ শব্দটি থেকে এমন একটি ধ্বনি ঝংকৃত হয় এবং অন্তরে তা এমন রেখাপাত করে যে, একে একটা অনুভবযোগ্য আবর্জনা বলে মনে হয়, সূক্ষ্ম ও মানসিক দোষ বলে মনে হয় না।

মানুষকে রকমারি ঘৃণ্য উপাধিতে ভূষিত করার মাধ্যমে তাকে বিদ্রূপ, উপহাস ও দোষারোপ করা হয়ে থাকে। এটা প্রত্যেক মুসলমানের ন্যায্য অধিকার যে, সে অন্য কোনো মুসলমানের পক্ষ থেকে এমন কোনো উপাধি লাভ করবে না যা সে অপছন্দ করে এবং যা দ্বারা তার ওপর কোনো কলংক আরোপ করা হয়। আর প্রত্যেক মোমেনের এটা কর্তব্য ও আদবের অন্তর্ভুক্ত যে, তার দ্বীনী ভাইকে সে এধরনের উপাধি দ্বারা সম্বোধন করার মাধ্যমে লাঞ্ছিত করবে না। রসূল (স.) জাহেলিয়াত যুগের এমন বহু নাম ও উপাধি পাল্টে দিয়েছিলেন, যাকে তাঁর সংবেদনশীল অনুভূতি ও মহানুভব হৃদয় দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তা উক্ত নাম বা উপাধির অধিকারীর ওপর কলংক লেপন বা দোষারোপ করে।

আল্লাহর চোখে শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মানদন্ড কী, সে সম্পর্কে পরোক্ষভাবে ধারণা দেয়ার পর এবং ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়ার পর আয়াতটি ঈমানের প্রকৃত মর্মার্থ বিশ্লেষণ করছে এবং মোমেনদেরকে এই গুণটি অর্থাৎ ঈমানের গুনটি হারানো ও তা থেকে বিপদগামী হয়ে মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, দোষারোপ করা ও বিকৃত উপাধি দ্বারা সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকার জন্যে সতর্ক করে দিচ্ছে। বলছে, 'ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা খুবই গর্হিত কাজ।' মন্দ নামে ডাকা তথা নাম বিকৃত করে খারাপ উপাধি দিয়ে সম্বোধন করা ইসলামকে পরিত্যাগ করার পর্যায়ভুক্ত। অতপর একে যুলুম বলে অভিহিত করার হুমকি দেয়া হয়েছে যা কিনা শেরেকের অপর নাম। বলা হয়েছে, 'যে তাওবা করে না, সে যালেম।' এবাবে মহানুভব ও ভদ্র ইসলামী সমাজের মনস্তাত্ত্বিক আচরণবিধি রচনা করা হয়েছে আয়াতটিতে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে মোমেনরা, তোমরা অত্যধিক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপ।'

এ আয়াতে ইসলামী সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই সমাজে লোকদের মর্যাদা ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। পাশাপাশি এতে মানুষের বিবেক ও আবেগ-অনুভূতিকে কি ভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায় ও রাখা যায় তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভংগিতে শেখানো হয়েছে। এ আয়াতও একই প্রিয় সম্বোধন 'হে মোমেনরা' দ্বারা শুরু করা হয়েছে। আদেশ দেয়া হয়েছে ধারণার আধিক্য পরিহার করে চলতে এবং নিজ নিজ মনকে অপরের সম্বন্ধে সন্দেহ সংশয় ও ধারণার লীলাভূমিতে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, 'কিছু কিছু ধারণা পাপ'। এখানে নিষেধাজ্ঞাটি যেহেতু অধিকাংশ ধারণার বিরুদ্ধে এবং কিছু ধারণা পাপ, তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, খারাপ ধারণা পোষণ সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। কেননা, কোন ধারণাটি পাপ, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

এভাবে কোরআন মানুষের মনকে খারাপ ধারণার নোংরামি থেকে পবিত্র করেছে, যাতে সে পাপে লিপ্ত হওয়া ও সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এভাবে ইসলামী সমাজের প্রত্যেক মানুষের মনে শুধু তার ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা সংশয়হীনতা ও পরিপূর্ণ মানসিক শক্তি বিরাজ করবে। যাবতীয় কূ-ধারণামুক্ত একটি সমাজে জীবন যে কতো শান্তিময় ও আনন্দময় হতে পারে, তা সত্যিই অভাবনীয়।

মানুষের হৃদয় ও বিবেককে ইসলাম শুধু যে কূ-ধারণামুক্ত থাকার প্রশিক্ষণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছে, তা নয়, বরং এই শিক্ষাকে সামাজিক আচরণের ভিত্তি এবং একটি পরিচ্ছন্ন সমাজে সহাবস্থানের একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সমাজের কাউকে নিছক ধারণার বশে পাকড়াও করা যাবে না। সন্দেহের বশে বিচারে সোপর্দ করা যাবে না। ধারণা ও অনুমানকে বিচারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি ধারণার ভিত্তিতে তদন্তেও অগ্রসর হওয়া যাবে না। রসূল (স.) বলেছেন, 'যখন তুমি কোনো ধারণা পোষণ করবে, তখন তদন্ত চালাবে না।' (তাবারানী) অর্থাৎ মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্মান সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরাপদ থাকবে-যতক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হয় যে, সে সেই কাজটি সত্যিই করেছে, যার জন্যে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কাউকে তদন্তের শিকার করতে নিছক ধারণা ও অনুমান যথেষ্ট নয়, বরং আনুষ্ঠানিক অভিযোগও আবশ্যক।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এ আয়াতগুলোতে মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে কতো ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে যে সব দেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষিত, তাতে কোরআনে নির্দেশিত ইসলামী সমাজের বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তারও আগে মুসলিম গনমানসে, বিবেকে ও চেতনায় জাগ্রত সেই মানবাধিকারের কতোটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে?

এরপর ধারণা ও অনুমানের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো একটি মূলনীতি বর্ণনার মাধ্যমে সমাজকে রক্ষাকবচ দেয়া।

দোষ অন্বেষণের কাজটি কখনো ধারণা ও অনুমানের পরে সংঘটিত হতে পারে, আবার মানুষের গোপনীয়তা উদঘাটনের কৌতূহলবশত সূচনাতেও সংঘটিত হতে পারে।

এই হীন কাজটিকে কোরআন নৈতিক দিক দিয়ে প্রতিরোধ করে থাকে, যাতে মানুষের গোপনীয়তা উদঘাটনের ঘৃন্য মনোভাব থেকে সমাজ মানসকে পবিত্র করা যায় এবং নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পবিত্রতা আনয়নের বিঘোষিত লক্ষ্য পূরণ করা যায়।

এ কাজটির লক্ষ্য শুধু সাময়িক পবিত্রতা সাধন নয় বরং এর চেয়েও সুদূরপ্রসারী। এটি ইসলামের সামাজিক বিধানের একটি প্রধান মূলনীতি এবং ইসলামের আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য স্থায়ী বিধি। ইসলাম মানুষের জন্যে এমন স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সম্মানের নিশ্চয়তা দিয়েছে, যা কোনো অবস্থাতেই লংঘিত হতে পারে না।

ইসলামী শাসনে মানবাধিকার

উন্নত, উদার ও মহানুভব ইসলামী সমাজে মানুষ পরিপূর্ণ জানের নিরাপত্তা, মালের নিরাপত্তা, বাসস্থানের নিরাপত্তা, ও গোপনীয়তার নিরাপত্তা ভোগ করে থাকে এবং এর কোনো একটিরও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্যে কোনো ছলছুতাই ধোপে টেকে না। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রে অপরাধ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকেও মানুষের ওপর গোয়েন্দাগিরি পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়নি। মানুষকে বাইর থেকে যেমন মনে হয়, তেমনই থাকতে দিতে হবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া যাবে না। প্রকাশ্য অপরাধ বা বিদ্রোহ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কোনোরূপ অনুমান বা আশংকার ভিত্তিতেও পদেক্ষপ নেয়া যাবে না। এমনকি গোপনে কেউ কোনো ব্যাপারে বিরোধিতা করে জানা গেলেও তার ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে তাকে আটক করা বা বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। নাগরিকদের কোনো অপরাধ প্রকাশিত ও সংঘটিত হলেই কেবল তাকে গ্রেফতার করা যাবে, তবে সে ক্ষেত্রেও তার জন্যে যে সব নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, তা লংঘন করা চলবে না।

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলা হয়েছিলো যে, অমুকের দাড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা মদ টপকাতে দেখা গেছে। তিনি বললেন, 'আমাদের গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোনো অপরাধ প্রকাশিত হয়ে পড়লে আমরা তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবো।'

'দোষ অন্বেষণ করো না' এ উক্তির তাফসীর প্রসংগে মোজাহেদ বলেন, 'অর্থাৎ যে দোষ প্রকাশ পায় তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নাও, আর আল্লাহ তায়ালা যা গোপন রেখেছেন, তা গোপন রাখো।'

ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আকাবার সেক্রেটারী দাজীন আকাবাকে বললেন, আমাদের কতিপয় প্রতিবেশী মদ খায়। আমি তাদের জন্যে পুলিশ ডেকে

আনি এবং তারা তাদেরকে ধর-পাকড় করুক। আকাবা বললেন, এরূপ করো না। তাদেরকে উপদেশ দাও এবং হুঁশিয়ারী দাও। দাজীন তাও করে দেখলো কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। তারা মদ ত্যাগ করলো না। দাজীন তার কাছে এসে বললো, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা বিরত হয়নি। তাই আমি তাদের জন্যে পুলিশ ডাকলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। আকাবা তাকে বললেন, দেখো, এমন করো না। আমি রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোনো মোমেনের গোপনীয় ব্যাপার ঢেকে রাখলো, সে যেন জ্যান্ত পুঁতে মারা একটি শিশু মেয়েকে পুনরুজ্জীবিত করলো।' (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

হযরত মোয়াবিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, 'তুমি যদি মানুষের গোপন দোষ খুঁজতে থাকো, তাহলে তাদেরকে নষ্ট করে ফেলবে অথবা নষ্ট করার উপক্রম করবে।' (আবু দাউদ)

আবু দারদা (রা.) বলেন, 'রসূল (স.)-এর কাছ থেকে মোয়াবিয়ার শোনা এই কথাটা তার অনেক উপকার সাধন করেছে।'

এভাবে ওহীর বিধান শুধুমাত্র বিবেক ও মনের পবিত্রতা সাধন করে ক্ষান্ত থাকেনি, বরং ইসলামী সমাজে বাস্তবে প্রযুক্ত হয়েছে এবং মানুষের অধিকার-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং কোনো ছলছুতায় তা লংঘন করা যায়নি।

১৪ শত বছর পরের আজকের পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের দাবীদার দেশগুলোতে এর কতোটুকু পাওয়া যাবে?

পরনিন্দার অভিশাপ

এরপর এক অভিনব পন্থায় গীবত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমাদের কেউ যেন অন্য কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাই-এর গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করেছো।'

প্রথমে গীবত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর একটা চরম নোংরা ও দুঃসহ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এক ভাই কর্তৃক তার মৃত অপর ভাইয়ের গোশত খাওয়ার দৃশ্য। এরপর স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই ঘৃন্য কাজকে তারা নিশ্চয়ই অপছন্দ করে, আর তাই তারা গীবতও অপছন্দ করে।

এরপর এ আয়াতে চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ সব কাজের কোনোটিতে কেউ লিপ্ত হয়ে থাকলে তাকে তাওবা করে আল্লাহর রহমত কামনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু।'

কোরআনের এই নির্দেশাবলী মুসলিম সমাজে এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে যে, তা মানুষের মর্যাদা রক্ষায় এক দুর্লংঘ্য প্রাচীরের রূপ ধারণ করে এবং মানুষের অন্তরে এক সুগভীর সদাচার-বিধি বদ্ধমূল করে দেয়। অধিকন্তু গীবতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও আতংক সৃষ্টিতে কোরআনের অনুসৃত এই অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করে রসূল (স.) আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে যে, রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূলুল্লাহ, গীবত কাকে বলে? রসূল (স.) বললেন, 'তোমার ভাই-এর অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে। পুনরায় বলা হলো, 'আমি যা বলি তা যদি তার মধ্যে সত্যিই থেকে

থাকে তাহলে?' রসূল (স.) বললেন, 'যদি তা তার মধ্যে থেকে থাকে, তবে তো তুমি গীবত করলে! নচেত তুমি তার ওপর অপবাদ আরোপ করলে।' তিরমিযীতে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি একবার রসূল (স.)-কে বললাম, সুফিয়ার এই একটা দোষই আপনার বিবেচনার জন্যে যথেষ্ট। (অর্থাৎ তার বেঁটে হওয়া) রসূল (স.) বললেন, তুমি এমন একটা কথা বলেছো যা সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দিলেও গোটা সমুদ্র দূষিত হয়ে যাবে। আর একবার তাঁর কাছে একজন মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। রসূল (স.) বললেন, আমাকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করা হলেও আমি পছন্দ করি না যে, কাউকে নিয়ে আলোচনা করি। (আবু দাউদ)

রসূল (স.) বলেছেন, মেরাজের রাত্রে আমি কিছু লোক দেখলাম, তাদের তামার নখ রয়েছে এবং তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখ ও বুক খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেই সব লোক যারা মানুষের গোশত খায় এবং তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।' (আবু দাউদ)

মায়েয ও গামেদ গোত্রের একটি মহিলা যখন ব্যাভিচারের স্বীকারোক্তি করলো এবং রসূল (স.) তার স্বেচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি ও পবিত্র করার কাকুতিমিনতির কারণে যখন পাথর মেরে হত্যা করে ফেললেন, তখন রসূল (স.) শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি তার সাথীকে বলছে, 'দেখলে? এই লোকটার অপরাধ আল্লাহ তায়ালা গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু সে নিজে তা গোপন থাকতে দিলো না। ফলে কিভাবে কুকুরের মতো পাথরের আঘাতে নিহত হলো।' এরপর রসূল (স.) তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের কাছাকাছি এক জায়গায় একটা মরা গাধা দেখে বললেন, অমুক অমুক ব্যক্তিদ্বয় কোথায়? তোমরা এসো এবং এই মরা গাধার লাশ থেকে গোশত খাও।' তারা বললো, হে রসূল, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করুন, এ কি খাওয়া যায়? রসূল (স.) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সাথে একটু আগে যে আচরণ করলে, তা এই মরা গাধা খাওয়ার চেয়েও খারাপ কাজ। যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, মায়েয এই মুহূর্তে বেহেশ্‌তের ঝর্নায় গোসল করছে। (ইবনে কাসীর)

বস্তুত এরূপ স্থায়ী ও অব্যাহত চিকিৎসার ফলেই ইসলাম পবিত্র ও উন্নত হতে পেরেছিলো এবং তা পৃথিবীতে একটি বাস্তব স্বপ্ন ও ইতিহাসের বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো।

মানবীয় সমাজে আসল মূল্যবোধ

মুসলমানদেরকে বারবার সম্বোধন করে এরূপ উন্নত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক রীতিনীতি শিক্ষাদান, তাদের সম্মান, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করার পর পরবর্তী আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ বংশ-নির্বিশেষে সকল মানুষের মূল যে এক ও অভিন্ন, তাদের মর্যাদা নিরূপণের মানদন্ড যে এক ও অভিন্ন এবং সেটই যে এই মহান ইসলামী সমাজের ভিত্তি, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

বলা হয়েছে, 'হে মানবমন্ডলী, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে আল্লাহভীরু ব্যক্তিই সবচেয়ে সম্মানিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।'

অর্থাৎ বহু বর্ণে ও জাতিতে বিভক্ত হে মানব সমাজ, তোমাদের মূল এক ও অভিন্ন। সুতরাং তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না এবং ধ্বংস হয়ে যেওনা।।

হে মানব সকল, যিনি তোমাদেরকে সম্বোধন করেছেন তিনিই তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তোমরা পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহ ও মারামারি কাটাকাটি করে মরবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু পারস্পরিক পরিচিতি। বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, চরিত্র, প্রতিভা ও যোগ্যতার বিভিন্নতা একটা সৃষ্টিগত বৈচিত্র মাত্র। এ বিভিন্নতা বিবাদ-বিসম্বাদ ও শত্রুতা দাবী করে না। বরং মানবজাতির সকল দায়িত্ব বহনে ও সকল চাহিদা পূরণে পারস্পরিক সহযোগিতা দাবী করে। বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূমি এবং এ ধরনের অন্য সকল উপকরণের কোনো মূল্য আল্লাহর দৃষ্টিতে নেই। আল্লাহর চোখে একটি মাত্র জিনিস রয়েছে, যা দ্বারা মানুষের মান-মর্যাদা পরিমাপ করা হয়ে থাকে এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়ে থাকে। 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু ও সৎ।' আর আল্লাহর কাছে যে সম্মানিত সেই যে প্রকৃত পক্ষে সম্মানিত, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তিনি তোমাদেরকে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিমাপ করে থাকেন। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি ছাড়া সম্মান ও মর্যাদার আর সকল মানদন্ডের বিলোপ সাধন করা হলো। পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এবং বিবাদ-বিসম্বাদের অন্য সকল কারণও এতে করে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের প্ররোচক সকল কারণ দূরীভূত হয়ে যায়। মৈত্রী ও সহযোগিতার একটি মাত্র বড় কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সকলের একমাত্র উপাস্য এবং মানুষ সৃষ্টির মূল ও উৎস এক। আর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এই মাপকাঠিকেই ইসলাম সর্বোচ্চ মাপকাঠিরূপে ঘোষণা করেছে। মানব জাতিকে সকল বর্ণ, বংশ, গোত্রভিত্তিক সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্যে। কেননা, এ সবই জাহেলিয়াত থেকে উদ্ভূত-চাই তার যতো রকম নাম-পরিচয় থাক না কেন। এগুলোর সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই।

ইসলাম এই জাহেলী আভিজাত্যের বিরুদ্ধে লড়েছে তা যে কোনো আকৃতির ও প্রকৃতির হোক না কেন। সে চেয়েছে তার বিশ্বমানবিক ব্যবস্থাকে একক পতাকার তলে প্রতিষ্ঠিত করতে। ইসলামের পতাকা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পতাকা। জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ বা গোত্রবাদের পতাকা নয়। এগুলো সবই বাতিল পতাকা, এগুলো ইসলামের কাছে ঘৃণিত।

রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের সবাই আদমের সন্তান। আদম হচ্ছে মাটির সৃষ্টি। যারা তাদের পিতৃপুরুষ নিয়ে গর্বিত, তাদের সংযত হওয়া উচিত। নচেত আল্লাহর কাছে তারা গোবরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়ে যাবে।' (বাযযার)

জাহেলী আভিজাত্য সম্পর্কে রসূল (স.) বলেছেন, 'এই নোংরা জিনিসটাকে তোমরা পরিত্যাগ কর।'

এ হচ্ছে সেই মূলনীতি, যার ওপর ইসলামী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মানব জাতি মনগড়া ধ্যান-ধারণা অনুসারে বিশ্ব-জোড়া মানবতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা, এ কাজের যে একমাত্র নির্ভুল ও অব্যর্থ পথ রয়েছে, সে পথ তারা অনুসরণ করছে না। সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথ। আর যে একমাত্র পতাকার নিচে সমবেত হয়ে এ কাজ করা সম্ভব, সেই আল্লাহর পতাকার নিচে তারা সমবেত হচ্ছে না।

ঈমানের যথার্থ দাবীদার কারা

সূরার শেষাংশে ঈমানের প্রকৃত মর্ম ও মূল্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈমানের মর্মার্থ উপলব্ধি না করে মোমেন হবার দাবীদার আরব বেদুইনদের জবাব দেয়ার জন্যে এটি করা হয়েছে। তারা রসূল (স.)-এর কাছে এসে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বুঝাবার চেষ্টা করতো যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে যেন রসূল (স.)-এর বিরাট একটা উপকার করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ঈমান আনয়নের তাওফীক দিয়ে যে বিরাট অনুগ্রহ ও করুণা করেছেন, সেটা তারা উপলব্ধি করতো না এবং সেই অনুগ্রহের কদর করতো না। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'বেদুইনরা বলেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বলে দাও যে, তোমরা ঈমান আনোনি। তোমরা কেবল আত্মসমর্পণ করেছো। এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে ঢোকেনি............।'

কথিত আছে যে, এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বনু আসাদ গোত্রের বেদুইনদের উপলক্ষে নাযিল হয়েছিলো। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রথম সুযোগেই এই দাবী করে এবং রসূল (স.)-এর বিরাট উপকার করেছে বলে জাহির করতে থাকে। তারা বলেছিলো, 'হে রসূলুল্লাহ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আরবরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আমরা করিনি।' এ কথাটা তারা যখন বলতো, তখন তাদের মনে যে জিনিসটি ছিলো তা আসলে ঈমান। না অন্য কিছু সেটাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এখানে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বুঝাচ্ছেন যে, তারা আত্মসমর্পণ পূর্বক ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানের স্তরে উন্নীত হয়নি। এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ঈমানের প্রকৃত মর্ম তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়নি এবং তাদের আত্মা একে আত্মস্থ করেনি।

তথাপি আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও মহানুভবতার গুণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদের দ্বারা যা কিছু সৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে,তার প্রতিদান দেবেন এবং তাতে মোটেই কোনো কাটছাঁট করবেন না। এই বাহ্যিক ইসলাম, যা অন্তরে বদ্ধমূল হয়নি, ফলে দৃঢ় ও অনমনীয় ঈমানের রূপ ধারণ করেনি, এরূপ ইসলাম তাদের সৎকাজগুলোকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে এবং কাফেরদের সৎকাজের মতো বৃথা যায়নি। যতক্ষণ তারা আনুগত্যশীল থাকবে, ততক্ষণ তাদের সৎকাজগুলোর সওয়াবও কমবে না। এ কথাই বলা হয়েছে এভাবে, 'তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকো, তাহলে তোমাদের সৎকাজের কিছুই নষ্ট হবে না।' এর কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা দয়া ও ক্ষমার অধিকতর নিকটবর্তী। তিনি বান্দার প্রথম পদক্ষেপটিই গ্রহণ করেন এবং তার আনুগত্য ও আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হয়ে যান, যতক্ষণ না সে ঈমানের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত হয়।

সত্যিকার ঈমান কি

এরপর ঈমানের প্রকৃত মর্মার্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এভাবে যে, 'মোমেন তারাই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতপর আর কোনো সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়নি। এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।' বস্তুত, ঈমান হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা জ্ঞাপনের নাম। এমন বিশ্বাস যে, এরপর আর কোনো সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয় না। দোদুল্যমানতা বা কু-প্ররোচনার শিকার হতে হয় না এবং অন্তরে ও চেতনায় কোনো অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় না। এই মনই হলো আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করার ইচ্ছার উৎস। হৃদয় বা মন যখন এই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে, তখন সেদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন সে অন্তরের বাইরের বাস্তব জগতেও ঈমানের বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। এ আয়াতে মানুষের মনের ঈমানী তত্ত্বের উপলব্ধি এবং বাস্তব জগতের জীবনধারার

মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। চেতনায় বিদ্যমান ঈমানের রূপ এবং বাইরের জগতে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার সাথে কোনো অসামঞ্জস্য মোমেনের পক্ষে অসহনীয়। কেননা, এই অসামঞ্জস্য তাকে প্রতি মুহূর্তে কষ্ট দেয়। এ কারণেই জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ জেহাদ আসলে মোমেনের অন্তরের স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আকাংখা। এ দ্বারা সে তার হৃদয়ে বিদ্যমান ঈমানের দীপ্তিমান রূপকে সমাজ জীবনে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। আর মোমেনের সাথে তার আশপাশের জাহেলী জীবনধারার বিরোধ একটা স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বিরোধ। নিজের ঈমানী চেতনা ও বিশ্বাস এবং বাস্তব জীবনের মাঝে দ্বৈত জীবন যাপনে তার অক্ষমতার কারণেই এই বিরোধের সূত্রপাত হয়। তার ঈমানী চেতনাকে সে বাস্তবের বিকৃত ও ভ্রষ্ট ইসলামবিরোধী জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বাধ্য করতে অক্ষম। তাই তার মাঝে ও তার আশপাশে বিরাজমান জাহেলিয়াতের সাথে তার যুদ্ধ বেধে যাওয়া অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী–যতক্ষণ না এই জাহেলিয়াত ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

'তারাই সত্যবাদী'। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসে তারা সত্যবাদী। তারা সত্যবাদী যখন তারা বলে যে, তারা মোমেন। অতপর অন্তরে যখন সেই চেতনা ও আবেগ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে না এবং বাস্তব জীবনেও তার কোনো প্রভাব ও আলামত দেখা যায় না, তখন বাস্তবে ঈমানের অস্তিত্ব আছে একথা বলা যায় না। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন এবং তার কেবল বুলি আওড়ানো দ্বারা কেউ সত্যবাদী হতে পারে না। যতক্ষণ তার বাস্তব জীবনে তথা কাজে-কর্মে তা প্রতিফলিত না হয়।

আয়াতের একটি অংশ, 'প্রকৃত মোমেন তারাই, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতপর কোনো সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়নি' নিয়ে একটু ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। এটা নিছক কথার কথা নয়, বরং বাস্তব ও সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে এর সংযোগ রয়েছে। ঈমানের পরেও মনের ভেতরে যে সন্দেহ-সংশয় থেকে যাওয়া সম্ভব, সেই স্পর্শকাতর সত্যটির প্রতিই এখানে ইংগিত দেয়া হয়েছে এবং এর প্রতিকার করা হয়েছে। 'অতপর কোনো সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হয়নি, এই উক্তিটি কোরআনের অন্যত্র বিদ্যমান এই উক্তিটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, 'যারা বলেছে যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা–অতপর তার ওপর অবিচল থেকেছে ..' আল্লাহর প্রতি ঈমানে সংশয়হীনতা ও আল্লাহর প্রভুত্বে অবিচল আস্থা এই দুটো উক্তি থেকেই বুঝা যায় যে, মোমেনের মনেও কখনো কখনো কঠিন অগ্নিপরীক্ষার প্রভাবে কিছুটা সন্দেহ-সংশয়, অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা দেখা দিতে পারে। মোমেনের মন দুনিয়ার জীবনে বহু কঠিন বিপদ-মুসিবতে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতিতে মনকে স্থির রাখে, আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখে এবং সঠিক পথে কদম অবিচল রাখে, তার কোনো বিপর্যয় ঘটে না, সন্দেহ সংশয় তার ক্ষতি করতে পারে না এবং এরূপ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে থাকে।

এখানে এমন বাচনভংগি ব্যবহৃত হয়েছে যে, এতে মোমেনদেরকে পথের পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক স্থানগুলো সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, যাতে তারা সচেতন হয়, দৃঢ় মনোবল অর্জন করে, নির্ভুল পথ অবলম্বন করে এবং পরিবেশ গুমট, অন্ধকার ও ঝড়-ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ হলেও সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত না হয়।

এরপর পুনরায় বেদুইনদের প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর কেমন ও তাতে কি আছে, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহই তাদের অন্তরে কি আছে সে কথা

তাদেরকে জানান। এ সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁকে তাদের কাছ থেকে অর্জন করতে হয় না। 'তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের আনুগত্যের কথা আল্লাহকে জানাচ্ছো? অথচ আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা জানেন। তিনি তো সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।'

মানুষ জ্ঞানের দাবীদার। অথচ সে নিজেকেই জানে না। তার ভেতরে কী কী আবেগ অনুভূতি ও চেতনা রয়েছে তা সে জানে না। সে তার নিজের ও তার আবেগ অনুভূতির নিগূঢ় তত্ত্ব জানে না। মানুষের বিবেক বুদ্ধি কিভাবে কাজ করে, তাও তার কাছে অজানা ব্যাপার। কেননা, সে যখন কর্মব্যস্ত থাকে, তখন তার ওপর সে পর্যবেক্ষণ চালাতে পরে না। নিজের ওপর যখন পর্যবেক্ষণ চালায়, তখন তার স্বাভাবিক তৎপরতা ও ব্যস্ততা স্তব্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তখন কিসের পর্যবেক্ষণ চালাবে? আর যখন সে স্বাভাবিক তৎপরতায় নিয়োজিত থাকবে, তখন একই সময় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই নিজের সত্ত্বার বৈশিষ্ট ও নিজের সত্ত্বার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনে সে অক্ষম। অথচ এই সত্ত্বাটা নিয়েই মানুষ কতো গর্ব করে।

'আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু জানেন।' অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞান রাখেন। তিনি বিশ্বজগতের শুধু বাহ্যিক জ্ঞান রাখেন না, শুধু তার লক্ষণসমূহের জ্ঞান রাখেন না–তিনি তার সম্পর্কে নিগূঢ়তম ও গভীরতম জ্ঞান রাখেন এবং ব্যাপকতম সর্বব্যাপী ও সীমাহীন জ্ঞান রাখেন।

'তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী।' অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক জ্ঞানের অধিকারী, সীমাহীন ও অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী।

ঈমান আল্লাহর একটি বিশেষ দান

এ পর্যন্ত ঈমানের সেই আসল ও প্রকৃত রূপ বর্ণনা করা হলো, যা বেদুইনরা অর্জন করতে পারেনি। এরপর তারা ইসলামের অনেক উপকার করেছে বলে যে কৃতিত্ব যাহির করতে ও বাহবা কুড়াতে চায়, তার উল্লেখ করে রসূল (স.)- কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বাহবা কুড়ানোর ও কৃতিত্ব যাহির করার ইচ্ছাটাই প্রমাণ করে যে, তাদের হৃদয়ে যথার্থ ও প্রকৃত ঈমান তখনো পর্যন্ত বদ্ধমূল হয়নি এবং তাদের অন্তর তখনো ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারেনি। বলা হয়েছে, 'ওরা তোমার কাছে নিজেদের কৃতিত্ব যাহির করে যে, ইসলাম গ্রহণ করে তারা ইসলামের কতোই না উপকার করেছে। তুমি বলো, তোমাদের ইসলাম গ্রহণের জন্যে আমার কাছে কৃতিত্ব জাহির করোনা। বরঞ্চ তোমাদেরকে ঈমানের পথের সন্ধান দিয়ে আল্লাহই তোমাদের মস্তবড় উপকার করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো।'

তারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের উপকার করেছে বলে দাবী করতো এবং ঈমান এনেছে বলে কৃতিত্ব যাহির করতো। তাদেরকে এ আয়াতে জবাব দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ইসলামের উপকার করার দাবী করো না। তোমাদের ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তোমাদের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

এই জবাবটি নিয়ে আমাদের একটু চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এখানে একটি মস্তবড় সত্য নিহিত রয়েছে। এ সত্যটি সম্পর্কে অনেকেই–এমনকি মোমেনদেরও অনেকে উদাসীন।

সেই সত্যটি এই যে, ঈমান হচ্ছে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও বড় অনুগ্রহ, যা তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে পৃথিবীতে দিয়ে থাকেন। এটি এমনকি বান্দার অস্তিত্বের চেয়েও এবং অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য ও সহায় সম্পদের চেয়েও বড় নেয়ামত।

এই নেয়ামত ও অনুগ্রহই মানব জীবনকে ও মানুষের অস্তিত্বকে বৈশিষ্টমন্ডিত করে থাকে এবং মহাবিশ্বে তাকে মৌলিক ও প্রধান ভূমিকা পালনের যোগ্য বানায়।

সত্যিকার মানুষ কারা

ঈমান অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার পর তা মানব সত্তার ভেতরে যে পরিবর্তন আনে, তা এই যে, বিশ্বজগত সম্পর্কে তার ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে, ব্যাপকতা লাভ করে তার সাথে তার সংযোগ, তার ভূমিকা, বিশুদ্ধ হয় পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনাবলী ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তার ধারণা। পৃথিবী নামক এই গ্রহে সে আজীবন স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। পারিপার্শিক জগতের প্রতিটি বস্তুর সাথে এবং তার ও বিশ্বজগতের স্রষ্টার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ও মৈত্রী গড়ে ওঠে। তার নিজের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে তার সঠিক চেতনা জন্মে এবং সর্বোপরি তার মধ্যে এই অনুভূতি জন্মে যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা ও বিশ্বজগতের সব কিছুর কল্যাণ সাধন করার মতো ভূমিকা পালন সে সক্ষম।

তার ধারণার ব্যাপকতার স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায় যে, সে স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার উর্ধে উঠে যায় এবং মহাবিশ্বের ব্যাপক ও বিপুল পরিসরে স্থান লাভ করে। এই মহাবিশ্বে কতো যে অজানা শক্তি সঞ্চিত ও গোপন রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, কে তার খবর রাখে?

বস্তুত জাতিগতভাবে সে মানব জাতির একজন সদস্য। তার একটা নির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। প্রথমে সে আল্লাহর রূহ বা আত্মা থেকে একটা মানবীয় আত্মা ফুৎকারের মাধ্যমে পেয়েছে। এই ফুৎকার মাটির তৈরী মানুষকে আল্লাহর নূর বা জ্যোতির সাথে সংযুক্ত করে থাকে। আল্লাহর এই নূর এক মুক্ত ও অসীম বস্তু, যার কোনো আদিঅন্ত নেই এবং স্থান ও কালের মধ্যে যা সীমাবদ্ধ নয়। এই অসীম ও মুক্ত উপাদানটিই মানুষকে সৃষ্টি করেছিলো। কোনো মানুষের অন্তরে উক্ত ধারণা বদ্ধমূল হওয়া তার নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। যদিও সে পৃথিবীতে বাস করে। এই উচ্চ ধারণা সৃষ্টির পাশাপাশি তার হৃদয় আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে প্রথম নূরের দিকে ছুটে যায়, যা তাকে জীবনের এই রূপটি উপভোগ করায়।

সম্পর্কের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সে মুসলিম জাতির একজন সদস্য। এই মুসলিম জাতি মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে চলে আসছে। এর নেতৃত্বে ছিলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও তাঁদের ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য নবী। এই ধারণাটা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকাই যথেষ্ট। এতে সে বুঝতে পারবে যে, সে একটি সংঘটিত, পবিত্র ও সুদূর প্রসারী বৃক্ষের ফল। এই অনুভূতি অর্জিত হলে সে জীবনের একটা আলাদা স্বাদ উপভোগ করতে পারবে।

এরপর তার ধারণা আরো প্রশস্ত হতে থাকে। এক পর্যায়ে সে তার নিজের ও গোটা মানব জাতির উর্ধে উঠে যায়। সে এই বিশ্বজগতকে মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে বিবেচনা করে। সে নিজেও এই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তার ফুৎকারেই সে মানুষ হয়ে জন্মেছে। তার ঈমান তাকে জানিয়ে দেয় যে, গোটা বিশ্বজগত একটা সজীব জিনিস এবং তা জীবন্ত জিনিসসমূহ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক বস্তুর আত্মা বা প্রাণ আছে। প্রত্যেক বস্তু ও এই মহাবিশ্বের আত্মা তার স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত। মানুষের নিজের আত্মার ন্যায় এই বিশ্বজগতের আত্মাও আল্লাহর গুণকীর্তন ও তাসবীহ পাঠ করে থাকে, তার প্রশংসা ও আনুগত্য করে থাকে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে বিশ্বাস স্থাপন করে। এভাবে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে নিজেও এই মহাবিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ, যা মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর প্রতি অনুগত। অতপর সে এও বুঝতে পারে যে, সে এই বিশ্বজগতের চেয়েও বড় একটি সৃষ্টি, পার্শ্ববর্তী সকল আত্মার সাথে সে পরিচিত, আল্লাহর প্রদত্ত আত্মা যা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সাথেও সে পরিচিত এবং সে গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে দৈর্ঘ ও প্রস্থে এই গোটা

সৃষ্টিজগতের সমান। এখানে সে অনেক জিনিস তৈরী করতে ও অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটাতে পারে। সে প্রত্যেক জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অতপর বৃহত্তম শক্তি থেকে সে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে-যে বৃহত্তম শক্তি কখনো দুর্বল হয় না বা উধাও হয় না।

নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি

এই ব্যাপক ধারণা থেকে সে সংগ্রহ করে জিনিস, ঘটনা, ব্যক্তি, মূল্যবোধ, মনোযোগ ও আকাংখ্যাসমূহের নতুন ও প্রকৃত মানদন্ড। এ বিশ্বজগতে তার প্রকৃত ভূমিকা কী এবং এই জীবনে তার প্রকৃত কাজ কী তাও সে নিরূপণ করে। মানুষ স্বয়ং মহাবিশ্বে আল্লাহর একটি শক্তি, যাকে তিনি এই উদ্দেশ্যে নির্দেশাবলী প্রদান করেন যেন তাকে দিয়ে ও তার ওপর নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে পারেন, আর এই গ্রহে সে যেন স্থির ও অবিচল পদক্ষেপে, খোলা চোখে ও অতন্দ্র বিবেকে বিচরণ করতে পারে।

পারিপার্শ্বিক সৃষ্টিজগতের প্রকৃত স্বরূপ, মানুষের জন্যে নির্ধারিত ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপ এবং এই ভূমিকা পালনের জন্যে তাকে দেয়া শক্তির প্রকৃত মর্ম ও মাত্রাসংক্রান্ত এই জ্ঞান ও পরিচিতি থেকে সে মানসিক শান্তি, তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভ করে এবং পারিপার্শিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যথার্থ ব্যাখ্যা লাভ করে। সে জানতে পারে কোথা থেকে সে এসেছে, কেন এসেছে, কোন দিকে সে যাচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে কী সে পাবে। সে একথা ইতিমধ্যেই জেনেছে যে, পৃথিবীতে তার একটা কাজ বা দায়িত্ব রয়েছে। সে জেনেছে যে, তাকে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্তে প্রতিটি ঘটনা শক্তি যোগাচ্ছে। সে এও জেনেছে যে, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের কৃষি ক্ষেত। তাকে ছোট-বড় প্রতিটি কাজের ফলাফল ভোগ করানো হবে। তাকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তাকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়েও দেয়া হয়নি।

উৎস ও পরিণতি সংক্রান্ত অজ্ঞতা, পথের গুপ্ত অংশ না দেখা এবং সেই পথে যাত্রা করা ও আসা যাওয়ার পেছনে প্রচ্ছন্ন কর্মকুশলতায় আস্থা না থাকার কারণে যে উদ্বেগ, সংশয় ও বিস্ময় জন্ম নেয়, তা জ্ঞান অর্জন করলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওমর খৈয়ামের চেতনার মতোই চেতনার বিলুপ্তি ঘটে। ওমর খৈয়াম বলেছেন,

'আমি জীবনের পোশাক পরিধান করেছি, অথচ
কারো কাছে পরামর্শও চাইনি, আর নিজেও নানা
চিন্তাধারার মধ্যে উদভ্রান্ত থেকেছি।
অচিরেই এ পোশাক আমি খুলে ফেলবো, অথচ
এখনো আমি জানলাম না কেন এসেছি এবং কোথায়
আমার ঠিকানা।'

ঈমান এক অসাধারণ শক্তি

মোমেন নিশ্চিত মনে ও সংশয়হীন বিবেকে জানে ও বোঝে যে, সে জীবনের পোশাক পরে কেবল সেই আল্লাহর ফয়সালা অনুসারে, যিনি সর্বোচ্চ মাত্রার কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞা সহকারে গোটা সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা করেন। আর যে হাত তাকে জীবনের পোশাক পরায়, সে হাত তার চেয়েও প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দয়ালু। সুতরাং তার কাছে তাঁর পরামর্শ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, যে হাত উক্ত জীবনের পোশাক পরায় সে যেমন পরামর্শ দিয়ে থাকে, মোমেন তেমন পরামর্শ দিতে সক্ষম নয়। সে হাত তাকে জীবনের পোশাক পরায়, এই মহাবিশ্বে এমন একটি বিশেষ

ভূমিকা পালন করার জন্যে যা এখানকার সব কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সব কিছুকে প্রভাবিত করে। তার এই ভূমিকা এই মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির সকল কার্যকলাপ ও ভূমিকার সাথে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সুসমন্বিত।

এভাবে জ্ঞান লাভের পর মোমেন জানে সে কেন দুনিয়ায় এসেছে এবং তার ঠিকানা কোথায়। নানাবিধ চিন্তার মধ্যে তাকে ঘুরপাক খেতে হয় না। বরং সে নিসংশয় ও পরম আত্মবিশ্বাসে নিজ ভূমিকা পালন করে। ঈমানী জ্ঞানে যখন তার আরো উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তখন সে স্বীয় ভূমিকা পালন করে অধিকতর আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করে এবং মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবনরূপী উপহার পেয়েও স্বীয় ভূমিকা পালন করতে পেরে কৃতার্থ হয়।

কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় লাভের আগে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দানের আগে আমি যে মানসিক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও বিভ্রান্তিতে পতিত থাকতাম, আমার সেই উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি যেমন বিদরিত হয়েছে, তেমনি ভাবে প্রত্যেক মোমেনের উদ্বেগ বিদূরিত হয়ে থাকে। আমি এই উদ্বেগ বিদূরিত হওয়ার পর আপন মনে বলেছিলাম–

'মহাবিশ্ব এ কথা ভেবে আপন যাত্রা থামিয়ে দিয়েছে যে, সে কোথায় চলেছে, কেন চলেছে ও কিভাবে চলেছে। বৃথা চেষ্টা, ব্যর্থ তৎপরতা ও অসন্তোষজনক পরিণতি তাকে খুশী করতে পারেনি।'

আল্লাহর শোকর, আমি আজ জানি যে, কোনো চেষ্টাই বৃথা যায় না। সকল কাজেরই কিছু না কিছু প্রতিদান পাওয়া যায়। সব শ্রমেরই কিছু না কিছু ফল হয়। ভালো কাজের পরিণতি সন্তোষজনক হয়ে থাকে। কারণ তা একজন সুবিচারক ও দয়ালু মালিকের বিবেচনাধীন থাকে। আল্লাহর প্রশংসা যে, বিশ্বজগত তার যাত্রা চিরদিনের জন্যে স্থগিত করে না। কেননা বিশ্বজগত তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর প্রশংসা করে তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং তাঁর বিধান অনুসারে চলে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, সন্তোষ ও আত্মোৎসর্গের চেতনা নিয়ে।

এটা একটা বিরাট অর্জন ও প্রাপ্তি, চাই তা চেতনা ও চিন্তার জগতেই হোক, দেহ ও স্নায়ুর জগতেই হোক এবং তৎপরতা, প্রভাবিত হওয়া ও প্রভাব বিস্তার করার জগতেই হোক।

ঈমান একটি উদ্দীপক শক্তি ও ঐক্যবদ্ধকারী শক্তি। ঈমান কারো হৃদয়ে অবস্থান করতে করতে এক সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিজের অস্তিত্বকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপকে পরস্পরের সাথে সমন্বিত করে মানব সত্তায় বিরাজমান কর্মতৎপরতার উৎসসমূহের ওপর আপন কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং তাকে পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে।

এ হচ্ছে মানুষের মনের ওপর ইসলামী আকীদা ও আদর্শের কার্যকারিতার রহস্য এবং এই আকীদা ও আদর্শের ওপর মনের বা বিবেকের শক্তির রহস্য। ইসলাম পৃথিবীতে যে অসাধ্য সাধন করেছে এবং প্রতিনিয়ত করে চলেছে, এ হচ্ছে তার রহস্য। ইসলাম পৃথিবীর জীবনধারায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আনছে এবং ব্যক্তি ও সমাজকে বৃহত্তর ও অবিনশ্বর জীবনের জন্যে সীমাবদ্ধ নশ্বর পার্থিব জীবনকে উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এক নগণ্য ও দুর্বল ব্যক্তিকে পরাক্রান্ত শাসক শক্তির বিরুদ্ধে অর্থ ও অস্ত্রের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সেই প্রবল ও পরাক্রান্ত শক্তি সেই ব্যক্তির ঈমানী শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। এত বড় বড়

শক্তিকে এই নগণ্য ব্যক্তিটি পরাভূত করে তা নয়, বরং সেই বৃহত্তম শক্তিই পরাভূত করে, যা তার আত্মায় সংগৃহীত হয়। এই মহা পরাক্রমশালী ঈমানী শক্তি কখনো দুর্বল হয় না বা পরাভূত হয় না।'(১)

'ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে যে অসাধ্য সাধন ও অলৌকিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে তা কোনো অস্পষ্ট কাল্পনিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে করে না। বরং তা করে সুনির্দিষ্ট কারণ ও স্থায়ী বিধির ভিত্তিতে। ইসলাম একটা সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী চিন্তাধারা, যা মানুষকে প্রকৃতির গোপন ও প্রকাশ্য শক্তিগুলোর সাথে সংযুক্ত করে, তার আত্মাকে বিশ্বাস ও আস্থা দ্বারা শক্তিশালী করে, তাকে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার ক্ষমতা দান করে এবং তা দান করে বিজয়ের প্রত্যয় ও আল্লাহর ওপর আস্থার শক্তির মাধ্যমে। ব্যক্তির সাথে তার পরিবেশে বিদ্যমান জিনিস, ঘটনা ও মানুষের সম্পর্ক কী এবং তার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কী, ইসলাম তাও বিশ্লেষণ করে। আনুরূপভাবে সে তার যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে একত্রিত করে ও একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করে। আর এভাবেও তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

মোমেনের শক্তিবৃদ্ধির আরো একটা কারণ এই যে, তার সকল তৎপরতা এমন একটি দিকে পরিচালিত হয়, যেদিকে গোটা বিশ্বজগত পরিচালিত। মহাবিশ্বে যতো প্রচ্ছন্ন শক্তি রয়েছে তা ঈমানী পথেই পরিচালিত হয়। ফলে মোমেনের যাত্রাপথে তার সাথে সম্মিলন ঘটে এবং তাকে বাতিলের ওপর হককে বিজয়ী করার সংগ্রামে সহযোগিতা করে। ফলে বাতিল বাহ্যদৃষ্টিতে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তার সামনে টিকতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন, 'তারা ইসলাম এনেছে বলে তোমার সামনে কৃতিত্ব ফলায়। তুমি বলো, তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কৃতিত্ব আমার সামনে যাহির করো না। বরঞ্চ আল্লাহই তোমাদের ওপর নিজের কৃতিত্বের দাবীদার যে, তিনি ঈমান আনার জন্যে তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।' বস্তুত এটা এতো বড় অনুগ্রহ যে, এটা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ দিতেও পারে না এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়া কাউকে তিনি দেনও না।

আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন। ভেবে দেখতে হবে যে, যে ব্যক্তি ঈমানী সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, সে আর কিছুই হারায়না। আর যে এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত, সে পশুর মতো যতোই আহার-বিহার করুক, এবং যতো অগাধ সম্পত্তি ভোগ করুক, সে কিছুই পায় না। বস্তুত এ ধরনের মানুষের চেয়ে পশু অধিকতর সুপথগামী। কেননা, তারা জন্মগতভাবে মোমেন ও আল্লাহর বিধানের অনুগত।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় জানেন এবং তিনি তোমাদের সকল কাজ দেখেন।' যিনি আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য খবর জানেন, তিনি মানুষের হৃদয় জগতে লুকিয়ে রাখা তথ্যও জানেন এবং তাদের কাজেরও খবর রাখেন। সুতরাং আল্লাহকে তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে তাদের কথাবার্তার ওপর নির্ভর করতে হয় না। কেননা তিনি তাদের হৃদয়ে বিদ্যমান ভাবাবেগের কথাও জানেন।

এই হলো একটি মহান সমাজ ব্যবস্থার পবিত্র বৈশিষ্টসমূহের রূপরেখা বর্ণনাকারী আঠারোটি আয়াতের সমষ্টি সূরা আল-হুজুরাত। এ সূরা মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে যে সব মহান তত্ত্ব ও তথ্য বদ্ধমূল করে দেয় তা যথার্থই অমূল্য ও দুর্লভ।

(১) আমার লেখা ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি।

সূরা ক্বাফ

আয়াত ৪৫ রুকু ৩

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَاۤءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ
الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ
بَعِيْدٌ ۝٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤ بَلْ
كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى
السَّمَاۤءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦ وَالْاَرْضَ
مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. ক্বা'ফ, মর্যাদাসম্পন্ন কোরআনের শপথ (অবশ্যই আমি তোমাকে রসূল করে পাঠিয়েছি), ২. (এ কথা অনুধাবন না করে) বরং তারা বিস্ময়বোধ করে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে (কি করে) একজন সতর্ককারী (নবী) তাদের কাছে এলো, অতপর অবিশ্বাসীরা (এও) বলে, এ তো (আসলেই) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার, ৩. এটা কি এমন যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো (তখন পুনরায় আমাদের জীবন দান করা হবে), এ তো সত্যিই এক সুদূরপরাহত ব্যাপার! ৪. আমি তো এও জানি, (মৃত্যুর পর) তাদের (দেহ) থেকে কতোটুকু অংশ যমীন বিনষ্ট করে, আর আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে (যেখানে এ সব বিবরণ) সংরক্ষিত রয়েছে। ৫. উপরন্তু এদের কাছে যখনি সত্য এসে হাযির হয়েছে, তখনি তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতপর তারা সংশয়ে দোদুল্যামান (থাকে)। ৬. এ লোকগুলো কি কখনো তাদের ওপরে (ভাসমান) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি, কিভাবে তা আমি বানিয়ে রেখেছি এবং কি (অপরূপ) সাজে আমি তা সাজিয়ে রেখেছি, কই, এর কোথাও কোনো (ক্ষুদ্রতম) ফাটলও তো নেই! ৭. আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (নড়াচড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে) আমি তার মধ্যে স্থাপন করেছি মযবুত (ও অনড়) পাহাড়সমূহ, আবার এ যমীনে আমি উদগত করেছি সব ধরনের চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ,

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚۖ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾

৮. (মূলত) প্রতিটি মানুষ– যে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে চায়, (এর প্রতিটি জিনিসই) তার চোখ খুলে দেবে এবং তাকে (আল্লাহর অস্তিত্বের) পাঠ মনে করিয়ে দেবে। ৯. আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যরাজি পয়দা করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়; ১০. (আরো পয়দা করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে, ১১. (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে) দান করেছি এবং আমি তা দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন দান করি; এমনিই (মৃত মানুষদের কবর থেকে) বেরিয়ে আসার ঘটনাটি (সংঘটিত হবে)। ১২. এর আগেও নূহের জাতি, রাস্-এর অধিবাসী ও সামুদ জাতির লোকেরা (তাদের নবীদের) অস্বীকার করেছে, ১৩. (অস্বীকার করেছে) আ'দ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়ও, ১৪. বনের অধিবাসী এবং তুব্বা সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাই করেছে); এরা সবাই আল্লাহর রসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর তাদের ওপর (আমার) প্রতিশ্রুত আযাব আপতিত হয়েছে। ১৫. আমি কি মানুষদের প্রথমবার সৃষ্টি করতে গিয়ে (এতোই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, (এরা) আমার নতুন সৃষ্টি করার কাজে সন্দেহ পোষণ করছে!

রুকু ২

১৬. নিসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি, (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে (অবস্থান করি)। ১৭. (এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) সেখানে আরো দু'জন (ফেরেশতা)– একজন তার ডানে আরেকজন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত) আছে।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

১৮. (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না! ১৯. মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্তটি সত্যিই এসে হাযির হবে (তখন তাকে বলা হবে, ওহে নির্বোধ), এ হচ্ছে সে (মুহূর্ত)-টা, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে! ২০. অতপর (সবাইকে একত্রিত করার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে (তখন তাদের বলা হবে), এ হচ্ছে সেই শাস্তির দিন (যার কথা তোমাদের বলা হয়েছিলো)! ২১. (সেদিন) প্রতিটি মানুষ (আল্লাহর আদালতে এমনভাবে) হাযির হবে যে, তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সাথে একজন (ফেরেশতা) থাকবে, অপরজন হবে (তার যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ) সাক্ষী। ২২. (একজন বলবে, এ হচ্ছে সে দিন,) যে (দিন) সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে, এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ) তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে অত্যন্ত প্রখর (সব কিছুই এখন তুমি দেখতে পাবে)। ২৩. তার (অপর) সাথী (ফেরেশতা) বলবে (হে মালিক), এ হচ্ছে (তোমার আসামী, আর এ হচ্ছে) আমার কাছে রক্ষিত (তার জীবনের) নথিপত্র; ২৪. (অতপর উভয় ফেরেশতাকে বলা হবে,) তোমরা দু'জন মিলে একে এবং (এর সাথে) প্রতিটি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, ২৫. (কেননা) এরা ভালো কাজে বাধা দিতো, (যত্রতত্র) সীমালংঘন করতো, (স্বয়ং আল্লাহর ব্যাপারে) এরা সন্দেহ পোষণ করতো, ২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিতো, তাকেও (আজ) জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো। ২৭. (এ সময়) তার সহচর (শয়তান) বলে উঠবে, হে আমাদের মালিক, আমি (কিন্তু) এ ব্যক্তিটিকে (তোমার) বিদ্রোহী বানাইনি, (বস্তুত) সে নিজেই (ঘোর) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো। ২৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এখন তোমরা আমার সামনে বাকবিতন্ডা করো না, আমি তো আগেই তোমাদের (আজকের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾

রুকু ৩

২৯. আমার এখানে কোনো কথারই রদবদল হয় না, আমি বান্দাদের ব্যাপারে অবিচারকও নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের আযাব দেবো)! ৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে (লক্ষ্য করে বলবো, তুমি কি সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবে, (হে মালিক, এখানে আসার মতো) আরো কেউ আছে কি? ৩১. (অপরদিকে) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের কাছে নিয়ে আসা হবে, (সেদিন তাদের জন্যে তা) মোটেই দূরে (-র বস্তু) হবে না। ৩২. (জান্নাতকে দেখিয়ে বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জায়গা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিলো, (এ স্থান) সে ধরনের প্রতিটি মানুষের জন্যে (নির্দিষ্ট), যে (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে এবং (তা) হেফাযত করে। ৩৩. (এ ব্যবস্থা তার জন্যে,) যে না দেখে পরম দয়ালু আল্লাহকে ভয় করেছে এবং বিনয় চিত্তে আল্লাহ তায়ালার কাছে হাযির হয়েছে, ৩৪. (সেদিন তাদের বলা হবে, হাঁ, আজ) তোমরা একান্ত প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও; এ হচ্ছে (তোমাদের) অনন্ত যাত্রার (প্রথম) দিন। ৩৫. সেখানে তারা যা যা পেতে চাইবে তার সব তো পাবেই, (এর সাথে) আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে (অপ্রত্যাশিত পুরস্কার)। ৩৬. আমি তাদের আগেও অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো শক্তি সামর্থে এদের চাইতে অনেক বেশী বড়ো, (দুনিয়ার) শহর বন্দরগুলো তারা চষে বেড়িয়েছে; কিন্তু (আল্লাহর আযাব থেকে তাদের) কোনো পলায়নের জায়গা কি ছিলো? ৩৭. এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যার (কাছে একটি জীবন্ত) মন রয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে (সে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ) শুনতে চায়। ৩৮. আমি আকাশমালা, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কোনো ধরণের ক্লান্তিই আমাকে স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝٣٩ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝٤٠ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝٤١ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ، ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝٤٢ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝٤٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ، ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝٤٤ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝٤٥

৩৯. অতএব (হে নবী, সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (যথাযথ) প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো– সূর্য উদয়ের আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে, ৪০. রাতের একাংশেও তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা করো এবং সাজদা আদায়ের কাজ শেষ করে (পুনরায়) তাঁর তাসবীহ পাঠ করো। ৪১. কান পেতে শোনো, (সেদিন দূরে নয়) যেদিন একজন আহ্বানকারী একান্ত কাছে থেকে (সবাইকে) ডাকতে থাকবে, ৪২. সেদিন তারা কেয়ামতের মহাগর্জন ঠিকমতোই শুনতে পাবে; সে দিনটিই (হবে কবর থেকে) উত্থিত হবার দিন। ৪৩. (সত্য কথা হচ্ছে,) আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং (সবাইকে আবার) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। ৪৪. সেদিন তাদের ওপর থেকে (কবরের) মাটি ফেটে যাবে, যখন তারা (দ্রুত হাশরের মাঠের দিকে) দৌড়াতে থাকবে; (বলা হবে,) এ হচ্ছে হাশরের দিন, (মূলত) আমার জন্যে এটি একটি সহজ কাজ। ৪৫. (হে নবী,) এরা যা কথাবার্তা বলে তার সব কিছুই আমি জানি, তুমি তো তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করার কেউ নও। অতপর এ কোরআন দিয়ে তুমি সে ব্যক্তিকে সদুপদেশ দাও, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

রসূলুল্লাহ (স.) সাধারণত এই সূরা দিয়ে ঈদ ও জুময়ার জামায়াতে ভাষণ দিতেন এবং তাতে শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো।

আসলে এটি একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ভীতিপ্রদ বিবরণ সম্বলিত সূরা। আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর সকল সৃষ্টিকে প্রতি মুহূর্তে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন এবং সেই পর্যবেক্ষণ যে তার ওপর তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত, তার পর থেকে কেয়ামতের ময়দানে জমায়েত হওয়া পর্যন্ত এবং তারপর থেকে হিসাব গ্রহণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, সে কথা এই সূরায় সুন্দর করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি একটি নিদারুণ ভীতিপ্রদ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, যা মানুষ নামক এই দুর্বল সৃষ্টির ওপর পরিপূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে ও থাকবে। মানুষ এমন এক সত্তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে, যিনি তার সম্পর্কে কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও উদাসীন হন না এবং একটুও দূরে সরেন না। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে তিনি গুনে রাখেন। তার মনের প্রতিটি চিন্তা তার জানা। তার প্রতিটি উচ্চারণ তাঁর কাছে লিখিত এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপ ও নড়াচড়ার হিসাব তাঁর কাছে সংরক্ষিত। এই সর্বাত্মক ও ভয়ংকর পর্যবেক্ষণের আওতাধীন রয়েছে তার অন্তরের প্রতিটি ভাবনা এবং তার অংগ-প্রত্যংগের প্রতিটি তৎপরতা। এই পর্যবেক্ষণের মাঝে কোনো পর্দা নেই, কোনো আড়াল নেই। প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কাজের ওপর এই সর্বাত্মক প্রহরা কার্যকর রয়েছে।

আল্লাহর এই সর্বাত্মক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সর্বজন বিদিত। কিন্তু এই সূরায় তা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তা নতুন কিছু, যেন তা শরীরের রোমাঞ্চ তোলে, স্নায়ুতে শিহরণ জাগায় এবং উদাসীন মানুষকে সচকিত করে তোলে। আর এ সব কিছুই করা হয় জীবন, মৃত্যু, পরকাল ও কেয়ামতের কথা স্মৃতিতে জাগরূক করার মাধ্যমে এবং আকাশ, পৃথিবী, পানি, উদ্ভিদ, ফল ও ফসলের দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে।

এ ধরনের সূরার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা খুবই কঠিন। তাই আমি মূল সূরাটি নিয়েই সরাসরি আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই।

তাফসীর

সূরার প্রথম রুকুটি লক্ষ্য করুন। এটি সূরার প্রথমাংশ। এতে আখেরাতের কথা এবং মোশরেক কর্তৃক আখেরাতকে অস্বীকার করা ও আখেরাত সংক্রান্ত কথাবার্তায় তাদের বিস্ময় প্রকাশ করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তবে কোরআন শুধু তাদের অস্বীকার করার বিষয়টিরই উল্লেখ করেনি যে, শুধু এর প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হবে। বরং তাদের বিভ্রান্ত মন ও মানসিকতার পর্যালোচনা করে যাতে তাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে পারে, তার বক্রতা দূর করে এবং সব কিছুর আগে মনকে এমনভাবে জাগিয়ে তোলা ও আন্দোলিত করার চেষ্টা করে, যাতে তা মহাবিশ্বের অন্তরালে বিরাজমান মহাসত্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ জন্যে কোরআন পরকালকে প্রমাণ করার জন্যে তাদের সাথে কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিতর্কে লিপ্ত হয় না। কেবল তাদের মনকেই জাগিয়ে তোলে, যাতে তা চিন্তাভাবনা করে এবং তাদের প্রজ্ঞা ও বিবেককে আলোড়িত করে, যাতে তা চারপাশের প্রত্যক্ষ সত্যগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয় ও তা গ্রহণ করে। যারা মনের বিশুদ্ধি ও সুচিকিৎসা কামনা করে, তাদের জন্যে এতে উপকৃত হওয়ার মতো শিক্ষা রয়েছে।

সূরাটি শুরু হয়েছে আরবী বর্ণমালার একটি অক্ষর 'ক্বাফ' দ্বারা এবং ক্বাফ দিয়ে লেখা ও শুরু করা কোরআনের নামে শপথ করার মাধ্যমে।

শপথ করে কোরআন কোন্ কথাটা বলতে চায়, তার উল্লেখ করেনি। তবে শুরুতেই শপথ করা দ্বারা বুঝা যায়, সূরার গোটা আলোচ্য বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চেতনায় এই গুরুত্ববোধ সৃষ্টি করার পর এমন একটি বিষয়ের সূত্রপাত করা হয়েছে, যাতে তাদের কাছে রসূলের আগমন ও আখেরাতের আলোচনা সম্বলিত কোরআন নাযিল হওয়া সম্পর্কে কাফেরদের বিস্ময় প্রকাশ নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে।

কেয়ামত ও জবাবদিহিতা অবধারিত

বলা হয়েছে– 'বরং তারা এ জন্যে অবাক হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসে গেছে। তা দেখে কাফেররা বলেছে যে, এতো খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার! আমরা মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর আবার বেঁচে উঠবো নাকি? সে তো খুবই সুদূর পরাহত এক প্রত্যাবর্তন।'

অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে এতে তারা অবাক হয়ে গেছে। অথচ এতে অবাক হবার কিছু নেই। এটা বরঞ্চ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যাকে বক্রতামুক্ত সুস্থ বিবেক মাত্রেই সানন্দে গ্রহণ না করে পারে না। স্বাভাবিক ব্যাপার তো এটাই যে, কোনো মানব গোষ্ঠীকে কোনো জিনিস শেখাতে হলে আল্লাহ তায়ালা সে জন্যে সে গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই কাউকে বাছাই করবেন। এই ব্যক্তি তাদেরই লোক হওয়ায় তার চেতনা অনুভূতি তাদের চেতনা অনুভূতির মতোই হবে। তাদের ভাষায় সে কথা বলবে। তাদের তৎপরতায় ও জীবনধারায় সেও অংশগ্রহণ করবে, তাদেরকে কিসে আকৃষ্ট করে এবং কিসে বিরক্ত করে তা সে বুঝবে। তাদের কর্মক্ষমতা ও ধারণ ক্ষমতা কতখানি তা সে জানবে। এরূপ ব্যক্তিকে পাঠালে সে তাদেরকে তাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করবে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাবে এবং নিজে হবে সর্বপ্রথম এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারী।

খোদ রেসালাত নিয়েও তারা বিস্মিত। রসূল তাদেরকে যে পরকালের কথা বলেন, তা তাদের কাছে বড়ই আশ্চার্যজনক। পরকাল-বিশ্বাস ইসলামের একটা মূলনীতি। এ মূলনীতি গোটা ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের দাবী ও চাহিদা সংক্রান্ত সামগ্রিক ধ্যানধারণা এই মূলনীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানের কাছে ইসলামের দাবী এই যে, অসত্যকে প্রতিহত করার জন্যে সে যেন সত্যের পতাকাবাহী হয়। অন্যায় ও অকল্যাণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সে যেন ন্যায়ের পতাকাবাহী হয়। পার্থিব জীবনে তার সকল কাজ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়ার মাধ্যমে এবাদাতে পরিণত হয়।

বস্তুত দুনিয়ার প্রতিটি কাজেরই বদলা প্রয়োজন। কিন্তু সেই বদলা পার্থিব জীবনে নাও মিলতে পারে। সে ক্ষেত্রে বদলা পার্থিব জীবনের পরবর্তী জীবন পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে। এ জন্যে আরেকটা জগত প্রয়োজন। আর সেই জগতে হিসাব গ্রহণের জন্যে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা অপরিহার্য। মানুষের মন মগযে যখন আখেরাতের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সেই সাথে ইসলামী আদর্শের সকল তত্ত্ব ও সে সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বিলুপ্ত হয় এবং এরূপ দায়িত্ববোধহীন মন ইসলামী জীবনধারার সাথে কখনো খাপ খাইয়ে চলতে পারে না।

কিন্তু মোশরেকেরা এ বিষয়টাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো দেখেনি। তারা এটিকে দেখেছে অন্য একটি অতীব জটিল দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। উপলব্ধি করা যায় না আল্লাহর শক্তির প্রকৃত স্বরূপও। এ জন্যেই মোশরেকেরা বলেছিলো, 'আমরা মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত হবো নাকি? সেটা তো একটা সুদূর পরাহত প্রত্যাবর্তন।'

এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তাদের চোখে আসল সমস্যাটা হলো মৃত্যু ও ধ্বংসের পর পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাকে সুদূর পরাহত মনে করা। এটা যে একটা স্থূল ও অসূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ, সে কথা আমি আগেই বলেছি। কেননা, একবার যে জীবন অলৌকিকভাবে অস্তিত্বে এসেছে তা আরো একবার অস্তিত্বে আসতে পারে। এই অলৌকিক ঘটনা তাদের সামনে অহরহই ঘটে চলেছে। গোটা সৃষ্টিজগত জুড়ে এ ঘটনা দৃশ্যমান। এই দিকটিই কোরআন আলোচ্য সূরায় তুলে ধরেছে।

তবে কোরআনের জীবন ও প্রকৃতি সংক্রান্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করার আগে সেই আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই যাতে মৃত্যু ও ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে মোশরেকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা ও তার ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। তারা বলেছিলো, 'আমরা মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পরও পুনরুজ্জীবিত হবো নাকি?' এ কথা সত্য যে, মানুষ একদিন মরবেই এবং মরার পর মাটিও হবে। মোশরেকদের এই উক্তির উদ্ধৃতি যে-ই পড়বে সে সরাসরি নিজের দিকে নযর বুলাবে এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রাণীর দিকেও তাকাবে, যাতে মৃত্যু ও ধ্বংস দৃশ্য কল্পনা করা যায়। এমনকি আজ মাটির ওপরে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করা সত্তেও অতি ধীরগতিতে কিভাবে তার দেহে মৃত্যু ও ধ্বংস নেমে আসবে, তা অনুভব করতে পারে। মৃত্যু ও ধ্বংস যেমন জীবিত প্রাণীর মনকে প্রকম্পিত করে, তেমন আর কিছু করে না।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের উক্ত বক্তব্যের যে পর্যালোচনা করেছেন, তাতে মৃত্যুর এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে আরো শাণিত ও গভীর করা হয়েছে এবং মাটি কিভাবে মানুষের মৃতদেহকে একটু একটু করে খেয়ে ফেলে, তার ধারণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'তাদের দেহকে মাটি কিভাবে ক্ষয় করে তা আমি জানি এবং আমার কাছে সুরক্ষিত লিপি রয়েছে।'

মাটির ভেতরে সমাহিত দেহ মাটির আলোড়নে কিভাবে পর্যায়ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে কিভাবে মাটি দেহকে খেয়ে ফেলে, সেই দৃশ্যকে এ আয়াতে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। আর জীবিত অবস্থায়ও মানুষের দেহ কিভাবে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত ও প্রাচীন হতে থাকে, তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে। আয়াতটির মর্মার্থ হলো, পৃথিবী (জীবিত কিংবা মৃত উভয় অবস্থায়) কিভাবে তাদের দেহকে ক্ষয় করতে থাকে, তা আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং এটা একটা সুরক্ষিত গ্রন্থে সংরক্ষিত। তারা মরে মাটি হয়ে গেলে একেবারে বিলীন হয়ে যায় না। জীবনকে এই মাটির অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা তো আগেও সংঘটিত হয়েছে। আর মৃতকে জীবিত করার ঘটনাও চারপাশে অহরহ ঘটে চলেছে এবং তা অবিরাম গতিতে চলেছে।

এভাবেই মানুষের মনকে নরম করা, গলানো, সচেতন করা, উদ্দীপিত করা ও ত্বরিত দাওয়াত গ্রহণ করার যোগ্য বানানোর চেষ্টা চলেছে এ আয়াতে এবং মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগেই এই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

অতপর মোশরেকদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই সকল অলীক ও উদ্ভট আপত্তির মূলে সক্রিয় রয়েছে। কেননা, তারা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সত্যকে অস্বীকার করার কারণে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে এবং এরপর কোনো ব্যাপারেই তারা স্থায়ী অবস্থান নিতে পারেনি।

'বরঞ্চ তারা তাদের কাছে আগত সত্যকে অস্বীকার করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান।'

যারা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের অবস্থার এক অতুলনীয় ও সচিত্র দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এ আয়াতে। স্থিতিশীল সত্যকে ত্যাগ করার পর তারা আর স্থিতি খুঁজে পায় না।

সত্য ও সত্যের পথিক সবসময়ই অটল

সত্য একটা অনড়, অটল ও অক্ষয় জিনিস। যে ব্যক্তি সত্যের ওপর ঈমান আনে, তার কদম কখনো টলটলায়মান হয় না। কেননা তার পায়ের নিচের মাটি অনড় ও অবিচল। সত্য ছাড়া আর সবই দোদুল্যমান ও টলটলায়মান। সত্য ছাড়া আর কোনো কিছুর স্থিতি নেই এবং স্থায়িত্ব নেই। তাই সে স্থিতিহীন ও ক্ষয়িষ্ণু। সত্যকে যে ত্যাগ করে, তাকে তার প্রবৃত্তি, বিভিন্ন কুপ্ররোচনা, ধোঁকা, সন্দেহ ও সংশয় ক্রমাগত ফুটবলের মতো এদিক থেকে ওদিকে, ডান থেকে বামে ছুঁড়ে মারতে থাকে। ফলে সে কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকে না। অনড়, অটল, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী সত্য সম্পর্কে এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে তাদের উদ্ভট ও অযৌক্তিক আপত্তির বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান সত্যের কিছু প্রতীক তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। এতে আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, বৃষ্টি, খেজুরের বাগান, উদ্ভিদ ও ফলের বাগানের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা অনড়, অটল সত্যের গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলা হয়েছে,

'তারা কি দেখেনি, কিভাবে আমি আকাশকে তাদের মাথার ওপর নির্মাণ করেছি, সুসজ্জিত করেছি এবং তাতে ফাঁক বা ফাটল নেই?'

বিশ্ব নিখিলকে যদি একটি গ্রন্থ রূপে কল্পনা করা যায়, তবে আকাশ হচ্ছে তার একটি পৃষ্ঠা রূপ। এই পৃষ্ঠায় সেই মহাসত্য বর্ণিত হয়েছে, যাকে কাফের ও মোশরেকরা পরিত্যাগ করেছে। মহাকাশে যে স্থিতি, সৌন্দর্য ও শৃংখলা বিরাজ করছে, তা কি তারা দেখতে পায় না? বস্তুত স্থীতি, পূর্ণতা ও সৌন্দর্য হচ্ছে আকাশের বৈশিষ্ট্য। আর এই তিনটে জিনিস কোরআনেরও বৈশিষ্ট্য। তাই আল্লাহর সৃষ্টি আকাশ, মহাসত্য ইসলাম ও আল্লাহর রচিত কোরআন পরস্পরের সাথে সাম স্যপূর্ণ। এ কারণেই নির্মাণ, সৌন্দর্য ও ফাটলহীন হওয়ার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে পৃথিবী মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থখানি চির সুন্দর, চির উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'আর পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদগত করেছি নয়নাভিরাম যাবতীয় উদ্ভিদ।'

এখানে পৃথিবীর বিস্তৃতি, স্থাপিত পর্বতমালা ও উদ্ভিদের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য–সব কিছুতে যে স্থিতি, ও সৌন্দর্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাতে স্রষ্টার সৃজনী-দক্ষতা ও বিচক্ষণতার একটি দিক এবং মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ স্বরূপ।'

অর্থাৎ এই কোরআনে রয়েছে এমন জ্ঞান ও উপদেশ, যা পর্দা সরিয়ে দেয়, অন্তর্দৃষ্টি উদ্ভাসিত ও প্রখর করে, হৃদয়কে উন্মীলিত করে আর অন্তরাত্মাকে এই বিচিত্র সৃষ্টিজগতের সাথে এবং এর অন্তরালে যে অভিনবত্ব, বিচক্ষণতা ও ধারাবাহিকতা লুকিয়ে রয়েছে, তার সাথে সংযুক্ত করে। এরূপ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যেক অনুগত বান্দা উপকৃত হয়ে থাকে এবং নিজের প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ঈমানের দৃষ্টিভংগি

মানুষের হৃদয় ও এই মনোরম চিত্তাকর্ষক সৃষ্টিজগতের দৃশ্যপটের মাঝে এই হচ্ছে যোগসূত্র। এই যোগসূত্রের কারণে সৃষ্টিজগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে পরিচয় লাভ

মানব মনের ওপর রেখাপাত করে ও মানব জীবনে তাৎপর্য বয়ে আনে। কোরআন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে মানুষের এই যোগসূত্রই স্থান করে। অথচ এ যুগের তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণায় এই যোগসূত্রটাই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের আবাসস্থল এই প্রকৃতির সাথে তার যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, উক্ত গবেষণা তাকে ছিন্ন করে। আসলে মানুষ তো বিশ্ব প্রকৃতিরই একটা অংশ। এই বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে মানুষের জীবন বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হতে পারে না। এই মহাবিশ্বের দৃশ্যপটের সাথে মানুষের হৃদয়ের যোগসূত্র মযবুত ও অটুট না হলে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হতে পারে না। আকাশের একটি নক্ষত্র, মহাশূন্যের কোনো একটি স্তর, উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোনো একটি গুণবৈশিষ্ট, অথবা সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব-প্রকৃতির গুনবৈশিষ্ট এবং বিশ্ব-প্রকৃতিতে আন্দিত কোনো সজীব ও জড় পদার্থের গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে কোনো 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্ব ও তথ্য মানব হৃদয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এক মনোরম দৃশ্যপটের সৃষ্টি করে, বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে তার সখ্য গড়ে তোলে, মানুষের সাথে প্রাণী ও বস্তুর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচয় প্রদান করে এবং এই বিশ্বজগত ও তার ভেতরে যত বস্তু ও প্রাণী আছে, তার স্রষ্টার একতা সম্পর্কে চেতনা দান করে। মানব জীবনের এই সুমহান, প্রাণবন্তু, কার্যকর দিনির্দেশক লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন যে কোনো জ্ঞান, বিজ্ঞান বা গবেষণা অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ও বিকৃত। এ ধরনের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও গবেষণা মানব জীবনের কোনো উপকার সাধন করতে পারে না। আমাদের এই মহাবিশ্ব সত্যের এক উন্মুক্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সকল ভাষায় পড়া যায় এবং সকল উপায়ে উপলব্ধি করা যায়। অজ্ঞ বস্তিবাসী থেকে শুরু করে সুসভ্য প্রাসাদবাসী সকলেই এ গ্রন্থ নিজের যোগ্যতা ও বোধশক্তি অনুপাতে অধ্যয়ন করতে পারে এবং সত্যান্বেষী মাত্রেই এই অধ্যয়ন দ্বারা সত্যের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। এ গ্রন্থ সব সময়ই উন্মুক্ত। 'আল্লাহর অনুগত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ স্বরূপ'-এ উক্তির এটাই মর্মার্থ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এই অন্তর্দৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয় অথবা মানব হৃদয়ের সাথে বিদ্যমান বিশ্বজগতের এই যোগসূত্রকে ছিন্ন করে দেয়। কেননা, এই বিজ্ঞানের সূতিকাগার হচ্ছে কতকগুলো বিকৃত মস্তিষ্ক, যাকে তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক কারিকুলাম' সম্পূর্ণরূপে স্থবির করে দেয়। এই বৈজ্ঞানিক কারিকুলাম মানুষের সাথে তার আবাসস্থল এই প্রকৃতির সম্পর্কও ছিন্ন করে দেয়।

অথচ ইসলাম উক্ত 'বৈজ্ঞানিক কারিকুলাম'-এর সুফলকে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে না এবং অকাট্য সত্যকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয় না। তবে ইসলাম সেই সাথে বিচ্ছিন্ন সত্যগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে, সেগুলোকে বৃহত্তম সত্যের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তার সাথে মানব মনকে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ মানব মনকে প্রাকৃতিক বিধান ও বিশ্বজগতের যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে যুক্ত করে এবং এই সকল প্রাকৃতিক বিধান ও তথ্যাবলীকে মানুষের অনুভূতিতে ও জীবনে কার্যকর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিতে পরিণত করে। ইসলাম নিছক নিষ্প্রাণ নিরস ও পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যাবলী পরিবেশন করে না, যা প্রকৃতির সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক রহস্যগুলোকে অনুদঘাটিত অবস্থায় রেখে দেয়, যাবতীয় শিক্ষায় ও গবেষণায় ইসলামী বিধানকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে তার এই অটুট যোগসূত্রের সাথে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলীকে যুক্ত করা যায়।

পুনরুজ্জীবনের জীবন্ত উদাহরণ

এই আলোচনার পর কোরআন প্রকৃতি নামক গ্রন্থের আরো এমন কয়েকটি পাতা উন্মীলিত করে, যাতে মহাসত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে। অতপর সর্বশেষে এখানে কেয়ামত ও পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি আকাশ থেকে বরকতপূর্ণ পানি বর্ষণ করেছি .....পুনরুত্থানের ব্যাপারটাও এভাবেই ঘটবে।'

আকাশ থেকে বর্ষিত পানি মৃত মাটিকে তো জীবনীশক্তি দেয়ই, কিন্তু তার আগে মানুষের মৃত হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করে থাকে। বৃষ্টির দৃশ্য যে মানুষের অন্তরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু শিশুরাই বৃষ্টিতে আনন্দিত হয় না, বরং বড়দের মনও এ দৃশ্য দেখে উল্লসিত হয়ে থাকে এবং প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুদের মত তাদের মনও স্পন্দিত হয়ে থাকে।

এখানে 'বরকতময়' বলে পানির একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর উদ্যোগে তা ফলের বাগান ও পরিপক্ক শস্য পয়দা করে থাকে। পানি দ্বারা খেজুর গাছও জন্মে। খেজুর গাছকে উচ্চ ও সুন্দর বলে বিশেষিত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে,

'আরো উৎপন্ন করে থাকি খেজুর গাছ, যা উচ্চ ও যাতে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর থাকে।'

আসলে এ আয়াতে উচুঁ উচুঁ খেজুর গাছে থোকায় থোকায় খেজুরের কাঁদি কত সুন্দর ও মনোহর দেখায়, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। মহাসত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এ বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, মহাসত্য তথা ইসলামী আদর্শ ও বিধান অতি উচ্চ ও উন্নত এবং তা অতীব সুন্দর তথা নিখুঁত ও চমকপ্রদ।

এই পানি, বাগান, খেজুর গাছ, শস্য ও খেজুর ইত্যাদি দিয়ে যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর কত বড় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, তা বর্ণনা করেছেন পরবর্তী আয়াতে মর্মস্পর্শী ভংগিতে বলেছেন,

'বান্দাদের জীবিকা হিসাবে।'

অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই এই জীবিকার উপকরণ তথা বৃষ্টি ইত্যাদি সরবরাহ করেন, তার অংকুরোদগমের ব্যবস্থা করেন এবং বান্দাদের জন্যে তাতে ফল উৎপন্ন করেন। কারণ তিনি তো মনিব, অথচ এ জন্যে তারা তার শোকর করে না।

এই পর্যায়ে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের বিবরণ দেয়া শেষ হয়েছে এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে,

'অতপর আমি তা দ্বারা মৃত শহরকে পুনরুজ্জীবিত করেছি, আর এভাবেই ঘটবে পুনরুত্থান।'

বস্তুত এ প্রক্রিয়াটি তাদের চারপাশে অহরহই ঘটছে এবং এটা তাদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু তারা এ দ্বারা সচেতন হয় না এবং আপত্তি ও বিস্ময় প্রকাশের আগে এর দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। 'আর এভাবেই ঘটবে পুনরুত্থান।' অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় এবং এত সহজেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। এ কথাটা বলার আগে প্রকৃতির যে দৃশ্যাবলী মানুষের মনের ওপর রেখাপাত করে এবং যা প্রত্যেক অনুগত বান্দার মনকে অনুপ্রাণিত করে, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুত মন-মগযের স্রষ্টা এভাবেই মন-মগযকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

মানব ইতিহাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাতা

এরপর মানবেতিহাসের এমন কয়েকটি পাতা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মক্কার মোশরেকদের ন্যায় একদল মানুষ আল্লাহর কেতাব, রসূল ও আখেরাতকে নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অনিবার্য আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

'তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি......সবাই নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো........বরং তারা নবতর সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত রয়েছে।'

'রাস্' শব্দটির অর্থ হচ্ছে বদ্ধ পুকুর, আর 'আয়কা' অর্থ ঘন পাতাপূর্ণ বন। আসহাবুল আয়কা বলে সম্ভবত হযরত শোয়ায়বের জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু 'আসহাবুর রাস' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। আর 'তুববা' ছিলো ইয়ামানের হিময়ারী রাজাদের উপাধি। অন্য যেসব জাতির এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআনের পাঠক মাত্রেরই কাছে তারা পরিচিত।

আয়াতে অতীতের এই জাতিগুলোর বিস্তারিত বৃত্তান্ত তুলে ধরা উদ্দেশ্য নয়। কেবল আল্লাহর রসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণামে কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ দ্বারা পরবর্তীকালের মানুষের মনকে সতর্ক করা হয়েছে। যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্যণীয় তা এই যে, এই জাতিগুলোর সবাই রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিলো।

'সবাই রসূলদের অস্বীকার করেছিলো, ফলে আমার হুমকি কার্যকরী হলো।'

এ দ্বারা মূলত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও রসূলদের দাওয়াতের বিষয় যে সর্বকালে একই ছিলো, সেটাই বলা উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি একজন রসূলকে অস্বীকার করে, সে সকল রসূলকে অস্বীকার করে। কেননা, সে সকল নবী ও রসূলের আনীত বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করে। নবী ও রসূলরা পরস্পরের ভাই। একই উম্মাত এবং স্থান-কাল নির্বিশেষে একই বৃক্ষের বিভিন্ন ডালপালা। এর একটি ডালকে ধরার অর্থ গোটা বৃক্ষকে এবং তার সবকটি ডালকে ধরা।

'ফলে আমার হুমকি কার্যকরী হলো।'

তাদের কী পরিণতি হয়েছিলো, তা পাঠকদের কাছে সুবিদিত।

এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির প্রেক্ষাপটে পুনরায় সেই বিষয়টির উল্লেখ করা হচ্ছে যাকে কাফেররা অস্বীকার করেছিলো। সেটি হচ্ছে পরকাল সংক্রান্ত বিষয়। বলা হচ্ছে, প্রথমবার সৃষ্টি করেই কি আমি অক্ষম হয়ে গিয়েছি?' উপস্থিত সৃষ্টিজগতই এর সাক্ষী। তাই এর জবাবের প্রয়োজন নেই।

'বরং তারা নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত রয়েছে।' অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টির সাক্ষ্য উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা গ্রহণ করছে না। সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তার কেমন পরিণতি হওয়া উচিত, সেটাই এখন বিবেচ্য।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের শাহ রগের চেয়েও কাছে

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার প্রকৃতি তাকে কি কি প্ররোচনা দেয়?..... সেখানে তারা যা যা চাইবে, তা তাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। উপরন্তু আরো অনেক কিছু আমার কাছে রয়েছে।'

এ হচ্ছে সূরার দ্বিতীয় অংশ। এটা প্রথমাংশের আখেরাত সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং রেসালাতকে অস্বীকারকারীদের জবাব। সূরার ভূমিকায় আমরা আল্লাহর যে প্রত্যক্ষ প্রহরা ও পর্যবেক্ষণ এবং তার দৃশ্যাবলী তুলে ধরেছি, এখানে সেটি আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া মৃত্যু ও মৃত্যু প্রাক্কালীন দৃশ্য, অতপর হিসাব গ্রহণ ও আমলনামা প্রদর্শনের দৃশ্য, অতপর জাহান্নামের মুখ ব্যাদান করে 'আরো আছে নাকি' বলে মানুষরূপী কাষ্ঠ প্রার্থনার ভয়াবহ দৃশ্য এবং তার পাশেই জান্নাত ও তার নেয়ামত ও মর্যাদার বিবরণ রয়েছে এ অংশে।

জন্ম থেকে মানব জীবনের যে যাত্রা শুরু হয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার কেবল এক পর্ব থেকে অপর পর্বে উত্তরণ ঘটে এবং কেয়ামত ও হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এটি একটি বিরতিহীন একক সফর। এ সফর মানুষের মনে তার একমাত্র যাত্রাপথ অংকিত করে, যাতে কোনো ফাটল বা ছেদ নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ যাত্রা আল্লাহর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও

পর্যবেক্ষণের আওতাধীন। এতে বিন্দুমাত্র উদাসীনতা ও বিপথগামিতার অবকাশ নেই। এটি একটি ভয়ংকর যাত্রা, যা গোটা স্নায়ুকে আতংক ও ত্রাসে আচ্ছন্ন করে রাখে। মহাপরাক্রান্ত ও অন্তর্যামী আল্লাহর মুঠোর মধ্যে থেকে মানুষ কিভাবে তাঁকে ফাঁকি দেবে? আল্লাহর তো ঘুম তন্দ্রা নেই, ভুল-ভ্রান্তি নেই!

মানুষ যখন জানতে পারে যে, দুনিয়ার কোনো শাসক তার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছে এবং নিজেও তার গতিবিধির ওপর নযর রাখছে, তখন তার দেহ-মনে কম্পন এসে যায় এবং সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অথচ দুনিয়ার শাসক যতো ধুরন্ধরই হোক না কেন, সে বাহ্যিক তৎপরতারই শুধু খবর নিতে পারে। মানুষ যদি নিজ ঘরে বসে থাকে, দরজা বন্ধ করে রাখে কিংবা নীরবতা অবলম্বন করে, তবে সে সহজেই শাসকের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্বের মহাপরাক্রান্ত শাসক আল্লাহর পাকড়াও থেকে তার নিস্তার নেই, চাই সে যেখানেই বাস করুক এবং যেখানেই চলে যাক। এমনকি আল্লাহর পর্যবেক্ষণে তার মনমগয ও চিন্তা পর্যন্ত ধরা না পড়ে পারে না। এমন কঠিন নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে মানুষ কোনোভাবেই রেহাই পেতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার প্রবৃত্তি তাকে কি প্ররোচনা দেয়। আমি তার ঘাড়ের শাহরগের চেয়েও নিকটবর্তী। ডান ও বাম দিকে উপবিষ্ট দুই প্রহরী যখন মিলিত হয়, তখন মানুষ যে শব্দই উচ্চারণ করে, তা তার কাছে বিদ্যমান সদা প্রস্তুত প্রহরী লিখে রাখে।'

আয়াতের প্রথম কথাটি

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি।'

এর আনুষংগিক বক্তব্যের দিকে ইংগিত করছে। সেটি এই যে, একটি যন্ত্রের প্রস্তুতকারী তার নির্মাণ কৌশল ও যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে অন্য সবার চেয়ে ভালো জানে। অথচ কোনো যন্ত্রের নির্মাতা তার সৃষ্টিকর্তা নয়। কেননা, সে তার মূল উপাদানগুলো তৈরী করেনি। সে শুধু তার উপাদানগুলোর সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়েছে মাত্র! কিন্তু যিনি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ মূলত আল্লাহর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করলেও তার মনের একান্ত গোপন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা তার সর্বজ্ঞ স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ জানা। তার কাছ থেকে সে কোনো কিছুই লুকাতে সক্ষম নয়।

'আর তার প্রবৃত্তি তাকে কী কী প্ররোচনা দেয় তা আমি জানি।'

এভাবে মানুষ দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে যে, সে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত, কোনো কিছুর আড়ালে সে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম নয়। তার মনে যতরকম কুপ্ররোচনা থাকে তা আল্লাহর কাছে জ্ঞাত। এভাবে যে হিসাবের দিনকে সে অস্বীকার করে থাকে, তার জন্যে তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

'আর আমি তার কাছে ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটতর।'

'ওয়ারিদ' হচ্ছে রগ, যার ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। 'রগের চেয়েও নিকটবর্তী হওয়া' এমন একটি প্রতীকী উক্তি, যা দ্বারা তার ওপর মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ও নিরংকুশ আধিপত্য ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষ যখন এই ব্যাপারটা কল্পনা করে, তখন সে শিউরে না উঠে ও আত্মসমালোচনা না করে পারে না। এই উক্তিটি দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা

যদি কোনো মানুষের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তবে সে এমন একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করতে সাহস পাবে না, যা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। এমনকি আল্লাহর কাছে অনুমোদনযোগ্য নয় এমন চিন্তাও তার মনে স্থান পাবে না।

মানুষের আমলের রেকর্ড

এই একটি উক্তিই মানুষের সার্বক্ষণিক সতর্কতা, সার্বক্ষণিক ভীতি ও জাগৃতি এবং আত্মসমালোচনার ভেতর দিয়ে জীবন যাপন করার জন্যে যথেষ্ট। তথাপি কোরআন স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের ধারণা জাগ্রত ও মযবুত করে। ফলে মানুষ তার জীবন যাপন, কাজকর্ম, ঘুম, পানাহার, কথা বলা ও নীরব থাকা– সবই ডানে ও বামে পাহারারত দু'জন ফেরেশতার মাঝে সম্পন্ন করে–যারা তার প্রতিটি কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং সংঘটিত হওয়া মাত্রই লিপিবদ্ধ করে।

এরা কিভাবে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করে তা আমরা জানি না। আর এ নিয়ে ভিত্তিহীন আন্দাজ-অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই। এ সকল অদৃশ্য বিষয়ে আমাদের নীতি এই যে, এগুলো যেমন আছে, তেমনভাবেই এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং এর উপায় ও পন্থা নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করার দরকার নেই। কেননা, সে চিন্তা-ভাবনায় কোনো লাভও নেই। তা ছাড়া এসব তথ্য আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানারও বাইরে এবং আমাদের মানবীয় জ্ঞানের সীমানারও বাইরে।

আমাদের বাহ্যিক মানবীয় বিজ্ঞানের আওতাধীন কিছু রেকর্ডিং এর উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আমাদের পূর্বতন পুরুষদের কল্পনারও অতীত ছিলো। এগুলোর মধ্যে অডিও ক্যাসেট মানুষের কথা ও শব্দ রেকর্ড করে। আর ভিডিও ক্যাসেট, সিনেমার ফিল্ম ও টেলিভিশন ফিল্ম মানুষের কার্যকলাপকে রেকর্ড করে। এগুলো আমাদের মানবীয় ক্ষমতার আওতাধীন। সুতরাং আমাদের এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, ফেরেশতারা আমাদের ব্যবহৃত সীমিত মানবীয় কোনো পদ্ধতিতে রেকর্ড করে থাকতে পারে। কেননা, আমাদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের অজানা সেই জগত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং সেই জগত সম্পর্কে আমরা আল্লাহর জানানো তথ্যের বাইরে বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারি না।

আমাদের জন্যে এই আয়াতে সত্যের যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, কেবল সেইটুকু অনুসরণ করাই যথেষ্ট। আমরা মনে মনে শুধু এতটুকু বিশ্বাস করলেই চলবে যে, আমরা যা-ই বলি বা করি না কেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড করার জন্যে আমাদের ডানে-বামে প্রহরী রয়েছে। তারা এগুলোকে আমাদের আমলনামায় সংরক্ষণ করেন এবং এই আমলনামা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আল্লাহর সামনে সংরক্ষিত থাকে।(১)

এই ভয়াবহ সত্যকে স্বীকার করে এর আওতায় জীবন যাপন করা আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এটা একটা অকাট্য সত্য, যদিও আমরা এর বিস্তারিত জানতে পারি না। যেভাবেই হোক,

(১) মানুষের কর্মকান্ড রেকর্ড করার ক্ষেত্রে যেসব নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার এ অসীম কুদরতকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। জীব বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের হাতের তালুতে যে নানা ধরনের অসংখ্য রেখা রয়েছে, তা তার হাত দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় কর্মকান্ডকে নিখুতভাবে ধরে রাখতে পারে। এমনিভাবে তার পায়ের তালুর রেখাগুলো তার পায়ের কাজগুলোকে সযত্নে রক্ষা করে। তাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ রেখাগুলো রেকডিং-এর ফিতার মতোই মানুষের কর্মকান্ডের সংরক্ষণ করে। সম্ভবত এ কারণেই পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত এমন দু'জন মানুষ পাওয়া যাবে না–যাদের হাতের রেখার মাঝে কোনো রকম সাদৃশ্য আছে। পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশানের ক্ষেত্রে এই কারণেই দস্তখতের চাইতে টিপসইর মূল্য এতো বেশী।–সম্পাদক।

আমলনামা তথা কর্মের রেকর্ড থাকবেই এবং কোনক্রমেই তা থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। আমরা যাতে এর ভয়ে সাবধান হয়ে চলি, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এর কথা জানিয়েছেন। এর স্বরূপ কী, তা নিয়ে বৃথা চিন্তা-ভাবনা করার কোনো দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি।

যারা কোরআন ও রসূল (স)-এর নির্দেশের আলোকে জীবন গড়েছে, তাদের নীতি ছিলো এই যে, ইসলামের জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কাজ করতে হবে।

রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ কখনো কখনো তার কথাবার্তা দ্বারা আল্লাহকে এতো সন্তুষ্ট করে যে, তা সে ভাবতেও পারে না। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার সে কথার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত তার প্রতি নিজের সন্তোষ লিখে দেন। আবার মানুষ কখনো কখনো তার কথাবার্তা দ্বারা আল্লাহকে এতো অসন্তুষ্ট করে যে, তা সে ভাবতেও পারে না। ফলে আল্লাহ সে কথার জন্যে তার প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত অসন্তোষ লিপিবদ্ধ করে দেন। হযরত আলকামা বলেন, এই হাদীসটি আমাকে বহু কথা বলা থেকে বিরত রেখেছে। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

কথিত আছে যে, ইমাম আহমদ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে যন্ত্রণাজনিত উহ্ আহ্ শব্দ বেরুচ্ছিলো। এই সময় তাঁকে যেই বলা হলো যে, উহ্ আহ্ শব্দও আমলনামায় লিখিত হয়, তখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন এবং সেই অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

সেকালের মনীষীরা এ রকমই ছিলেন। তাঁরা এ সত্যকে মানতেন এবং তদনুসারে কাজ করতেন।

মৃত্যুর যন্ত্রনা থেকে কারোই রক্ষা নেই

এ আয়াতগুলো ছিলো জীবিতকালের প্রসংগ। এবার আসছে মৃত্যুকালীন প্রসংগ,

'মৃত্যু যন্ত্রণা সত্য সত্যই আসবে। তুমি তা থেকেই অব্যাহতি চেয়ে আসছো।'

মানুষ যে সব জিনিস থেকে অব্যাহতি পেতে চায়, এমনকি যার কথা কল্পনাও করতে চায় না, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিস হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু এ থেকে সে কিভাবে অব্যাহতি পাবে? মৃত্যু তো অবধারিত এবং তা ঠিক নির্দিষ্ট মুহূর্তেই আসবে। মৃত্যু-যন্ত্রণার উল্লেখ হাড়গোড়ে কাঁপুনি তোলার জন্যে যথেষ্ট। এই দৃশ্যটা থাকবে উন্মুক্ত এবং মানুষ তা শুনতে পাবে,

'তুমি তা থেকেই অব্যাহতি চেয়ে আসছ।' জীবিতাবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও যদি মানুষ এই যন্ত্রণার ভয়ে কম্পমান হতে পারে, তাহলে এই যন্ত্রণা ভোগ করার সময়ে যখন তাকে এ কথা বলা হবে, তখন কী অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন মুখ থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সোবহানাল্লাহ! সত্যিই মৃত্যুর যন্ত্রণা রয়েছে।' মহান আল্লাহকে সর্বোচ্চ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা ও তাঁর সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব হয়েও তিনি যদি এ কথা বলতে পারেন, তাহলে অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এখানে 'হক' তথা সত্য শব্দটির উল্লেখ লক্ষণীয়। বলা হয়েছে, 'মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্য সত্যই আসবে।' এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের মন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করার সময় সত্যকে পরিপূর্ণভাবে দেখবে। সত্যকে অবারিত অবস্থায় দেখবে এবং সত্যের যেটুকু জানতো না ও বুঝতো না তা জানবে ও বুঝবে। তবে তখন আর বুঝে কোনো লাভ হবে না। কেননা, তখন তাওবার কোনো

গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এবং ঈমানের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। এই সত্যকেই কাফেররা অস্বীকার করতো এবং এ নিয়ে সংশয়ে আচ্ছন্ন থাকতো। যখন তা বুঝবে ও স্বীকার করবে, তখন আর তাতে কোনো লাভ হবে না।

কবর থেকে কেয়ামত

মৃত্যু-যন্ত্রণার পর কেয়ামত ও হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত আর যা যা ঘটবে তা হচ্ছে,

'শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। .... প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন একজন রক্ষক ও একজন সাক্ষী সহকারে আসবে। ....আমি বান্দাদের জন্যে যালেম নই।'

এ আয়াতগুলোতে যে দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে, তা মনে জাগরূক রাখা যে কোনো মানুষকে তার সমগ্র জীবন সংযম ও সতর্কতার মধ্যে কাটিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি কিভাবে স্বস্তি লাভ করি? অথচ শিংগাধারী মুখে শিংগাধারণ করে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে, নিজের কপালকে লাল রং-এ রঞ্জিত করেছে এবং তাকে যে কোনো মুহূর্তে শিংগায় ফুঁকার নির্দেশ দেয়া হতে পারে। সাহাবীরা বললেন, হে রসূলুল্লাহ (স.)! আমরা এখন কী বলবো? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'বলো, আমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট এবং তিনি কতো সুন্দর অভিভাবক।' তখন সকলে বললো, 'আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতো সুন্দর অভিভাবক।'

'প্রত্যেক নাফস সেদিন একজন রক্ষক ও একজন সাক্ষী সহকারে আসবে।'

এখানে নাফ্স বলতে সেই মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যার হিসাব নেয়া হবে এবং যাকে কর্মফল দেয়া হবে। তার সাথে তাকে পরিচালনাকারী একজন ও তাকে সাক্ষ্যদানকারী একজন থাকবে। এরা দুইজন পার্থিব জীবনে মানুষের প্রহরী ও পাপপুণ্য লিপিবদ্ধকারী দু'জন ফেরেশতাও হতে পারে। অথবা অন্য কেউও হতে পারে। তবে প্রথমোক্ত দু'জন হওয়াই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এটা বিচারের জন্যে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এই নিয়ে যাওয়াটা কোনো সাধারণ আদালতে নয়, বরং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে।

এহেন কঠিন ও দুঃসহ অবস্থায় তাকে বলা হবে,

'তুমি এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। তাই আমি তোমার চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি এবং এখন তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর।'

এখানে প্রখর অর্থ হচ্ছে এরূপ শক্তিশালী যে, পর্দা দিয়ে তা ঢাকা যায় না। আয়াতের মর্ম এই যে, এই দিনটি সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে এবং এদিনটির যথাযথ গুরুত্ব দাওনি। এখন একটু তাকাও তো! আজ তো তোমার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর।

এই সময় তার সংগী এগিয়ে আসবে। সম্ভবত সেই হবে শহীদ অর্থাৎ তার সাথী 'তার সংগী বলবে, এই যে আমার কাছে সব কিছু প্রস্তুত।'

আয়াতে আমলনামা দেখা ও আদেশ কার্যকরী করার কোনো উল্লেখ নেই। কেবল রক্ষক ফেরেশতাদ্বয়কে আল্লাহ তায়ালা যা বলবেন তার উল্লেখ রয়েছে। যথা,

'তোমরা উভয়ে প্রত্যেক হঠকারী কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, যে সৎ কাজে ভীষণ বাধাদানকারী, সীমা অতিক্রমকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারী, সর্বোপরি যে আল্লাহর সাথে আরেকজন ইলাহ বানিয়েছে।'

'সুতরাং তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।'

এখানে কাফেরের এতগুলো বিশেষণের উল্লেখ দ্বারা মূলত মহান আল্লাহর ক্রোধ ও আক্রোশকে বুঝানো হয়েছে। অতপর যেই তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হয়, অমনি তার সংগী ঘাবড়ে যায়, ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং তার সংগী হিসাবে নিজের ওপর থেকে সম্ভাব্য অপবাদ প্রক্ষালণের চেষ্টা চালায়,

'তার সংগী বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমি ওকে বিপথগামী করিনি, সে নিজেই বিরাট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলো।'

সম্ভবত এই সাথী পূর্ববর্তী আমলনামা বহনকারী সাথী নয়। সম্ভবত এই সাথী তাকে গোমরাহকারী শয়তান। সে নিজে তাকে গোমরাহ করেনি বরং সে নিজেই গোমরাহ ছিলো বলে সাফাই গাইছে। কোরআনে এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, শয়তান তার সংগী মানুষের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব বহনে অস্বীকৃতি জানায়। আবার এই ব্যক্তি আমলনামা বহনকারী ফেরেশতাও হতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতায় হয়তো সেও ঘাবড়ে গিয়ে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হতে পারে। নিরপরাধ হয়েও তাকে যদি এভাবে নিজের সাফাই গাইতে হয়, তাহলে সহজেই বুঝা যায় যে, সেই পরিস্থিতিটা কত ভয়াবহ হতে পারে।

এই পর্যায়ে এসে চূড়ান্ত নির্দেশ জারী করা হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আমার কাছে কোন্দল করো না। আমি তো আগেই তোমাদেরকে হুশিয়ারী দিয়েছিলাম। আমার কাছে কথা পরিবর্তিত হয় না এবং আমি বান্দাদের জন্যে যালেম নই।' কেননা, ওটা কোনো ঝগড়াঝাটির জায়গা নয়। প্রত্যেক কাজের পরিণাম ও ফলাফল নির্দিষ্ট করে আগেই হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। সব কিছুই রেকর্ড করা এবং তাতে কোনো রদবদলের অবকাশ নেই। কাউকে রেকর্ড করা আমলনামা ব্যতীত অন্য কিছুর কর্মফল দেয়া হয় না। কাউকে যুলুম করা হয় না। কেননা, কর্মফলদাতা ও বিচারক হচ্ছেন ন্যায়বিচারক।

জান্নাত জাহান্নামের দৃশ্য

এখানে হিসাব-নিকাশের ভয়াবহ দৃশ্য শেষ হলো। কিন্তু সব দৃশ্য শেষ হয়নি। বরং এর একটা ভয়ংকর দিক পরবর্তী আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'যেদিন আমি জাহান্নামকে বলবো যে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো? সে বলবে, আরো কিছু আছে নাকি?'

পুরো দৃশ্যটা আলোচনারই দৃশ্য। এতে জাহান্নামকেও আলাপরত দেখানো হয়েছে। এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে একটা বিস্ময়কর ও ভয়াল দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এই সমস্ত হঠকারী কাফেরের দল এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিরোধকারী সীমা অতিক্রমকারী ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীর দলকে দোযখে নিক্ষেপ করে জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করা হবে। 'তোমারে পেট ভরেছে তো?' কিন্তু সেই জ্বলন্ত পেটুক জাহান্নাম বলবে, 'আরা আছে নাকি?' কী সাংঘাতিক আতংকময় দৃশ্য! ভাবলেও গা শিউরে ওঠে!

এই ভয়াল দৃশ্যের পাশাপাশি রয়েছে আরেকটা দৃশ্য, মনোরম, সন্তোষজনক, চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। সেটি জান্নাতের দৃশ্য। আল্লাহভীরু সৎ লোকদের সম্মানজনক সম্বর্ধনার দৃশ্য। বলা হয়েছে,

'আল্লাহভীরু লোকদের খুবই কাছাকাছি জায়গায় জান্নাত খুলে রাখা হবে। এই হচ্ছে সেই জিনিস, যা তোমাদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো ....' এখানে প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। জান্নাত এত নিকটবর্তী করা হবে যে, তাদেরকে কষ্ট করে আর তার কাছে যেতে হবে না, বরং জান্নাত নিজেই তাদের কাছে এগিয়ে আসবে। জান্নাতের সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টিজনিত পুরস্কার তাদের কাছে আসবে। 'এই হচ্ছে তোমাদের

জন্যেও প্রত্যেক অনুগত স্মরণকারী ব্যক্তির জন্যে প্রতিশ্রুত পুরস্কার। যে না দেখেও দয়াময়কে ভয় করে ও আনুগত্যপূর্ণ মন নিয়ে আসে-তার পুরস্কার।' মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো তাদের জন্যে ঘোষিত বিশেষণ ও খেতাব। আল্লাহর মানদন্ডে তারা অনুগত, আল্লাহকে স্মরণকারী, না দেখেও আল্লাহকে ভয়কারী এবং আল্লাহ তায়ালার অনুগত।

অতপর তাদেরকে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে এবং সেখান থেকে আর কখনো বেরিয়ে আসতে হবে না। বলা হবে, 'তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ কর। সেটা হবে চিরস্থায়ী হবার দিন।' অতপর এই জান্নাতবাসীদের সম্মানার্থে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো ঘোষণা করা হবে, সেখানে তারা যা চাইবে তা পাবে। অধিকন্তু অতিরিক্ত আরো অনেক কিছু আমার কাছে তাদের জন্যে থাকবে। অর্থাৎ তাদের জন্যে যা কিছু আল্লাহর কাছে থাকবে, তারা চেয়ে-চিন্তে তার নাগাল পাবে না। আল্লাহর কাছে এই অতিরিক্ত জিনিসগুলো থাকবে সীমাহীন ও অফুরন্ত পরিমাণে, থাকবে অযাচিতভাবে দেয়ার জন্যে।

অতীত জাতি সমূহের পরিণতি

এরপর আসবে সূরার শেষাংশ। সংক্ষেপে অথচ তীব্র ভাষায় ইতিহাস ও অতিক্রান্ত জাতিগুলোর কথা, মহাবিশ্বের এই উন্মুক্ত গ্রন্থের কথা, নতুন আংগিকে আখেরাত ও কেয়ামতের কথা এবং চেতনার অভ্যন্তরে ও অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল করে দেয়া নির্দেশাবলী উচ্চারিত হয়েছে এ অংশে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাদের আগে আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি .... অতএব যারা আমাকে ভয় করে তাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দাও।'

এসব বক্তব্য যদিও এ সূরায় ইতিপূর্বে রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআনের এটা একটা বিস্ময়কর রীতি যে, সূরার প্রথমভাগে কোনো জিনিস সবিস্তারে আলোচিত হয়, অতপর শেষ ভাগে সেই একই জিনিস একটু ভিন্ন আংগিকে ও ভিন্ন ভংগিতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়ে থাকে।

যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তাদের পূর্বে নূহের জাতি, রাসের অধিবাসীরা, সামুদ জাতি, আদ জাতি, ফেরাউন, লূতের ভাইয়েরা, আইকার অধিবাসীরা ও তুব্বার জাতিরা অস্বীকার করেছে। প্রত্যেক জাতি রসূলদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে। ফলে আমার হুমকি কার্যকর হয়েছে।'

এখানে বলা হয়েছে, 'তাদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি। তারা ওদের চাইতে বেশী শক্তিশালী ছিলো এবং তারা দেশে দেশে অনুসন্ধান চালাতো। তাদের কোনো পালাবার জায়গা ছিলো না।'

এখানে যে সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তা মূলত একই জিনিস। কিন্তু এর নতুন রূপটি পূর্বের রূপ থেকে ভিন্ন। এরপর এখানে সংযোজন করা হয়েছে প্রাচীন জাতিগুলোর দেশে দেশে বিচরণ ও জীবিকা অন্বেষণের বিষয়টি। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা এমন এক মহাশক্তিধর শাসকের মুঠোর মধ্যে ছিলো, যার হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

অতপর এ বিষয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে,

'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে স্মরণীয় বিষয় তাদের জন্যে যাদের মন আছে, অথবা যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে।'

অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্তদের পরিণতিতে রয়েছে স্মরণীয় বিষয়, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। এ সকল ঘটনা যাকে শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে না, তার অন্তর হয় মরে গেছে, নতুবা তার কোনো অন্তরই নেই। প্রকৃতপক্ষে স্মরণ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যে মনোযোগ দিয়ে ঘটনাগুলো

শোনা ও উপলব্ধি করাই যথেষ্ট। এতে অন্তরে ঘটনার প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে এবং সে প্রতিক্রিয়া যথার্থ ও ন্যায়সংগত। বস্তুত, মানুষের মন সাধারণত অতীতের ধ্বংস ও মৃত্যুর ঘটনাবলীর ব্যাপারে অত্যধিক স্পর্শকাতর। এ ধরনের সাড়া জাগানো ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলোতে স্মৃতি জাগানো ও প্রেরণা সঞ্চারণের জন্যে অপেক্ষাকৃত কম চেতনাসম্পন্ন হওয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হয়ে থাকে। অধিকতর চেতনা সম্পন্নরা তো আপনা থেকেই অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণে উন্মুখ থাকে।

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতত্ত্ব

প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, 'তারা কি তাদের মাথার ওপরে বিরাজমান আকাশকে দেখে না (এবং ভাবে না যে) কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি, সুসজ্জিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটল ও ছেদ নেই। আর পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছি, তাতে বহু পর্বত প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে প্রত্যেক রকমের জোড়া জোড়া নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি।'

আর এখানে সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে,

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও এই উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। অথচ আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।'

এখানে প্রকৃতি সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি ক্লান্তি স্পর্শ না করার বিষয়টি সংযোজিত হয়েছে। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই বিশাল সৃষ্টিজগতে সৃজনের কাজটি যখন আল্লাহর কাছে এতই সহজ, তখন মৃতকে জীবিত করা কেন সহজ হবে না? অথচ এ কাজটা আকাশ ও পৃথিবীর তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র।

অনুরূপ ভাবে সূরার এই শেষ ভাগে নতুন আংগিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

'অতএব তারা যত যা-ই বলুক, তাতে ধৈর্যধারণ কর। তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে গুণকীর্তন কর সূর্যাস্তের আগে ও সূর্যোদয়ের আগে, আর রাত্রিকালেও এবং সেজদার পরেও তার গুণকীর্তন করো।'

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সূর্যাস্ত পরবর্তী রাতের দৃশ্য—এই সবই আকাশ ও পৃথিবীর বৈশিষ্ট। আর এ সব কিছুর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও সেজদাকে এই প্রেক্ষাপটে আখেরাতকে ও পুনরুজ্জীবনে আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করা সহ কাফেরদের যাবতীয় কথাবার্তায় ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যের পুনরাবৃত্তির পরই একে ঘিরে এক নতুন আবহ ও নতুন পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে। এটি হচ্ছে ধৈর্য, প্রশংসা, গুণকীর্তন ও সেজদার পরিবেশ, আর এ সবই প্রকৃতির বৈশিষ্টসমূহের সাথে সংযুক্ত, যা আকাশ ও পৃথিবীতে দৃষ্টি দেয়া মাত্রই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পরবর্তী প্রথম রাত্র দেখা মাত্রই এবং আল্লাহর জন্যে সেজদা করা মাত্রই স্নায়ুতন্ত্রীতে সাড়া জাগায়।

সূরার মূল বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি

অতপর প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বিবরণের সাথে যুক্ত আরেকটি নতুন বক্তব্য—ধৈর্যধারণ কর, গুণকীর্তন কর ও সেজদা কর, যখন তুমি দিন ও রাতের প্রতি মুহূর্তে সেই ভয়াবহ ঘটনার জন্যে অপেক্ষমাণ থাকবে, যাকে কেবল মাত্র উদাসীন ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ অবহেলা করে না। সেই ভয়াবহ ঘটনাটা হলো কেয়ামত, যা এই সূরার কেন্দ্রীয় ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। বলা হচ্ছে,

'শোনো, যেদিন ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে ঘোষণা করবে, যেদিন যথার্থই লোকেরা বিকট একটা ধ্বনি শুনবে। .... এদের সমবেত করা আমার কাছে সহজ কাজ।'

এটা এক কঠিন দিনের চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। ইতিপূর্বে এ দৃশ্য একটু ভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছেছিলো, 'শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সেটি হচ্ছে হুশিয়ারীর দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি একজন পরিচালক ও একজন দর্শকের সাথে আসবে ....'

এখানে 'বিকট ধ্বনি' দ্বারা শিংগার ফুঁক বুঝানো হয়েছে। এতে অভিযানের দৃশ্য ও অতীতের সকল মানুষের মাটি ফুঁড়ে বেরুনোর দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেইসব অগণিত কবর ফুঁড়ে তারা বেরুবে, যাতে করে মৃতরা শাস্তি ভোগ করবে।

কবি আবুল আলা আল মায়াররী বলেন,

'বহু কবর বহুবার নতুন করে কবরে পরিণত হয়েছে,
পরস্পর বিরোধী লোকদের ভীড় দেখে সে হাসতে থাকে।
আর বহু সমাহিত ব্যক্তি সমাহিত হয়েছে পূর্ববর্তী সমাহিত ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষের ওপর
আর যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে এমনটি।'

বস্তুত সকল কবর এক সময় ভেংগেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং কবরবাসীর হাড়গোড় পৃথিবীর দিকে দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে এ সবের অবস্থানস্থল আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটি একটি অভাবনীয় দৃশ্য।

আর এই সাড়া জাগানো দৃশ্যের আড়ালে আল্লাহ তায়ালা সেই মহা সত্য অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য উদঘাটন করেন, যা নিয়ে তারা তর্ক-বিতর্ক করে এবং যাকে তারা অস্বীকার করে,

'নিশ্চয় আমিই মারি এবং আমিই বাঁচাই এবং আমার কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন। ......এই একত্রিতকরণ আমার কাছে সহজ কাজ।'

সর্বশেষে কাফেরদের অব্যাহত প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতির মোকাবেলায় রসূল (স.)-এর মনোবল মযবুত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা যা বলে তা আমিই সবচেয়ে ভালো জানি। তুমি তাদের ওপর পরাক্রমশালী নও। অতএব যে ব্যক্তি আমার হুশিয়ারীকে ভয় করে, তাকে কোরআন দ্বারা স্মরণ করিয়ে দাও।'

বস্তুত তাদের বিরোধিতার কথা আল্লাহ তায়ালা যে সবচেয়ে ভালো জানেন—এটা রসূলের সান্ত্বনার জন্যে যথেষ্ট, আর এটা প্রকারান্তরে কাফেরদের প্রতি একটি হুশিয়ারী স্বরূপ।

'তুমি তাদের ওপর ক্ষমতাবান নও।' সুতরাং তুমি তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পার না। কাজেই এ ক্ষেত্রে তোমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এটা শুধু আমার দায়িত্ব। আমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীল।'

'কোরআন দ্বারা স্মরণ করিয়ে দাও ....' কেননা, কোরআন মানুষের মনকে কাঁপিয়ে দেয়। ফলে এমন কোনো বিদ্রোহী মনকে সে আর বিদ্রোহের ওপর বহাল থাকতে দেয় না, যা কোরআনে বর্ণিত সত্যকে অস্বীকার করে।

এ ধরনের সূরা যখন পেশ করা হয়, তখন ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারে এমন পরাক্রমশালী লোকের তার প্রয়োজন থাকে না। কেননা, এ সূরায় এমন শক্তি ও পরাক্রম রয়েছে, যা পরাক্রমশালী লোকদের থাকে না। এতে মানব-মনে রেখাপাত করার মতো এমন বহু বক্তব্য রয়েছে, যা স্বৈরাচারী শাসকদের লাঠি বা তরবারির চেয়েও শক্তিশালী।

সূরা আয যারিয়াত

আয়াত ৬০ রুকু ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرّٰصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۖ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ) বাতাসের শপথ, যা ধুলাবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়, ২. অতপর (মেঘমালার) শপথ যা পানির বোঝা বয়ে চলে, ৩. (জলযানসমূহের) শপথ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, ৪. অতপর তাদের (ফেরেশতাদের) শপথ, যারা (আল্লাহর) আদেশ মোতাবেক প্রত্যেক বস্তু বন্টন করে, ৫. (কেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্যম্ভাবী) সত্য, ৬. বিচার আচারের একটা দিন অবশ্যই আসবে; ৭. বহু কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের শপথ, ৮. তোমরাও (কেয়ামতের ব্যাপারে) নানা কথাবার্তার মধ্যে (নিমজ্জিত) রয়েছো; ৯. (মূলত) যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে ব্যক্তিই (কোরআনকে) পরিত্যাগ করেছে; ১০. ধ্বংস হোক, যারা শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে), ১১. (সর্বোপরি) যারা জাহেলিয়াতে (নিমজ্জিত হয়ে) মূল সত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়েছে, ১২. এরা (তামাশার ছলে) জিজ্ঞেস করে, বিচারের দিনটি কবে আসবে? ১৩. (এদের তুমি বলো,) যেদিন তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে (সেদিন কেয়ামত হবে)। ১৪. (সেদিন তাদের বলা হবে, এবার) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে থাকো; এ হচ্ছে (সেদিন) যে জন্যে তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছিলে! ১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তারা (আল্লাহ তায়ালার) জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায় (চির শান্তিতে) থাকবে,

آخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

১৬. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যা (যা পুরস্কার) দেবেন, তা সবই তারা (সানন্দ চিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; নিসন্দেহে এরা আগে সৎকর্মশীল ছিলো; ১৭. তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাতো। ১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। ১৯. (এরা বিশ্বাস করতো,) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে। ২০. যারা (নিশ্চিতভাবে) বিশ্বাস করতো, তাদের জন্যে পৃথিবীর মাঝে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নিদর্শন (ছড়িয়ে) রয়েছে। ২১. তোমাদের নিজেদের (এ দেহের) মধ্যেও তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে; তোমরা কি দেখতে পাও না? ২২. আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রেযেক, তোমাদের দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি। ২৩. অতএব এ আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এ (গ্রন্থ)-টা নির্ভুল, ঠিক যেমনি তোমরা (এখন) একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছো।

রুকু ২

২৪. (হে নবী,) তোমার কাছে ইবরাহীমের সেই সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে কি? ২৫. যখন তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা (তাকে) 'সালাম' পেশ করলো; (সেও উত্তরে) বললো সালাম, (কিন্তু তার কাছে এদের একটি) অপরিচিত দল বলে মনে হলো, ২৬. এরপর (চুপে চুপে) সে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (ভুনা করা) মোটা তাজা বাছুরসহ (ফিরে) এলো, ২৭. অতপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছো না যে, ২৮. (তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় পেলো, (তার ভয় দেখে) তারা বললো, তুমি ভয় করো না; তার সাথে তারা তাকে গুণধর একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾
قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ
أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ
عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ
كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ
أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

২৯. এটা শুনে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব), আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা। ৩০. (তারা বললো,) হাঁ তোমার ব্যাপারটি এভাবেই হবে, তোমার মালিক বলেছেন; তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন (এটা তাঁর জন্যে অসম্ভব কিছু নয়)। ৩১. সে বললো, হে (আল্লাহ তায়ালার) প্রেরিত (মেহমান)-রা, (এবার) বলো, তোমাদের (এখানে আসার পেছনে আসল) ব্যাপারটা কি? ৩২. তারা বললো, আমাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) একটি অপরাধী জাতির কাছে (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) পাঠানো হয়েছে, ৩৩. (আমাদের বলা হয়েছে,) আমরা যেন মাটির (শক্ত) পাথর তাদের ওপর বর্ষণ করি, ৩৪. যাতে (তাদের নাম ধাম) তোমার মালিকের কাছ থেকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে সীমালংঘনকারী যালেমদের জন্যে। ৩৫. অতপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো, ৩৬. (আসলে) সেখানে মুসলমানদের একটি ঘর ছাড়া (উদ্ধার করার মতো দ্বিতীয়) কোনো ঘরই আমি পাইনি, ৩৭. (তাদের ধ্বংস করে) আমি পরবর্তী এমন সব মানুষদের জন্যে একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করে; ৩৮. (আরো নিদর্শন রেখেছি) মূসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ৩৯. সে তার সাংগপাংগসহ (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সে বললো, (এ তো হচ্ছে) যাদুকর কিংবা (আস্ত) পাগল। ৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার লয় লশকরদের (এ বিদ্রোহের জন্যে) চরমভাবে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, (আসলেই) সে ছিলো এক (দন্ডযোগ্য) অপরাধী ব্যক্তি।

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ

عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾ وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا

مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا

قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَالْاَرْضَ

فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا

تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾

৪১. আ'দ জাতির ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয় উপদেশ) রয়েছে, যখন আমি তাদের ওপর এক সর্ববিধ্বংসী (ঝড়) বাতাস পাঠিয়েছিলাম। ৪২. এ (বিধ্বংসী) বাতাস যা কিছুর ওপর দিয়ে (ধেয়ে) এসেছে, তাকেই পচা হাড়ের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে; ৪৩. (নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা (নেয়ামত) ভোগ করতে থাকো। ৪৪. (কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতপর এক প্রচন্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা চেয়েই থাকলো। ৪৫. (আযাবের সামনে) তারা (একটুখানি) দাঁড়াবার শক্তিও পেলো না এবং এ আযাব থেকে নিজেদের তারা বাঁচাতেও পারলো না, ৪৬. এর আগেও (বিদ্রোহের জন্যে আমি) নূহের জাতিকে (ধ্বংস করেছিলাম); নিসন্দেহে তারাও ছিলো একটি পাপী সম্প্রদায়।

রুকু ৩

৪৭. আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি, (নিসন্দেহে) আমি মহান ক্ষমতাশালী। ৪৮. আমি এ যমীনকেও (তোমাদের জন্যে) বিছিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের সুবিধার জন্যে) আমি একে কতো সুন্দর করেই না (সমতল) করে রেখেছি! ৪৯. (সৃষ্টি জগতের) প্রত্যেকটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এ নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো। ৫০. অতএব তোমরা (এ সবের আসল স্রষ্টা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হও; আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে (আগত) তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র, ৫১. তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নিয়ো না; আমি তো তোমাদের জন্যে তাঁর (পক্ষ) থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র,

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

৫২. (রসূলদের ব্যাপারটি) এমনটিই (হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেনি, যাদের এরা যাদুকর কিংবা পাগল বলেনি, ৫৩. (একি ব্যাপার!) এরা কি একে অপরকে এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে (যে, বংশানুক্রমে সবাই একই কথা বলছে,) না, (আসলেই) এরা ছিলো সীমালংঘনকারী জাতি, ৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি এদের উপেক্ষা করো, অতপর (এ জন্যে) তুমি (কোনোক্রমেই) অভিযুক্ত হবে না, ৫৫. তুমি (মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথে) উপদেশ দিতে থাকো, অবশ্যই উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে। ৫৬. আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে সৃষ্টি করিনি। ৫৭. আমি তো তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করি না, তাদের কাছ থেকে আমি এও চাই না, তারা আমাকে খাবার যোগাবে। ৫৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।। ৫৯. অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আযাবের অংশ ততোটুকুই নির্দিষ্ট থাকবে– যতোটুকু তাদের পূর্ববর্তী (যালেম) লোকেরা ভোগ করেছে, অতপর (আযাবের ব্যাপারে) তারা যেন খুব তাড়াহুড়ো না করে। ৬০. দুর্ভোগ (ও ভোগান্তি) তো তাদের জন্যেই যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের (বার বার) দেয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটির একটি বিশেষ আবহ ও পরিবেশ রয়েছে। এর শুরুতেই আল্লাহর সৃষ্টিজগতের চারটি শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে কিছুটা রহস্যময় ভাষায়। সূচনাতেই এই ধারণা দেয়া হয় যে, সে কতকগুলো রহস্যময় জিনিসের সম্মুখীন। প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা একটি বিষয়ে কসম খেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কসম ধুলিঝঞ্ঝার .... তোমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, আর কর্মফল প্রদানের কাজ অবশ্যই সম্পন্ন হবে।'

প্রথম দফায় যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে 'যারিয়াত', 'হামেলাত', 'জারিয়াত' ও 'মোকাসসেমাত'। এ শব্দ কয়টির অর্থ তেমন সুপরিচিত নয়। ফলে এটা এতোটা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, এর অর্থ জানার জন্যে প্রশ্ন ও উত্তরের প্রয়োজন পড়ে। উপরন্তু এ শব্দ কয়টি মানুষের অনুভূতিতে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে, আর এটাই বোধ হয় সূরার প্রথম উদ্দেশ্য।

এরপর দ্বিতীয় দফা কসম খাওয়া হয়েছে এভাবে, 'কসম বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের। নিশ্চয় যে বিষয়ে তোমরা নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকো।' অর্থাৎ যে সব বক্তব্যের মধ্যে কোনো সমন্বয় ও সামঞ্জস্য নেই, যা কোনো জ্ঞানভিত্তিক নয়, বরং অনুমান ভিত্তিক।

সূরা এভাবে শুরু হওয়া এবং গোটা সূরা জুড়ে একই ধরনের বক্তব্যের প্রাধান্য পাওয়া সত্ত্বেও এর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর অদৃশ্য জগতের সাথে যুক্ত করা, তাকে যাবতীয় পার্থিব মলিনতা থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহর একনিষ্ঠ এবাদাত ও আনুগত্যের পথের সকল বাধা থেকে তাকে মুক্ত করা। এ উদ্দেশ্যের সাথে সূরার দুটি আয়াতের বক্তব্যের মিল রয়েছে। যথা, 'তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো' এবং 'আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার এবাদাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।' প্রথমটিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে।

যেহেতু জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত থাকা ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজই আল্লাহর ইবাদতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, তাই এই সূরায় মানুষের অনুভূতিতে জীবিকার হাতে যিম্মী হওয়া থেকে মুক্ত করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, মানুষের মনকে তার দিক থেকে নিশ্চিন্ত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে মনকে পৃথিবী ও পার্থিব উপকরণাদির ওপর নয় বরং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে এই সূরায় একাধিক জায়গায় বক্তব্য রাখা হয়েছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে যথা 'আকাশেই তোমাদের জীবিকা ও তোমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত অন্যান্য জিনিস রয়েছে।' 'আল্লাহই জীবিকাদাতা এবং অটুট শক্তির অধিকারী।' আবার কোথাও আভাস-ইংগিতে, যথা, 'তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য রয়েছে।' এবং হযরত ইবরাহীমের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার বিবরণ দানের মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সুতরাং এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো, মন-মগযকে জীবিকার গোলামী, বাঁধা ও বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল করা ও তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণের শিক্ষা। অন্য সকল আলোচিত বিষয় ও ঘটনাবলী এই মূল বিষয় থেকেই উদ্ভূত। এ জন্যেই সূরাটি এভাবে কসমের মাধ্যমে ও অস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে শরু হয়েছে এবং তারপর আকাশের নামে শপথ ও বারবার আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথম দিকে পরহেযগার লোকদের যে ছবি আঁকা হয়েছে, যথা-'নিশ্চয় পরহেযগার লোকেরা বাগানসমূহে ও ঝর্নাসমূহে অবস্থান করবে। .... তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।' এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা, রাত জেগে তাঁর এবাদাত, শেষ রাতে তাঁর দরবারে ধরণা দেয়া, সেই সাথে সম্পদের লালসা ও প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং প্রার্থী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য দেয়াকে পরহেযগারদের বৈশিষ্ট রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর এ প্রসংগেই মোমেনদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে পৃথিবীতে ও তাদের নিজ সত্তায় আল্লাহর যে নিদর্শনাবলী বিরাজ করছে তার দিকে মনোযোগ দিতে, আর সেই সাথে জীবিকা অর্জনের জীবিকার পার্থিব উপকরণগুলোর পরিবর্তে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হতে। বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্যে বহু নির্দশন রয়েছে, নিদর্শন রয়েছে তোমাদের সত্তার ভেতরেও। তবু কি তোমরা তা দেখতে পাওনা? আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং যা যা তোমাদেরকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়।'

এই প্রসংগে আকাশকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করা, পৃথিবীকে বিস্তৃত করা, পৃথিবীতে জোড়ায় জোড়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সৃষ্টি করা এবং এ সবের ওপর আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আকাশকে আমি নির্মাণ করেছি এবং আমি প্রশস্তকারী ...... অতএব আল্লাহর কাছে আশ্রয় নাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

সর্বশেষে সূরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তার উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, 'আমি আমার এবাদাত ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্যে জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিনি।' .... নিশ্চয় আল্লাহই জীবিকাদাতা, শক্তিশালী ও চিরঞ্জীব।'

এভাবে সূরাটিতে বিভিন্ন সুরে ও বিভিন্ন ভংগিতে একটা বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে। তাহলো, মানুষ যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়।

এ সূরায় অতি সংক্ষেপে হযরত ইবরাহীম, লূত, মূসা, আদ জাতি, সামুদ জাতি ও নূহ (আ.)-এর সমকালীন মানবজাতির ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের ঘটনার প্রতি ইংগিত দিতে গিয়ে সম্পদ ব্যয় করে আতিথেয়তা, তাকে একটি জ্ঞানী পুত্র দানের সুসংবাদ প্রদান এবং তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তান দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর বাদবাকী ঘটনাগুলোতে আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যা তিনি সূরার শুরুতে কসম খেয়ে দিয়েছেন। যথা 'তোমাদেরকে যা যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সত্য।' আর সূরার শেষে মোশরেকদেরকে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তাও সত্যে পরিণত করার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই হুমকি হলো, 'যালেমদের জন্যে তাদের সমমনাদের মতোই শাস্তি প্রাপ্য রয়েছে....' আর এর কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের বংশধরেরা যেন আবহমান কাল ধরে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করা জন্যে। বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রসূল এসেছে, অমনি তাকে জাদু-করে অথবা পাগল বলে অভিহিত করেছে! তবে কি তারা পরস্পরকে এ কথা বলার জন্যেই উদ্বুদ্ধ করে আসছে? আসলে তারা একটা গোমরাহ জাতি।'

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, এ সূরার কিস্সা কাহিনী তার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথেই সংযুক্ত। সেই মূল বিষয়টি হলো, আল্লাহর এবাদাতের জন্যে মনকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করা, তাকে সকল বাধাবন্ধন থেকে মুক্ত করা, ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অটুট বন্ধন দ্বারা তাকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করা এবং সর্বশেষে সকল বাধাবিপত্তি ও ব্যস্ততাকে অতিক্রম করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দেয়া।

এবার সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

তাফসীর

প্রথমে সূরার প্রথম ছয়টি আয়াতের আলোচনায় আসা যাক। এই দ্রুতগামী ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত কথাগুলো, তার ভেতরকার কিছু অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য শব্দাবলীসহ মানুষের চেতনা ও অনুভূতিতে একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার ও একটা বিশেষ শিক্ষা ও ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়। এগুলো দ্বারা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় ও সতর্ক করা হয়। প্রথম যুগে অনেকে এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতেন বলে জানা যায়।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে যে, ইবনুল কাওয়া নামক এক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আলী বলেন, প্রথম আয়াত দ্বারা বায়ু, দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা মেঘ, তৃতীয় আয়াত দ্বারা নৌযান এবং চতুর্থ আয়াত দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ছাবীগ বিন আসাল তামীমীর প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমরও অনুরূপ ব্যাখ্যা দেন। তামীমী বিদ্রূপাত্মকভাবে প্রশ্ন করেছে বুঝতে পেরে পরে তিনি তাকে শাস্তি দেন এবং সে তাওবা করে ও এর পুনরাবৃত্তি না করার জন্যে শপথ করে। ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, মোজাহেদ, সাঈদ ইবনে যোবায়র, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী প্রমুখও অনুরূপ তাফসীর করেছেন। (ইবনে কাসীর)

চারটি বিস্ময়কর জিনিসের কসম

আল্লাহ তায়ালা বাতাসের কসম খেয়েছেন, যা ধুলাবালি, মেঘ, পানি ইত্যাদি বহন করে থাকে এবং মানুষের জানা-অজানা আরো অনেক কিছু বহন করে। অতপর পানিবাহী মেঘমালার নামেও কসম খেয়েছেন, যাকে তিনি যেদিক খুশী সেদিকে চালিত করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা পানিতে সাবলীলভাবে চলাচলকারী নৌযানগুলোরও কসম খেয়েছেন, যা তাঁরই দেয়া ক্ষমতাবলে চলাচল করে এবং পানি, নৌযান ও বিশ্ব-প্রকৃতিকে তিনি এমন সব বৈশিষ্ট দিয়েই সৃষ্টি করেছেন যা নৌযানের উক্ত সাবলীল চলাচলকে সম্ভব করে তোলে। অতপর সেইসব ফেরেশতার কসম খেয়েছেন যারা মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার অর্পিত দায়িত্বকে বন্টন করে। অর্থাৎ, আল্লাহর নির্দেশকে বহন করে এনে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে বন্টন করে এবং বিভিন্ন রকমের কাজকে পৃথক করে মহাবিশ্বের প্রশাসনকে তদানুসারে বিভক্ত করে।

বাতাস, মেঘ, নৌযান ও ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে এগুলোকে হাতিয়ার হিসাবে ও নিজের ইচ্ছাকে আড়াল করার পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। আর এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিজগতে ও তার বান্দাদের মধ্যে তাঁর ফয়সালা কার্যকর হয়ে থাকে। আবার এগুলোর নামে আল্লাহ তায়ালা কসমও খান শুধু এগুলোর গুরুত্ব প্রকাশের জন্যে, এগুলোর আড়ালে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে এবং আল্লাহর সদা সক্রিয় সেই হাতকে দেখবার সুযোগ দেয়ার জন্যে, যা এগুলোকে সৃষ্টি করে, পরিচালনা করে এবং আল্লাহর ফয়সালা বাস্তবায়িত করে, আর বাতাস, পানি ইত্যাদির এরূপ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ এগুলোর গোপন রহস্যের প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে এবং এগুলোর স্রষ্টার সাথে তার সংযোগ সৃষ্টি করে।

তা ছাড়া অন্যান্য দিক দিয়েও জীবিকা সংক্রান্ত আলোচনার সাথে এ জিনিস কয়টির সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়। এ সূরার জীবিকা সংক্রান্ত আয়াতগুলো জীবিকার চাপ ও গোলামী থেকে মনকে মুক্ত করে। বাতাস, মেঘ ও নৌযান কিভাবে জীবিকা ও তার উপকরণাদির সাথে যুক্ত তা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু ফেরেশতারা এবং তাদের দায়িত্ব বন্টনের কাজটি কিভাবে জীবিকার সাথে যুক্ত এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, জীবিকাও ফেরেশতাদের বন্টিত দায়িত্বসমূহের অন্যতম। এভাবেই সূরার শুরু ও সূরার বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাঝে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কসম করে আল্লাহ যা বলতে চেয়েছেন

আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত চার রকম সৃষ্টির নামে কসম খেয়ে বলছেন, 'নিশ্চয় তোমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা সংঘটিত হবেই এবং কর্মফল প্রদানের কাজটি অবশ্যই সম্পন্ন হবে।' আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই ভালো কাজের ভালো পুরস্কার এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেবেন। পৃথিবীতে তিনি কর্মফল দান বিলম্বিত করলেও আখেরাতে বিলম্বিত করবেন না। সেখানে হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহী অবধারিত।

'কর্মফল প্রদানের কাজটি অবশ্যই সম্পন্ন হবে।' অথাৎ প্রতিশ্রুতি দুনিয়ায় হোক বা আখেরাতে হোক পূরণ হবেই। আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতির মধ্যে জবিকা অন্যতম। পৃথিবীতে অনটনের মধ্য দিয়েই হোক বা প্রাচুর্যের মধ্য দিয়েই হোক যেভাবেই চান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জীবিকা নির্বাহ করবেনই। তাঁর প্রতিশ্রুতি অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা তিনি যেভাবে ও যে সময়ে ওয়াদা করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই সেই ওয়াদা পূরণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে তাঁর কসমের প্রয়োজন হয় না।

তথাপি আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেসব সৃষ্টির নামে কসম খান শুধু ওগুলোর দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে, এগুলোর পেছনে আল্লাহর যে অসীম ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করানোর জন্যে এবং এ কথা উপলব্ধি করানোর জন্যে যে, যে আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাকারী, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ হবেই, ভালো ও মন্দ কাজের জন্যে তার কাছ থেকে মানুষকে প্রতিদান নিতে হবেই। আর সৃষ্টিজগতের স্বভাব-প্রকৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সৃষ্টিজগতের উৎপত্তি কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা কাকতালীয় ঘটনা নয়। এভাবে এই কসম খাওয়ার কারণেই উক্ত সৃষ্টিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ বহনকারী নিদর্শনে পরিণত হয়ে যায়। কেননা, কসম খাওয়ার কারণে মানুষের মন ওগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয় ও চিন্তা-ভাবনা করতে অনুপ্রাণিত হয়। কাজেই এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই কসম খাওয়া আসলে প্রকৃতির ভাষায় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দান, প্রেরণা দান ও সহজাত বিবেককে সম্বোধন করার এক অনুপম পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কসমের ব্যাখ্যা

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কসম নিয়ে আলোচনা করা যাক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সুগঠিত আকাশের কসম, তোমরা পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় লিপ্ত।' এখানে আল্লাহ তায়ালা সুগঠিত ও সুসমন্বিত আকাশের কসম খেয়ে বলছেন যে, বাতিলপন্থীরা এমন পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে, যার কোনো স্থিতি ও স্থিরতা নেই, যার যতক্ষণ ইচ্ছা তার ওপর বহাল থাকে আর যার যখন ইচ্ছা তা থেকে সরে যায়। বাতিলপন্থীদের কথাবার্তা এ রকমই সব সময় টলমলে। অনুরূপভাবে বাতিলও এক টলমলে জিনিস। এর কোনো স্থিতি নেই। যারা বাতিলকে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সব সময় বিরোধ ও অস্থিরতা লেগেই থাকে। তাদের এই অস্থিরতা, বিরোধ ও সন্দেহ তখনই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, যখন চিরস্থির সুগঠিত ও সুসমন্বিত আকাশের সাথে তার তুলনা করা হয়।

এরপর আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত এবং সে সম্পর্কে কোনো সত্যের সনদ তাদের জানা নেই। তাই এই প্রকাশ্য সত্য নিয়েও তারা পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত। অতপর তাদের কাছে কেয়ামতের সেই দিনটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে,

'অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক! .... তারা জিজ্ঞাসা করে কর্মফল দিবস কবে আসবে? ....' অনুমান বলতে সেই ধারণাকে বুঝায়, যা কোনো সঠিক মানদন্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের ধ্বংস কামনা করেছেন। কী সাংঘাতিক ব্যাপার। তিনি যদি কারো ধ্বংস বা মৃত্যু কামনা করেন, তাহলে সেটা তো তাঁর পক্ষ থেকে ধ্বংসের ফয়সালারই নামান্তর। অনুমানকারীদের একটি বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে এই যে, তারা গোমরাহীতে সংজ্ঞাহীনভাবে ডুবে আছে। 'বাতিলপন্থীদের প্রকৃত চিত্র এঁকে দেয়া হয়েছে এখানে এই বলে যে, তারা সব কিছু ভুলে বসে আছে, আশেপাশের অবস্থা অনুভবই করে না, যেন মাতাল।'

তারা স্পষ্ট জিনিসকেও স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। যা সচেতন মানুষ মাত্রেই দেখে। তাই তারা জিজ্ঞাসা করে যে, 'কর্মফল দিবস কবে হবে?' আসলে তাদের এ জিজ্ঞাসা জ্ঞানার্জনের জন্যে নয়, বরং ঠাট্টা ও বিদ্রূপের জন্যে।

এ জন্যে যেদিনকে তারা অসম্ভব মনে করতো সেদিন তাদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের দগ্ধীভূত হওয়ার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'যেদিন তাদেরকে আগুনের ওপর জ্বালিয়ে যাচাই করা হবে।' আর সেই সাথে তাদেরকে ঘোরতর কষ্টদায়ক কথা দিয়েও সেই কঠিন যন্ত্রণাময় দিনে যন্ত্রণার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে। বলা হবে, 'এখন তোমাদের যাচাই বাছাই এর স্বাদ গ্রহণ করো। এই হচ্ছে সেই দিন, যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করতে।'

বস্তুত কর্মফল দিবস কবে হবে এ প্রশ্নের এটাই মোক্ষম জবাব যে, এই হচ্ছে সেই দিন, যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করতে। আর এমন ভয়াবহ দৃশ্যকে তুলে ধরে অনুমানকারীদের যথার্থ জবাব দেয়া হয়েছে। আর এটা তাদের প্রতি আল্লাহর সেই মৃত্যু কামনার সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রয়োগ। বলা হয়েছে, 'যেদিন তাদেরকে আগুনের ওপর জ্বালিয়ে যাচাই করা হবে।'

ঈমানদারদের কিছু বৈশিষ্ট্য

অপরদিকে রয়েছে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। এ পক্ষটি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে, আন্দাজ অনুমানে লিপ্ত হয় না। এ পক্ষটি অত্যন্ত আল্লাহভীরু, সতর্ক ও সংযত। এরা কোনো একগুঁয়ে ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে না। রাত জেগে-এরা এবাদাত করে ও গুনাহ মাফ চায়। জীবনকে অলসতা ও উদাসীনতায় কাটিয়ে দেয় না। এই পক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহভীরু লোকেরা বাগান ও ঝর্নায় অবস্থান করবে .... তাদের সম্পদে প্রত্যাশী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য রয়েছে।'

এ দলটি আল্লাহভীরু, সদা সচেতন এবং তাদের ওপর আল্লাহর প্রহরা ও তদারকী সম্পর্কে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন। আর এ জন্যে তারা নিজেরাও নিজেদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও সংযত থাকে। 'তারা তাদের প্রতিপালক যা দেন তা গ্রহণ করে বাগানে ও ঝর্নায় অবস্থান করবে।' অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে থাকাকালে আল্লাহর এমন এবাদাত করতো যেন তারা আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখতে পেতো আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো যে, আল্লাহ তাদেরকে দেখতে পান। এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীতে এবাদাত ও সৎ কাজ করে আসার ফল হিসাবে আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহ ও পুরস্কার দেবেন, তা নিয়ে সন্তুষ্ট-চিত্তে বাগান ও ঝর্নার কাছে অবস্থান করবে। 'তারা তার আগে সৎকর্মশীল ছিলো।' এখানে তাদের একটা প্রচন্ড আনুগত্যপূর্ণ, সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'তারা রাত্রে খুব কমই ঘুমাতো এবং শেষ রাত্রে গুনাহ মাফ চাইতো।' অর্থাৎ মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন তারা জেগে জেগে তাদের প্রতিপালকের কাছে ধরণা দিতো, ক্ষমা ও

দয়া ভিক্ষা চাইতো। রাত্রে সামান্যই ঘুমাতো, গভীর রাতে তাদের প্রতিপালকের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতো। বিছানা ত্যাগ করতো এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা অর্জনের বাসনা তাদেরকে এতো হাল্কা করে দিতো যে, ঘুমের ভারে তাদের দেহ ভারী হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়তো না।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হাসান বসরী বলেন, অর্থাৎ তারা সারারাত জাগবার চেষ্টা করতো এবং রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো। এভাবে রাতের শুরু থেকে এবাদাত করতে করতে শেষরাত হতো এবং শেষ রাতে গুনাহ মাফ চাইতো।

আহনাফ বিন কায়েস বলতেন এর অর্থ রাতের বেশীরভাগ জেগে কাটানো, তবে আমি এই দলভুক্ত হতে পারিনি।

হাসান বসরী জানান যে, আহনাফ বিন কায়েস বলতেন, 'আমি (স্বপ্নে) জান্নাতবাসীর আমলের সাথে নিজের আমলের তুলনা করলাম। দেখলাম তারা আমাদের চাইতে অনেক দূরে ও নাগালের বাইরে। আমাদের আমল তাদের ধারে-কাছেও ছিলো না। কারণ তারা রাতে অতি অল্প ঘুমাতো। তারপর দোযখবাসীর আমলের সাথে নিজের আমলের তুলনা করলাম। দেখলাম, তারা আল্লাহর কেতাব, রসূল ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ফলে তাদের কোনো নেক আমলই নেই। তবে যারা কিছু ভালো কাজও করেছে এবং কিছু খারাপ কাজও করেছে, তাদেরকে আমাদের মধ্যে মোটামুটি ভালো অবস্থায় দেখলাম।'

আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম বলেন, 'বনু তামীমের এক ব্যক্তি আমার পিতাকে বললো, হে উসামার পিতা, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের একটি সদগুণের উল্লেখ করেছেন। তাহলো রাত্রে কম ঘুমানো। অথচ এই সদগুণটি আমরা নিজেদের মধ্যে দেখতে পাই না। রাত্রে আমরা খুব কমই জাগি।' আমার পিতা তাকে বললেন, তন্দ্রা এসে গেলে যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে এবং জেগে উঠলে যে ব্যক্তি তাকওয়ার অনুশীলন করে তার জন্যে সুসংবাদ।'

বস্তুত সাহাবীদের অনুসারী দৃঢ় ঈমানের অধিকারী একদল মর্যাদাবান ব্যক্তি এই পর্যায়ে উন্নীত হবার চেষ্টা ও সাধনা করে থাকেন। কেননা, তারা এর নীচে অবস্থান করেন। আল্লাহ তায়ালা নিজের মনোনীত কিছু লোককেই শুধু এই পর্যায়ে উন্নীত হবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। তাদেরকে তিনি 'মোহসেনীন' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

এ তো হলো আল্লাহর সাথে তাদের আচরণ। মানুষের সাথে ও ধন-সম্পদের সাথে তাদের আচরণও মোহসেনদের অনুরূপ, 'তাদের ধন-সম্পদে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের প্রাপ্য রয়েছে।'

অর্থাৎ যে চায় তাকেও তারা অংশ দেয়, আর যে চায় না, বরং নীরব থাকে এবং সে জন্যে বঞ্চিত থাকে, তাকেও তারা তাদের সম্পদের অংশ দেয়। এ অংশটা তারা স্বেচ্ছায় দিয়ে থাকে। অথচ নিজেদের জন্যে অপরিহার্য মনে করে।

এই বক্তব্যটুকুর মধ্যে যে ইংগিত রয়েছে তা গোটা সূরার সম্পদ ও জীবিকা সংক্রান্ত আলোচনার সাথে সংগতি-পূর্ণ। সূরার এতদসংক্রান্ত আলোচনায় মানুষের মনকে স্বার্থপরতা, কৃপণতা এবং জীবিকা উপার্জনে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততার বাধা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতপর মোত্তাকী বা আল্লাহভীরু ও মোহসেন তথা সদাচারীর লক্ষণ সমূহের বর্ণনা সম্পন্ন করার পর সূরার পরবর্তী অংশ পেশ করা হয়েছে,

বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শন

'আর বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমাদের নিজেদের ভেতরেও রয়েছে। ....'

পৃথিবীতে ও মানব সত্তায় বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি এটি একটি মনোযোগ আকর্ষণকারী আহবান। নির্ধারিত জীবিকা ও ভাগ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার জন্যেও এখানে আহবান জানানো হয়েছে। অতপর নিজের নামে কসম খেয়ে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ও নিশ্চিত। 'বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের ভেতরেও রয়েছে, তোমরা কি দেখতে পাওনা?'

যে গ্রহটির ওপর আমরা বাস করি তা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর বিস্ময়কর কারিগরীর কীর্তিতে পরিপূর্ণ এক মেলা। এ মেলায় যেসব বিস্ময়কর কীর্তি রয়েছে, এ যাবত আমরা তার সামান্য কিছুই জানতে পেরেছি। প্রতিদিন আমরা তার কিছু কিছু নতুন তথ্য জানতে পারি। এ ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আরো একটা মেলা আমাদের অভ্যন্তরে লুকানো রয়েছে। সেটি হচ্ছে মানবসত্তা। এ সত্তা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। শুধুমাত্র পৃথিবী নামক গ্রহ নয় বরং গোটা সৃষ্টিজগতের যাবতীয় রহস্য মানবসত্তায় নিহিত রয়েছে।

এই দুটি মেলার দিকেই উক্ত দুটি আয়াতে সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে। এ ইংগিত দিয়ে শুধুমাত্র সেইসব লোকের জন্যে মেলার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে, যারা এ মেলা পরিদর্শন করতে চায়, দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করতে চায় এবং নিজের জীবনের ডালিকে আনন্দ, শিক্ষা ও নির্ভুল জ্ঞান দ্বারা ভরে তুলতে চায়। বস্তুত এই আনন্দ, শিক্ষা ও নির্ভুল জ্ঞান হৃদয়কে উন্নত করে এবং আয়ুষ্কালকে বাড়িয়ে দেয়।

পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বক্তব্য সকল অবস্থায় সকল পরিবেশে ও সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও কার্যোপযোগী। প্রতিটি মানুষের মন, বিবেক ও বোধশক্তিকে তা তার সাধ্য ও সামর্থ অনুপাতে সুনির্দিষ্ট কার্যোপকরণ ও জ্ঞান ভান্ডার দিতে সক্ষম। মানুষ যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করবে, যতই তার উপলব্ধির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। যতই তার তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং যতই সে বিশ্ব-প্রকৃতি ও আপন সত্তার ভেতরকার গোপন রহস্য জানতে পারবে, কোরআন থেকে তার অর্জিত জ্ঞানভান্ডার ততোই বৃদ্ধি পাবে। রসূল (স.) এ সম্পর্কে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও নিজের জানা গোপন তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর আলোকেই কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি এমন এক মহাগ্রন্থ, যার বিস্ময় ও বৈচিত্র কখনো শেষ হয় না এবং বারবার এর কাছে প্রত্যাবর্তন করা সত্ত্বেও এটা কখনো পুরানো হয় না।

কোরআন: অফুরন্ত নলেজ ব্যাংক

যারা এই কোরআনকে সর্বপ্রথম শুনেছে, তারা পৃথিবীতে ও মানবসত্তায় বিরাজিত আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে নিজ নিজ অংশ লাভ করেছে আপন আপন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তরের ঔজ্জ্বল্য অনুপাতে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম রকমারি জ্ঞান--বিজ্ঞান, তত্ত্ব-তথ্য ও অভিজ্ঞতার যথোচিত অংশ লাভ করেছে। আমরাও আমাদের জ্ঞান, তত্ত্ব-তথ্য ও অভিজ্ঞতার যা কিছু আমাদের প্রাপ্য এবং এই মহাবিশ্বের যা কিছু গোপন রহস্য আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়, তা লাভ করতে পারবো। আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও মহাবিশ্বে ও আপন সত্তায় বিরাজমান অনুদঘাটিত নিদর্শনাবলী নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত দেখতে পাবে। এভাবে আল্লাহর এই দুটো মেলা সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পৃথিবী নামক এই গ্রহটি তার সকল জন্মগত বৈশিষ্ট সহকারে জীবনকে লালন ও সংরক্ষণের জন্যে প্রস্তুত এবং সে জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণাদিতে সমৃদ্ধ। জীবনের এই লালন ও সংরক্ষণ সে এমন সুন্দরভাবে করে যে, স্থবির গ্রহ সমূহ ও চলন্ত নক্ষত্রসমূহ সম্বলিত এই

মহাবিশ্বের যতটুকু আমাদের পরিচিত তার কোথাও এ কাজ হয় না। এ যাবত যতগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় আমাদের হস্তগত হয়েছে, শুধু সেগুলোর সংখ্যা হলো শত শত কোটি ছায়াপথ, যার প্রতিটি ছায়াপথে রয়েছে শত শত কোটি নক্ষত্র। আর গ্রহগুলো নক্ষত্রসমূহের অধীন।(১)

এই অগণিতসংখ্যক গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই জীবনকে ধারণ ও লালনের উপযোগী। পৃথিবীর বহুসংখ্যক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার একটিরও যদি অভাব থাকতো বা একটিও যদি ত্রুটিপূর্ণ হতো, তাহলে পৃথিবীতে যে ধরনের জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, তা টিকতে পারতো না। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর আকৃতি যদি বর্তমানের চেয়ে আরো বড় বা ছোট হতো, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি বর্তমানের চেয়ে আরো বেশী বা কম হতো, সূর্যের আকৃতি যদি বর্তমানের চেয়ে ছোট বা বড় এবং তার তাপমাত্রা যদি বর্তমানের চেয়ে কম বা বেশী হতো, পৃথিবী যদি তার মধ্যভাগে বর্তমানের চেয়ে আরো বেশী বা কম চাপা হতো, তার আহ্নিক গতি বা বার্ষিক গতি যদি বর্তমানের চেয়ে বেশী বা কম দ্রুত হতো, তার উপগ্রহ চাঁদ যদি বর্তমানের চেয়ে ছোট বা বড় আকারের হতো বা পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব যদি আরো বেশী বা কম হতো এবং এ ধরনের আরো বহু জানা বা অজানা বৈশিষ্ট যা জীবন ধারণের ও লালনের যোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে-যদি না থাকতো, তবে এ গ্রহটিতে জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না।

এটা কি আল্লাহর এই মেলায় প্রদর্শিত একটি বা একাধিক নিদর্শন নয়?

তাছাড়া যে সকল প্রাণী এই পৃথিবীতে বাস করে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থান করে, শূণ্যে সাঁতার কাটে, পানিতে চলাচল করে বা পৃথিবীর গর্ভে লুকিয়ে থাকে, সেসব অগনিত প্রাণীর জন্যে পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের তৈরী যৌগিক বা মৌলিক খাদ্য সংরক্ষিত আছে। এই সকল খাদ্য পৃথিবীর পৃষ্ঠে জন্মাক, কিংবা সূর্য থেকে আসুক, পানিতে ভাসমান থাকুক বা অন্য কোনো জানা বা অজানা জগত থেকে আসুক, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণে তার সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। কেননা, তিনিই এই পৃথিবীকে এ ধরনের জীবনের লীলাভূমি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন যাপনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণসহ তাকে অগণিত রকমের প্রাণীর জন্যে প্রস্তুত করেছেন।

আর এই পৃথিবীর যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক এবং যেদিকেই পদচারণা করা যাক, তার বিচিত্র দৃশ্যসমূহের কোনো শেষ নেই। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, সাগর-উপসাগর, ঝর্না-পুকুর, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ভূখন্ডসমূহ, আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত এবং খেজুরের বাগান ইত্যাদি সর্বত্র বিরাজমান। আর এ সকল দৃশ্য মহান স্রষ্টার কুশলী হাতের পরশে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। একটি ক্ষেতে যখন ফসল সবে উদগত হয় তখন তার এক দৃশ্য। আর ফসল যখন কাটা হয়ে যায় তখন আর এক দৃশ্য। অথচ জায়গাটা একই আছে, এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক সরেনি।

আর এই পৃথিবীতে যে সকল সজীব সৃষ্টি বিরাজমান, চাই তা উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী হোক, পাখী হোক বা মাছ হোক, পোকা-মাকড় বা সরীসৃপ হোক (মানুষ বাদে-কেননা মানুষের কথা

(১) অবশ্য অতি সাম্প্রতিক কালে মংগলসহ সৌর জগতের কোনো কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা দারুণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কে জানে আগামী দিনে এ ব্যাপারে আরো কতো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে- যার ভিত্তিতে সৌর জগতের আরো অনেক স্থানেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সম্পর্কে মানুষরা অনেক কিছুই জানতে পারবে।-সম্পাদক

কোরআন আলাদাভাবে উল্লেখ করেছে) এ সকল সৃষ্টির সংখ্যা গনার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তা সম্ভব নয়, এমনকি এগুলো কত প্রকার ও কী কী তাও আজ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এর প্রতিটি সৃষ্টি বিস্ময়কর। এগুলো সব আল্লাহর সেই বিস্ময়কর মেলার এক একটি অতুলনীয় সৃষ্টি। আর মেলার বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই।

পৃথিবীর সকল মানুষ যদি পৃথিবীর এইসব সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকে এবং পৃথিবীর সকল বিস্ময়কর সৃষ্টি ও তাতে নিহিত নিদর্শনাবলী লিপিবদ্ধ করে, তবে কোনোদিন তা লিপিবদ্ধ করে শেষ করতে পারবে না। কোরআন মানুষকে এগুলো নিয়ে শুধু চিন্তা-গবেষণা করতে বলে এবং এগুলোতে কী কী বিস্ময় ও উপকারিতা রয়েছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে বলে।

সৃষ্টির নিদর্শন শুধু মোমেনরাই বুঝতে পারে

তবে এসব বিস্ময়কর সৃষ্টিকে বুঝা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া কেবল ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।' বস্তুত বিশ্বাস ও প্রত্যয়ই হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে এবং এভাবে সঞ্জীবিত হৃদয়ই পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের ক্ষমতা রাখে। এই বিশ্বাসই পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনীয় জিনিস দেখে তার গোপন রহস্য সম্পর্কে হৃদয়কে অবহিত করে এবং তার অন্তরালে যে কুশলতা ও সৃজনী ক্ষমতা রয়েছে, তা তাকে জানায়। বিশ্বাস ছাড়া এ সকল দৃশ্য সম্পূর্ণ মৃত ও অসার। ফলে তা মনকেও কোনো তথ্য জানায় না এবং তা কোনো কিছুতে সাড়াও দেয় না।

আল্লাহর এই উন্মুক্ত সৃষ্টিমেলাকে অনেকে চোখ ও হৃদয় বন্ধ করে অতিক্রম করে। এতে তারা কোনো জীবনের স্পন্দন দেখতে পায় না। এর কোনো ভাষা বুঝতে পারে না। কেননা, বিশ্বাস তাদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করেনি এবং তাদের আশপাশে জীবনীশক্তির বিস্তার ঘটায়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞানীও হতে পারে। তবে তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক বিষয়ই শুধু জানে। তার নিগূঢ় রহস্য জানতে পারে না। কেননা, বিশ্ব-প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনের জন্যে বন্ধ হৃদয়কে খোলা যায় এই ঈমানের চাবি দিয়েই এবং ঈমানের আলো দিয়েই তা দেখা যায়।

মানুষই এক নিদর্শন

এরপর আর একটি বিস্ময়ের উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা–

'আর তোমাদের সত্তার মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে। ....'

বস্তুত মানুষ নামক এই সৃষ্টিই এই পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যখন ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে তার এই মূল্য ও মর্যাদা সে অনুধাবন করে না এবং তার সত্তায় যেসব নিদর্শন লুকিয়ে আছে, সে সম্পর্কেও সে উদাসীন থাকে। তার দৈহিক ও মানসিক উভয় গঠনই বিস্ময়কর। যেহেতু সে এই মহাবিশ্বের উপকরণাদি ও গুপ্ত রহস্য সমূহের প্রতীক, তাই তার বাহ্যিক দিকও বিস্ময়কর, আভ্যন্তরীণ দিকও। কবি যথার্থই বলেছেন,

'তুমি মনে করো যে, তুমি একটা ক্ষুদ্র বস্তু।

অথচ তোমার অভ্যন্তরে গোটা বিশ্বজগত লুকিয়ে রয়েছে।'

মানুষ যেখানেই থাকুক, সে যদি নিজ দেহ ও মনের দিকে দৃষ্টি দেয় ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তবে সে হতবুদ্ধি করে দেয়ার মতো তত্ত্ব ও তথ্য পাবে। তার অংগ-প্রত্যংগের গঠন, অংগ-প্রত্যংগের দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি, পরিপাক প্রণালী, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী, হৃৎপিন্ড ও শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হওয়া, স্নায়ুতন্ত্রী, তার গঠন প্রক্রিয়া ও দেহ রক্ষায় তার ভূমিকা, লালাগ্রন্থী এবং দেহের বিকাশের সাথে তার সম্পর্ক, লালাগ্রন্থীর কাজ, এই সকল অংশের

সমন্বয় ও সহযোগিতা এবং এগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সবই অলৌকিক ও বিস্ময়কর। এ সব বিস্ময়কর জিনিসের প্রতিটির আওতায় আবার বহু বিস্ময় রয়েছে। প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ ও তার প্রতিটি অংশ এক একটি অলৌকিক জিনিস যা দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

তা ছাড়া প্রাণ ও তার জানা-অজানা শক্তিসমূহের গোপন রহস্য, বোধগম্য জিনিসসমূহ অনুধাবন করা ও অনুধাবন করার পদ্ধতি এবং তার স্মরণ করা ও স্মরণ করার পদ্ধতি এই সকল সংরক্ষিত তথ্য ছবি কোথায় আছে, কিভাবে আছে? কিভাবে হৃদয়ে এ সকল ছবি ও দৃশ্যের ছাপ পড়ে, কোথায় পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল তো জানা বিষয়। আর অজানা বিষয়গুলোর তো কোনো সীমা-পরিসীমাই নেই। সেগুলোর লক্ষণ মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং অদৃশ্য তথ্যাদি জানা যায়।

অতপর আসে এই জাতিটির প্রজননের রহস্য। একটি মাত্র জীবকোষ গোটা মানব জাতির বৈশিষ্টসমূহ বহন ও সংরক্ষণ করে থাকে। সেই সাথে এই কোষ পিতামাতা ও নিকটতম পিতামহ ও মাতামহের বৈশিষ্টগুলো ধারণ করে। প্রশ্ন জাগে যে, এতোসব বৈশিষ্ট উক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষটিতে কোথায় থাকে? কিভাবেই বা তা আপনা-আপনি তার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ বেয়ে চলে এবং এতো নিখুঁতভাবে এই বিস্ময়কর মানুষের পুনর্জন্ম ঘটায়?(১)

একটি সদ্যপ্রসূত শিশু যে মুহূর্তে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়ে পৃথিবীতে নিজের জীবন শুরু করে, নিজের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে, তার হৃৎপিন্ড ও কিডনীকে জীবন যাপন শুরু করার অনুমতি দেয়া হয়, সেই মুহূর্তে সেই শিশুটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে মানুষ মাত্রেই বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারবে না এবং তার মন-মগযে ঈমানী আবেগের সয়লাব বয়ে যাবে।

তারপর যে মুহূর্তে নবাগত শিশু একটু একটু করে ভাংগা ভাংগা ভাষায় প্রথমে এক একটা অক্ষর, তারপর একটা শব্দের ভগ্নাংশ তারপর পুরো শব্দ এবং তারপর বাক্য উচ্চারণ করতে শেখে, তখন এই কথা বলার ভংগিটা পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে, এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা এটা সব সময় হতে দেখি বলে এই বিস্ময়কর কাজটি আমাদের মনে তেমন কোনো সাড়া জাগায় না। কিন্তু একটু থেমে যদি চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে শুধু বিস্ময়কর নয় বরং অলৌকিক ঘটনা বলেই মনে হবে, এমন অলৌকিক যে, তা শুধু আল্লাহর অসীম কুদরতের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এভাবে মানব শিশুর যে কোনো খুঁটিনাটি তৎপরতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে প্রতিটি তৎপরতাই এক একটা অলৌকিক ঘটনা মনে হবে, যার বিস্ময় কখনো শেষ হতে চায় না।

প্রতিটি মানুষকে মনে হবে এক একটা পৃথক জগত। তাকে এমন একটি আয়নার মতো মনে হবে, যার ভেতর দিয়ে গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি প্রতিফলিত হয় এবং এমন অসাধারণ রূপে প্রতিফলিত হয় যে যুগ যুগ কালেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। আর প্রতিটি মানুষ এমন এক অভাবনীয়

---

(১) সাইয়েদ কুতুব শহীদ যখন এই কথাগুলো তার তাফসীরে লিখেছেন, তখন বিজ্ঞানের সবচাইতে বড়ো আবিষ্কার হিউম্যান ডি এন এ সংক্রান্ত জেনিটিং ম্যাপ-এর বিস্ময়কর তথ্য সমীক্ষাগুলো তার সামনে ছিলো না। সদ্য আবিষ্কৃত এসব তথ্য আমাদের সামনে আল্লাহর তায়ালার কেতাবে বর্ণিত প্রতিটি কথাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করেছে যতোই দিন এগুচ্ছে ততোই যেন মানব সৃষ্টি তত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদের চোখের সামনে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের নিত্যনতুন দিগন্ত খুলে ধরছে। বিষয়টি এতো ব্যাপক ও জটিল যে, এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মহাসাগর পাড়ি দেয়ার সমান। উৎসাহী পাঠকদের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনার আবেদন জানাবো।-সম্পাদক

ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যার আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, আত্মা ও চেতনা এবং তার অনুভূতিতে ও কল্পনায় বিশ্বজগতের যে ছবি প্রস্ফুটিত তা এসবের কোনো কিছুতেই তার কোনো তুলনা নেই। মহান আল্লাহর এই আজব ও অদ্ভুত সৃষ্টির প্রতিটি সদস্য যেন এক একটি ঐশী জাদুঘর। প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটা স্বতন্ত্র নমুনা ও এক একটি অতুলনীয় সত্তার অধিকারী। এহেন ঐশী জাদুঘরের সংখ্যা কয়েক শত কোটি। এদের মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বজগত একটা নযীরবিহীন জগতে পরিণত। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত একটি বুড়ো আংগুলেও অন্য কোনো বুড়ো আংগুলের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানবীয় সত্তার অনেক বিস্ময়কর বৈশিষ্টই প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমাদের সত্তায়ও অনেক নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কি দেখতে পাওনা?' বস্তুত যা দৃশ্যমান তার আড়ালে অনেক অদৃশ্য সত্যও লুকিয়ে আছে বলে আভাস পাওয়া যায়।

মানব-সত্তায় বিরাজিত এইসব বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য কোনো পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই। তা থাকাও সম্ভব নয়। কেননা, যে বৈশিষ্টগুলো আমাদের জানা ও আমাদের চোখে দৃশ্যমান, শুধুমাত্র সেগুলো লিখে রাখলে বিপুল সংখ্যক ভলিউমের প্রয়োজন হবে, আর অজানাগুলো তো জানাগুলোর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী, কোরআনও এগুলো সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেনি। তবে তা মানুষের হৃদয়ে এমন চেতনার সৃষ্টি করে যে, তা চাক্ষুষ দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি উভয় রকমের দৃষ্টি দিয়েই সেই ঐশী জাদুঘর দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। শুধু মানব নামক এই জাদুঘর নয় বরং চিন্তা-গবেষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবী নামক এই সমগ্র গ্রহটিতেই সে তার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। আর তার সত্তার অভ্যন্তরের এই বিস্ময়কর সৃষ্টিকে যার সম্পর্কে সে এ যাবত উদাসীন রয়েছে, তাকেও পরিদর্শন করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

কোরআন চেতনা জাগিয়ে তোলে

বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে মানুষ যে মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে, নিসন্দেহে তা অত্যন্ত তৃপ্তিকর ও উপভোগ্য মুহূর্ত। শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টির এই জাদুঘরকে আল্লাহর একজন যথার্থ অনুগত ও সঠিক বান্দার চোখ দিয়ে দেখা যথার্থই আনন্দদায়ক, আর যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনই কাটিয়ে দেয় মহান স্রষ্টার এই বিচিত্র মেলা ও জাদুঘরকে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে, সে যে কত মহিমান্বিত ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোরআন মানুষকে এরূপ অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়, তাকে নতুন চেতনা ও অনুভূতি দিতে চায়, তাকে নতুন জীবন দিতে চায় এবং এমন সহায়-সম্বল ও সাজ-সরঞ্জাম দিতে চায় পৃথিবীতে যার কোনো তুলনা নেই। কোরআন ঈমানেরই মাধ্যমে মানুষকে এরূপ উচ্চাংগের চিন্তা-গবেষণায় অনুপ্রাণিত করতে চায়। কোননা, ঈমানই মানুষের জন্যে এই মূল্যবান পাথেয় ও এই উচ্চাংগের সম্পদ প্রস্তুত করে দেয় এবং তাকে নিম্নস্তর থেকে ওপরে টেনে তোলে।

'পৃথিবীতে মোমেনদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে' আগের এ আয়াতে পৃথিবীর মেলা এবং 'তোমাদের সত্তার মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে' এ আয়াতে মানব-সত্তার মেলার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। অতপর এর পরই আকাশের অদৃশ্য মেলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যেখানে জীবিকা বন্টিত ও নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। বলা হয়েছে, 'আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা ও প্রতিশ্রুত অন্যান্য জিনিস।' এটা একটা চমকপ্রদ বক্তব্য। যদিও জীবিকার বাহ্যিক

উপকরণগুলো পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মানুষ পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করে এবং তাতে করে সে জীবিকা ও সৌভাগ্য লাভের আশায় ও অপেক্ষায় থাকে, তথাপি কোরআন মানুষের দৃষ্টিকে আকাশের দিকে , অদৃশ্য জগতের দিকে তথা আল্লাহর দিকে ফেরায়। তার কাছ থেকেই জীবিকা লাভের প্রত্যাশা করতে বলে। পৃথিবী ও পৃথিবীতে বিরাজমান জীবিকার বাহ্যিক উপকরণগুলো বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনস্বরূপ। এই নিদর্শনসমূহ মানুষের মনকে আল্লাহর দিকে ফেরায়, যাতে সে তাঁর অনুগ্রহস্বরূপ জীবিকা অন্বেষণ করতে পারে, যাতে পার্থিব লোভ-লালসা থেকে ও জীবিকার বাহ্যিক উপকরণাদির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং এসব জিনিসকে তার মাঝে ও এসব জিনিসের স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াতে না দেয়।

প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির মন উক্ত বক্তব্যকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে। সে বোঝে যে, পৃথিবীকে ও পৃথিবীর উপকরণাদি অবজ্ঞা করা এর উদ্দেশ্য নয়। সে তো এই পৃথিবীতেই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে আদিষ্ট এবং এই পৃথিবীকেই পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ করা তার দায়িত্ব। উক্ত বক্তব্য অর্থাৎ 'আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা' এই কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, মোমেন যেন তার মনকে পৃথিবীর ওপরই নির্ভরশীল করে না ফেলে এবং পৃথিবীর উন্নয়ন ও বিনির্মাণে আল্লাহ তায়ালা থেকে উদাসীন হয়ে না যায়। সে কাজ করবে পৃথিবীতে, কিন্তু তার মনোযোগ থাকবে আল্লাহর দিকে। সে পার্থিব উপকরণাদিকে কাজের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করবে, কিন্তু এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সেসব হাতিয়ার তার রেযেকদাতা নয়। তার রেযেক নির্ধারিত রয়েছে আকাশে। আল্লাহ তায়ালা তার জীবিকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেন তা পূরণ না হয়েই পারে না।

এইভাবে বাহ্যিক উপকরণাদির হাতে বন্দী হওয়া থেকে মোমেনের মন নিষ্কৃতি পায়। বরঞ্চ এই সকল উপকরণ থেকেই সে আকাশের বিশাল রাজ্যে উড্ডয়নের পাখা সংগ্রহ করে নেয়। কেননা, সে এই সকল উপকরণে এমনসব নিদর্শন দেখতে পায়, যা তাকে ওগুলোর স্রষ্টার সন্ধান দেয় এবং তার মনকে সেই মহান স্রষ্টার সাথে যুক্ত করে, যদিও তার পা দুটিকে পৃথিবীর মাটিতেই প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা এটাই। যে মানুষকে তিনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন, তার ভেতরে নিজের আত্মা সঞ্চালিত করেছেন এবং তাকে বিশ্বজগতের বহু সৃষ্টির চেয়ে উত্তম সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন।

আল্লাহর নিজ সত্ত্বার কসম

ঈমানই মানুষের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠত্ব এনে দেয়। যে পরিবেশে সে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে অবস্থান করতে পারে ঈমানই সে পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেননা, সে তখন সেই পরিবেশে অবস্থান করে, যা তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। এটাই সেই ফেতরাত বা স্বাভাবিক অবস্থা, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কবলে পড়ার আগে এই স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত করাই ঈমানের দাবী।

পৃথিবী, মানব-সত্তা ও আকাশ সংক্রান্ত উল্লেখিত তিনটি আয়াতের পর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে নিজের কসম খেয়ে এই সকল উক্তির সত্যতা প্রত্যয়ন করেছেন। তিনি বলেছেন,

'অতএব, আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতির কসম, তোমাদের নৈমিত্তিক কথাবার্তার মতোই এটা সত্য।'

তাদের নৈমিত্তিক কথাবার্তা যে একটা বাস্তবতা, সেটা তারা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করে থাকে। তা নিয়ে তারা কোনো তর্কবিতর্ক করে না। সন্দেহে লিপ্ত হয় না এবং আন্দাজ-অনুমান প্রয়োগ করে না। তদ্রূপ এই সকল উক্তিও অকাট্য সত্য ও বাস্তব। আর আল্লাহ তো সবার চাইতে সত্যবাদী।

প্রসংগত যামাখশারী কর্তৃক তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করছি,

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

'বিখ্যাত মোফাসসের বলেন, আমি বসরার জামে মসজিদ থেকে আসছিলাম। এই সময় জনৈক বেদুইনের সাথে আমার দেখা হলো। সে বললো, তুমি কোন্ গোত্রের লোক? আমি বললাম, বনু আসমা গোত্রের। সে বললো, কোথা থেকে আসছো? আমি বললাম, যেখানে দয়াময়ের বাণী পড়া হয় সেখান থেকে। সে বললো, আমাকে একটু পড়ে শোনাও তো। আমি সূরা যারিয়াতের প্রথম থেকে পড়তে লাগলাম। যখন এই আয়াত পড়লাম যে, 'আকাশে তোমাদের জীবিকা ও তোমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত অন্যান্য জিনিস রয়েছে', তখন সে বললো, থামো। অতপর তার বাহন উষ্ট্রীটাকে যবাই করে দুদিক থেকে চলমান পথিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। অতপর নিজের ধনুক ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে চলে গেলো । পরবর্তীকালে আমি যখন খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে হজ্জে গেলাম, তখন তাওয়াফ করার সময় কে যেন আমাকে ডাক দিল। তাকিয়ে দেখলাম, সেই বেদুইন। খুবই জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। সে আমাকে সালাম করলো এবং পুনরায় সূরা যারিয়াত পড়তে বললো। আমি পড়তে লাগলাম। যখন আমি পড়লাম, 'আকাশে তোমাদের জন্যে রেযেক রয়েছে...' তখন সে চিৎকার করে বলে উঠলো, আল্লাহ তায়ালা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমরা পেয়েছি। তারপর বললো, আরো আছে নাকি? আমি এরপর পড়লাম, অতএব আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতির কসম। এটা অবশ্যই সত্য ...' তখন সে পুনরায় চিৎকার করে বললো, সোবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহকে কে এতো রাগালো যে, তিনি কসম খেলেন। নিশ্চয় লোকেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করেনি বলেই তিনি কসমের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।' কথাটা সে তিনবার বললো এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

প্রামাণ্যতার দিক দিয়ে এ বর্ণনা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যাই হোক, এটি একটি মূল্যবান বর্ণনা বটে। আল্লাহর নিজের নামে করা এই শপথ যে কত গুরুত্বপূর্ণ, সে কথাই এ আয়াত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত যে বিষয়ে শপথ করা হয়েছে, শপথ না করলেও তা সত্য।

এই ছিলো সূরার প্রথমাংশ। দ্বিতীয়াংশে ইবরাহীম, লূত, মূসা, (আ.) এবং আদ জাতি, সামূদ জাতি ও নূহের জাতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এসেছে এবং তা সূরার পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ অংশটি ২৪ থেকে ৩৭ তম আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ আয়াতগুলো নবীদের ইতিহাস সংক্রান্ত, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতগুলো পৃথিবী ও মানব-সত্তা সংক্রান্ত। পূর্ববর্তী অংশে যে সকল প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, এ অংশে তার বাস্তবায়নের উল্লেখ রয়েছে।

ইবরাহীম (আ.)—এর একটি ঘটনা

প্রথমে একটি প্রশ্নের মাধ্যমে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা দিয়ে কথাটি শুরু হয়েছে। যথা, 'ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথির ঘটনা কি তোমার কাছে পৌছেছে?' এ দ্বারা দ্বিতীয় পর্বের সমগ্র আলোচনার জন্যে মনকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই সাথে ইবরাহীমের অতিথিদের বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সম্মানিত। হয়তো হযরত ইবরাহীম তাদের সম্মান করেছিলেন বলেই এ কথা বলা হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীমের অতিথিভক্তি বা অতিথিপরায়ণতা, বদান্যতা ও নিজের সম্পদকে অকাতরে ব্যয় করার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার অতিথিরা তার বাড়িতে এসে সালাম করলেন ও তিনি এর জবাব দিলেন। তিনি তাদেরকে চিনতেন না। তথাপি পরিচয় গ্রহণের অপেক্ষা না করেই তিনি নিজের স্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে অতিথিদের খাবারের আয়োজনে লেগে

গেলেন। অনতিবিলম্বে তিনি এতো খাবার নিয়ে এলেন যে, দশজনেরও বেশী লোক তা খেয়ে তৃপ্ত হতে পারতো। অথচ তারা ছিলেন মাত্র তিনজন। 'ইবরাহীম দ্রুতবেগে ছুটে গেলেন নিজের স্ত্রীর কাছে এবং একটি মোটামোটা বকরী নিয়ে এলেন।'

অতপর যখন দেখলেন, তারা খাচ্ছেন না এবং খাওয়ার কোনো লক্ষণও নেই, তখন খাদ্যদ্রব্যকে তাদের একেবারে কাছে এনে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনারা খাবেন না?'

'অতপর তিনি তাদের প্রতি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।' এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোনো নবাগত অতিথি যখন খাদ্য গ্রহণ করে না, তখন বুঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য ভালো নয় বরং তার কোনো অসদুদ্দেশ্য রয়েছে। এর কারণ এও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে আশ্চর্যজনক বা অস্বাভাবিক কিছু প্রত্যক্ষ করে থাকতে পারেন। ঠিক তখনই তারা নিজেদের আসল পরিচয় তুলে ধরলেন অথবা তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন ও সুসংবাদ দিলেন। 'তারা বললো, ভয় পেয়ো না। অতপর তারা তাকে একটি জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল।' এটা ছিলো তার বন্ধ্যা স্ত্রীর পেট থেকে এসহাক (আ.)-এর ভূমিষ্ঠ হবার সুসংবাদ।

'তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এলেন এবং মুখ চাপড়ে বললেন, আমি বুড়ি বন্ধ্যা হয়ে গেছি।' তিনি সুসংবাদ শুনতে পেয়েছিলেন এবং তাতে বিস্ময়জনিত চিৎকার ফুটে উঠেছিলো তার মুখ দিয়ে। মহিলাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি হাত দিয়ে মুখ চাপড়ে বললেন, একে তো তিনি বন্ধ্যাই ছিলেন, তদুপরি একেবারেই বৃদ্ধা। এমতাবস্থায় এই সুসংবাদ তাকে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করে ফেলেছিলো। একেবারেই অপ্রত্যাশিত এই সুসংবাদে তিনি এতোই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, ফেরেশতারা যে সুসংবাদ বহন করে এনে থাকেন তা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। এই সময় প্রেরিত ফেরেশতারা মূল সত্যটি উদঘাটন করে জানালেন যে, আল্লাহর শক্তি সীমাহীন এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সহকারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

'তারা বললেন, তোমার প্রতিপালক এরকমই বলেছেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখনই কোনো জিনিসকে 'হও' বলেন, অমনি তা হয়ে যায়। তিনি তো 'হও' বলেছেন। এরপর আর কী বলার থাকতে পারে? প্রচলিত অভ্যাস ও রীতিপ্রথা মানুষের কল্পনাশক্তি ও বোধশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং যা দেখতে অভ্যস্ত নয় তা দেখলে অবাক হয়ে যায় ও ভাবে, এটা কী করে সম্ভব। কখনো কখনো হঠকারী হয়ে পড়ে এবং বলে, এটা হতে পারে না। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা সীমাহীন এবং তা তার নিজস্বগতিতেই চলে। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মানুষ কী দেখতে অভ্যস্ত বা অনভ্যস্ত তার তোয়াক্কা সে করে না। যখন যা খুশী তাই করে।

এই সময় ইবরাহীম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। আগেই তিনি তাদের পরিচয় জেনেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে (আমাদের কাছে) পাঠানো ব্যক্তিবর্গ, আপনারা কী বলতে চান?' তারা বললেন, 'আমরা একটি অপরাধী জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি।' অন্যান্য সূরায় বলা হয়েছে যে, এই জাতিটি ছিলো লূতের জাতি।

'যেন আমরা তাদের ওপর মাটি থেকে তৈরী পাথর নিক্ষেপ করি, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত রয়েছে দুষ্কৃতিকারীদের জন্যে।'

লূত জাতির ঘটনা

লূতের জাতি যথার্থই সভ্য ও প্রাকৃতিক রীতি, সত্য ও দ্বীনের নীতি লংঘন করে দুষ্কৃতকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। এই পাথর কোনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে নির্গত পাথরও হতে পারে, যা ভূগর্ভস্থ উত্তাপের দরুন উদ্‌গত হয়ে থাকে। 'তোমার প্রভুর কাছে চিহ্নিত' অর্থাৎ এই পাথর কখন কাদের ওপর নিক্ষেপ করতে হবে এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমেই নিক্ষেপ করতে হবে- এটা তিনিই স্থির করে রেখেছিলেন। ফেরেশ্‌তাদের প্রকৃত স্বরূপ কী, মহাবিশ্বের সাথে ও মহাবিশ্বে বিরাজমান বস্তু ও প্রাণীর সাথে তাদের সম্পর্ক কী, এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন শক্তি, যেগুলোকে আমরা বিভিন্ন সময়ে উদঘাটিত তথ্যের আলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করে থাকি, তার প্রকৃত পরিচয় কী তা কি আমরা জানি? আল্লাহ তায়ালা যতি আমাদেরকে সংবাদ দেন যে, তিনি কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে দিয়ে কোন সময়ে, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন দেশে, কোন জাতির ওপর আঘাত হেনেছেন, তাহলে এ সংবাদে আমাদের আপত্তি তোলার অধিকার থাকে না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি সংক্রান্ত আমাদের তথ্য, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাসমূহ নিছক আন্দায-অনুমান ছাড়া কিছু নয়, এ সবের প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের নাগালোর বাইরে। সুতরাং নিক্ষিপ্ত পাথর আগ্নেয়গিরির পাথরই হোক বা অন্য কোনো পাথর হোক, তা যে আল্লাহর তৈরী পাথর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রকৃত পরিচয় আমাদের অজানা। আল্লাহ যখন জানাবেন, তখনই আমরা জানতে পারবো।

'আমি সেখানকার মোমেনদেরকে বের করলাম।' অর্থাৎ তাদেরকে বাঁচানো ও রক্ষা করার জন্যে বের করলাম। 'সেখানে একটিমাত্র ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো ঘর আমি পাইনি।' এই ঘরটিই ছিলো হযরত লূতের ঘর। হযরত লূতের স্ত্রী ছাড়া এই ঘরের সকল অধিবাসী বেঁচে গিয়েছিলো। তাঁর স্ত্রী অন্যান্য কাফেরদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

'সেখানে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে একটা নিদর্শন রেখে দিয়েছিলাম।' যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পায়, তারা এ নিদর্শন দেখে চিনতে পারে। অন্যরা আল্লাহর কোনো নিদর্শনই দেখতে পায় না এবং চিনতে পারে না–পৃথিবীতেও নয়, তাদের সত্তার ভেতরেও নয় এবং ইতিহাসের ঘটনাবলীতেও নয়।

মূসা (আ.)-এর ঘটনা

নবীদের ইতিহাসে বিরাজমান নিদর্শনাবলীর বর্ণনার প্রেক্ষাপটে হযরত মূসা সম্পর্কেও কয়েকটি আয়াতে সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর মূসা সম্পর্কে, যখন আমি তাকে প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠালাম।'

যে প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মূসাকে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তা ছিল তার অকাট্য যুক্তি এবং অত্যন্ত ভীতিপ্রদ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। মূসা (আ.) তাঁর ভাই সহকারে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তায়ালা গভীর পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। অথচ ফেরাউন তার ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং অকাট্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো।

হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণ দেখেও সে তাঁর সম্পর্কে বললো যে, 'মূসা হয় জাদুকর, না হয় পাগল।' এ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে হৃদয় হেদায়াত গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়নি, তাকে হেদায়াত করা এবং যে জিহ্বা বাতিল ও মিথ্যাকে ক্রমাগত স্বীকৃতি দিতে থাকে, তাকে মিথ্যা থেকে ফেরানো অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সম্ভব নয়।

এখানে আয়াতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। শুধু তার শেষ পরিণতিকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, 'অতপর আমি তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিলো তিরস্কারযোগ্য।' অথাৎ বিদ্রোহ ও সত্যকে অস্বীকার করার কারণে সে তিরস্কারের ও ধিক্কারের উপযুক্ত ছিলো।

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনকে ও তার জাতিকে পাকড়াও করা ও তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করাটা ছিলো আল্লাহর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ। আর পৃথিবীতে, মানব-সত্তায় ও নবীদের ইতিহাসে আল্লাহর নিদর্শন পেশ করতে গিয়ে মূসা (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহর এই নিদর্শনই তুলে ধরা অভিপ্রেত ছিলো।

আদ জাতির ঘটনা

আদ জাতি সম্পর্কে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'আর আদ সম্পর্কে, যখন আমি তাদের ওপর বন্ধ্যা বাতাস পাঠালাম। সেই বাতাস যার ওপরই গিয়ে পড়ে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।' আদ জাতির ওপর নাযিল করা বাতাসকে 'বন্ধ্যা বাতাস' বলা হয়েছে এ জন্যে যে, তাতে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পানি বা জীবনের কোনো উপকরণ ছিলো না-ছিলো শুধু মৃত্যু ও ধ্বংস। আর যার ওপরই এই বাতাস পড়তো তাকে টুকরো টুকরো ও ছিন্নভিন্ন করে দিতো মৃত লাশের মতো।

বাতাস প্রকৃতির একটি শক্তি এবং আল্লাহর এক সৈনিক। আল্লাহর সৈনিকের সংখ্যা কত তা কেবল আল্লাহই জানেন। এ সব সৈনিককে তিনি যখন যে আকারে যার ওপর ইচ্ছা ধ্বংসের নির্দেশ দিয়ে পাঠাতে পারেন অথবা জীবন গড়ার নির্দেশ দিয়েও পাঠাতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে এমন কোনো আপত্তি তোলার কোনোই অবকাশ নেই যে, বাতাস তো একটা প্রাকৃতিক নিয়মে চলে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক কার্যকারণ হেতু কোথাও তা প্রবাহিত হয়, আবার কোথাও হয় না। মনে রাখতে হবে যে, শক্তি বাতাসকে উক্ত নিয়ম অনুসারে ও উক্ত কার্যকারণ অনুসারে পরিচালিত করে, সেই শক্তি তাকে যার ওপর যখন আপন ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে পাঠাতে চায় পাঠাতে পারে। আর সে শক্তি তাকে আপন নির্ধারিত নিয়ম ও কার্যকারণ অনুসারেও পাঠাতে পারে। এতে কোনো বিরোধিতা, সন্দেহ বা আপত্তির কোনো অবকাশ নেই।

সামূদ ও নূহের ঘটনা

'আর সামূদের ইতিহাসেও নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হলো ..... এবং তারা সাহায্য গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলো না।'

'যখন তাদেরকে বলা হলো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আনন্দ উপভোগ করো' এর অর্থ উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর তিন দিন সময় দেয়া হয়ে থাকতে পারে, যেমন সূরা হুদে বলা হয়েছে, 'তোমাদের ঘরে তোমরা তিন দিন আনন্দ উপভোগ করো।' আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, রেসালাতের পক্ষ থেকে ঈমানের দাওয়াত আসার পর থেকে উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা পর্যন্ত তাদেরকে যা কিছু আনন্দ উপভোগ করতে দেয়া হয়েছে, সেটাই আরো কয়েক দিন চলতে থাকুক। এভাবে উষ্ট্রী হত্যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করার ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আর লূতের জাতির ওপর বর্ষিত পাথর এবং আদ জাতির ওপর প্রেরিত বাতাস সম্পর্কে যা যা বলা হয়ে থাকে, সামুদের ওপর প্রেরিত বিকট চিৎকার সম্পর্কেও তা বলা যেতে পারে। এ সবই আল্লাহর আদেশে পরিচালিত এবং তাঁরই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তি। আল্লাহ তায়ালা যার ওপর খুশী একে পরিচালিত করে থাকেন এবং আল্লাহর অন্যান্য সৈনিকের মতো সেও নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

অতপর নূহের জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'আর নূহের জাতিকে স্মরণ করো, তারা ছিলো একটা পাপিষ্ঠ জাতি।' এখানে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে পরবর্তী আয়াত 'আকাশকে নির্মাণ করেছি স্বহস্তে..'এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর এরই মাধ্যমে সূরার দ্বিতীয় অংশকে তৃতীয় অংশের সাথে যুক্ত করা হয়েছে,

'আকাশকে নির্মাণ করেছি হাত দিয়ে। আমি তার বিস্তৃতিও ঘটাই। ....আমি তোমাদের জন্যে সতর্ককারী।'

আকাশের নির্মাণ প্রসংগে

এখানে এসে পুনরায় সেই প্রাকৃতিক মেলায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে, যা সূরার শুরুতে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে,

'আকাশকে আমি হাত দিয়ে তৈরী করেছি এবং তার বিস্তৃতি ঘটাই।' এখানে হাত অর্থ শক্তি। আর এই 'শক্তি' সুগঠিত বিশাল আকাশ তৈরী সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করে। আকাশ বলতে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথকে বুঝানো হতে পারে। ছায়াপথসমূহের কোনো সমষ্টিকে বুঝানো হতে পারে, যাতে হাজার হাজার কোটি নক্ষত্র বিদ্যমান, অথবা এ দ্বারা মহাশূন্যের অসংখ্যস্তরের মধ্য থেকে কোনো বিশেষ স্তরকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করে। আবার অন্য কিছুও বুঝানো হতে পারে। 'বিস্তৃতি' বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তাও এখানে সুস্পষ্ট। কেননা, বিশাল বিশাল আকৃতির কোটি কোটি নক্ষত্র এই আকাশে বিন্দুর চেয়ে বড় কিছু নয়।

সম্ভবত এখানে 'বিস্তৃতি' শব্দটি দ্বারা ইংগিতে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, এটা জীবিকার ভান্ডার। কেননা, ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তোমাদের জীবিকা রয়েছে আকাশে। যদিও সেখানে আকাশে বলতে আল্লাহর কাছে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু কোরআনের ভাষা একটা সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য বহন করে এবং মনে হয় মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে আলোড়িত করার জন্যে এখানে সেই তাৎপর্যই ঈঙ্গিত। অনুরূপ ইংগিত রয়েছে পরবর্তী আয়াতেও। বলা হয়েছে,

'আর পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি। আমি কত সুন্দর বিস্তৃতকারী।' আগেই বলেছি যে, আল্লাহ এই পৃথিবীকে জীবনের লীলাভূমি হিসাবে তৈরী করেছেন। 'ফারশ' শব্দটির মধ্যে আরাম, সাবলীলতা ও তত্ত্বাবধানের ভাব নিহিত রয়েছে। পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, তা আরামদায়ক লালন-পালনের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে প্রতিটি জিনিস জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে প্রস্তুত।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

'প্রত্যেক জিনিসের দুটি করে জোড়া তৈরী করেছি ....'

এ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। এ দ্বারা পৃথিবীর সৃজনী নিয়ম জানা যায়। গোটা বিশ্বেও হয়তো তাই। মনে হয় জোড়ায় জোড়ায় বানানোই সৃষ্টির নিয়ম। এটা বাহ্যত প্রাণী জগতে সীমিত। কিন্তু কোরআনে বলা হয়েছে 'প্রত্যেক জিনিসের .....' এ দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু প্রাণী নয়, জড় পদার্থকেও আল্লাহ তায়ালা জোড়ার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

আমরা লক্ষ্য করি যে, জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির এই নিয়ম মানব জাতি ১৪শ' বছর আগেই কোরআনের মাধ্যমে জেনেছে। সে সময় পদার্থে তো দূরের কথা, প্রাণীদের জন্মও যে জোড়া ভিত্তিক, তাও মানুষ জানতো না। এ বিষয়টা যখন লক্ষ্য করি, তখন দেখতে পাই যে, আমরা প্রাকৃতিক জগত সংক্রান্ত বহু তত্ত্ব ও তথ্য এরূপ বিস্ময়করভাবে অনেক আগেই জানতে পেরেছি।

উল্লেখিত আয়াত থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানব জাতিকে প্রকৃত সত্যের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হবার কাছাকাছি এসে গেছি যে, গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টির মূল হলো পরমাণু। আর এই পরমাণু বিদ্যুতের একটি জোড়া দিয়ে তৈরী—নেগেটিভ ও পজেটিভ। তাই বলা যেতে পারে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যত এই আয়াতের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে।

যাবতীয় আশ্রয় তো আল্লাহর কাছেই

আকাশ, পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের এই নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হবার পর মানব জাতিকে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। আত্মাকে ভারাক্রান্তকারী সকল পার্থিব আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঘনিষ্ঠ হবার আহবান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে,

'অতপর, তোমরা আল্লাহর দিকে পালাও। ......আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

এখানে 'পালাও' কথাটা খুবই তাৎপর্যবহ। পৃথিবীতে মানব-সত্তা যে অসংখ্য বোঝার নিচে চাপা পড়ে আছে ও অসংখ্য বাধা-বিপত্তি ও দায়দায়িত্বের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে এক ধরনের বন্দীদশা ও গোলামীর জীবন যাপন করছে, বিশেষত জীবিকা উপার্জনের কাজে নিয়োজিত হয়ে ও লোভ-লালসার শিকার হয়ে যে অবরুদ্ধ জীবন কাটাচ্ছে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জোরদার কণ্ঠে আহবান জানানো হয়েছে যে, এইসব বাধা-বিপত্তি ছুঁড়ে ফেলে আল্লাহর দিকে পালাও ও তার নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করো এবং একমাত্র তার কাছেই আশ্রয় নাও।

'আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী' এ কথাটা দু'বার উচ্চারণ করে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, অতপর মানুষের আর কোনো ওজুহাত ও ওযর আপত্তি খাটবে না।

উপরোক্ত আয়াতটিতে আকাশ, পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির নিদর্শনের পাশাপাশি নবীদের ইতিহাসের নিদর্শনের দিকেই সম্ভবত ইংগিত করা হয়েছে। অতপর পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনার ওপর মন্তব্য করে বলা হয়েছে, 'এভাবে যখনই তাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাছে কোনো রসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে যে, ও তো হয় জাদুকর, না হয় পাগল। এটা কি তাদের পারস্পরিক উপদেশ বিনিময়? ......।'

বস্তুত সত্যকে অস্বীকারকারী কাফেরদের এটা চিরন্তন মজ্জাগত স্বভাব—রসূলদের সাথে তারা চিরকাল এরূপ আচরণই করেছে। তারা নবীদেরকে জাদুকর অথবা পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। আর এটা যুগ যুগকালের ব্যবধান সত্ত্বেও এভাবেই যেন তারা পারস্পরিক উপদেশ বিনিময় করে এসেছে যে, নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করা চাই। অতীত ও পরবর্তী খোদাদ্রোহীদের এটাই ছিলো অভিন্ন চরিত্র: সত্যকে অগ্রাহ্য করা ও নবীদের অবাধ্য হওয়া।

আর কাফেরদের এই চিরন্তন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার স্বাভাবিক ফল এটাই হতে পারে যে, রসূল (স.) যেন মোশরেকদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানে মনোক্ষুণ্ন না হন। কেননা তারা গোমরাহ হয়ে গেলে তাতে তো তাঁর কোনো দোষ নেই। পক্ষান্তরে হেদায়াতের কাজে তাঁর কোনো কমতি রাখাও চলবে না। তাই বলা হয়েছে, 'অতএব তুমি তাদের কাছ থেকে সরে যাও, কারণ তুমি দোষী নও।' স্মরণ করিয়ে দেয়াই যখন তোমার কাজ, তখন তারা যতই প্রত্যাখ্যান করুক, স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাক।

'স্মরণ করিয়ে দিতে থাকো, কারণ স্মরণ করিয়ে দেয়া মোমেনদের উপকার করে।' অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের উপকার করে না। স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজটা নবীদের কাজ। কারো হেদায়াতপ্রাপ্তি বা গোমরাহ হওয়া এ কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে, যিনি মানুষকে নিজের ঈপ্সিত একটি কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

এরপর আসছে সূরার সর্বশেষ নির্দেশিকা। এখান থেকে আল্লাহর কাছে পালানোর অর্থ কি তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে পালানোর উদ্দেশ্যই হলো সেই কাজ সম্পাদন করা, যার জন্যে আল্লাহ জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য

'আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার এবাদাত করে ....।'

এই ক্ষুদ্র বক্তব্যটুকু একটি বিরাট সত্যকে ধারণ করে আছে। এটি সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সত্যসমূহের অন্যতম, যা না বুঝে ও না মেনে পৃথিবীতে মানুষের সফল জীবন যাপন সম্ভব হয় না, চাই তা ব্যক্তির হোক বা সমষ্টির হোক এবং যে কোনো যুগের হোক।

এখানে এই মহা সত্যের বেশ কয়েকটি দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথমটি এই যে, জ্বিন ও মানুষের অস্তিত্বের একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটি বিশেষ ভূমিকার মাধ্যমে সফলতা লাভ করে। যে ব্যক্তি এই ভূমিকা পালন করবে, সে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত করবে। আর যে তাতে ব্যর্থ হবে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বিফল হবে। এতে তার জীবনের কোনো ভূমিকা থাকবে না এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে না। তার জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং তার অস্তিত্ব একেবারেই নিরর্থক হয়ে যাবে।

এই সুনির্দিষ্ট কাজ ও ভূমিকা, যা জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি জগতের বিধির সাথে একাত্ম করে ও তার হেফাযতের নিশ্চয়তা দেয়, তা হচ্ছে আল্লাহর এবাদাত, আনুগত্য ও দাসত্ব। অর্থাৎ একজন গোলাম ও একজন মনিব থাকবে। গোলাম আনুগত্য করবে ও মনিব আনুগত্য পাবে। বান্দার জীবন এভাবেই সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এবাদাত মানে শুধু কিছু আনুষ্ঠানিকতা নয়

এর দ্বিতীয় দিকটি এই যে, এবাদাত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পূজা-উপাসনার মধ্যে সীমিত থাকবে না। বরং তার চেয়ে ব্যাপকতর ও প্রশস্ততর হবে। জ্বিন ও মানুষ তাদের গোটা জীবন কেবল আনুষ্ঠানিক পূজা-উপাসনা তথা নামায রোযা হজ্জ যাকাত দোয়া দুরূদ পাঠ ইত্যাদি করেই কাটিয়ে দেবে না আর তা করার আদেশও দেয়া হয়নি। তিনি তাদেরকে আরো বহুরকম কাজ করতে আদেশ দেন, যা তাদের সারা জীবন জুড়ে বিস্তৃত থাকবে। জ্বিনদের কত রকমের দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আমরা না জানতে পারি। কিন্তু মানুষের কর্মসীমা আমাদের জানতে হবেই। আমরা কোরআন থেকেই তা জানতে পারি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি পৃথিবীতে খলীফা পাঠাবো।' তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের কাজ হচ্ছে খেলাফত। আর এই খেলাফত দুনিয়াকে গড়ার জন্যে বহুরকম তৎপরতা দাবী করে। পৃথিবীর কি কি শক্তি ও সম্পদ আছে এবং তাকে কি কিভাবে কাজে লাগাতে হবে, কিভাবে দুনিয়ার জীবনকে উন্নত করা যাবে, কিভাবে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করে মানব জীবনকে

মহাবিশ্বের নিয়ম-বিধির সাথে একাত্ম করা যাবে, তাও জানা ও মানা খেলাফতের দায়িত্বের আওতাভুক্ত। সুতরাং এবাদাত নিছক আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনা নয়, বরং খেলাফতের কাজ অপরিহার্যভাবে এবাদাতের আওতাভুক্ত। আর এবাদাত বলতে প্রধানত দুটো জিনিস বুঝায়।

প্রথমত, অন্তরে আল্লাহর দাসত্বের অনুভূতি বদ্ধমূল হওয়া। অর্থাৎ এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া যে, গোলাম ও মনিবের বাইরে তৃতীয় কেউ নেই। উপাসক ও উপাস্য, গোলাম ও মনিব ছাড়া এ বিশ্বচরাচরে আর কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র মনিব, আর সব কিছু তাঁর দাস ও গোলাম।

দ্বিতীয়ত, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি কাজ দ্বারা একমাত্র আল্লাহর দিকে সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক মনোযোগী হওয়া ও অনুগত হওয়া। আর এ ছাড়া অন্যসব রকমের আনুগত্যের ধারণা মন থেকে মুছে ফেলা।

এই দুটি জিনিস মিলিত হয়েই এবাদাতের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য। এতে আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও দুনিয়ার পুনর্গঠনের কাজ একই পর্যায়ে উন্নীত হবে। দুনিয়ার উন্নয়নের কাজ আর আল্লাহর পথে জেহাদে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আর আল্লাহর পথে জেহাদ আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া ও দুঃখ-মুসিবতকে সহ্য করার সমান হবে। সবটাই হবে এবাদাত, যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্বজগতের বিধানের সাথে তথা 'সব কিছু একমাত্র আল্লাহর বান্দা–আর কারো নয়' এই নীতির সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।

এরূপ যখন হবে, তখনই মানুষ অনুভব করবে যে, সে এ পৃথিবীতে কেবল আল্লাহর এবাদাত করতে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করতে এসেছে। এ ছাড়া এখানে তার আর কোনো কাজ নেই। আর এর বিনিময়ে সে ইহজগতে মানসিক শান্তি ও পরিতৃপ্তি পাবে আর আখেরাতে পাবে অশেষ মর্যাদা, অনুগ্রহ ও সম্মান।

এরূপ করতে যখন কেউ সমর্থ হবে, তখনই প্রমাণিত হবে যে, সে যথার্থই আল্লাহর কাছে পালিয়েছে ও আশ্রয় নিয়েছে। তখন বুঝা যাবে সে, দুনিয়ার সকল চাপ, সকল বাধা-বিপত্তি ও সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং নিরংকুশভাবে ও নিষ্কলুষভাবে একমাত্র আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়েছে। তখনই প্রমাণিত হবে যে, সে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সফল করেছে। বস্তুত এবাদাত বা গোলামীর স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে পৃথিবীতে খেলাফাতের দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য। এই খেলাফাতের দায়িত্ব নিজের কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে পালন করতে হবে না, বরং এবাদাতের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত করার জন্যে এবং আল্লাহর দিকে পালানোর জন্যে।

এবাদাতের প্রকৃত তাৎপর্য বাস্তবায়নের ও তার স্থিতির আরো একটা দাবী এই যে, মানুষের অন্তরে কোনো কাজের মূল্য নির্ণীত হবে সেই কাজের পেছনে কী উদ্দেশ্য ও প্রেরণা কার্যকর ছিলো তার আলোকে, তার পার্থিব পরিণতি ও ফলাফল কী দেখা দিয়েছে তার ভিত্তিতে নয়। ফলাফল যা হয় হোক। মানুষের তাতে কিছু এসে-যায় না। সে এইসব কাজ সম্পন্ন করার সময়ে এবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ঠিকমত করতে পেরেছে কিনা সেটাই আসল লক্ষণীয় বিষয়। মনে রাখতে হবে, আখেরাতে তার কাজের প্রতিদান সে এ কাজের পার্থিব ফলাফলের ভিত্তিতে পাবে না, বরং এ কাজ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে করা বা না করার ভিত্তিতে পাবে।

এখান থেকেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে মানুষের নীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে দেখবে তার কাজের মধ্যে এবাদাতের তাৎপর্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা। তা যদি হয়ে থাকে, তবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত ও উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এরপর সে কাজের ফলাফল যা হয় হোক। এই ফলাফল তার দায়িত্বের আওতাধীন নয় এবং তা তার হাতেও নেই। ফলাফল কী হবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তার চেষ্টা, উদ্দেশ্য ও কাজ আল্লাহর ইচ্ছার একটা দিক মাত্র।

আর যখনই মানুষ তার মনকে নিজের চেষ্টা ও কর্মের ফলাফলের ভাবনা থেকে মুক্ত করে এবং বুঝতে পারে যে, নিজের চেষ্টা ও কর্মের পেছনে সদুদ্দেশ্য থাকায় এবাদাতের সঠিক অর্থ সে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে আর তাতেই তার করণীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও কাজের প্রতিদানপ্রাপ্তি তার নিশ্চিত হয়েছে, তখন আর তার মনে কোনো লোভ লালসা অবশিষ্ট থাকবে না। আর যেহেতু পার্থিব সহায়-সম্পদের ওপর এই লোভ-লালসাই যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও কলহের মূল কারণ, তাই তা থেকেও সে রেহাই পেয়ে যাবে। তখন একদিকে সে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যতদূর শক্তি সামর্থ ও চেষ্টা তৎপরতা চালানো তার পক্ষে সম্ভব, তা সম্পন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করবে, অপরদিকে সে নিজের হাত ও মনকে পার্থিব সম্পদের সম্পর্ক থেকে ও এই সকল তৎপরতার ফলাফল থেকে মুক্ত করতে পারবে। কেননা, সে তো এই সকল ফলাফল বাস্তবায়িত করেছে শুধু এবাদাতের প্রকৃত তাৎপর্য সফল করার তাগিদেই—সেগুলো নিজে দুনিয়াতে ভোগ করার জন্যে নয়।

কোরআন মানুষকে জীবিকার দুশ্চিন্তা থেকে এবং মনের সংকীর্ণতা ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে তার এই অনুভূতিকে শক্তিশালী করে। জীবিকার দুশ্চিন্তায় সে কেন ভুগবে? জীবিকার নিশ্চয়তা তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি যখন বান্দাদেরকে তাদের সম্পদ অভাবী ও বঞ্চিতদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন, তখন বান্দারা তাঁকে জীবিকা দিক ও আহার করাক—তা কখনো স্বভাবতই প্রত্যাশা করেন না।

‘আমি তাদের কাছে কোন জীবিকা চাই না এবং আমাকে তারা আহার করাক—তাও কামনা করি না। নিশ্চয় আল্লাহই জীবিকাদাতা, শক্তিমান ও চিরঞ্জীব।

সুতরাং কাজ করার পেছনে ও খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পেছনে মোমেনকে যে জিনিস উৎসাহ যোগায়, তা জীবিকা অর্জনের মোহ নয়। বরং এবাদাতের প্রকৃত অর্থের বাস্তবায়নই এই উৎসাহের উৎস। আর সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সাধনা করা দ্বারাই এবাদাতের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এ জন্যে মোমেনের মন যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা করার সময় শুধু এবাদাতের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়নের ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকে, চেষ্টা-সাধনার ফলাফল কী হলো না হলো সে চিন্তায় নয়। আর এটা একটা মহৎ চেতনা, যা সঠিক ঈমান থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে।

এই মহৎ চেতনা থেকে যদি মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ এই যে, প্রথম যুগের মুসলমানরা যে ভাবে কোরআনের শিক্ষাকে গভীরভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করতো, এ যুগের মানুষ তেমন অনুধাবন ও অনুসরণ করে না এবং এই কোরআনের ন্যায় মহান সংবিধান থেকে তাদের জীবন যাপনের রীতিনীতি গ্রহণ করে না।

মানুষ যখন এবাদাত ও দাসত্বের উপরোক্ত সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হয় এবং এই স্তরে আপন অবস্থানকে সংহত ও স্থিতিশীল করে, তখন তার মন নিশ্চয়ই একটি মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করাকে ঘৃণা করে থাকে। এমনকি এই মহৎ লক্ষ্য যদি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতকে ও আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করাও হয়ে থাকে। কেননা, নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন এবাদাতের সঠিক, পরিচ্ছন্ন ও মহান অর্থকে বিনষ্ট করে দেয়, এবাদাতের লক্ষ্য অর্জন নিয়ে মাথা ঘামানো বান্দার কাজ নয়। বরং এবাদাতের অর্থকে বাস্তবায়িত করার জন্যে আন্তরিকতার সাথে অবশ্য করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করাই তার দায়িত্ব। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি যখন যেভাবে তা চান সেভাবেই তা সফল করেন। জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে কোনো পন্থা অবলম্বনপূর্বক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই এবং তা এবাদাতকারী মোমেন বান্দার দায়িত্বেরও আওতায় পড়ে না। তাকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আন্তরিকতা সহকারে উত্তম পন্থায় কাজ করে যেতে হয়।

এরপর এবাদাতকারী বান্দাকে বিবেক ও মনের পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও স্থিরতা সহকারে সর্বাবস্থায় কাজ করে যেতে হবে, চাই পার্থিব জীবনে তার সুফল দেখুক বা না দেখুক, অথবা নিজে তার যেমন ফলাফল আশা করেছে, তেমন হোক বা তার বিপরীত হোক। কেননা, সে তো সাধ্যমত তার কাজ সম্পন্ন করেছে এবং এবাদাতের অর্থ বাস্তবায়িত করে তার প্রতিদান লাভ নিশ্চিত করেছে। এতটুকু করেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। এরপর যা কিছু হয় তা তার দায়িত্ববহির্ভূত। বান্দার এটা জানা থাকা চাই যে, সে বান্দা। সুতরাং নিজের খেয়ালখুশী মতো কাজ করতে গিয়ে বান্দার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। তার এও জানা থাকা চাই যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রভু ও মনিব। কাজেই আল্লাহর দায়িত্বের সীমানায় অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করা তার উচিত নয়। এ পর্যায়ে এসেই তার ভাবাবেগকে শান্ত ও স্থির করতে হবে। সে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

'আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার এবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।' এই ক্ষুদ্র আয়াতে যে বিরাট ও বিশাল সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে, ওপরে তারই বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করা হলো। আর এ সত্যটি যখন যথাযথভাবে মন-মগজে বদ্ধমূল হয়, তখন তা গোটা জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম।

এই বিরাট সত্যের আলোকেই আল্লাহ তায়ালা সেইসব লোককে সতর্ক করে দিচ্ছেন যারা যুলুম করেছে, ঈমান আনেনি, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যে তাড়াহুড়া করেছে এবং ইসলামের আহবানকে অগ্রাহ্য করেছে। 'যারা যুলুম করেছে। তাদের জন্যে তাদের সহযোগীদের মতোই পরিণতি নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তাদের তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। যে দিন সম্পর্কে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তাকে যারা অস্বীকার করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।'

সূরা আত তূর

আয়াত ৩৯ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَالطُّوۡرِ ۙ﴿۱﴾ وَكِتٰبٍ مَّسۡطُوۡرٍ ۙ﴿۲﴾ فِىۡ رَقٍّ مَّنۡشُوۡرٍ ۙ﴿۳﴾ وَّالۡبَيۡتِ الۡمَعۡمُوۡرِ ۙ﴿۴﴾

وَالسَّقۡفِ الۡمَرۡفُوۡعِ ۙ﴿۵﴾ وَالۡبَحۡرِ الۡمَسۡجُوۡرِ ۙ﴿۶﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿۷﴾

مَّا لَهٗ مِنۡ دَافِعٍ ۙ﴿۸﴾ يَّوۡمَ تَمُوۡرُ السَّمَآءُ مَوۡرًا ۙ﴿۹﴾ وَّتَسِيۡرُ الۡجِبَالُ سَيۡرًا ؕ﴿۱۰﴾

فَوَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۙ﴿۱۱﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ خَوۡضٍ يَّلۡعَبُوۡنَ ۘ﴿۱۲﴾ يَوۡمَ

يُدَعُّوۡنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ﴿۱۳﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىۡ كُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۱۴﴾

اَفَسِحۡرٌ هٰذَاۤ اَمۡ اَنۡتُمۡ لَا تُبۡصِرُوۡنَ ۚ﴿۱۵﴾ اِصۡلَوۡهَا فَاصۡبِرُوۡۤا اَوۡ لَا تَصۡبِرُوۡا ۚ

سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ তূর (পাহাড়)-এর, ২. শপথ (পাহাড়ী উপত্যকায় অবতীর্ণ) লিখিত গ্রন্থের, ৩. (যা রক্ষিত আছে) উন্মুক্ত পত্রে। ৪. শপথ 'বায়তুল মামুর'-এর, ৫. শপথ সমুন্নত ছাদ (আকাশ)-এর, ৬. (আরো) শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের, ৭. তোমার মালিকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে, ৮. তা প্রতিরোধ করার কেউই থাকবে না, ৯. যেদিন আসমান ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে, ১০. পাহাড়সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে; ১১. (সেদিন) দুর্ভোগ হবে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের, ১২. যারা তামাসাচ্ছলে অর্থহীন খেলাধুলা করছিলো। ১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; ১৪. (তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই (দোযখের) আগুন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে! ১৫. এটাকে কি (তোমাদের চোখে) যাদু (মনে হয়)? না তোমরা আজ দেখতে পাচ্ছো না? ১৬. (যাও, তোমরা এতে জ্বলতে থাকো,) অতপর (এখানে বসে) তোমরা ধৈর্য ধারণ করো কিংবা না করো, কার্যত তা তোমাদের জন্যে সমান কথা; তোমাদের (ঠিক) সে (ধরনের) বিনিময়ই আজ প্রদান করা হবে, যে (ধরনের) কাজ তোমরা করতে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فٰكِهِينَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنٰهُمْ بِفٰكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

১৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা অবশ্যই (আজ) জান্নাতের (সুরম্য) উদ্যানে ও (অফুরন্ত) নেয়ামতে অবস্থান করবে, ১৮. তাদের মালিক তাদের যা দেবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে, তাদের মালিক তাদের জাহান্নামের কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। ১৯. (তাদের আরো বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যেমন আমল করতে তার বিনিময়ে (পরিতৃপ্তির সাথে আজ এখানে) পানাহার করতে থাকো, ২০. তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় সমাসীন হবে, আর আমি সুন্দর সুন্দর চোখবিশিষ্ট সুন্দর হুরের সাথে তাদের মিলন ঘটিয়ে দেবো। ২১. যে সব মানুষ নিজেরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে, আমি (সেদিন জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা মাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতা মাতার) পাওনার কিছুই হ্রাস করবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে। ২২. (জান্নাতে) আমি তাদের এমন (সব ধরনের) ফলমূল ও গোশত (দিয়ে আহার্য) পরিবেশন করবো যা তারা পেতে চাইবে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, সেখানে কোনো অর্থহীন কথা (ও কাজকর্ম) থাকবে না এবং কোনো রকম অপরাধও থাকবে না। ২৪. তাদের চারপাশে তাদের (সেবার) জন্যে নিয়োজিত থাকবে কিশোর দল, যারা এক একজন হবে যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা। ২৫. তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (তাদের দুনিয়ার জীবনের) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে। ২৬. তারা (তখন) বলবে (হাঁ), আমরা তো আগে আমাদের পরিবারের মাঝে (সব সময় জাহান্নামের) ভয়ে জীবন কাটাতাম।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۝٢٧ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝٢٨ فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝٢٩ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝٣٠ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝٣١ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝٣٢ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٣٣ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝٣٤ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٣٥ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝٣٦ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَۜيْطِرُوْنَ ۝٣٧

২৭. (আর এ কারণেই আজ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর (এ সব নেয়ামত দিয়ে) অনুগ্রহ করেছেন, (সর্বোপরি) তিনি আমাদের (জাহান্নামের) গরম আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন। ২৮. আমরা আগেও আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতাম, (আমরা জানতাম) তিনি অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

রুকু ৩

২৯. অতএব (হে নবী, মানুষদের) তুমি (এ দিনের কথা) স্মরণ করাতে থাকো, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তুমি কোনো গণক নও, আবার তুমি কোনো পাগলও নও (তুমি হচ্ছো তাঁর বাণী বহনকারী একজন রসূল); ৩০. তারা কি বলতে চায়, 'এ ব্যক্তি একজন কবি এবং সে কোনো দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা সে অপেক্ষাই করছি।' ৩১. তুমি (তাদের) বলো, হাঁ, তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো; ৩২. ওদের জ্ঞান বুদ্ধিই কি ওদের এসব বলতে বলে, না (আসলে) ওরা (একটি) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়! ৩৩. (অথবা) এরা কি বলতে চায়, সে (রসূল) নিজেই (কোরআনের) এ কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে) এরা ঈমান আনে না, ৩৪. তারা (নিজেদের কথায়) যদি সত্যবাদী হয় তবে তারাও এ (কোরআনে)-র মতো কিছু একটা (রচনা করে) নিয়ে আসুক না! ৩৫. তারা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা (বলে যে, তারা) নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা; ৩৬. না তারা নিজেরা এ আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (আল্লাহ তায়ালার এ সৃষ্টি কৌশলে) বিশ্বাসই করে না; ৩৭. তাদের কাছে কি তোমার মালিকের (সম্পদের) ভান্ডার পড়ে আছে, না তারা নিজেরা (সে সম্পদের) পাহারাদার (সেজে বসেছে);

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ
الْبَنَٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ
عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ
الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنْ
يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ
يُلَٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৩৮. অথবা তাদের কাছে (আসমানে উঠার মতো) কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা (আসমানের অধিবাসীদের) কথা শুনে আসে? তাহলে তারা (আসমান থেকে) শোনা বিষয়ের ওপর সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ এনে হাযির করুক; ৩৯. অথবা (তোমরা কি আসলেই মনে করো যে,) সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ তায়ালার জন্যে আর তোমাদের ভাগে থাকবে শুধু ছেলেগুলো! ৪০. কিংবা তুমি কি (আল্লাহর বিধানসমূহ পৌঁছানোর বিনিময়ে) তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো, যা তাদের কাছে (দুর্বিসহ) জরিমানা বলে মনে হচ্ছে; ৪১. অথবা তাদের কাছে রয়েছে অদৃশ্য (জ্ঞানের এমন) কিছু যা তারা লিখে রাখছে; ৪২. না (এর কোনোটাই নয়), এরা (আসলে) তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আঁটতে চায়; (অথচ) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারাই (পরিণামে) ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়; ৪৩. আল্লাহ তায়ালার বদলে এদের কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? আল্লাহ তায়ালা তো এদের (যাবতীয়) শেরেকী কর্মকান্ড থেকে পবিত্র। ৪৪. যদি (কখনো) এরা দেখতে পায়, আসমান থেকে (মেঘের) একটি টুকরো ভেংগে পড়ছে, তাহলে (তাকে এরা আল্লাহর কোনো নিদর্শন মনে না করে) বলবে, এ তো হচ্ছে পুঞ্জীভূত এক খন্ড মেঘ মাত্র! ৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের ছেড়ে দাও এমন সময় পর্যন্ত– যখন তারা সে দিনটি স্বচক্ষে দেখে নেবে– যেদিন তারা হুশ জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়বে, ৪৬. সেই (সর্বনাশা) দিনে তাদের কোনো ষড়যন্ত্র (ও ফন্দি)-ই কোনো কাজে লাগবে না এবং সেদিন তাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না; ৪৭. যারা যুলুম করেছে তাদের জন্যে এ ছাড়াও (পার্থিব জীবনে) এক ধরনের আযাব রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (অবশ্যই) আমার চোখের সামনে আছো, তুমি যখন (শয্যা ত্যাগ করে) উঠো তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, ৪৯. রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ করো, আবার (রাতের শেষে) তারাগুলো অস্তমিত হবার পরও (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটি মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং পড়ার সময় পাঠকের অন্তর থেকে যাবতীয় পেরেশানী, সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং নানাভাবে আগত যেসব ভুল চিন্তা ও চেতনা, যা তার অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে–দূর হয়ে যায়, আর যেসব ওযর-অজুহাত দিয়ে এই মিথ্যার মায়াজাল তাকে অভিভূত করে রেখেছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে সরিয়ে রেখেছিলো তা খান খান হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সূরাটি এত গভীরভাবে অন্তরকে প্রভাবিত করে যে, কোনো পাঠকই এ প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে না, যার ফলে আল্লাহর কাছে সে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর হুকুম মানতে সে বাধ্য হয়ে যায়।

সূরাটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং হৃদয়ে গেঁথে যাওয়ার মতো বিভিন্ন আলোচ্য-বিষয় রয়েছে, এ উভয়ের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে এ বশীভূত করার ক্ষমতা। উপরন্তু এতে রয়েছে অর্থ ও শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ব্যাপকতা। আরও রয়েছে এর মধ্যে ছবির মতো আঁকা বিবরণসমূহ। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে সূরাটির মধ্যে এতো সুন্দরভাবে যে, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ে বর্ণিত কথাগুলো যেন সুরের এক মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনা পরম্পরা তাই পাঠকের হৃদয়কে দারুণভাবে অভিভূত করে। সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো যেন তীরবেগে পাঠকের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, ঘটনাবলী যেন বজ্রপাতের মতো এবং চিত্রের মতো আপতিত হয় আঁকা কথাগুলো যেন অনুভূতির দুয়ারে এমনভাবে কষাঘাত করতে থাকে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মুহূর্তও যেন তা থামতে চায় না।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যমীন ও আসমানের বিভিন্ন পবিত্র বিষয় ও জিনিসের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করার সাথে সূরাটি শুরু করছেন। সে বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের সুপরিচিত যা খোলাখুলি বাহ্যিক চোখে দেখা যায় এবং কোনো কোনোটি থাকে চোখের আড়ালে এবং মানব সাধারণের কাছে অপরিচিত ও বুদ্ধিরও অগম্য। এরশাদ হচ্ছে,

'কসম তূর পর্বতের এবং লিপিবদ্ধ কেতাবের, যা লিখিত হয়েছে সপ্রশস্ত কেতাবে। কসম বায়তুল মা'মুর-এর সমুন্নত ছাদের এবং উত্তাল সমুদ্রের।'

এখানে অতি ভয়ানক কিছু বিষয়ের কসম খাওয়া হয়েছে, যা অন্তরকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলে এবং অনুভূতিকে প্রবলভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে। সূরাটির ব্যাখ্যার মধ্যে 'ভয়' কথাটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর যেসব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তাতে দারুণভাবে হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমার মালিকের আযাব সংঘটিত হবে, কোনো কিছুই তাকে রোধ করতে পারবে না। সে দিন আকাশ ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে এবং পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত হয়ে ভীষণ গতিবেগে সঞ্চালিত হতে থাকবে।'

এ ভয়ংকর দৃশ্যের মধ্যে আমরা প্রবল কম্পনের একটা দৃশ্য দেখতে পাব এবং তার ভয়ানক আওয়াযও শুনতে পাব। চতুর্দিকে দেখা যাবে শুধু ধ্বংস-বিপর্যয়, প্রচন্ড ধাক্কা ও সব কিছু ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ভয়ংকর দৃশ্য। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং চরম ধ্বংস নেমে আসবে সেদিন সেইসব মিথ্যারোপকারীদের জন্য, যারা হেলায় খেলায় নানা প্রকার মিথ্যা কথা বলে। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এ-ই হচ্ছে সেই অগ্নিকুন্ড, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে এবং যার খবর দেয়ার কারণে তোমরা নবীদের মিথ্যাবাদী বলতে। কেমন, এটা কি কোনো জাদু? না তোমরা প্রকৃতপক্ষে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ না! যাও, প্রবেশ করো এর মধ্যে, সহ্য করতে পারো আর না পারো এর মধ্যেই ধৈর্য ধরে থাকতে হবে তোমাদের। সহ্য করো, আর না করো উভয় অবস্থা আজ তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের তো সেই সকল কাজের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে থেকেছো।'

পাপীদের প্রতি উপর্যুপরি যে আক্রমণ হবে তার শেষ পরিণতি হবে এই দোযখ। অবশ্য অন্য আরও অনেকভাবে কঠিন পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষমান থাকবে। অতি কঠিন ও ভয়ানক এ পরিণামের দিকে তাদের এগিয়ে যাওয়ার কারণ হবে তাদের বল্গাহারা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেপরোওয়া হয়ে যাওয়া। যখন দুনিয়াতে তারা নিরাপত্তা লাভ করেছে ও নানাপ্রকার বিলাসিতার উপকরণ লাভে ধন্য হয়েছে, তখনই কুপ্রবৃত্তির তাড়নে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কেয়ামতের সে ভয়াবহ দিনে তারা আশাভরা চাহনি নিয়ে তাকাতে থাকবে

নিরাপদ অবস্থানে থেকে নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাহদের দিকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নানা বর্ণের নানা প্রকৃতির ভোগ-বিলাসের অফুরন্ত উপকরণ ও সম্মানপ্রাপ্তি দেখে, আযাবে পতিত সে হতভাগারা লালায়িত হবে, সেসব নেয়ামতের প্রাচুর্য দেখে তাদের অনুভূতি ছটফট করবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহভীরু লোকেরা বাগ-বাগিচায় ভরা বেহেশতে এবং স্বয়ং আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতের মধ্যে মাতোয়ারা হয়ে থাকবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। তাদেরকে বলা হবে, 'খাও পান করো তৃপ্তির সাথে, যে সকল কাজ তোমরা (অতীতে) করেছো তারই বিনিময়ে এসব নেয়ামত তোমাদের জন্য দেয়া হচ্ছে। সারিবদ্ধ খাট-পালং-এ হেলান দিয়ে তারা আরামের সাথে উপবিষ্ট থাকবে।'

আল্লাহ তায়ালা আরও জানাচ্ছেন, আমি আয়ত-লোচনা সুন্দরী রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে দেব। আর যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে যে সকল সন্তান-সন্ততি তাদের অনুসরণ করেছে, তাদেরকে ওদের সাথে মিলিত করে দেব, তাদের নেক কাজকে কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। আমি তাদেরকে, তাদের চাহিদা মতো ফলমূল ও গোশত সরবরাহ করবো। শরবতের পাত্রগুলো তারা পরস্পর বিনিময় করতে থাকবে, যার মধ্যে কোনো মাদকতা, মাথাধরা অথবা বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়ার খারাবী থাকবে না। এসব পানপাত্র নিয়ে মতির মতো সুন্দর সুন্দর বালকের দল তাদের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকবে। বেহেশতীরা এই বলে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাবে, 'আমরা তো এর পূর্বেও এমনি করে

পরস্পরের প্রতি দরদী ও সহানুভূতিশীল ছিলাম, তাই না? এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি এই দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে প্রচন্ড উত্তপ্ত আগুনের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। অবশ্যই আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেছি, নিশ্চয়ই তিনি অতি মহান ও নেক কাজের প্রতিদান দেন এবং তিনি অতি মেহেরবান।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আলোচ্য সূরার মধ্যে প্রথমেই মানুষের সামনে আযাবের কষাঘাতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে যে, মানুষের অন্তর আল্লাহ্ পাকের অতুলনীয় নেয়ামতের স্বাদ অবশ্যই অনুভব করে এবং তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে, মানুষ এমনই এক জীব যে সে কোনো কিছু যেন বেশীদিন স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারে না, বরং নানা প্রকার পেরেশানী ও প্ররোচনা তাকে যেন তাড়িয়ে বেড়ায়, তার মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে থাকে এবং নানাপ্রকার ভ্রান্তির বেড়াজালে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। তখন সে বিবিধ হিলা-বাহানা ও ওযর-আপত্তি পেশ করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, অথচ পরিষ্কারভাবে তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সত্যের বাতিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। সত্যের বাণীকে এমন উত্তম যুক্তি সহকারে পেশ করা হয়েছে যে অন্য কোনো ব্যাখ্যা করে সত্য থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সত্য-সঠিক পথ হচ্ছে এমন সরল ও মযবুত পথ যে তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা মারপ্যাঁচ নেই। সত্যের জোরালো যুক্তির কাছে মানুষের ঘাড় আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়ে এবং পরিশেষে মেনে নিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, আর এ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই কথা বলার জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি মানুষকে সঠিক উপদেশ দিতে পারেন। যদিও রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে তারা চরম বেআদবী করে আসছিলো, তবু অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তাদের হৃদয় দুয়ারে বারবার আঘাত হানার জন্য রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি এ নির্দেশ ছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, (হে আমার নবী) উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তোমার রব-এর মেহেরবানীতে কোনো গনক নও এবং পাগলও নও। ওরা কি (তোমাকে) বলছে, ও তো নিছক একজন কবি, যার জন্য আমরা মৃত্যুসম কোনো এক (দৈব) দুর্ঘটনার অপেক্ষা করছি ? হে রসূল, (তুমিও) বলো, আমার ওপর এধরনের বিপদ আসুক তোমরা এ অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে সে বিপজ্জনক অবস্থার জন্য অপেক্ষা করছি.........তাঁর ক্ষমতায় কেউ অংশীদারি গ্রহণ করুক এ দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

মোটকথা, এইসব উপর্যুপুরি প্রশ্নের পেছনে একথা বলা রয়েছে, নবী (স.)-কে আঘাত দেয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত এই প্রশ্নবাণের মূলে কোন, ইচ্ছা কাজ করছে? হাঁ, এসব কটূক্তি দ্বারা তারা চাইছে যে, যে সত্য সমাগত হয়েছে তা বাতিল শক্তির এইসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে ময়দান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় এবং হিংসাত্মক কাজ করার সংগ্রামে তারাই বিজয়ী হোক, মোহাম্মদ (স.)-এর পয়গাম পৌঁছানোর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাক, সত্য প্রচারের আন্দোলন থেমে যাক এবং এর প্রচারক হাল ছেড়ে দিক। এর পেছনে সত্যের নিশানবর্দারকে নিস্তেজ করে দেয়ার অসৎ ইচ্ছা ও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব যে প্রকটভাবে রয়েছে তা সহজেই অনুভব করা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওরা কখনও আকাশের কোনো টুকরাকে পতিত হতে দেখে তখন বলে উঠে এটা তো নিছক ঘণীভূত এক খন্ড মেঘমালা'। কিন্তু 'আকাশ থেকে কোনো টুকরার স্খলিত হওয়া এবং মেঘমালার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সে সব কিছু জেনে-বুঝেও স্পষ্ট সত্যের বিরোধিতা করার অসদুদ্দেশ্যে তারা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলেছে।

এখানে তাদের প্রতি শেষ বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে, এ হচ্ছে প্রচন্ড এক ধমকের বাণ যখন এ ভয়ানক দৃশ্য তারা দেখবে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে আযাবের এই ধমক, আর এরই উল্লেখ হয়েছে সূরাটির শুরুতে, 'ছেড়ে দাও ওদেরকে সেই প্রলয়ংকরী চীৎকারধ্বনির আযাবের মধ্যে পতিত হওয়ার জন্য যখন তারা তার মুখোমুখি হয়ে যাবে। সে দিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোনো কাজেই লাগবে না এবং তাদেরকে কোনো দিক থেকে সাহায্যও করা হবে না।' এইভাবে এই রকম আরও একপ্রকার শাস্তির ধমক তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, 'যারা যুলুম করেছে তাদেরকে এ আযাব ছাড়া আরও একপ্রকার আযাব দেয়া হবে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখে না।'

এরপর কিছু নমনীয় ও সন্তোষজনক কথা দ্বারা সূরাটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে, ওরা রসূল (স.)-কে যে সব কথা বলতো তার উল্লেখ করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'ও তো একজন কবি, যার ওপর মৃত্যুসম কোনো বিপদ নেমে আসুক এরই অপেক্ষায় আমরা আছি।' ওরা নবী সম্পর্কে আরও বলতো, 'এ লোকটি একজন গনক বা জ্যোতির্বিদ অথবা পাগল।' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী (স.)-কে লক্ষ্য করে সম্ভ্রম ও সান্ত্বনার স্বরে এমন মধুর বচনে বলা হয়েছে যার কোনো নযির ইতিপূর্বে কোরআন করীমে পাওয়া যায়নি এবং কোনো নবী-রসূলকে এর আগে এই ভাবে সম্বোধন করাও হয়নি—'তোমার রব-এর পক্ষ থেকে আসা ফায়সালার অপেক্ষা করো, আমি বলছি, কিসের চিন্তা, যখনই তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তোমার রব-এর প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করবে এবং রাতের এক অংশে তাঁর নামের গুণ গাইতে থাকবে আর তখনও তাঁর প্রশংসায় তোমার কণ্ঠধ্বনি যেন সোচ্চার হয়, যখন তারকারাজি অস্তাচলে যায়।'

উক্ত মধুর বচন দ্বারা মেহেরবান পরওয়ারদেগার তাঁর প্রিয় নবীর ওপর দুশমনদের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণের প্রলেপ দান করছেন। অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আসা এ কথাগুলো রসূল (স.)-এর জর্জরিত হৃদয়ে এমন মধুর পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলো, যার কারণে শত্রু কর্তৃক উপর্যুপরি আঘাতের ঘা সহজেই শুকিয়ে গিয়েছিলো।

আল্লাহ্ তায়ালা তূর পর্বতের কসম খেয়ে বলছেন, 'কসম তূর পর্বতের, লিখিত আকারে আসা কেতাবের, ...।' (আয়াত ১-১৬)

এই ছোট ছোট আয়াতগুলো যা বড়ই মনোরম সংগীতের মতো অবতীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে মানুষদের কাছে গাওয়া হয়েছে। সূরাটির শুরুর দিক লক্ষ্যণীয়, এক একটি শব্দ উচ্চারণ করে তার কসম খাওয়া হয়েছে, তারপরই দুটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, তারপর একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে বারোটি কথায়। এই কথাগুলোতে শক্তিশালী একটি প্রসংগ বিধৃত হয়েছে।

তাফসীর

'ওয়াত্ তূর'—কসম তূর পর্বতের, যার মধ্যে বহু গাছপালাও রয়েছে। বরং আরও বেশী গ্রহণযোগ্য এই অর্থটি—যা কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে এবং যা মূসা (আঃ)-এর কেস্সাতেও বর্ণিত হয়েছে, এই প্রসংগে তার ওপরে কিছু ফলকও নাযিল হয়েছে। এ সময় বায়ুমন্ডলে যে পবিত্র অবস্থা বিরাজ করছিলো তার কসম খেয়ে আল্লাহ তায়ালা সেই মহা বিষয়টির উল্লেখ করছেন—যা শীঘ্র আসতে যাচ্ছে।

বিস্ময়কর কিছু জিনিসের কসম

কসম সেই লিখিত কেতাবের যা প্রশস্ত খোলাপাতায় রয়েছে। এ কথার দ্বারা মূসার কাছে প্রেরিত কেতাব-এর অর্থই বেশী গ্রহণযোগ্য, তা কয়েকটি ফলকে লিখিত আকারে নাযিল

হয়েছিলো, কারণ এ কেতাবের সাথে তূর পর্বতের সম্পর্ক আছে। অবশ্য এ বিষয়ে আর একটি অর্থ বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, 'লাওহে মাহ্ফূয' (সুরক্ষিত সেই মহা প্রশস্ত ফলক), আল্লাহ্ পাকের কাছে সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি খোলা অবস্থায় রয়েছে। এই ফলক ও এর পরবর্তী দুটি জিনিস চির আবাদ (মক্কা নগরে অবস্থিত কাবা) ঘর এবং সমুন্নত ছাদ সে ফলকের সাথে একই কাজে নিয়োজিত বলে মনে হয়। অবশ্য এ অর্থের সাথে আগের অর্থের তেমন কোনো বিরোধ নেই।

বায়তুল মা'মুর বলতে যদিও কা'বা ঘরকে বুঝানো হয়, কিন্তু আরও বেশী গ্রহণযোগ্য অর্থ হচ্ছে সেই ঘরটি যা মহাকাশে ফেরেশতাদের এবাদাতের জন্য বর্তমান রয়েছে, বোখারী ও মুসলিম শরীফে 'ইস্রা' সংক্রান্ত হাদীসে এসেছে, 'এরপর আমাকে বায়তুল মা'মূরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। আর সেটি এমন এক গৃহ যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে, যারা আর কখনও ফিরে আসে না। অর্থাৎ প্রবেশকারী প্রতিটি ফেরেশতার দল সেই গৃহে এবাদাত করে এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা যেমন করে কা'বাঘরের তাওয়াফ করে সে ঘরেও ফেরেশতার দল একইভাবে তাওয়াফ করে। এভাবে প্রতিদিনই একই সংখ্যক ফেরেশতার দল প্রবেশ করে চলেছে।

আর সমুন্নত ছাদ কি? এ হচ্ছে আমাদের মাথার ওপরে অবস্থিত আকাশ। এ বিষয়ে সুফিয়ান ছওরী, শো'বা এবং আবুল আহ্ওয়াস সাম্মাক ইবনে খালিদ ইবনে আ'রআ'বার বরাত দিয়ে হযরত আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তারপর রসূলুল্লাহ্ (স.) পড়লেন, 'আমি মহাকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে বানালাম, কিন্তু ওরা আমার এসব নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (ইচ্ছা করেই দেখল না)।'

এরপর কলম খাওয়া হয়েছে উত্তাল তরংগাভিঘাতে উন্মত্ত মহাসাগরের, অর্থাৎ পরিপূর্ণ এ মহাসমুদ্রের। আলোচ্য অংশে আকাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই মহাসাগরের উল্লেখ বড়ই উপযোগী, কেননা মহাকাশের পূর্ণত্ব ও প্রশস্ততার সাথে অকূল সমুদ্রের পূর্ণত্ব ও প্রশস্ততার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। এ এমন একটি আয়াত যার মধ্যে যেমন রয়েছে ভয়, তেমনি রয়েছে ভয় সৃষ্টি করার মতো উপাদান। আলোচ্য বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য এই দুটি জিনিসেরই সমধিক গুরুত্ব রয়েছে, 'মাস্জুর' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়, জ্বলে উঠা ও বিস্ফোরিত হওয়া। যেমন অপর আর একটি সূরাতে বলা হয়েছে, (স্মরণ করে দেখো সে সময়ের কথা, যখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, অথবা সমুদ্রে আগুন লেগে তা বিস্ফোরিত হবে। এভাবে আর একটি সৃষ্টির দিকে ইশারা করা হয়েছে, যেমন, 'বাইতুল মাফূ'-অর্থাৎ সমুন্নত ঘরটি, এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝানোর উদ্দেশ্যে মহাসৃষ্টির কসম খেয়েছেন, যাতে করে আমাদের অনুভূতিসমূহ বর্ণিত এসব ঘটনা অনুভব করে এবং এই তীব্র অনুভূতির মাধ্যমে আগামীতে যে মহা বিষয়টি সংঘটিত হবে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এরশাদ হচ্ছে,

অবধারিত আল্লাহর আযাব

'নিশ্চয়ই, তোমার রব-এর (পক্ষ থেকে) আযাব আসবে। কেউ সেই আযাবকে রুখতে পারবে না।'

সে অবস্থাটি অবশ্যই আসবে। কেউই সে আযাব আসাকে বন্ধ করতে পারবে না। পৃথক পৃথকভাবে এই দুটি ঘটনা সংঘটিত হওয়াটা অকাট্য সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী। এর বর্ণনাভংগি অনুভূতির দুয়ারে আঘাত হেনে বলে, অবশ্যই এ ভয়ানক ঘটনার আগমন অকাট্য সত্য, তা যখন আসবে তখন সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সে অবস্থা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না বা সে অবস্থাকে কেউ রুখতেও পারবে না। এ ভয়ানক ঘটনার অনুভূতি যখন মানুষের হৃদয়পটে

অপ্রতিরোধ্যভাবে আঘাত হানে, তখন তার গোটা সত্তা প্রচন্ডবেগে কেঁপে উঠে এবং তাকে যেন এই অনুভূতি ভেংগে চুরমার করে দেয়। এ প্রসংগে হাফেয আবু বকর ইবনে আবিদ্দুনিয়া একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত 'ওমর (রা.) রাতের বেলায় সংগোপনে প্রজাদের খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে বেরুলে এক রাতে মদীনার শহরে এলেন। অতপর তিনি একজন মুসলিম ব্যক্তির ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, শুনতে পেলেন, ভেতর থেকে নামাযের মধ্যে কোরআন পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। পড়া হচ্ছিল, সূরায়ে 'ওয়াত তূর'। যখন সে ব্যক্তি এই আয়াত পড়লেন, 'তোমার রব-এর আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে, তা থামাবার মতো কেউই নেই', তখন লোকটি বলে উঠল, 'কা'বাঘরের রব-এর কসম- একথা অবশ্যই সত্য।' একথা শোনার সাথে সাথে ওমর (রা.) তাঁর গাধার পিঠ থেকে নেমে বহুক্ষণ ধরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বাড়িতে ফিরে এলেন। এরপর তিনি মাসাধিককাল সময় শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। এ সময়ে কত মানুষ তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করতে ও দেখতে এলো। কিন্তু কেউ তাঁর রোগ নির্ণয় করতে পারলো না।'

ওমর (রা.) ইতিপূর্বে সূরাটি বহুবার অন্যকে পড়তে শুনেছেন, নিজেও পড়েছেন। এ সূরা তিনি নামাযেও অনেকবার পড়েছেন। রসূলুল্লাহ (স.)-ও মাগরেবের নামাযে প্রায়ই এ সূরাটি পড়তেন তাই ওমর (রা.) এ সূরাটি অবশ্যই জানতেন এবং বহুবার এ স্যারাটি পড়েছেন এবং পড়ার সময় অনেক দীর্ঘ নিশ্বাসও ছেড়েছেন। কিন্তু সে রাতে, কি জানি কী হলো, তাঁর অন্তরের ওপর কী আজব আছর হলো, তাঁর হৃদয়ানুভূতি যেন খুলে গেলো, যার ফলে সূরাটি তাঁর ওপর দারুণ ক্রিয়া করলো এবং তাঁর অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে, তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আসলে এ সময়ে তিনি এ সূরার মধ্যে ব্যক্ত কথাগুলোর চাপ সহ্য করতে পারেননি। এর মধ্যে বর্ণিত কথাগুলোর তাৎপর্য তার হৃদয়ে সরাসরি প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর হৃদয়কে গলিয়ে দিয়েছিলো এবং তিনি অনুভব করেছিলেন সূরাটি মূল উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে এসে যেন তাঁর হৃদয়-দুয়ারে এই বিশেষ মুহূতটিতে আঘাত হেনেছিলো। এর ফলে হৃদয়ের অন্তস্তলে তা গভীরভাবে ক্রিয়া করেছিলো। এ ক্রিয়া ছিলো (মূলত) প্রত্যক্ষ এক স্পর্শ। রসূলুল্লাহ (স.)-এর হৃদয়কে এসব আয়াত যেমন করে স্পর্শ করতো, সেই রকমই এক গভীর ও প্রত্যক্ষ স্পর্শ তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিলো। যারা আয়াতের এই অংশটি খেয়াল করে পাঠ করে তাদের ওপরেও এই ধরনের অনুভূতি অবশ্যই কিছু না কিছু প্রতিফলিত হবে যেমন করে ওমর (রা.)-এর অন্তরে এসেছিলো।

কেয়ামতের দিন আকাশ ও পাহাড়ের অবস্থা

এরপর আরও অধিকতর ভয়ংকর একটি ঘটনার বর্ণনা আসছে, 'যে দিন ভয়ানকভাবে আকাশ আন্দোলিত হতে থাকবে এবং পর্বতমালা (নিজ নিজ স্থান থেকে) উৎখাত হয়ে যাবে।'

স্থির আকাশের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন আসার জন্য প্রয়োজন এক মহাশক্তির যা মহাকাশকে অস্থির করে দিতে পারে এবং তার চেহারাকে ওলট-পালট করে দিতে পারে—যেমন করে প্রচন্ড তুফান মহাসাগরের অথৈ পানিকে তোলপাড় করে ফেলে এবং উত্তাল তরংগ শান্ত সাগরের চেহারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। আবার তাকিয়ে দেখুন, সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পাথরের পাহাড়গুলো চালিত হওয়ার দৃশ্যের দিকে, কেমন করে এগুলো হালকা হয়ে যাবে এবং স্থানচ্যুত হয়ে প্রচন্ডবেগে সঞ্চালিত হতে থাকবে। এসব দৃশ্য মানুষের বুদ্ধিকে হতভম্ব করে দেয় এবং হৃদয়ের মধ্যে প্রচন্ড এক কম্পন সৃষ্টি করে। এসব বর্ণনা যখন আমাদের সামনে আসে, তখন

প্রচন্ড বেগে আকাশের মধ্যে আন্দোলন হওয়ার ঘটনা বুঝা কিছুটা সহজ হয়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবীর বুকে যখন এই ভীষণ অবস্থা সংঘটিত হবে, তখন ধরণীর বক্ষে অবস্থিত এই তুচ্ছ ও অতি দুর্বল মানবকুলের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!

কেয়ামত অস্বীকারকারীদের ভয়াবহ অবস্থা

এই প্রলয়ংকর ও ভীষণ ভীতিজনক অবস্থাতে যখন কিছুই স্থির হয়ে থাকতে পারবে না এবং প্রচন্ড গতিবেগে যখন সব কিছু সঞ্চালিত হতে থাকবে, তখন সে দিনকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা আরও মারাত্মক হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং নিদারুণ দুঃখ সেদিন নেমে আসবে তাদের জন্য, যারা রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী বলে দাবী করতো, যারা খেলাচ্ছলে (রসূল (স.)-কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে) নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষণ এবং দুঃখের ডাক দেয়ার অর্থই হচ্ছে তাদের প্রতি দুঃখ নেমে আসার ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া। সুতরাং হঠকারী, বিদ্রোহী, সত্যকে জেনে বুঝে অস্বীকারকারী ও রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রচন্ড বেদনাদায়ক কষ্ট আসাটা অবধারিত। এ কঠিন অবস্থাকে কেউই ঠেকাতে পারবে না। সেদিন আসবেই আসবে। এই দুঃসহ অবস্থায় যেদিন আকাশ ভীষণভাবে আন্দোলিত হবে এবং পর্বতমালা প্রচন্ড গতিবেগে সঞ্চালিত হতে থাকবে। আর এ কারণেই এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে সর্বগ্রাসী ভয় মানুষকে ঘিরে ফেলবে এটা স্বাভাবিক। আর বিশেষভাবে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে এই ভয় স্থায়ীভাবে এসে গ্রাস করবে, 'যারা হেলা ও খেলাচ্ছলে নবী (স.)-কে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছে।

নবীকে উপহাস বিদ্রূপ করা প্রথমত মোশরেকদেরই বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই বহিপ্রকাশ। যেসব ভুল বিশৃঙ্খল এবং অর্থহীন চিন্তাধারার মধ্যে তারা ডুবে ছিলো তারই কারণে দয়ার নবী, সর্বগুণে গুণান্বিত ও পরম দরদী নবী (স.)-কে তারা নিষ্ঠুর বাক্যবাণে কষ্ট দিয়েছে। তাদের হেলা খেলার জীবন, অসংলগ্ন আচরণ এবং স্বার্থপরতায় অন্ধ তাদের এই নিষ্ঠুর জীবন গোটা সমাজকে অতল তলে তলিয়ে দেয়, এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের আওতায় এনে তারা গোটা মানবদেহকে দুঃখ-বেদনায় ভরে দেয়। এ বিষয়গুলো কোরআনের বহু জায়গায়ই উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো সবই তাদের অর্থহীন এক খেলা, প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। যেসব জিনিস নিয়ে তারা মেতে থাকে তা হচ্ছে এমনই এক খেলা যার সাথে সেই সাঁতারুর তুলনা করা যায় যে পানিতে লক্ষ্যহীনভাবে সাঁতার কেটে বেড়ায়, যার কিনারায় উঠার কোনো খেয়াল থাকে না। অবশেষ যে চরম শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পানিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এধরনের সাঁতারু না নিজের কোনো উপকার করতে পারে, না তার এই আচরণে অন্য কেউ উপকৃত হয়।

সৃষ্টিজগত সম্পর্কে জড়বাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা

কিন্তু যখনই এই মোশরেক ব্যক্তি ইসলামী চিন্তাধারা বহির্ভূত অন্য চিন্তা-চেতনার আলোকে নিজের কার্যকলাপকে সত্য ও কল্যাণকর বলতে চায়, তখনই তার চিন্তার অসারতা তার কাছে ধরা পড়ে বিশেষ করে যখন সে তার সকল চিন্তা-চেতনা তখন বিষয়টা তার কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। মানুষের অস্তিত্ব ও অন্যসব সৃষ্টির কল্যাণের নিরিখে ইসলামী চিন্তাধারার সাথে তুলনা করবে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি ব্যবস্থার ভাল-মন্দ ও উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা পরীক্ষা করে

দেখলেই কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা প্রতীয়মান হয়ে যাবে। এমনকি দার্শনিকদের ইতিহাসে যারা খ্যাতিমান বলে পরিচিত সেই সকল দার্শনিকের কাছে মানবরচিত এসব চিন্তাধারা নিছক ছেলেখেলা বলে মনে হয়েছে। যেহেতু সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে তারা অসীম বিশ্বের রহস্যরাজি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছে এবং নিজেদের সংকীর্ণ বুদ্ধি বলে সত্যকে উদ্ঘাটনের চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছে। যে সকল সত্য ইসলামী মতবাদে বিধৃত হয়েছে, বিশেষ করে কোরআন মজীদে উল্লিখিত হয়েছে , তা অবশ্যই নিখুঁত ও সব কিছু থেকে সুন্দর সুবিস্তীর্ণ ব্যাপক ও সুগভীর অর্থব্যঞ্জক। সে ব্যবস্থা যে প্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল এ কথা বুঝতেও কোনো কষ্ট পেতে হয় না। এ কথা বিনা চেষ্টাতেই বুঝা যায় এবং কোনো প্রকার অস্পষ্টতাও এখানে নেই, কেননা এ সত্য সত্যের সেই মূল শেকড়ের সাথে বাঁধা রয়েছে, যেখান থেকে মূল সত্য উৎসারিত হয়েছে এবং সেই মূল থেকেই গোটা সৃষ্টির অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এ কাজ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজেই করছেন এবং তাঁর ইচ্ছাই সবখানে কার্যকর রয়েছে। তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু চলছে।

এ বিষয়ের ওপর যতবারই আমি চিন্তা করেছি মোশরেক মিথ্যার ধ্বজাধারী নেতৃবৃন্দের আচরণে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি। বড় বড় দার্শনিকের চিন্তাধারা আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। দেখেছি, তারা লাগামহীনভাবে চিন্তা করতে গিয়ে অযথাই কষ্ট পাচ্ছে। তারা এই সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এবং সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টায় তেমনি গবেষণা করে চলেছে, ঠিক যেমন করে ছোট এক বাচ্চা কোনো জটিল অংকের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। অথচ আমাদের সবার সামনে রয়েছে আল্ কোরআনের সুস্পষ্ট চিন্তাধারা, যা অবিমিশ্র সত্য, সহজ এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের কোনো জটিলতা বরং তা সরল ও স্বাভাবিকভাবে জীবনের সকল বিষয়ের মীমাংসা করে দেয়। তার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই, নেই কোনো গোঁজামিল বা অস্পষ্টতা এবং এমন কোনো জটিলতা এতে নেই যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পাক কালামের মধ্যে উপস্থাপিত কথাগুলো সবই আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সাম স্যপূর্ণ। এই বিশ্ব-প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা কোরআন দিয়েছে তা হচ্ছে স্বয়ং এর সৃষ্টিকর্তা ও নির্মাতার নিজস্ব ব্যাখ্যা। এর প্রকৃতি কি এবং সব কিছুর পারস্পরিক সম্পর্কই বা কি তা তিনিই আমাদের জানিয়েছেন। অথচ সীমাবদ্ধ বয়সের, সীমাবদ্ধ জ্ঞান, বুদ্ধি ও দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকদের সমীক্ষায় অতি অল্প কিছু রহস্য ধরা পড়ে যার ওপর জ্ঞান-গবেষণা চালাতে গিয়ে জীবনভর তারা শুধু হোঁচটই খেতে থাকে। তাদের সীমাবদ্ধ চেষ্টা-সাধনার ফল একইভাবে সীমাবদ্ধই হতে বাধ্য।

জীবনের মূল্যায়ন ও কোরআনের দৃষ্টিভংগী

আল কোরআন যখন মানব কল্যাণের লক্ষ্যে পরিপক্ক চিন্তাধারা ও পূর্ণ জীবনদর্শন পেশ করছে, তখন বিদগ্ধ ব্যক্তিদের কাছে এসব দার্শনিকের জ্ঞান-গবেষণা এবং অলীক চিন্তা, জগাখিচুড়ি সাধনা ও কষ্ট-কল্পনা সবই মিথ্যা বলে প্রতিভাত হবে, তখন তারা সেসব নিষ্ফল ক্রটিপূর্ণ, অবাস্তব ও অসম্ভব প্রয়াস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে এবং তখনই তারা তাদের সেই সব জ্ঞান-সাধনা প্রত্যাখ্যান করবে যা কোনো দিন পরিপক্বতা লাভ করবে না কিংবা তা পরিপূর্ণ উৎকর্ষ বয়ে আনতে পারবে না।

জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে মানুষ পেরেশান হয়েছে, লাগামহীন চিন্তা-গবেষণা করতে গিয়ে বরাবর তারা শুধু কষ্টই পেয়েছে, বিপরীতমুখী চিন্তাধারার জালে আবদ্ধ হয়ে তারা

বিভ্রান্ত হয়েছে এবং ক্রটিপূর্ণ চেষ্টায় শুধু সময়ের অপচয়ই করেছে। এরপর আল-কোরআনের আয়াতে পেশ করা দাওয়াত পেয়ে তারা একদিন সচকিত হয়ে উঠেছে। তারপর তাদের দীর্ঘদিনের পেরেশানীর ব্যাপারে যখন তৃপ্তিজনক সমাধান খুঁজে পেয়েছে, তখন হেদায়াতের এ নূরকে তারা সাদরে আলিঙ্গন করেছে। তারা দেখতে পেয়েছে এ মহাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ ইনসাফের বিধান। প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ স্থানে সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত। প্রতিটি বিষয় স্বস্থানে সমাদৃত এবং প্রত্যেকটি সত্য বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সাথে দিক-নির্দেশনা দিয়ে চলেছে। সেখানে কোনো অস্থিরতা নেই, নেই কোনো দোদুল্যমান অবস্থা। এসব সত্যসন্দর্শনে তাদের মন বড়ই আরাম বোধ করেছে, তাদের মেজাজ শান্ত হয়েছে এবং তাদের বুদ্ধি প্রশান্তি লাভ করেছে, এটা এই কারণে যে, স্পষ্ট সত্যপ্রাপ্তির প্রয়াসে তারা সফল হয়েছে। তারা অন্তর থেকে বিগত জীবনের সকল প্রকার অস্পষ্টতা ও পেরেশানীকে ঝেড়ে-মুছে ফেলতে পেরেছে এবং তাদের জীবনের সকল বিষয় এখন স্থির হয়ে গেছে।

আল কোরআনের উজ্জ্বল আভায় তিমিরাচ্ছন্ন মানুষগুলো যখন সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে, তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এতদিন তারা সত্যিই অন্ধ বিশ্বাসের পংকিলতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবেছিলো এবং জীবনের অমূল্য সময় তারা হেলায় ও খেলায় কাটিয়ে দিয়েছে। আজ তারা ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এই যে সত্য মতাদর্শ তাদেরকে প্রিয় বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে এতে তারা ধন্য। আজ ইসলামের ছায়াতলে এসে তারা সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পেয়েছে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তারা নিয়োজিত হতে পেরেছে এই পরম তৃপ্তিতে তারা পুলকিত। তাদের কাছে জাহেলিয়াতের যাবতীয় পেরেশানী ও ভ্রান্ত পরিচালনার কথা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। মুসলমানরাও নয়ন-ভরে দেখছে, যারা মতাদর্শের পাথর্ক্যের কারণে দূরে ছিলো এবং বৈরীভাব পোষণ করছিলো তারা ধীরে ধীরে তাদের সাথে শামিল হয়ে যাচ্ছে, বরং তাদের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের হারানো সম্মান আবার ফিরে আসছে এবং তাদের সাথে যখন কথা বলছে তখন ইসলামের বিশ্বজনী তাকে তারা যেন স্বীকার করে নিচ্ছে! মুসলমানরা সেইভাবে খুশীর সাথে তাদের দিকে তাকাচ্ছে যেমন করে কোনো অনুষ্ঠানে মিষ্টি-মন্ডা ও কোরবানী করা পশুর দিকে বাচ্চারা খুশীর সাথে তাকিয়ে থাকে। তারা ভাবে, এই তো মজার মজার খাবার তৈরী হয়ে আসছে আরএই আশাতেই তারা গান, বাজনা ও খেলাধুলায় সময় কাটাতে থাকে।

মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য এবং বিশ্ববাসী সবার প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু জরুরী, ইসলাম অবশ্যই ততটুকু দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিপদ আসার পরও ইসলাম ততটাই তা দূর করার উদ্যোগ নেয় যতটা মানুষের জন্যে অস্তিত্বের প্রয়োজন আর ততদিন ইসলাম মানুষকে দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখতে চায় যতদিন তার মধ্যে মৃত্যুর পরে আসা প্রশ্নাবলীর জওয়াব দেয়ার যোগ্যতা পয়দা না হয় ততোদিনই তার প্রয়োজন। সে প্রশ্নগুলো হচ্ছে, 'কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি এবং কোথায় যাবো?'

এসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে মানুষের নিজের ও গোটা সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বের প্রয়োজনে ইসলাম বিশেষ এক সীমারেখা টেনে দিয়েছে। আসলে মানুষ সৃষ্টির সব কিছু থেকে পৃথক, নতুন কোনো এক জীব নয়, বরং সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে সেও একজন, তা সে যেখান থেকেই আসুক না কেন। তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে সে সবার সাথে একজন শরীকদার হিসেবে থাকতে বাধ্য। যে সময় তার সৃষ্টিকর্তার মেহেরবানী হবে এবং তাকে তিনি তুলে নিতে চাইবেন, সেই সময়েই তুলে

নেবেন। সুতরাং গোটা সৃষ্টির প্রয়োজনেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জওয়াব হতে হবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই জওয়াবের মধ্যে তার নিজের যাবতীয় সম্পর্ক এবং অন্য সকল মানুষের সম্পর্কের কথাও নিহিত থাকতে হবে। আরও থাকতে হবে এ জওয়াবের মধ্যে সর্বসাধারণের সাথে সম্পর্কের কথা এবং সবার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের কথাও।

গোটা মানব জীবনে যেসব দুঃখ-কষ্ট বিরাজ করছে তার মধ্যে ওপরে বর্ণিত ব্যাখ্যারই মোটামুটি প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি মানুষকে তার সঠিক অবস্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিয়েছেন। আর এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বহু দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রেখেছেন। মুসলমানকে এই মহা সৃষ্টির মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে তাই এব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ জন্য তাকে সাধারণ খেলোয়াড়দের মতো তুচ্ছ দুঃখ-কষ্টভারে নুয়ে পড়লে চলবে না। বরং সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাকে মর্দে মোজাহিদের মতো মযবুত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানুষের মধ্যে মুসলমানদের জীবন আসলেই এক মহৎ জীবন। অর্থাৎ মহৎ এক উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা বিশ্বের অস্তিত্বের সাথে তার যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পৃক্ত। তার সকল ব্যবহার ও কাজকর্মের প্রভাব পড়ে এই মহা-বিশ্বের ওপর। তার আত্ম-সম্ভ্রমবোধের দাবী হচ্ছে, সে তার সময়, মনোযোগ, কার্যকলাপ ও জ্ঞান-গবেষণাকে কোনো হেলা ও খেলার বস্তু বানাবে না। মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য মানুষকে অর্থাৎ মুসলমানকে (যে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হয়েছে)–সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন এ মহান উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সে আত্মনিয়োগ করে, তখন তার যাবতীয় কর্মকান্ডের তুলনায় অন্যদের সমস্ত কাজ ও ব্যবহার তুচ্ছ, অর্থহীন ও বেফায়দা বলে মনে হয়। (১)

সেদিন যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

চরম দুর্দশা এবং আল্লাহর অভিশাপ সেসব দার্শনিক বুদ্ধিজীবীর জন্য যারা নানাপ্রকার মনগড়া কথা ও চিন্তাভাবনায় বিভোর রয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি নানা কটাক্ষপাত করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো সেই দিনের কথা যেদিন তাদেরকে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা মেরে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।'

এ দৃশ্য হবে সত্যিই বড় ভয়াবহ। ধাক্কা মারার এই শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হবে আর এটা হবে এ জ্ঞানপাপী মূর্খদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি,

যারা প্রকৃতপক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল করে না, হিসাব করে দেখে না যে, এ মহা সৃষ্টির বুকে চলমান ঘটনাবলী কোন্ মহা শক্তির ইশারায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে তাড়িয়ে যাওয়া হবে, তাদের পিঠে প্রচন্ড ধাক্কা মারা হবে। এইভাবে ধাক্কা মারতে মারতে তাদেরকে যখন আগুনের একেবারে কিনারায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে, তখন বলা হবে, 'এই যে সেই আগুনে ভরা জাহান্নাম যাকে তোমরা অস্বীকার করতে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-কে মিথ্যাবাদী বলে গালি দিতে।' এই কঠিন দুঃখজনক অবস্থায় তাদের পড়তে হবে এটা তারা কোনো দিন কল্পনাও করেনি। মূলত তাদের ইচ্ছা-ইখতিয়ারের বাইরেই এ কঠিন শাস্তি প্রদত্ত হবে। পার্থিব জীবনে তাদের অস্বীকৃতি, হঠকারিতা ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিদানস্বরূপ

---

(১) আরো ব্যখ্যার জন্য আমার 'ফিকরাতুল ইসলামি আনিল কওনে আল হায়াতিল ইনসানে।' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য

অপমানজনক শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত থাকবে। বলা হবে, 'কেমন লাগছে, এটা কি যাদু বলে মনে হয়, না তোমরা চোখে এ অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না?' এ কথাগুলো বলা হবে এজন্য যে তারা কোরআন সম্পর্কে বলতো এটাত যাদু, তাহলে এখন যে আগুন তারা দেখছে তাও কি যাদু? না এটা সেই ভয়াবহ ও কঠিন সত্য? না তারা এ অবস্থাকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, যেমন করে কোরআনুল করীমে বর্ণিত সত্যকে তারা দেখতে পেতো না!

এইসব তিরস্কার ও আযাবের হুমকি দেয়ার পর অবিলম্বে তাদেরকে ধাক্কা মেরে আগুনে ফেলে দিয়ে বলা হবে, 'দাখিল হয়ে যাও তোমাদের উপযুক্ত স্থানে, সহ্য হোক আর না-ই হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না, এখানেই তোমাদের থাকতে হবে। তোমাদের কৃতকর্মের ফলই তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।'

যখন কেউ জানতে পারে যে, শাস্তি এসে পড়ার পর 'সহ্য করি আর না-ই করি, কোনো ছাড়াছাড়ি নাই', তখন তার অবস্থা কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া পশুর মতোই হয়ে যায়। অতএব এ অবস্থা যখন এসে যাবে তখন শাস্তি হবেই, সে আযাব কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। এ অবস্থাতে সবর করলেই বা কি, আর না করলেই বা কি, কষ্ট যা হওয়ার তা তো হবেই। যত অস্থিরই হোক না কেন, সে আযাবের সময় তো পূর্ব থেকে নির্ধারিত রয়েছে। এ পরিণতির কারণ তো এই যে, এটা তার কৃতকর্মের প্রতিদান। যে কারণে এ প্রতিদান সে পাবে তা তো সে নিজেই ইচ্ছা করে ঘটাচ্ছে, সুতরাং তার পরিবর্তন বা এ আযাব দূর হয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এই দৃশ্যের বিবরণ দান করার পর এই ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা শেষ হচ্ছে, একই ভাবে সূরায় বর্ণিত প্রথম কথাগুলোর উদ্দেশ্যও এখানে শেষ হচ্ছে।

যারা সেদিন পরম আনন্দে থাকবে

আলোচ্য সূরায় বর্ণিত কথাগুলোর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের অনুভূতিতে তাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে রেখাপাত করানো। কিন্তু সূরাটিতে দুঃখের সাথে, আরাম-আয়েশ ও আনন্দধ্বনি উচ্চারণের কথাও এসেছে। এমন সুখ-সম্ভোগের বিবরণ এসেছে যার কোনো তুলনাই হতে পারে না। বিশেষ করে সে কঠিন আযাবের বিবরণ দানের পর যখন নেয়ামতের বিবরণ আসে, তখন তা বড়ই মধুর লাগে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ-ভীরু লোকেরা থাকবে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত (বাগ-বাগিচা) সমূহে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তাতে তারা আনন্দে বিভোর থাকবে এবং তাদের রব তাদেরকে বাঁচিয়ে নেবেন জাহান্নামের আযাব থেকে। বলা হবে, 'খাও, পান করো তৃপ্তির সাথে—এইছে তোমাদের সেই সকল কাজের প্রতিদান যা তোমরা (পৃথিবীর বুকে) করতে থেকেছো। ওরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাটের ওপর তাকিয়ায় আরামছে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। আর তাদের সাথে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের বিয়ে দেব।' ১৭ ও ১৮ নং আয়াতেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে।

যে সব নেয়ামতের দৃশ্যের কথা ওপরে বলা হলো, তা যে কোনো ব্যক্তির অনুভূতির কাছেই বোধগম্য। যে সব নেয়ামতের স্বাদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এ পরিচ্ছন্নতার উল্লেখ হয়েছে সে কঠিন আযাবের উল্লেখের পাশাপাশি যা ছিদ্রান্বেষণকারী এবং বিদ্রূপকারীদেরকে দেয়া হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভীরুরা থাকবে নেয়ামত ভরা জান্নাতসমূহে। তাদের রবের কাছে থেকে যে প্রতিদান তারা পাবে তাতে তারা খুশীতে বিভোর থাকবে এবং তাদেরকে তাদের রব জাহান্নামের আযাব থেকে অবশ্যই বাঁচিয়ে নেবেন।'

আসলে আল্লাহ পাকের মেহেরবানী ও নেয়ামতের কারণেই তারা সাধারণভাবে আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তারপরও জান্নাতের বাগবাগিচাসমূহ এবং নানাপ্রকার নেয়ামত দেয়া হবে–একথার অর্থ কি হতে পারে? এর অর্থ হচ্ছে, তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তার স্বাদ তারা আকণ্ঠভাবে গ্রহণ করবে এবং আনন্দ-উল্লাসে তারা মেতে থাকবে।

জান্নাতের অপরিসীম নায-নেয়ামত

এসব নেয়ামত, স্বাদযুক্ত ফলমূল, সম্মান ও সাদর সম্ভাষণের সাথে বলা হয়েছে, 'খাও, পান করো পরম পরিতৃপ্তির সাথে, তোমরা যা কিছু করে এসেছো তার প্রতিদান হচ্ছে আজকের এই আপ্যায়ন।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে এইভাবে যে মেহমানদারী করা হবে, তা-ই তাদের মর্যাদাপ্রাপ্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দিয়ে ডাকা হবে এবং যে অধিকার ও নেয়ামত তাদেরকে দেয়া হবে আজকে তারই ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাট-পালং-এ তারা আরামে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। এইসব আদর-আপ্যায়ন, নেককার লোকদের মান-মর্যাদার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হবে। এই নেয়ামত ভরা পরিবেশে তারা ভাই-বেরাদরের সাথে থাকার মজা পাবে। আরও ওয়াদা দেয়া হয়েছে,

'আমি তাদের সাথে বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট হুরদের বিয়ে দেবো' মানুষ সৌন্দর্যের যে নেয়ামত সব থেকে বেশী পছন্দ করে তাই ওখানে দেয়া হবে।

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এই সম্মান দানের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাদের নেক সন্তান-সন্তুতিদেরকেও তাদের সাথে (এসব নেয়ামতের মধ্যে) মিলিত করে দেয়া হবে। এটা হবে তাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অতিরিক্ত পুরস্কার-এর একটি বিশেষ নিদর্শন। তাদের সন্তানরা তাক্ওয়া-পরহেযগারীর মানদন্ডে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও শুধু ঈমানদার হওয়ার সুবাদে এই বিশেষ এহ্সান দান করা হবে, আর এই কারণে সে পিতামাতাদের পুরস্কার বা মর্যাদা থেকে কোনো কিছু হ্রাস করা হবে না, আর এজন্য তাদের অনুসারীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতারও প্রয়োজন হবে না, বা কারও কোনো কিছুর বদৌলতে এ নেয়ামত দেয়া হবে তা নয়। নিছক আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতেই তাদেরকে এই মহামূল্যবান মর্যাদা দান করা হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার হবে তাদেরকে আমি তাদের সাথে মিলিয়ে দেবো এবং এ কারণে তাদের সৎকর্ম থেকে কোনো কিছু কমিয়ে দেবো না এবং যে কোনো ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করবে তার জন্য সেই দায়ী হবে।'

আলোচনার ধারাতে অন্য দৃশ্য সামনে আসছে, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের ভান্ডারে রকম বেরকমের নেয়ামত এবং প্রাণ-মাতানো স্বাদযুক্ত বিভিন্ন জিনিসের বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। দুনিয়ায় মানুষ যা কামনা করে তারই অনুরূপ ফলমূল এবং চাহিদামতো গোশত থাকবে, আর তারা পরস্পর পানপাত্র বিনিময় করবে, যাতে কোনো মাদকতা থাকবে না, যা দুনিয়ার মদের মধ্যে মানুষ প্রত্যক্ষ করে। এ পানীয় পান করে কারও বুদ্ধি নষ্ট হওয়া অথবা আবোল-তাবোল বকাবকি করার মতো বিভ্রান্তিকর কোনোটিই এতে থাকবে না। সাধারণত দুনিয়ায় মানুষ যে সুরা পান করে তাতে মানুষের হুশ নষ্ট হয়, হাত পাগুলো নিসাড় হয়ে যায়, আবার অনেক সময় যৌন অনুভূতি তীব্রতর হয় যার কারণে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না এবং একারণে লজ্জাকর কাজের প্রসার ঘটে। আল্লাহ পাকের সরবরাহ করা পানীয়তে আকর্ষণীয় সব কিছুই থাকবে। কিন্তু এর মন্দ পার্শ্বক্রিয়া যা মানুষ

জানে তার কোনোটিই থাকবে না। থাকবে না তাতে কোনো বকাবকি বা অপরাধ প্রবণতা। এ সুরা পান করার পর তারা নিজেদের প্রিয় সমাবেশে পরস্পর মহববত বিনিময় করবে। এ মধুময় পরিবেশে তাদের মধ্যে মহববত যেমন অন্য যে কোনো সময়ের থেকে বেশী হবে, তেমনি বেশী হবে ওখানকার নেয়ামত ও তার স্বাদ। এ সময়ে তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে শুভ্র শিশির-বিন্দুর মতো মনোরম কিশোর দল। এরা যেমন হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তেমনি রাতের শিশির-বিন্দুর এরা সুকোমল স্বচ্ছ ও সজীব। 'যেন তারা গুপ্ত হীরক খন্ড।' এই সুন্দর কিশোররা এ সমাবেশের শোভা ও শরীরের অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে আনন্দানুভূতি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবে।

এই সুন্দর-সুমিষ্ট পরিবেশের পরিপূর্ণতা আসবে তাদের খোশগল্পের আসর জমে উঠা ও জীবনের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাদের এ অবস্থানের বৈশিষ্ট্য হবে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, হাসি-খুশী ও প্রাচুর্য, ভালবাসা ও সর্বপ্রকার মনোলোভা ভোগ-বিলাস সামগ্রী, '(এ সময়ে) তারা একে অন্যের সামনে এগিয়ে আসবে এবং তারা পরস্পর প্রশ্ন করতে থাকবে। বলবে, 'আমরা অবশ্যই ইতিপূর্বে আমাদের পরিবারের মধ্যে স্নেহ ও মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি এহসান করলেন এবং আমাদেরকে প্রচন্ড তাপসম্পন্ন আগুনের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। আমরা এর আগে তাঁকে ডাকতাম, তিনি বড়ই মেহেরবান এবং সৎ কাজের প্রতিদানকারী।'

একমাত্র পরহেজগাররাই মুক্তি পাবে

এতে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে, দুনিয়ার জীবনে তারা আজকের দিন সম্পর্কে ভেবে ভেবে ভয়ে ভয়ে কালাতিপাত করতো। তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার ভয় করতো। তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে এ ভয় তাদের ছিলো। যখন পরিবারের সাথে জীবন যাপন করেছে, তখনও এ ভয় তাদের থেকেছে। কোনো কোনো মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি করার সুযোগ এসেছে, কিন্তু তারা ধোঁকাবাজি করেনি। বাজে খেলাধুলা ও অবৈধ তৎপরতার সুযোগ পেয়েও তারা তা গ্রহণ করেনি।

আল্লাহর নিকটেই তারা প্রতিদানের আশা করেছে, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভীষণ উত্তপ্ত সেই আগুনের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন যা শরীরের মধ্যে সাপের দংশনে নির্গত গরম বিষের মতো প্রবেশ করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবানীতে তাদের প্রতি এহসানস্বরূপ এবং তাদেরকে মর্যাদা দিতে গিয়ে এইভাবে এ আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। যেহেতু তিনি জানতে পেরেছেন যে, তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে মন্দ কাজ পরিহার করে চলেছে। সব ব্যাপারেই তারা আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখেছে এবং মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে। এসব ভাল কাজ করার সময়ে তাদের এ চেতনাও প্রবলভাবে থেকেছে যে, যত ভাল কাজই তারা করুক না কেন, নাজাতের জন্য সেগুলো মোটেই যথেষ্ট নয়, বরং মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ পাকের মেহেরবানীই হচ্ছে একমাত্র সহায়। মোমেন ব্যক্তির নেক কাজ করার দাবী এর থেকে বেশী কিছু নয় যে, তার কাজ সাক্ষ্য দেবে যে, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এবং আল্লাহ পাকের নিকটেই নেক প্রতিদানের আশা করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার যোগ্য বানিয়েছে।

অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতা, আল্লাহর ভয় ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার মানসিকতা নিয়েই সে বরাবর আল্লাহকে ডেকেছে। এজন্যেই তারা সে দিন বলতে পারবে, 'এর আগে অবশ্যই আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি।' হাঁ তারা জানে ও বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই মেহেরবান এবং তাঁর বান্দার সকল নেক আমলের প্রতিদান দানকারী। সেই জন্যই তো তিনি 'বাররুর রহীম' অর্থাৎ নেক আমলের মূল্যায়নকারী মেহেরবান।

আর, এইভাবে বুঝা যায় এবং এ রহস্যের দ্বার খুলে যায় যে, এই নেক লোকদের দোয়া আল্লাহ তায়ালা কেন কবুল করেন এবং তাদেরকে তাঁর নেয়ামতের ভান্ডার দান করেন।

আলোচ্য এ সূরাতে প্রথমে কেন আযাবের কষাঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে আর কেনই বা দ্বিতীয় অধ্যায়ে গিয়ে প্রচুর নেয়ামতের ঘোষণা দান করা হয়েছে এবং কেনইবা সর্বপ্রকার উপায়ে তাদের অনুভূতিতে প্রকৃত সত্য বিষয়ের চেতনা দান করা হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে গেলো। বর্তমান প্রসংগে এসে তাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও তাৎক্ষণিকভাবে বান্দার সামনে সকল অবস্থার বাস্তব চিত্র এঁকে দেয়া হয়েছে। এর ফলে বান্দাহর সামনে বহু তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, তার পরপরই আবার তার অন্তরের গোপন কোনে নানাপ্রকার সন্দেহ-সংশয় উঁকি-ঝুঁকি মারা শুরু করেছে এবং এমন সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে সে জড়িয়ে গেছে যেখান থেকে বেরিয়ে আসা বড়ই কঠিন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ বাতলাতে গিয়ে এরশাদ করছেন,

'অতপর উপদেশ দাও এবং স্মরণ করাও তাদেরকে তুমি তো আর কোনো জ্যোতিবিদ বা গনক নও আর কোনো পাগলও তুমি নও আর কোনো পাগলও তুমি নও যে, যা মনে আসবে তাই বলবে। .... ।'

(আযাব থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্যে) আমরা আগেও আল্লাহ ....কোনো নিদর্শন মনে না করে) বলবে এ তো হচ্ছে, পুঞ্জিভূত একখন্ড মেঘ মাত্র! (আয়াত ২৮-৪৪)

রসূলের ওপর মানুষকে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব

'ফা-যাক্কের'-এ শব্দটি রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যাতে করে তাঁর উপদেশদানের কারণে তারা প্রিয় নবী (স.)-এর সাথে বেয়াদবী করতে না পারে এবং তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ না করে। আবার তারা একথাও কোনো সময় বলেছে, 'সে একজন গনক বা জ্যোতিবিদ, কখনও বলেছে পাগল। অবশ্য এ দুটি কথা তাদের কাছে একইরকম বলে মনে হয়, যেহেতু জ্যোতবিদরা শয়তানের কাছ থেকে কিছু কথা আহরণ করে। আর শয়তানও এই সুযোগে মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেয়, যার কারণে তার মধ্যে কিছু পাগলামি দেখা দেয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শয়তানই এই উভয় প্রকার দোষের জন্য দায়ী। 'সে হয়তো বা জ্যোতিবিদ একথা বলে তারা মহাগুণান্বিত নবী (স.)-এর ওপর এই ধরনের কথা প্রয়োগ করতো, অর্থাৎ কখনও বলতো তিনি জ্যোর্তিবিদ, কখনও বলতো পাগল। এর কারণ অবশ্য এটিই যে কোরআনে করীমের অলৌকিক বাণীর সামনে তাদের বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলতো। তারা বুঝতেই পারতো না যে কি বলবে। যে কথা তারা বলত, তাদের নিজেদের কাছেই তা খাপ খাওয়ার মতো কথা মনে হতো না। তারা নিজেরাও ছিলো কথার রাজা। আল্লাহর কাছ থেকে এ বাণী এসেছে তাদের মানসিক ব্যাধির কারণে তারা এ কথা যখন মানতে পারছিলো না তখন তারা এমন একটি কথা বলতে শুরু করলো যা মানুষের বুদ্ধিতে ধরে না। এজন্যই তারা বলছিলো, এটা জিনদের পক্ষ থেকে আসা কথা, অথবা তাদের সাহায্যে আসা অন্য কোনো কথা। কাজেই যার কাছে এসেছে সে হয় এমন একজন জ্যোতিবিদ যাকে শয়তান কিছু শিখিয়ে দিয়েছে, অথবা এমন একজন যাদুকর, যে নিয়মিত জিনদের সাহায্য পেয়ে থাকে, কিংবা একজন কবি, যে জিনদের পক্ষ থেকে আসা কোনো কবিত্ব প্রতিভা হাসিল করেছে, নতুবা এমন একজন পাগল, যার ওপর শয়তান 'আছর' করায় সে পাগল হয়ে গেছে এবং এইসব অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

মোশরেকদের এই কথাগুলো ছিলো অবশ্য অত্যন্ত বিশ্রী ও মারাত্মক। এ ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং সেসব কথাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য

তাঁকে বিশেষভাবে নসীহত করছেন। কেননা তিনি তা নিজেই সাক্ষী যে, মোহাম্মদ (স.) তাঁর প্রতিপালকের করুণা-ধন্য। যার কারণে তাঁর ওপর আন্দায-অনুমানভিত্তিক জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা বা পাগলামিতে পেয়ে বসার মতো অবস্থা কিছুতেই আসতে পারে না।

প্রিয় নবীর ওপর কবিয়াল হবার অপবাদ

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের যে কথা, 'তিনি একজন কবি'—একে ঘৃণাভরে খন্ডন করছেন। তিনি বলছেন, ওরা কি বলছে, 'সে একজন কবি, যার জন্য মৃত্যুকঠিন কোন দুর্ঘটনা আমরা কামনা করি।' এ কথা তো ওরা নিজেরা প্রিয় নবী (স.)-কে বলেছে, আবার ওরা একে অপরকে বলেছে, একটু ধৈর্য ধর এবং যা বলেছো তার ওপর টিকে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু না আসে, ব্যস মৃত্যু এসে গেলেই আমরা বেঁচে গেলাম। আমাদের জানে স্বস্তি এসে গেলো। এজন্যই ত ওরা নবী (স.)-এর মৃত্যুকে তাদের সান্ত্বনার বিষয় বলে মনে করতো, আর এরই কারণে আল্লাহ রব্বুল ইযযত এ হতভাগাদেরকে সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন, 'বলো, (হে রসূল), অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে আপেক্ষমান হয়ে আছি।' আর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে শেষ পরিণতিতে কার কি অবস্থা হবে, আর এই অপেক্ষা করায় কে সাহায্য-প্রাপ্ত হবে আর কে বিজয় লাভ করবে।

কোরায়শ নেতারা খুবই ধৈর্যশীল ও বড়ই বুদ্ধিমান বলে পরিচিত ছিলো এবং তাদের লোকজনকে খুবই বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত করতো অথবা বলতো তারা বিস্তর বুদ্ধির অধিকারী। একথা দ্বারা তারা ইংগিতে বুঝাতে চাইতো যে, তারা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কাজ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে কাজ করে। তাই আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের ধিক্কার দিচ্ছেন, কেননা ইসলাম সম্পর্কে তারা যে দৃষ্টিভংগি পোষণ করতো তার মধ্যে কোনো কৌশল, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির লক্ষণ ছিলো না। এজন্য এ মোশরেকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ঘৃণা ভরে বলছেন, মোহাম্মদ (স.)-কে কি এই সমস্ত নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা যায়, আর তাঁর রেসালাত সম্পর্কে ওরা যে দৃষ্টিভংগি রাখে তা-ই কি তাদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির পরিচয় বহনকারী? না তারা বিদ্রোহী, যালেম, তারা যুক্তি-বুদ্ধির কোনো মূল্যই প্রকৃতপক্ষে দেয় না। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের যুক্তি-বুদ্ধি কি তাদেরকে এইসব বাজে কথা বলতে বলে, না এই আচরণ করতে শেখায়? না, আসলে তারা এক বিদ্রোহী জাতি!'

ওপরের দুটি প্রশ্নের প্রথমটি হচ্ছে, এক তীব্র দংশনকারী প্রশ্ন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটির মধ্যে মারাত্মক মিথ্যা দোষারোপ করার কথা রয়েছে।

এইভাবে রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধে তাদের লম্বা কথা বলার অভ্যাস অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিলো। তারা বহু মনগড়া কথা তৈরী করে বলতে থাকলো। তাই এখানে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণার সাথে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ওরা কি বলে, 'সে (মোহাম্মদ) নিজে (কোরআন) রচনা করে বলছে?' তার মানে ওরা এটা বলতে চায়, যে কথা সে বলছে তা সাধারণভাবে মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এই কারণেই তো আল্লাহ তায়ালা ঘৃণার সাথে ওদের কথাটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলছেন, 'ওরা কি বলে নাকি সে নিজে রচনা করে করে বলছে?' সাথে সাথে এই আজব কথাটি বলার কারণও আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করছেন, 'বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে, তারা কিছুতেই ঈমান আনবে না। এরই কারণে আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তরকে ঈমানের চেতনা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। ঈমানের তাৎপর্য যাতে তারা না জানতে পারে তার জন্য তিনিই তো তাদের মুখ দিয়ে

এই ধরনের কথা বলাচ্ছেন। তারা যদি তাদের বুঝ শক্তিকে কাজে লাগাতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা জানতে পারতো যে, অবশ্যই এটা মানুষের তৈরী করা কোনো কথা নয় এবং একথাও চিন্তা করতো, যে কথাটি তিনি বহন করে নিয়ে এসেছেন তিনি সেই মহান ব্যক্তি যিনি পরম সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত বলে খ্যাত।

এরপর অবতীর্ণ এই মহাগ্রন্থ যে আল্লাহর বাণী তা বুঝা সে হঠকারীদের পক্ষে আর সম্ভবই রইল না, আর এই কারণে আল্লাহ তায়ালা এমন এক যুক্তিপূর্ণ কথা বললেন যার ওপর আর কোনো তর্কই করা চলে না, 'ঠিক আছে, ওদের দাবীতে ওরা যদি সত্যবাদীই হয়ে থাকে, তাহলে তৈরী করে নিয়ে আসুক না এমনই কিছু কথা!' কোরআন করীমে বারবার এই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু এ নাফরমানরা কোরআনকে শুধু পরাজিতই করতে চেয়েছে এবং বরাবরই কোরআনকে ছোট করে রাখতে চেয়েছে। এহেন আচরণকারী ব্যক্তিরা কেয়ামত পর্যন্ত এমন ধিক্কৃত আচরণই করতে থাকবে।

কোরআনের কিছু গোপন রহস্য

অবশ্যই কোরআনুল করীমের মধ্যে বিশেষ কিছু গোপন রহস্য রয়েছে। তারাই সে রহস্য বুঝতে পারে, যারা-এর মধ্যে অবস্থিত আশ্চর্যজনক স্থানগুলোর ব্যাপারে তর্ক করার পূর্বে শুরু থেকেই এই মহান কালাম সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের খেয়াল করে এসেছে। কোরআনের প্রতিটি লাইন সম্পর্কে বিশেষভাবে তারা তাদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে। এটা তারা বুঝে যে, কোরআনের যে বাহ্যিক অর্থ মানুষের জ্ঞানে আসে তার উর্ধে-আরও কিছু তাৎপর্য অন্তর্নিহিত আছে। কোরআনের মধ্যে এমন একটি দিক আছে যা সে ব্যক্তির কানে ফোঁটায় ফোঁটায় মধু ঝরায় যে ব্যক্তি মনোনিবেশ সহকারে কোরআন শোনে। অমিয় সে বাণীর সুধা কারও কারও কানে স্পষ্টভাবে পৌছে যায়, আর কারও কারও কাছে তা অস্পষ্টই থেকে যায়, কিন্তু বাস্তবে তো এ সুধা ও তার মিষ্টতা সর্বক্ষণ আছেই। এই অমিয় বাণী অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করে কোনো সুনির্দিষ্ট উৎসের খবর জানায়, এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে অমিয় সুধা কি? বাহ্যিক এই বাক্যাবলী, না এর মধ্যে অবস্থিত অন্য কোনো গোপন রহস্য? না সেই সব চিত্র এবং ছায়া যা দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে! অথবা এ জিনিসগুলো কি কোরআনের মধ্যে উপস্থাপিত বিশেষ কোনো বিষয় যা মানুষের রংগীন ভাষা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না? না এগুলো সবই সামষ্টিক কিছু উপাদান? না মানুষের মধ্যে নিহিত সীমা-সংখ্যার আওতার বাইরের কোনো অজানা রহস্য?

মূলত এসব হচ্ছে এমন সব রহস্য যা কোরআনের সকল আয়াতের মধ্যেই নিবদ্ধ রয়েছে।

এসব রহস্য তারাই বুঝতে পারে যারা জীবনের শুরু থেকে কোরআন বুঝতে চায়। এরপর কোরআনে বর্ণিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করে, পর্যবেক্ষণ করে এবং এর ফলে বহু অজানা রহস্যের দ্বার তাদের সামনে উদঘাটিত হতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক চিন্তা তো সেইটিই যা মানুষের হৃদয়-মন ও তাকে যুক্তি-বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে আসে। মানুষের সৃষ্টি কেন, এ সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি এবং কি সে মহাসত্য যা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুনিয়া জাহানের সকল কিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে-একথা জানার জন্যই মানুষের মধ্যে চিন্তা শক্তি জাগানো হয়েছে। এ চিন্তাশক্তির মধ্যে প্রথম সেই সত্যটি সম্পর্কে চেতনা দেয়া হয়েছে যা অন্য সকল সত্যের উৎস, আর তা হচ্ছে আল্লাহর বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা-ধারণা।

এ চিন্তাশক্তিকে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করা ও মানুষের বোধগম্য করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির কাছে আবেদন পেশ করা। এ এমন

বৈশিষ্টমন্ডিত আবেদন যা গোটা মানবমন্ডলীর কোনো ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ আবেদন মানুষের অন্তরকে সবদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং এ আবেদনের কারণে তার মধ্যে অন্য কোনো কথা প্রবেশ করতে পারে না। এ আবেদন সকল দিক থেকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহমুখী বানিয়ে দেয় এবং সকল রহস্য বুঝার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে সব কিছুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে, সবার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সাথে পরিপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে। অবশ্য এসব সম্পর্ক-সম্বন্ধ মহান সেই উৎসমূল আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে। এ ব্যাপারে একজন মোমেন কোনো মানুষের কাজের সাথে স্বাধীনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। যেহেতু মানুষের চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত কর্মকান্ড কোনো বিশেষ এক জায়গায় স্থির থাকে না বা জীবনের সকল দিককে পরিচালনা করারও যোগ্যতা রাখে না। মানুষ এমন কোনো ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে না যার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই এবং এমন কোনো পন্থাও সে উদ্ভাবন করতে পারে না যা সব দিক দিয়ে ভাল। এ কথাও সে বলতে পারে না যে চূড়ান্ত কোনো প্রান্তিক সীমারেখার হাতছানি থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ কথাও সে বলতে পারে না যে পূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা মত সে নিজে চলতে ও সব কিছুকে চালাতে পারবে।

এমন কোনো মৌলিক বিষয় বা তার শাখা-প্রশাখা নিখুঁতভাবে সে গড়ে তুলতে পারে না, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেবে না সে বিষয়ের উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ লাগবে না বা কোনো সংঘর্ষও লাগবে না—এ ধরনের কোনো নিশ্চয়তাও সে দিতে পারে না।

এগুলো তো হচ্ছে প্রকাশ্য ও বাহ্যিক জিনিস এবং এইগুলোর মতো অন্যান্য আরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস রয়েছে। এসবের সাথে আরও অনেক গোপন তথ্য রয়েছে যার কোনোটাকেই অস্বীকার যায় না। এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও রহস্যময় বিষয়ের অনেকগুলো এই পাক কালামের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যাতে সর্ব যুগের চাহিদা পূরণ করা যায় এবং সকল শ্রেণীর মানুষের মন মুগ্ধ হয়। এ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যাকে মানুষের অন্তর ও অনুধাবনশক্তি শ্রদ্ধা করে, আর এই কারণেই এ নিয়ে সে বেশী মাথা ঘামায় না। সে সম্মান করে সেই শক্তিকে যা সে তার সমস্ত বুঝশক্তি দিয়ে গভীরভাবে বুঝতে পারে। এই মযবুত বুঝশক্তি বা হৃদয়কে আল-কোরআন 'ক্বালবুন সালীম' অর্থাৎ আনুগত্য ভরা প্রশান্ত মন বলে অভিহিত করেছে 'অতএব–(বিরোধী সে মোশরেকরা) এই রকমই কিছু কথা নিয়ে আসুক না কেন–যদি 'কোরআন মোহাম্মদ-এর মনগড়া' তাদের এই দাবীকে তারা সত্য বলে মনে করে!

মানুষ নিজেই তো এক রহস্য

নীচের প্রশ্নগুলো হচ্ছে তাদের অস্তিত্বের রহস্য ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে। তারা নিজেরা, অর্থাৎ তাদের নিজেদের অস্তিত্বই তো রহস্যময়। এ এমন এক সত্য যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। আর মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব যে কি আশ্চর্যভাবে নির্মিত তার ব্যাখ্যা আল কোরআন ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না। তাদের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি তাদের থেকে যোগ্য ও অধিক মান-মর্যাদাসম্পন্ন। তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি বরাবরই যিন্দা আছেন এবং তিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর বাকি সবাই সৃষ্টজীব। এ বিষয় এরশাদ হচ্ছে, 'তারা কি এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, অথবা তারা নিজেরাই কি নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?'

কোনো জিনিসের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যাওয়া—এ এমন একটি কথা, যা প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবস্থিত যুক্তিবুদ্ধি কিছুতেই স্বীকার করে না এবং এ বিষয়ে বেশী

বা কম তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নেই। অন্য প্রশ্ন, সে নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। এটা এমনই এক বিষয়, যা সে নিজে বা অন্য কোনো সৃষ্টজীব কোনো দিন দাবী করেনি। নিজে নিজে সৃষ্টি হওয়া এবং নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা হওয়া–এই দুইটির কোনোটাই যুক্তি-তর্কে যদি না টেকে, তাহলে আল কোরআন যে সত্য পেশ করেছে তা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনোই উপায় থাকে না, আর আল কোরআনে পেশ করা সে সত্য হচ্ছে সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি। সে মহান স্রষ্টার সাথে (সাহায্য করার বা এ কাজের) অংশীদার বলতে আর কেউ নেই। মূল ঘটনা যখন এই তখন তার এই সৃষ্টির প্রতিপালন ও তাদের আনুগত্য লাভের যোগ্যতা ও অধিকারও আর কারও নেই। এ যুক্তিটা যেমন স্পষ্ট, তেমনই সুদূরপ্রসারী।

পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক দর্শন

এরপর তাদের সামনে রয়েছে গোটা আকাশমন্ডলী ও বিশাল এ পৃথিবীর অস্তিত্ব। ওরাই কি এসব কিছুকে সৃষ্টি করেছে? একথার জওয়াব একমাত্র এটিই যে, না, মানুষ নিজেকে যেমন সৃষ্টি করতে অক্ষম, তেমনি অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই। এরশাদ হচ্ছে, 'তারা কি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে? না, বরং তারা নিজেরাই একথা স্থিরভাবে বিশ্বাস করে না।'

তারা নিজেরা বা কোনো যুক্তি-বুদ্ধিই একথা বলার অধিকার রাখে না। তারা একথাও কেউ বলে না যে, আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী নিজেদেরকে নিজেরাই সৃষ্টি করেছে, অথবা কোনো স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, আর তারা কেউ একথাও দাবী করে না যে তারাই এ আসমান-যমীনকে সৃষ্টি করেছে। বিশাল এ সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে সবার সামনে তার সকল রহস্যরাজি নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কে এ সবের স্রষ্টা? আর ইতিপূর্বেও যখনই তাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন তারা বলেছে, আল্লাহ। কিন্তু এ মহাসত্যের ওপর তাদের ঈমান এতটা স্পষ্ট নয় যে, তাদের অন্তরের ওপর দৃঢ়ভাবে এর ছাপ পড়তে পারে এবং তাদের এ বিশ্বাসকে গভীর বিশ্বাসের রূপ দিতে পারে, 'বরং সত্যিকারে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না।'

এরপর তাদের মর্যাদাকে আর এক স্তর নামিয়ে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের নিজেদের অথবা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনী ক্ষমতার নীচে অন্য কোনো ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, ওরা কি আল্লাহ পাকের সম্পদ ও অর্থভান্ডারের মধ্যে কোনো কিছুর ওপর মালিকানার দাবী রাখে নাকি? ইচ্ছা করলেই কি তারা এগুলো সব করতে পারে, বা ইচ্ছামত কি এগুলোকে ছেড়ে দিতে পারে, অথবা এগুলোর কোনো ক্ষতি বা উপকার তারা করতে পারে কি? এরশাদ হচ্ছে, 'তাদের কাছে কি তোমার রব-এর কোনো ভান্ডার রয়েছে, না তারাই এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক?'

আর যদি তা না হয় এবং এ দাবীও যদি তারা না করে, তাহলে এগুলোর মালিক কে, আর কেই বা এসব কিছুকে পরিচালনা করছে? এ বিষয়ে আল কোরআন জওয়াব দিচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এগুলো প্রয়োজন মতো কব্জা করেন, আবার ছাড়তে চাইলে ছেড়ে দেন। এগুলোকে তিনি চালান এবং এগুলোর মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজও একমাত্র তিনিই করেন। সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুকে পাকড়াও করা, ঢিল দেয়া, নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিচালনা করার ক্ষমতা ও অধিকার অন্য কারও আছে- একথা প্রত্যাখ্যান করার পর একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এসব কিছুর মালিক হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র– এইটিই গোটা সৃষ্টি-পরিচালনার একমাত্র ব্যাখ্যা।

এরপর ভ্রান্ত ও সীমা অতিক্রমকারী মানুষের মর্যাদাকে আর এক দফা নামাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আল্লাহর বাণীর উৎসমূলে পৌঁছানোর মতো কোনো উপায় তাদের কাছে আছে কি?

'তাদের কাছে কোনো সিঁড়ি আছে নাকি, যা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কথা শুনে আসতে পারে? বেশ, তা যদি থেকেই তাকে, তাহলে সে ব্যক্তি তাদের এই দাবীর পক্ষে কোনো যুক্তি বা স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ হাযির করুক না কেন?'

মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বলছেন, সে তো একজন রসূল (বার্তাবাহক) মাত্র তার কাছে ওহী পাঠানো হয় এবং এই কোরআন তাঁর কাছে উর্ধাকাশ থেকে নেমে আসে। অথচ যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজেই কথা বলছেন, সেই বিষয়টিকেই তারা মিথ্যা বলে দাবী করছে? তাহলে তাদের কাছে কোনো সিঁড়ি আছে নাকি, যা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে তারা নিজেরা মূল সত্যটি জেনে আসতে পারে এবং তারা যদি আরও জেনে আসতে পারে যে, মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে কোনো ওহী আসে না, বরং তিনি যা বলছেন তা সঠিক নয়, সত্য অন্য কিছু? এরশাদ হচ্ছে, 'বেশ তো সে ব্যক্তিরা (তাদের দাবীর পক্ষে) স্পষ্ট কোনো দলীল-প্রমাণ হাযির করুক না কেন।' অর্থাৎ কোনো এমন মযবুত দলীল তারা পেশ করুক, যার দ্বারা তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়। একথার মধ্যে কোরআনের ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল কোরআনের আয়াতসমূহে যে সব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা খন্ডন করার সাধ্য কারও নেই। অথচ তারা সে যুক্তি-প্রমাণের দিকে খেয়াল না করে অহংকারে মত্ত এবং নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সদাসর্বদা ব্যস্ত।

কতিপয় বাজে মন্তব্যের জবাব

এরপর আলোচনা আসছে পাক-পবিত্র আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তারা যেসব এলোমেলো ও লাগামহীন কথার্বাতা বলতো সে বিষয়ে ফেরেশতাদের সম্পর্কে তারা বলতো যে, তারা সব আল্লাহর কন্যা সন্তান–এ বিষয়ে তাদের প্রতি সরাসরি ইংগিত করে বলা হচ্ছে,

'হাঁ, যত কন্যা সন্তান সব তাঁর, আর যত পুত্র সন্তান সবই তোমাদের?' অথচ আরবের সাধারণ অবস্থা ছিলো এই যে, তারা ছেলেদের তুলনায় মেয়ে হওয়াকে তাদের জন্য তুচ্ছ ও অপমানজনক মনে করতো। মেয়েদেরকে তারা এত বেশী ছোট জানতে যে, কারও ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে জানতে পাবার সাথে সাথে রাগে-দুঃখে তার মুখ কালো হয়ে যেতো। এতদসত্ত্বেও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলতে তারা এতটুকু লজ্জাবোধ করতো না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে আল্লাহর কন্যা সন্তান দাবীর সমালোচনা করেছেন। মূলত এ ছিলো এমন এক দাবী যার পেছনে কোনো যুক্তি ছিলো না।

দ্বীনের দাওয়াত হবে নিঃস্বার্থ

অপরদিকে সত্য সঠিক পথের দিকে নবীর আহবানকে বড়ই কষ্টকর এক বোঝা বলে তারা মনে করতো। অথচ নিছক নবুয়তের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্য ছাড়া এই আহবানে তাঁর নিজের যে কিছুমাত্র স্বার্থ ছিলো না একথা তারা ভালভাবেই বুঝতো। কারণ একাজের জন্য তিনি কখনও তাদের কাছে কোনো মজুরী বা প্রতিদান চাননি। এ দায়িত্ব পালনের কাজ করতে গিয়ে তিনি যে সকল মানুষের কল্যাণ কামনাই করতেন তা বুঝা খুবই সহজ ছিলো।

যে কথাগুলো ওদের কাছে নবী (স.) পেশ করছিলেন তার দ্বারা তিনি যে তাদের কল্যাণই কামনা করতেন তা এইভাবে বুঝা যায় যে, তিনি তাদের বাপ-দাদাদের আমলের প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে তখন কথা বলেছেন যখন তাদেরকে সে জীবন বিধানের দিকে আহ্বান করার মতো কেউই ছিলো না। তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'তুমি কি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার বিনিময়ে কিছু প্রতিদান চাইছো, যার কারণে তারা এটাকে জরিমানার বিরাট এক বোঝা মনে করে নিয়েছে?'

অর্থাৎ, তুমি যে কথাগুলো তাদেরকে বলছো তার প্রতিদান হিসাবে তাদের কাছে কিছু চাইলে সেটাকে তারা জরিমানার বোঝা মনে করতো। কিন্তু বাস্তবে তো কোনো বিনিময় চাওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাহলে জরিমানা আদায় করার প্রশ্ন আসবে কেমন করে। নবীর সাথে এইভাবে ব্যবহার করা এবং তাঁকে এই ধারণা দেয়া যে, তাঁর প্রদত্ত দাওয়াত যেন জরিমানার বিরাট এক বোঝা এক মহা যুলুম নয় কি?

তারা কি গায়েব জানে?

এরপর, আবারও আল্লাহ তায়ালা লোকদেরকে তাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব এবং গোটা সৃষ্টির মধ্যে তাদের মর্যাদার কথা স্মরণ করাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সকল বস্তুকে তাদের অনুগত করে দিয়েছেন–এটা তাঁরই নিজস্ব আইন অনুযায়ী করেছেন বলেই সব কিছু এক নির্দিষ্ট মাত্রায় মানুষের পদানত হয়ে যায়। সৃষ্টির কিছু রহস্য তাদের কাছে উদঘাটন করেছেন এবং নির্দিষ্ট সে সীমার বাইরে অনেক কিছু তাদের নযরের ও বোধগম্যের বাইরে রেখেছেন, যা একমাত্র সৃষ্টির মালিক আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কিছু রহস্য এমনও আছে, যা মানুষ ছাড়া আল্লাহর অন্য কোনো বান্দাহ জানে না, এ বিষয়ে মানুষ ইচ্ছা করলেও তাঁর সে জ্ঞান হাসিল করতে পারবে না। সে তো তাঁরই বান্দাহ! তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো বান্দাহ কোনো কিছু জানতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের কি গায়বের কোনো খবর আছে, যা তারা লিখে রাখছে?'

অথচ তারা জানে যে গায়বের কোনো খবর তারা জানে না এবং গায়বের জ্ঞান লাভ করার মতো কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই। গায়বের রেজিষ্টারে তারা কিছু লিখে রাখতেও সক্ষম নয়, সে পুস্তকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহর ভাগ্যে যা দান করতে চান, তা লিখে রাখেন।

কে আছে এমন যে গায়বের খবর রাখতে পারে, জানতে পারে সে কথা যা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করো রেখেছেন এবং সেই ব্যবস্থা যা তিনি পরিচালনা করছেন? একমাত্র তিনিই সকল ব্যবস্থা ঠিক করে রাখার মালিক এবং তিনিই সর্বকালের সকল চক্রান্তকারীর যাবতীয় চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন।

সুতরাং যারা গায়বের খবর রাখে না, বা তাঁর রেজিষ্টারে কিছু লিখতে পারে না, তাদের কি করার ক্ষমতা আছে? হে রসূল, তোমার বিরুদ্ধে ওরা যেসব ষড়যন্ত্র করছে এবং তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য তারা নানারকম ব্যবস্থা নিচ্ছে, আর মনে করছে ভবিষ্যতের অনেক কাজ তাদের ইচ্ছামতো তারা করতে পারবে। এ জন্যই তো ওরা বলছে, এ ব্যক্তি নিছক একজন কবি বৈ-ভিন্ন কিছু নয়, আমরা ওর জন্য মৃত্যু-কঠিন কোনো দুর্ঘটনার অপেক্ষা করছি! আল্লাহ তায়ালা ওদের একথার জওয়াবে বলছেন,

'ওরা কি কিছু চক্রান্ত করতে চাইছে? অতপর ওদের জানা দরকার, কুফরী যারা করেছে তারাই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে।'

এ অবিশ্বাসী ও সত্যের দুশমনদেরকেই গায়বের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সেই শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন, যা তাদের জন্য তিনি ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। তাদের ওপরেই নেমে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি এবং তাঁর ফায়সালা এবং আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণকারী।

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া ওদের পক্ষে (কাজ করার মতো) অন্য কোনো সার্বভৌম মালিক আছে নাকি? যারা ওদেরকে রক্ষা করবে, মুরব্বী বা বন্ধুর মতো সাহায্য করতে দরদভরা দিল নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং আল্লাহর ক্রোধ থেকে ওদেরকে বাঁচাবে?' আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার শরীক গ্রহণ করা থেকে মহা পবিত্র, তিনি পবিত্র তাদের থেকে যাদেরকে ওরা তাঁর সাহায্যকারী মনে করে।' আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ ব্যাধিগ্রস্ত মোশরেকদের ভুল ও রোগগ্রস্ত চিন্তা-ভাবনার উর্ধে সর্বশক্তিমান মহাসত্তা।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্ষমতা যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধে থাকার কথা ঘোষণার সাথে সাথে এবং রসূল (স.) ও দ্বীন ইসলামের ওপর আঘাতের জওয়াব দান করার পর এ প্রসংগ শেষ করা হচ্ছে। এখানে নাফরমানদের ওপর যে কঠিন আযাব নেমে আসবে তারও বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আলোচনায় সকল সন্দেহ-সংশয়ের জট খুলে গেছে। তাদের প্রত্যেক কূটতর্ককে খন্ডন করা হয়েছে। অবশেষে সমগ্র জাতি স্পষ্ট সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। তাদের কাছে ইসলামের বাইরে থাকার মতো অজুহাত অথবা পেশ করার মতো কোনো দলীল আর অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু অন্তরের অন্ধ যারা তারা তখনও সুস্পষ্ট সত্যের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল এবং সুদূরপ্রসারী আরও বিভিন্ন সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াসে মেতেছিলো। এরশাদ হচ্ছে, 'আকাশ থেকে কোনো কিছুর টুকরা পড়লে তারা বলে উঠতো, এ তো হচ্ছে এক খন্ড জমাট মেঘখন্ড'। অর্থাৎ আকাশ থেকে আযাব হিসাবে ধ্বংসাত্মক কোনো পাথর বৃষ্টি হতে দেখলেও তারা বলতো, এত জমাট মেঘ খন্ড, এর মধ্যে পানি ও সঞ্জীবনী শক্তি রয়েছে, এতে ভয়ের কি আছে! সত্যের বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্যেই তারা এসব বলতো যাতে সত্যের দিকে কেউ এগিয়ে না আসে। যদিও এসময়ে তাদের মাথার ওপর তরবারি ঝুলছিলো। যেমন তাদের নিজেদের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এই সময় ওদের নিজেদের কথা বলতে গিয়ে সম্ভবত আদ জাতির পরিণতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যেহেতু এ ঘটনা সাধারণভাবে তাদের মধ্যে জানাজানি ছিলো। তারা নিজেরা এ আদ জাতির কথা বলাবলি করতো। এ জাতির ওপর যখন গযব ও ধ্বংসের বার্তা বহনকারী মেঘ নেমে আসছিলো, তখনও ওরা বলছিলো, 'এত মনোরম মেঘমালা (আমাদের ওপর) বারিবর্ষণ করার জন্যই নেমে আসছে।' কোথা গেলো তাদের এ আযাব প্রতিরোধ শক্তি? 'বরং, এ তো হচ্ছে সেই আযাব যার জন্য তোমরা বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে। এছিলো এক প্রচন্ড বায়ুপ্রবাহ, যার মধ্যে কঠিন আযাব ছিলো যা তার রব-এর নির্দেশে সব কিছুকে মিসমার করে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলো।

মোশরেকদের ধ্বংস অনিবার্য

মোশরেকদের মাথার ওপর ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সংকেত দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা সত্যের বিরুদ্ধে যে দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করে চলেছিলো, যে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার দেখাচ্ছিল, এখানে ছবির মতো তার বিবরণ দান করার পর রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই দিনের জন্য তাদেরকে ছেড়ে দিতে বলছেন যার বর্ণনা ইতিমধ্যে পেশ করা হয়েছে এবং এ সূরার শুরুতেও যার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই আযাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর নবী (স.)-কে আল্লাহ যে মান-মর্যাদা দিয়েছেন, নিজ হাতে পরিচালনা করেছেন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর তত্ত্বাবধান করেছেন তা স্মরণ রেখে তাঁর ফায়সালা আসা পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি আল্লাহ পাকের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে ঘুম থেকে উঠার সময়, রাতের এক অংশে এবং তারকারাজি ডুবে যাওয়ার পর অর্থাৎ শেষ রাতে বেশী বেশী তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেন। একথা বেশী বেশী স্মরণ করেন যে তিনি সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, ওদেরকে ছেড়ে দাও সেই দিনের জন্য যেদিন তাদের ওপর এসে পড়বে এক বজ্রকঠিন 'শব্দের' আযাব। যেদিন তাদের কোনো চক্রান্ত তাদের এতটুকু উপকারে আসবে না। আর তাদেরকে কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্যই করা হবে না। আর মানুষের ওপর যারা অতীতে অত্যাচার করেছে, তাদেরকে তো এই আযাব ছাড়াও অন্য আরও অনেক আযাব দেয়া হবে, যা তাদের অধিকাংশই জানে না। আর তুমি তোমার রব-এর ফায়সালার অপেক্ষা করো। জেনে রাখ, তুমি আমার সরাসরি সাহায্যের মধ্যে আছ আর যখনই তুমি ঘুম থেকে ওঠো আমার নামের তাসবীহ জপতে থাকবে এবং আমি যে যাবতীয় দুর্বলতামুক্ত তা স্মরণ করতে থাকবে। রাতের একটি অংশে এবং তারাগুলো ডুবে যাওয়ার পরও আমার কথা স্মরণ করে আমার প্রশংসা করবে।

মোশরেকদেরকে আক্রমণ করতে গিয়ে যে নতুন আর একটি অধ্যায় শুরু করা হচ্ছে তার সূচনা করা হচ্ছে এই ভয়াবহ দিনের ভীষণ ভীতিজনক অবস্থার ভয় দেখিয়ে, যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, যার ফলে তারা বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে–সে ভীষণ অবস্থার পরই কবর থেকে সবাই উঠে হাশরের মাঠে জমা হয়ে যাবে। সেদিন কারও কোনো তদ্বীর কাজে লাগবে না এবং কোনো সাহায্যকারী সেদিন কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। আজকে তারা নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার তদ্বীর করলেও করতে পারে, কিন্তু সেদিন কোনো ষড়যন্ত্র এবং কোনো তদ্বীর তাদের কোনো কাজে লাগবে না। অবশ্য একথাও সত্য যে, এ চূড়ান্ত আযাব আসার আগেও কিছু শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে, যা তাদেরকে সবার স্মরণের বাইরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে জানে না।

নবীকে মিথ্যাবাদী বলে দোষারোপকারী ও সেইসব যালেম যারা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের পেছনে লেগে থেকেছে, তাদের সম্পর্কে সর্বশেষ এই কঠিন ও প্রচন্ড তিরস্কারের কথা উচ্চারণের পর এ প্রসংগ শেষ করা হচ্ছে। সংগে সংগে শাস্তি না দিয়ে এই কঠিন দিনের অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিলো এই যে, তারা যেন অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ করে সে ভয়ানক দিনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যে দিনের কঠিন আযাব কাছে ও দূরে, সকল দিক থেকে চূড়ান্তভাবে তাদেরকে পাকড়াও করবে।

সবরের নির্দেশ

আযাবের বর্ণনা শেষ করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই প্রিয় নবীর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন যাঁকে দীর্ঘ দিন ধরে যালেমরা কষ্ট দিয়ে আসছিলো। তারা তাঁকে এই বলে দোষারোপ করে আসছিলো যে, আল কোরআন তাঁর নিজের রচনা করা কথা। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এই সব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সবর করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়ার জন্য এবং শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার নির্যাতন করার জন্য সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে তাঁকে এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আরও দঢ়তার সাথে তাঁর দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তারা দাওয়াত গ্রহণ করুক আর না-ই করুক, তারা নিজ নিজ অপরাধের শাস্তি পাক আর না-ই পাক, এসব ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যা চাইবেন তা-ই করবেন। এরশাদ হচ্ছে, 'অতপর তুমি সবর কর এবং তোমার রব-এর পক্ষ থেকে আসা ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে থাক।'

তবে সবর করার জন্য উৎসাহিত করতে গিয়ে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা পাক পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে যেমন সম্মানজনক, তেমনই স্নেহসিঞ্চিত এবং এমন মহব্বত ভরা যা তাঁর দুর্গম পথের যাবতীয় কষ্টকে মুছে দিয়েছে। এর ফলে সবর করা বড়ই প্রিয় বস্তু বলে তাঁর

কাছে মনে হয়েছে। আসলে সবর বা আল্লাহর ওপর ভরসা করে দৃঢ়তা অবলম্বন করে নিজ দায়িত্ব পালন করার মানসিকতাই মহান সম্মানের অধিকারী হওয়ার উপায় হয়। তাই পুনরায় আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তোমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে আসা ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে থাক। অবশ্যই তুমি আমার সাহায্যের মধ্যে রয়েছ।'

কী চমৎকার এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল্লাহ পাকের কথাগুলো কেমন ছবির মতো হৃদয়গ্রাহী হয়ে এখানে ফুটে উঠেছে আর তাকদীর সম্পর্কিত কথাগুলোকে কী সুন্দরভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা দুনিয়ায় আর কেউ কখনও পায়নি। তাঁর প্রতি মর্যাদাসূচক এই যে বিশেষ এক তুলনাহীন ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন, তা এখানেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোরআনের সর্বত্র এই ধরনের সম্মানজনক ভাষা ও বর্ণনাভংগি তাঁর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এমনকি আরও বিভিন্ন জায়গায় সাদৃশ্য দেখাতে গিয়েও এএকই সম্মানজনক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মূসা (আ.)-কে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাকে পছন্দ করেছি। সুতরাং যে ওহী পাঠানো হচ্ছে তা খেয়াল করে শোনো।' আরও বলা হয়েছে,

'আমি তোমার ওপর আমার মহব্বত বর্ষণ করলাম। আর এমন এক বিশেষ ব্যবস্থা নিলাম যাতে করে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।' আরও বলা হয়েছে, 'আর তোমাকে আমি গড়ে তুললাম আমার নিজের প্রয়োজনে।'

উপরোক্ত এ সকল কথা অবশ্যই অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অর্থ ব্যক্ত করছে। কিন্তু মোহাম্মদ (স.)-এর জন্য যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন, 'আমি বলছি, তুমি আমার চোখে চোখে আছ।' এ কথায় এক বিশেষ সম্মানসূচক অর্থ বুঝা যাচ্ছে এবং এ কথায় এক বিশেষ মহব্বত প্রকাশ পাচ্ছে। এ শব্দগুলো অদ্বিতীয় এক ভঙ্গিমায় ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যান্য যে কোনো বর্ণনা-পদ্ধতি থেকে অনেক বেশী মোলায়েম, আরও বেশী স্নেহপূর্ণ। এ এমন বিশেষ পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবীর জন্য ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ করার মতো ভাষা মানুষ কোনো দিন তৈরী করতে পারেনি। সুতরাং 'আমরা আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়াতলে রয়েছি' একথার যে অর্থ সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে রয়েছে, সেই দিকে ইংগিত করেই ক্ষান্ত হওয়া শ্রেয় মনে করছি এবং এই যে কেতাব 'ফী যিলালিল কোরআন' এর মধ্যে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করছি।

এই মহব্বত প্রকাশের সাথে সাথে এ সূরাটির মধ্যে আল্লাহর সাথে মানুষের স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে পদ্ধতি জানানো হয়েছে তাও লক্ষ্যণীয়। এরশাদ হচ্ছে, 'আর তাসবীহ করো তোমার রব-এর প্রশংসার সাথে যখনই তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠো এবং তারাগুলো ডুবে যাওয়ার পরও তাঁর নামের তাসবীহ পড়ো।' আজকের প্রেক্ষাপটে এ আয়াতের শেষ অংশটুকুর অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর তাসবীহ করো রাতে যখন তোমার ঘুম ভেংগে যায়, রাতের প্রথম অংশে এবং ফজরের নামাযের সময়, যখন তারাগুলো ডুবে যায়। এইভাবে যদি আল্লাহর হুকুম পালন করা হয়, তাহলে তাঁর কথায় যথাযথভাবে কান দেয়া হবে বলে আল্লাহ তায়ালা মেনে নেবেন। আর তাসবীহ পাঠ করা, অর্থাৎ সোবহানাল্লাহ পড়ে সৃষ্ট বস্তুর যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি মুক্ত–একথার ঘোষণা দান করা। এইভাবে উল্লিখিত সময়গুলোতে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সময় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে তাঁর মহব্বতকে আকর্ষণ করা হয়, তাঁর সাথে গোপন সম্পর্ক বিনিময় করা সম্ভব হয় এবং তাঁর সাথে বিশেষ আন্তরিকতা গড়ে ওঠে।

সূরা আন্ নজম

আয়াত ৬২ রুকু ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ② وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوٰى ③ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ④ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ⑤ ذُوْ مِرَّةٍ ؕ
فَاسْتَوٰى ⑥ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ⑦ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ⑧ فَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ⑨ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ⑩ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا
رَاٰى ⑪ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑫ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ⑬ عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهٰى ⑭ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ⑮ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ⑯

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা ডুবে যায়, ২. তোমাদের সাথী পথ ভুলে যায়নি, সে পথভ্রষ্টও হয়নি, ৩. সে কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলে না, ৪. বরং তা হচ্ছে 'ওহী', যা (তার কাছে) পাঠানো হয়, ৫. তাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছে এমন একজন (ফেরেশতা), যে প্রবল শক্তির অধিকারী, ৬. (সে হচ্ছে) সহজাত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী; অতপর সে (একদিন সত্যি সত্যিই) নিজ আকৃতিতে (তার সামনে এসে) দাঁড়ালো, ৭. (এমনভাবে দাঁড়ালো যেন) সে উর্ধ্বাকাশের উপরিভাগে (অধিষ্ঠিত); ৮. তারপর সে কাছে এলো, অতপর সে আরো কাছে এলো, ৯. (এ সময়) তাদের (উভয়ের) মাঝে ব্যবধান থাকলো (মাত্র) দুই ধনুকের (সমান), কিংবা তার চাইতেও কম! ১০. অতপর সে তাঁর (আল্লাহর) বান্দার কাছে ওহী পৌঁছে দিলো, যা তার পৌঁছানোর (দায়িত্ব) ছিলো; ১১. (বাইরের চোখ দিয়ে) যা সে দেখেছে (তার ভেতরের) অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি। ১২. তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছো যা সে নিজের চোখে দেখেছে! ১৩. (সে ভুল করেনি, কারণ) সে তাকে আরেকবারও দেখেছিলো, ১৪. (সে তাকে দেখেছিলো) 'সেদরাতুল মোন্তাহা'র কাছে। ১৫. যার কাছেই রয়েছে (মোমেনদের চিরস্থায়ী) ঠিকানা জান্নাত; ১৬. সে 'সেদরাটি' (তখন) এমন এক (জ্যোতি) দিয়ে আচ্ছন্ন ছিলো, যা দ্বারা তার আচ্ছন্ন হওয়া (শোভনীয়) ছিলো,

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ

وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ

اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ

مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا

تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾

১৭. (তাই এখানে তার) কোনো দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং তার দৃষ্টি কোনোরকম সীমালংঘনও করেনি। ১৮. অবশ্যই সে আল্লাহ তায়ালার বড়ো বড়ো নিদর্শনসমূহ দেখেছে। ১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উযযা' সম্পর্কে? ২০. এবং তৃতীয় আরেকটি (দেবী) 'মানাত' সম্পর্কে! ২১. (তোমরা কি মনে করে নিয়েছো,) পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্যে আর কন্যা সন্তান সব আল্লাহর জন্যে? ২২. (তা হলে তো) এ (বন্টন) হবে নিতান্তই একটা অসংগত বন্টন! ২৩. (মূলত) এগুলো কতিপয় (দেব দেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা ঠিক করে নিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা এ (নামে)-র সমর্থনে কোনো রকম দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি; এরা (নিজেদের মনগড়া) আন্দায অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাংখার ওপর চলে, অথচ তাদের কাছে (ইতিমধ্যেই) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হেদায়াত এসে গেছে। ২৪. অতপর (তোমরাই বলো, এদের কাছ থেকে) মানুষ যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পেতে পারে– ২৫. দুনিয়া ও আখেরাত তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই।

রুকু ২

২৬. কতো ফেরেশতাই তো রয়েছে আসমানে, (কিন্তু) তাদের কোনো সুপারিশই ফলপ্রসূ হয় না– যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা, যাকে ইচ্ছা এবং যাকে ভালোবাসেন তাকে অনুমতি না দেন। ২৭. যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারা ফেরেশতাদের (দেবী তথা) নারীবাচক নামে অভিহিত করে।

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾

২৮. অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নেই; তারা তো কেবল আন্দায অনুমানের ওপরই চলে, আর সত্যের মোকাবেলায় (আন্দায) অনুমান তো কোনো কাজেই আসে না, ২৯. অতএব (হে নবী), যে ব্যক্তি আমার (সুস্পষ্ট) স্মরণ থেকে সরে গেছে, তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করো না, (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না; ৩০. তাদের (মতো হতভাগ্য ব্যক্তিদের) জ্ঞানের সীমারেখা তো ওটুকুই; (এ কথা) একমাত্র তোমার মালিকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। ৩১. আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছু আল্লাহ তায়ালার জন্যে, এতে করে যারা খারাপ কাজ করে বেড়ায় তিনি তাদের (খারাপ) প্রতিফল দান করবেন এবং যারা ভালো কাজ করে তাদের তিনি (এ জন্যে) মহাপুরস্কার প্রদান করবেন; ৩২. (এটা তাদের জন্যে) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে এবং (বিশেষত) অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোখাটো গুনাহ (সংঘটিত) হলেও (তারা আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে না, কারণ), তোমার মালিকের ক্ষমা (-র পরিধি) অনেক বিস্তৃত; তিনি তোমাদের তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকে পয়দা করেছেন, (তখনও তিনি তোমাদের জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রুণের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্র দাবী করো না; আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কোন ব্যক্তি (তাঁকে) বেশী ভয় করে।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾

রুকু ৩

৩৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিটিকে দেখোনি, যে (আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, ৩৪. যে ব্যক্তি সামান্য কিছুই দান করলো, অতপর সম্পূর্ণভাবে (নিজের) হাত গুটিয়ে নিলো। ৩৫. তার কাছে কি অদৃশ্য জগতের কোনো জ্ঞান ছিলো যে, তা দিয়ে সে (অন্য কিছু) দেখতে পাচ্ছিলো। ৩৬. তাকে কি (একথা) জানানো হয়নি যে, মূসার (কাছে পাঠানো আমার) সহীফাসমূহে কি (কথা লেখা) আছে, ৩৭. (তাকে কি) ইবরাহীমের কথা জানানো হয়নি, ইবরাহীম তো (আল্লাহর) বিধানাবলী পুরোপুরিই পালন করেছে, ৩৮. (তাকে কি এটা বলা হয়নি যে,) কোনো মানুষই অন্যের (পাপের) বোঝা উঠাবে না, ৩৯. মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা করবে, ৪০. আর তার কাজকর্ম (পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এবং অচিরেই তা) দেখা হবে, ৪১. অতপর তাকে তার পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে, ৪২. পরিশেষে (সবাইকে একদিন) তোমার মালিকের কাছেই পৌঁছুতে হবে, ৪৩. তিনিই (সবাইকে) হাসান, তিনিই (সবাইকে) কাঁদান, ৪৪. তিনিই (মানুষকে) মারেন, তিনিই (তাদের) বাঁচান, ৪৫. তিনিই নর নারীর যুগল পয়দা করেছেন, ৪৬. (পয়দা করেছেন) এক বিন্দু (স্খলিত) শুক্র থেকে, ৪৭. নিশ্চয়ই পুনরায় এদের জীবন দান করার দায়িত্বও (কিন্তু) তাঁর (একার), ৪৮. তিনিই (তাকে) ধনশালী করেন এবং তিনিই পুঁজি দান করে তা স্থায়ী রাখেন, ৪৯. তিনি 'শেরা' (নামক) নক্ষত্রেরও মালিক, ৫০. তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন,

وَثَمُوْدَاْ فَمَآ أَبْقٰى ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ أَظْلَمَ

وَأَطْغٰى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوٰى ﴿٥٣﴾ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ

تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُوْلٰى ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُوْنَ

সাজদা

وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿٦٢﴾

৫১. (তিনি আরো ধ্বংস করেছেন) সামুদ জাতিকে (এমনভাবে), তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখেননি, ৫২. এর আগে (তিনি ধ্বংস করেছেন) নূহের জাতিকে; কেননা তারা ছিলো ভীষণ যালেম ও চরম বিদ্রোহী; ৫৩. তিনি একটি জনপদকে ওপরে উঠিয়ে উল্টো করে ফেলে দিয়েছেন। ৫৪. অতপর সে জনপদের ওপর তিনি ছেয়ে দিলেন এমন এক (ভয়ংকর) আযাব, যা (তাকে পুরোপুরিভাবে) ছেয়ে দিলো, ৫৫. তারপরও (হে নির্বোধ মানুষ,) তুমি তোমার মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনে সন্দেহ প্রকাশ করো! ৫৬. (আযাবের) সতর্ককারী (এ নবী তো) আগের (পাঠানো) সতর্ককারীদেরই একজন! ৫৭. (ত্বরিত আগমনকারী কেয়ামতের) ক্ষণটি (আজ) আসন্ন হয়ে গেছে, ৫৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই সে ক্ষণটির (দিন কাল সম্পর্কিত তথ্য) উদঘাটন করতে পারবে না; ৫৯. এগুলোই কি (তাহলে) সেসব বিষয়– যার ব্যাপারে তোমরা (আজ রীতিমতো) বিস্ময়বোধ করছো, ৬০. (এসব বিষয় নিয়ে) তোমরা (আজ) হাসাহাসি করছো, অথচ (পরিণামের কথা ভেবে) তোমরা মোটেই কাঁদছো না, ৬১. (মনে হচ্ছে) তোমরা (মূল ব্যাপারেই) উদাসীন হয়ে রয়েছো। ৬২. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে সাজদাবনত হও এবং (কাউকে শরীক করা ব্যতীত) তাঁরই এবাদাত করো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটির প্রধান অংশ মনে হয় কবিতা আকারে নাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি ছত্রের মধ্যকার চমৎকার ছন্দ ও শব্দাবলীর পারস্পরিক মিল পাঠকের মনে প্রাণ মাতানো এমন এক ঝংকার তোলে, যা যে কোনো সংগীতের মূর্ছনাকে হার মানায়। সংগীতের এই ধ্বনি সূরাটির সর্বত্র যদিও এক মনোমুগ্ধকর আবেগের পরশ বুলিয়ে দেয়, তবুও সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠে, পাঠককে তা সচেতন করে তোলে। তার হৃদয়-কমলে ভাবের আবেগ সৃষ্টির জন্যে এবং আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কখনও কখনও সমার্থবোধক শব্দের সংযোজন করা হয়েছে, অথবা কখনও পংক্তির শেষে চমৎকার মিল দেখানো হয়েছে। এইভাবে কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুসারে মূল উদ্দেশ্যকে অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে,

'তোমরা কি লাত ও ওযযাকে দেখোনি, দেখোনি কি মানাত নামীয় তৃতীয় আরো একজনকে?' যদি বলা হতো 'মানাতাল্ উখরা', তাহলে ছন্দ পতন ঘটতো। আবার যদি বলা হতো 'অ-মানাতাস্ সালেছাতা' তাহলেও লাইনের শেষে মিল থাকতো না। আর যেহেতু যে কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের নিজস্ব একটি মূল্যমান রয়েছে, তাই অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেকটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের শেষে যেমন মিল রাখা হয়েছে, তেমনি ছন্দ পতন না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে। এমনই পরবর্তী দুটি আয়াতের ছন্দের সাথে মিল রাখতে গিয়ে মাঝে আর একটি শব্দ 'ইযান' ব্যবহার করা হয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে শুধু ছন্দ ঠিক রাখার জন্যেই 'ইযান' শব্দটি বসানো জরুরী মনে করা হয়েছে, কারণ এ শব্দটি ছাড়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে কথাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে ছন্দের মিল-এর দিকে বিশেষভাবে খেয়াল দেয়া হয়েছে।

এখানে এই সুরের মূর্ছনার দুটি উল্লেখযোগ্য দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে এর বর্ণনাভংগি, যা পাঠকের অন্তরে ভাবের এক তরংগ সৃষ্টি করে এবং রব্বুল আলামীনের সাথে তার নিবিড় সম্পর্কের কথা জানায়, বিশেষ করে সূরাটির প্রথম ও শেষ ভাগে এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগের ছন্দময় কথাগুলো পাঠকের হৃদয়কে এমন আবেগমুগ্ধ করে যে, সে যেন সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে থাকে এবং প্রেমাস্পদের সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তার মধ্যে এক মধুময় কম্পন সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কথাগুলো বান্দা ও প্রভুর মধ্যে সম্পর্কের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোকে তুলে ধরে। আর এই দুটি অধ্যায়ের মাঝের কথাগুলো আবেগ ও যুক্তির মধ্যে এক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে।

সৃষ্টি রহস্যের বাস্তব চিত্র এবং অজানা-অচেনা অথচ গভীর ও আকর্ষণীয় এক মধুময় সম্পর্কের আবেগ যেন এক মায়াময় ছায়া যা পাঠকের হৃদয়পটে নূরানী আলোর এক শুভ্র সমুজ্জ্বল ছটা ছড়িয়ে দেয় এবং ভক্তের হৃদয়কে প্রভুর অস্তিত্ববাহী আদিগন্তব্যাপী রহস্যরাজির সাথে গভীরভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সৃষ্টির উন্মুক্ত অঙ্গনে সঞ্চরণশীল বিশ্বস্ত বার্তাবাহক জিবরাঈল (আ.) সে রহস্যজাল ভেদ করে সম্মানিত রসূল (স.)-এর কাছে আল্লাহর বাণী বহন করে হাযির হয়েছেন তা আর বুঝতে কষ্ট হয় না। সৃষ্টি রহস্যের দৃশ্য-অদৃশ্য ছবি সঞ্চরণশীল গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকারাজি, ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়াদি এবং আত্মিকভাবে অনুভব করার মতো বিষয়সমূহ সব কিছুই পরস্পর এক অবিচ্ছেদ্য সুতায় গাঁথা রয়েছে। আলোচ্য সূরার চমৎকার ছন্দময় আয়াতগুলোর সুরের ঝংকারে এ সত্যটি ধরা পড়ে।

তারপর দেখা যায় শ্বাস-রোধকারী এক আশ্চর্য আবেগ ছড়িয়ে রয়েছে সূরাটির সর্বত্র। এই আবেগের চিহ্নগুলো পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে নীচে বর্ণিত অধ্যায়গুলোতে যা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাকে উজ্জীবিত করে তোলে তার অস্তিত্বের অণুপরমাণুগুলোর মধ্যে এক প্রকম্পন সৃষ্টি হয়, সে ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় তাই যা অন্যান্য মক্কী সূরার মধ্যে বর্তমান, অর্থাৎ ঈমান-আকীদার মূল বিষয়গুলো, ওহী, আল্লাহ তায়ালার একত্ব এবং আখেরাত। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় যে, ওহীর সত্যতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস জন্মানো এবং শেরেক ও-এর অলীক ধারণা-কল্পনার অসারতা প্রমাণের জন্যে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

সূরাটির প্রথমাংশে আলোচ্য বিষয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ওহীর প্রকৃতি ও তাৎপর্য পেশ করা এবং এ বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য বহনকারী বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে দুটি প্রমাণ হাযির করে ওহীর সত্যতা ও বাস্তবতা তুলে ধরা। এ বিষয়ে রসূল (স.) এবং জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত, তাঁকে খোলা চোখে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত আয়াতসমূহ দ্বারা তার সাক্ষ্যদানও এ সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে মোশরেকদের দাবী করা দেব-দেবী লাত, উযযা ও মানাত এবং ফেরেশতাকুল সম্পর্কে তাদের কাল্পনিক ধারণা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে তাদের আল্লাহর কন্যা হওয়া সম্পর্কে কল্পকাহিনীর কথা এবং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা। অথচ অনুমান সত্যপ্রাপ্তির পথে মোটেই সহায়ক নয়। পাশাপাশি এ কথাও তুলে ধরা হয়েছে যে, 'আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (স.) বর্তমান রয়েছেন, যিনি তাদেরকে সেই জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে আহবান করে যাচ্ছেন যার দিকে তিনি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা, চাক্ষুষ সাক্ষ্য ও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এ পর্যন্ত ডেকে এসেছেন।'

সূরার তৃতীয় অংশে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিশেষভাবে পার্থিব সেইসব বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে চলা হয়েছে যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং শুধু দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং এমন সব বাধায় লাগিয়ে দেয় যার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। আখেরাত ও আখেরাতের জীবনে মানুষের অতীত কার্যকলাপের যে প্রতিদান দেয়া হবে সে সম্পর্কে তাঁকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৃষ্টির দিন ও পৃথিবীতে প্রেরণের দিন থেকেই অবগত এবং তখন থেকেই সবার অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন, জানেন তাদেরকে তখনও যখন তারা মায়ের পেটে ভ্রূণ হিসাবে অবস্থান করে। তারা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে যেটুকু জানে তার থেকেও বেশী তিনি তাদেরকে জানেন। সুতরাং এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন ও প্রতিদান দেবেন, কোনো আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে নয়। আর এইভাবে অবশেষে তাদের কাজের যথাযথ ফল তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

সূরার চতুর্থ ও শেষ অংশে, আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি কি, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক আগমনের সূচনা থেকে নিয়ে এক এক করে তাঁর অনুসারী বৃদ্ধি পাওয়া, সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ, ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা এবং সৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে তাদের সকল কাজ নিয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা এসেছে। এসব কিছুর সাথে

আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে প্রাচীনকালের সত্য বিরোধী ও সত্য অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কে, যারা শেষ পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই বলা হচ্ছে, 'এ ব্যক্তি হচ্ছে পূববর্তী সতর্ককারীদের মতই একজন সতর্ককারী। কেয়ামত আগতপ্রায়, (কিন্তু কখন এটা বাস্তবে সংঘটিত হবে) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তা অন্য কেউ প্রকাশ করতে পারে না। সেই জন্যেই কি তোমরা এ ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছ এবং হাসি-বিদ্রূপ করছো, আর ভয়াবহতা বুঝতে না পারার কারণে কাঁদছ না? বরং তোমরা কি কৌতুক করছো? (সময় থাকতেই সাবধান হও) আল্লাহর কাছে অবনত মাথায় ঝুঁকে পড়ো এবং নিরংকুশভাবে তাঁরই আনুগত্য করো।' এইভাবেই সূরাটির সূচনা ও পরিসমাপ্তির কথাগুলোর মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে তা সর্ব সাধারণের বোধগম্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাফসীর

'কসম নক্ষত্রের যখন তা ডুবে যায়, তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হয়নি বা সঠিক পথ পরিত্যাগও করেনি। আর সে মনগড়া কোনো কথাও বলে না, যা বলে তা তো ওহী যা তার ওপর অবতীর্ণ হয় ......অবশ্যই সে তার রব-এর মহান নিদর্শনগুলো দেখেছে।'

সূরার শুরুতে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী পেশ করা হয়েছে, শুভ্র সমুজ্জ্বল সে সুন্দর শোভাসাগরে কিছু সময় অবগাহন করার সময় আমরা কম্পিত হৃদয়ে অনুভব করি যে, মোহাম্মদ (স.) এমনই স্নিগ্ধ পরিবেশে জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাত যখন পেয়েছিলেন তখন তাঁর হৃদয় কেমন ভাবাবেগে পূর্ণ হয়েছিলো। আমরা কল্পনার চোখে যেন দেখতে পাচ্ছি সেই আলোকময় পাখাগুলো যা ঝাপটা মেরে এ মহান ফেরেশতাকে ঊর্ধাকাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা শুনতে পাচ্ছি ধীরগতিতে তালে তালে উত্থিত সে পাখার মৃদু মধুর ধ্বনি। একইভাবে আরও যেন শুনতে পাচ্ছি সে উড্ডয়নের শব্দ কখনও অস্পষ্ট আবার কখনও খুবই স্পষ্টভাবে।

পেয়ারা নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সাথে আমরাও যেন চোখ বন্ধ করে সেই মনোরম দৃশ্য অবলোকন করছি, যেন পর্দাটা সরে গেলেই ঊর্ধাকাশের সেই মহান দৃশ্য দৃষ্টিপটে ভেসে উঠবে। শোনা যাবে, দেখাও যাবে এবং সে দৃশ্য যেন দীর্ঘদিন হৃদয়ের পর্দায় অম্লান রয়ে যাবে। এই সেই দৃশ্য যা প্রিয় নবী (স.)-এর স্বচ্ছ হৃদয়পটে বিশেষভাবে অংকিত হয়েছিলো। অবশ্য আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাহদের প্রতি অনেক মেহেরবানী করেছেন এবং এসব দৃশ্যেগুলোর জীবন্ত ছবি তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন, তাদের অন্তরের সন্দেহ ও দুশ্চিন্তার কলুষ-কালিমাকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ঊর্ধাকাশের স্বচ্ছতার মতই তাদের অন্তরের গগনে স্বচ্ছতা এনে দিয়েছেন। তাদেরকে ধীরে ধীরে এবং এক এক পা করে এমনভাবে বিভিন্ন দৃশ্য ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর রহস্য-ভান্ডারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন যে অবশেষে তাদের মন পরিপূর্ণ সন্দেহমুক্ত হয়ে গিয়েছে ও এমনভাবে সে দৃশ্য মযবুত হয়ে গিয়েছে যেন তারা নিজ চোখে সে রহস্য ভান্ডারকে দেখতে পেয়েছে।

আল্লাহর শপথ বাক্য

তাই, এই সঞ্জীবনী গুণটিই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তারকার কসম খাওয়া, 'কসম তারকার যখন তা অস্তমিত হয়।' আর তারকার চমকানো, পতন বা নিকটে আসা এগুলো সবই জিবরাঈল (আ.)-এর ঊর্ধাকাশে গমনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। 'আর সে ঊর্ধাকাশে প্রতিভাত হলো, তারপর নিকটতর হলো এবং নেমে এলো এত কাছে যেন মাত্র দুটি ধনুকের মধ্যকার ব্যবধানের মতই দূরত্ব রয়ে গেল, বা তার থেকেও নিকটে চলে এলো। তারপর আল্লাহর বান্দার নিকটে পেশ

করলো সেই কথাগুলো যা আল্লাহ তায়ালা নিজে তাকে দিয়েছিলেন।' এমনিভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতের পর থেকে নিয়ে সে দৃশ্য, তার সঞ্চালন, তার ছায়া ও তার বাস্তব কাজের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বুঝা যায়।

'কসম তারকার যখন তা অস্তমিত হয়।' তারকার এই কসম খাওয়ার বিভিন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তবে সব থেকে গ্রহণযোগ্য যে ব্যাখ্যাটি আমাদের বুঝে আসে, তা হচ্ছে তারকা বলতে 'শে'রা' নামক তারাটিকে বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো আরব যার পূজা করতো এবং এই সূরার মধ্যে পরবর্তী এক জায়গায় 'শে'রা'র উল্লেখও এসেছে; যেমন বলা হয়েছে 'আর তিনিই শে'রা'র রব।' প্রাচীন কালে 'শে'রা' তারাটিকে মহা সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হতো। আর প্রাচীন মিসরীয়রা শে'রার তলদেশ দিয়ে গমন করতে পারাকে প্রচুর সম্পদশালী হওয়ার পূর্বাভাস মনে করতো। এ কারণে তাক লাগিয়ে থাকতো তারা শে'রা-কে খুঁজে পাওয়ার জন্যে এবং এর নড়া-চড়া প্রত্যক্ষ করার জন্যে বিস্তর সময় ব্যয় করতো। ইরান ও আরবের প্রাচীন লোকদের মধ্যে সমভাবে এই নক্ষত্রের মূল্যায়ন করা হতো। সুতরাং, আলোচ্য সূরার মধ্যে তারকা বলতে এই তারাটিকেই বুঝানো হয়েছে বলে অধিকাংশ লোকের ধারণা। এখানে ভালোবাসার প্রতীক বুঝাতে গিয়ে এই তারাটিই অধিক প্রাসংগিক যার দিকে আমরাও ইংগিত করেছি। অপর আর একটি অর্থ হচ্ছে, উজ্জীবিত করা, কারণ তারা বলতে প্রায়ই অত্যন্ত বিরাট এমন এক জিনিসকে বুঝায় যা নড়াচড়া করে বা স্থান পরিবর্তন করে, সুতরাং কোনো স্থানের সাথে বিজড়িত সঞ্চারণশীল কোনো জিনিস উপাস্য হতে পারে না। মাবূদ বা উপাস্য মহান সেই সত্তা যিনি স্থান-কালের সীমার ঊর্ধে বিরাজমান স্থায়ী শক্তি।

আরব সাধারণ ও তৎকালীন পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে বিবেচিত এই তারার কসম খেয়ে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, নবী (স.) সেই সৌভাগ্যের প্রতীক যিনি তারার প্রভুর তরফ থেকে প্রেরিত এবং তিনি প্রেরিত হয়েছেন ওহী নিয়ে যা তিনি তাদের কাছে পেশ করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

ওহী আগমনের মাধ্যম

'তোমাদের সাথী পথহারা হয়নি এবং কোনো ভুল পথও গ্রহণ করেনি, আর সে খেয়াল-খুশী মতো বা মনগড়া কোনো কথাও বলছে না। সে যা বলছে, তাতো সেই ওহী যা তার কাছে পাঠানো হয়েছে।'

অতএব, তোমাদের সংগী (যাকে তোমরা সর্বদাই ধারে-কাছে দেখতে পাও) সঠিক পথের পথিক, কোনো ভুল পথে চালিত সে নয়। সে হেদায়াতপ্রাপ্ত, সে ইচ্ছা করে কোনো ভুল পথে চলছে না। আন্তরিকতাপূর্ণ ও নিষ্ঠাবান সে, কোনো স্বার্থপর ব্যক্তি সে নয়। সে সত্য-প্রচারক এবং সত্যকে মহাসত্য সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সে পেয়েছে। সে ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে কথা বলার মানুষ নয়। তৈরী করে কোনো কথাও সে বলছে না বা নিজে কোনো কথার উদ্ভাবকও নয়। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তাবাহক হিসেবে কথা বলার সময় কোনো মনগড়া কথা (বাড়িয়ে বা কমিয়ে) সে বলে না। যা সে বলে তা তো সেই ওহী যা তার কাছে প্রেরণ করা হয় এবং একজন সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবেই সে তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়।

এই ওহী সুপরিচিত। এর বহনকারী ওহীর আগমন পথকে স্থির ও সুনির্দিষ্ট ভাবে জানেন। সে আগমন-পথ তাঁর নিজ চোখে দেখা। রসূলুল্লাহ (স.) নিজ চর্ম চোখে এবং অন্তরের চোখ দিয়েও

দেখেছেন সে পথকে। আর এই কারণেই তিনি কোনো ধারণা-কল্পনার বশবর্তী হননি অথবা কোনো ধোঁকাবাজির মধ্যে নেই, এরশাদ হচ্ছে,

'তাকে শিক্ষা দিয়েছে অত্যন্ত শক্তিধর এক ব্যক্তি (ফেরেশতা), যে জবরদস্ত শক্তির অধিকারী।' তারপর নিজ দায়িত্ব পালনে সে সুপ্রতিষ্ঠিত, আর সুউচ্চ দিগন্তে আবির্ভূত। তারপর সে নিকটবর্তী হলো এবং নেমে এলো অতি কাছে। এতো কাছে যেন দুটি ধনুককে মুখোমুখি স্থাপন করলে অথবা মুখোমুখি ধরলে ধনুক দুটির পিঠ বা কাঠের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে সেই ব্যবধানের মধ্যে সে জিবরাঈল (আ.) এসে গেলো, অথবা এর থেকে আরও কাছে এসে গেল। তারপর সে আল্লাহ তায়ালার বান্দার কাছে সেই ওহী পেশ করলো যা আল্লাহ তায়ালা নিজে তাকে দিয়েছিলেন। রসূলের অন্তর যা দেখেছে এবং অনুভব করেছে সে বিষয়ে সে কোনো মিথ্যা কথা বলেনি, তোমরা কি সেই বিষয়ে কোনো তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও যা সে (তার চর্ম চোখ) দেখেছে?'

আর 'দারুণ শক্তিশালী' বলতে জিবরাঈল (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর সাথী মোহাম্মদ (স.)-কে সেই জিনিসটিই শিখিয়েছেন যা মোহাম্মদ (স.) তোমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। এটিই হচ্ছে সেই সুনির্দিষ্ট পথ এবং মহান পথ পরিক্রমা যার সূক্ষ্মতা রসূল (স.)-এর নিজ চোখে দেখা। আর নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করার এ কাজ ওহী নাযিল হওয়ার সূচনালগ্নেই সংঘটিত হয়েছিলো যখন মোহাম্মদ (স.) জিবরাঈল (আ.)-কে সেই আসল মূর্তিতে দেখেছিলেন যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকান্ড সেই অবয়ব দিগন্তব্যাপী ছেয়েছিলো। তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হতে হতে একেবারে তাঁর মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে এসে গেলেন। এতটা কাছে এলেন যেন মুখোমুখি রাখা দুটি ধনুকের দূরত্ব মাত্র রয়ে গেল তাদের মধ্যে অথবা এই দূরত্ব থেকেও আরও বেশী কাছে এসে গেলেন। আসলে চরম নৈকট্য বুঝাতে গিয়েই এই উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। তারপর সে মহান ফেরেশতা আল্লাহর বান্দার কাছে সেই ওহী পেশ করলেন যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে দান করেছিলেন। এ বর্ণনাভংগিতে সংক্ষিপ্ত কথায় ওহীর গুরুত্ব, এর বাহকের বিশালত্ব ও ভয়াবহতা যুগপৎভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রসূল (স.) জিবরাইলকে নিজের চোখে দেখেছেন

জিবরাঈল (আ.)-কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার এই সৌভাগ্য সংঘটিত হয়েছে যেমন কাছ থেকে, তেমনি দূর থেকেও। তাই এই ওহীর মধ্যে একাধারে বার্তা, শিক্ষা, বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা পাওয়া যায়। এ এমন একটি অবস্থা যার মধ্যে কোনো সন্দেহ-সংশয় বা মিথ্যা হওয়ার আশংকা বা তর্ক-বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই। তাই এরশাদ হয়েছে, 'অন্তর মিথ্যা বলেনি সেই বিষয়ে যা সে নিজের চোখে দেখেছে। এমতাবস্থায় তোমরা কি তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চাও সে ব্যাপারে যা সে নিজের চোখে দেখেছে?'

চোখের দেখা ভুল হলেও হতে পারে, কিন্তু অন্তরের চোখে দেখা (গভীরভাবে দেখার বাস্তবতা উপলব্ধি করা) আরও বেশী বাস্তব এবং আরও বেশী দৃঢ়। তিনি নিজ চোখে দেখলেন, তারপর তাঁর কাছে এই দেখাটা নিশ্চিত হয়ে গেল এবং তার অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গেল যে, তিনিই সেই ফেরেশতা যিনি তার রব-এর দূত হিসেবে তাঁর কাছে ওহী বহন করে নিয়ে এসেছেন। সে ফেরেশতা এসেছেন তাঁর কাছে আল্লাহর কথাগুলো তাঁকে শেখাতে এবং সে কথাগুলোকে তাঁর মাধ্যমে মানবমন্ডলীর কাছে পৌঁছে দিতে। বর্ণনা ধারার এ পর্যায়ে এসে যাবতীয় তর্ক-বিতর্ক ও ওহীর সত্যতা সম্পর্কে ঝগড়া-ঝাটির সকল সুযোগ খতম হয়ে গেল। মনের নিশ্চিন্ততা ও অন্তরের

প্রশান্ততা এসে যাওয়ার পর জিবরাঈল (আ.) ও মোহাম্মদ (স.) এই দুই ব্যক্তির কারো মধ্যে আর কোনো সংশয়ই রইলো না।

জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর নিজ আসল মূর্তিতে রসূল (স.) শুধু এই একবারই দেখেছিলেন এমন নয়, আরও একবার এই আসল চেহারায় দেখার কাজ সংঘটিত হয়েছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাকে সে অবশ্যই দেখেছে আর একবার, সেদরাতুল মোনতাহার নিকটে, যার কাছে রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া (চিরস্থায়ী বাসস্থানের বাগিচা), সে সময়ে সেই গাছটিকে জিবরাঈল (আ.)-এর অবয়ব পুরোপুরিভাবে ঢেকে ফেলেছিলো। এ দৃশ্য সে (মোহাম্মদ) স্থির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, তার নযর সরেও যায়নি এবং অতিরিক্ত কিছুও সে দেখেনি। সেদিন সে তার 'রব'-এর বহু বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখেছে।

এই দেখার ঘটনা ঘটে ইস্‌রা কিংবা মেরাজ-এর রাতে—এটিই বিশ্বস্ত রেওয়ায়াতসমূহের কথা মোহাম্মদ (স.)-সে দিনও তাঁর খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান। সে দিনও তিনি তাঁর সেই অবয়ব ও চেহারা নিয়ে 'সেদরাতুল মোনতাহার' কাছে অবস্থান করছিলেন, যে চেহারায় আল্লাহ পাক তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। সেদরা শব্দটি বলতে একটি গাছকে বুঝায়, আর সেদ্‌রাতুল মোনতাহা বলতে সেই গাছটিকে বুঝায় যেখানে এসে মেরাজ-এর সফরের একপর্যায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এরই নিকটে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া, অথবা বলা যায় এখানে এসেই মে'রাজ (আরোহণ কাজ) সমাপ্ত হয়েছিলো, অথবা বলা যায় এ পর্যন্ত এসে জিবরাঈল (আ.)-এর মোহাম্মদ (স.)-কে সংগ দান করার কাজটি শেষ হয়েছিলো। এখানে তিনি পেছনে থেকে গিয়েছিলেন এবং মোহাম্মদ (স.) একাই পরবর্তী পর্যায়ের দিকে আরোহণ করেছিলেন, যা তাঁকে তাঁর রব-এর আরশ-এর আরও আরও নিকটতর করে দিয়েছিলো। এ সকল অবস্থা আল্লাহ তায়ালার রহস্যরাজির মধ্যে বিশেষ বিশেষ রহস্য যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানিত বান্দা মোহাম্মদ (স.)-কে তা প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। এর বেশী আমাদেরকে কিছু জানানো হয়নি এবং এ সবের আরও বিস্তারিত অবস্থা আমাদের পক্ষে জানার আর কোনো উপায়ও নেই। এর থেকে বেশী জানা আমাদের শক্তিরও বাইরে। মানুষ ও ফেরেশতাকুলের সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ ও আল্লাহ তায়ালাই এ সম্পর্কে বলতে পারেন, যেহেতু মানুষ ও ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ একমাত্র তিনিই জানেন।

আরও বেশী গুরুত্ব ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মানোর উদ্দেশ্যে সেদরাতুল মোনতাহার কাছে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো তার দিকে কিছু ইংগিত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন সে ঢেকে ফেললো পুরোপুরিভাবে সেই গাছটিকে।' এর বিস্তারিত আর কোনো বর্ণনা দেয়া হয়নি বা কোনো সীমাও নির্ধারণ করা হয়নি। এ বিষয়ক বিবরণ ও সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত যে কথাগুলো এসেছে তা এর বিরাটত্ব ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যেই বলা হয়েছে মাত্র। তবে এসব কিছু যে নিরেট সত্য সঠিক এবং সন্দেহাতীত বাস্তবতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরশাদ হচ্ছে,

('এ মহাদৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর) দৃষ্টি সরে যায়নি বা বিভ্রান্তও হয়নি'—এসময় প্রিয় নবী (স.)-এর চোখে কোনো ধাঁধা লাগেনি বা তাঁর দৃষ্টি ফিরেও আসেনি, বরং এ ছিলো খোলা চোখের স্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত দেখা, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। মোহাম্মাদুর রসূলুলাহ (স.) সেখানে তাঁর রব-এর বহু বিরাট বিরাট নিদর্শন নিজ চোখে দেখেছিলেন। খোলা চোখের চাহনি দিয়ে সেদিন প্রিয় নবী (স.) হৃদয়ের প্রশান্তিসহ সরাসরি বহু রহস্য অবলোকন করেছিলেন।

এসব কিছুর মধ্যে আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হচ্ছে ওহী। এই ওহীর বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তোলার জন্যে এত সব আয়োজন, যাতে করে ওহীর সত্যতা ও বাস্তবতা মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে ও সর্বপ্রকার সন্দেহ-মুক্ত করে দিতে পারে। আনতে পারে নিশ্চিত বিশ্বাস, স্থাপন করতে পারে আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক। আল্লাহ পাককে বলিষ্ঠভাবে জানা ও চেনার পথ সহজ হয়ে যায়। তিনি যে সদা সর্বদা তাঁর অনুগত বান্দাদের সাথেই আছেন এই অনুভূতি জোরদার হয় এবং তাঁর কাছেই যে সকলকে অবশেষে ফিরে যেতে হবে, তার বাস্তবতা সুপ্রশস্তভাবে যেন মানুষের বোধগম্য হয়। এই সুনিশ্চিত বিশ্বাস নিয়েই তোমাদের সেই সংগী দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সমাজের বুকে দাঁড়াচ্ছেন যাঁকে তোমরা উপেক্ষা করছ, তাঁর কথার সত্যতাকে অস্বীকার করছো এবং ওহীর সত্যতা সম্পর্কে নানা প্রকার সন্দেহ আরোপ করছ। অথচ তিনি তোমাদের সেই সংগী যাঁকে তোমরা এ পর্যন্ত জেনেছো, চিনেছ এবং তাঁর যাবতীয় অবস্থা তোমাদের নিশ্চিতভাবে জানা রয়েছে। এমন তো নয় যে, তিনি তোমাদের মধ্যে একজন আগন্তুক, যার কারণে তাঁকে অচেনা, অজানা মনে করতে পারো এবং অবহেলা করতে পারো। তাই তাঁর রব-প্রতিপালক তাঁর সত্যতা ঘোষণা করছেন এবং তাঁর সত্যতা সম্পর্কে কসম দিয়ে কথা বলছেন, আর কেমনভাবে তিনি তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন তার বর্ণনা পেশ করছেন। এ মহান আমানত তিনি কোন্ পাত্রে দান করছেন, কাকে দিচ্ছেন তিনি এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কিভাবেই বা তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং কোথায় বা দেখলেন তাকে—এসব কিছুর বিশদ বর্ণনা আল্লাহ পাক পেশ করছেন।

এই হচ্ছে অতি নিশ্চিত সে বিষয়টি যার দিকে মোহাম্মদ (স.) দাওয়াত দিচ্ছেন। এখন এসব ব্যক্তি তাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যেসব দেব-দেবীর পূজা করতো তার সপক্ষে তারা কোন্ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছে? কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তারা লাত, ওযযা ও মানাতের পূজা করে চলেছে? তাদের এসব মাবূদের পূজা করার পক্ষে তাদের কাছে কি দলীল বা যুক্তি-প্রমাণ আছে? এবং কোন্ ক্ষমতার ওপর ভরসা করে এসব অলীক ধ্যান-ধারণাকে তারা জিইয়ে রেখেছে? এই সব বিষয়ের ওপরই এ সূরার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা এসেছে।

লাত, মানাত ওযযার স্বরূপ

এরশাদ হচ্ছে 'ভেবে দেখেছো কি তোমরা লাত ও ওযযা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আর একজন, মানাত সম্পর্কে? .... আর প্রকৃতপক্ষে ওদের কোন (সঠিক) জ্ঞান নেই, নিছক ধারণা-কল্পনার বশবর্তী ওরা কাজ করে। আর প্রকৃতপক্ষে সত্য পথ-প্রাপ্তির ব্যাপারে নিছক ধারণা-কল্পনা তাদেরকে কোনো সাহায্য করে না।'

'লাত' ছিলো তাদের মনগড়া খোদার একজন এবং তার মূর্তি তায়েফ নগরীতে অবস্থিত একটি সাদা পাথরে খোদাই করা ছিলো। এই পাথরের মূর্তির ওপর একটি ঘর নির্মিত ছিলো যেখানে এর সেবায়েতরা, অবস্থান করতো। এর আশেপাশের এলাকায় বাস করতো এই দেবী মূর্তির ভক্ত সাকীফ-গোত্র ও তার অনুসারীরা। কোরায়েশ ছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় এরা নিজেদেরকে মর্যাদাবান মনে করতো, কারণ কোরায়েশদের কাছে ছিলো ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত পবিত্র কা'বা শরীফ। সাকীফ গোত্রের লোকেরা মনে করতো মহান আল্লাহ নামের স্ত্রীলিঙ্গ 'লাত' এবং এজন্যেই এই দেবীমূর্তি তাদের কাছে ছিলো পূজনীয়।

মক্কা ও তায়েফ নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্তী একস্থানে ওযযা নামক এক বৃক্ষ অবস্থিত ছিলো। এর ওপরে নির্মিত ছিলো একটা ঘর এবং এটা খেজুর বাগিচা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো। কোরায়েশরাই

বিশেষভাবে এ দেবতার পূজা করতো। যেমন ওহুদ যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ান জোর গলায় বলেছিলো, 'আমাদের কাছে রয়েছে মহান উযযা, তোমাদের কাছে তো এরকম কোনো ওযযা নেই'। একথার জওয়াবে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন, (হে মুসলমানগণ) তোমরাও বলো, 'আল্লাহ আমাদের মওলা, তোমাদের কোনো মওলা নেই।' এই ওযযাকে তারা তাদের দেবী মনে করতো। আবার মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'মুসাল্লাল' নামক স্থানে ক্বাদীদ গোত্রের মধ্যে মানাত দেবীর মূর্তি স্থাপিত ছিলো যাকে জাহেলিয়াতের যুগে খুযায়া, আওস ও খাযরাজ গোত্রসমূহ পূজা করতো। এখান থেকেই কা'বা ঘরের হজ্জ করার জন্যে তারা রওয়ানা হতো।

আরব উপদ্বীপে তৎকালীন আরব গোত্রসমূহ এই ধরনের আরও বহু দেব-দেবীর উপাসনা করতো, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে ওপরে বর্ণিত লাত, ওযযা ও মানাত–এই তিনটি মূর্তি ছিলো প্রধান।

মূর্তি ফেরেশতাদের প্রতীক নয়

ওদের ধারণা ছিলো এসকল দেবী-মূর্তি হচ্ছে ফেরেশতাদের প্রতীক, যাদেরকে আরবরা নারী মনে করতো এবং তারা ওদেরকে আল্লাহর কন্যা-সন্তান বলে অভিহিত করতো। আর এই কারণেই তারা মূল মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে বাদ দিয়ে তাদের পূজা করতো। অবশেষে অধিকাংশ আরববাসীর কাছে এই প্রতীকগুলোই মূল মাবূদের স্থান দখল করে নিলো। শুধুমাত্র অতি নগণ্য এক ছোট্ট দল এক আল্লাহর বন্দেগীতে নিজেদেরকে মশগুল রেখেছিলো।

তাই, আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যে আল্লাহ পাক তিন খোদা-এর পূজা করা সম্পর্কে বলছেন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত ও ওযযা সম্পর্কে? তৃতীয় আর একজন মানাত সম্পর্কেও?'

প্রশ্নের সূচনাতেই আরববাসীর এ নিরর্থক কাজের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে যে শব্দে তা হচ্ছে 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো'? কথার মধ্যে তৃতীয় আর এক ব্যক্তি 'মানাত' সম্পর্কেও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

ওদের কথাকে ঘৃণাভরে ওদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে আল্লাহ পাক বলছেন, কি আশ্চর্য, তাদের নিজেদের জন্যে তারা পুত্র সন্তান পছন্দ করে আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে পছন্দ করে কন্যা সন্তান? কত অদ্ভূত বেইনসাফীপূর্ণ বন্টন তাদের!

প্রসংগক্রমে এখানে জানানো হচ্ছে যে, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কন্যা-সন্তান জ্ঞানে আরবরা তাদের নারীমূর্তি তৈরী করে সেগুলোর পূজা করতো। তাদের একটু লজ্জাও লাগতো না যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সর্বশক্তিমান জানা ও মানা সত্ত্বেও তাঁর জন্যে তারা পছন্দ করলো ফেরেশতা–কন্যা-সন্তান অথচ সেইসব কন্যা-সন্তান তাদের ঘরে পয়দা হলে তাদের মুখ কালো হয়ে যেত এবং তাদের অধিকাংশকে তারা জীবন্ত প্রোথিত করতো! প্রকৃতপক্ষে মূর্খ নাদানের দল আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান হওয়ার এইসব উদ্ভট কথা বলে আসলে তারা যে কী বুঝাতে চায় তা তারা নিজেরাও জানতো না।

এই জন্যেই আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের এই অলীক ও যুক্তিবুদ্ধিহীন ধারণার ওপর পাকড়াও করছেন। তাই অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে তাদের ও তাদের মাবূদ এ মূর্তিগুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন, 'কি ব্যাপার, তোমাদের জন্যে তোমরা পছন্দ করলে বেটা ছেলে, আর তাঁর জন্যে পছন্দ করলে কন্যা সন্তান? না, আল্লাহ ও তোমাদের নিজেদের মধ্যে এই বন্টননীতি বড়ই যুলুমপূর্ণ ও বেইনসাফীতে ভরা!–এই কথাটিই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে সকল প্রশ্নের মূল প্রশ্ন হচ্ছে, বাস্তবতার নিরিখে ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের এসব বাজে কথার কোনো ভিত্তিই নেই, নেই কোনো যুক্তি বা নেই কোনো প্রমাণ, তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এগুলো তো হচ্ছে নিছক কিছু কথার কথা এবং কিছু বানোয়াট নাম যা তোমরা নিজেরা রেখে নিয়েছো। এসব কথার পেছনে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। ওরা নিছক ধারণা-কল্পনার শিকার হয়ে এসব কথা বলছে এবং এগুলো একেবারেই মনগড়া কথা। অথচ প্রকৃত সত্য হেদায়াত একমাত্র তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকেই তাদের কাছে এসেছে।'

এই যে সব নাম তোমরা শুনছো, লাত, উযযা, মানাত এবং অন্য আরও অনেক নাম, যাদেরকে মাবূদ বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে এবং এ ফেরেশতাদেরকে অভিহিত করা হয়েছে নারী বলে এবং এসব নারীকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবী করা হয়েছে, এসব কিছুই নিছক মিথ্যা বানোয়াটি নাম, যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, নেই এসবের পেছনে কোনো সত্যতা এবং তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এসবের জন্যে কোনো যুক্তি খাড়া করারও কোনো সুযোগ দেননি। আর আল্লাহ পাক নিজে যার মূল্যায়ন করেননি তার কোনো শক্তি বা ক্ষমতা কিছুই নেই, যেহেতু তার বাস্তব কোনো মূল্য নেই। বাস্তব সত্য জিনিসের ভারত্ব, শক্তি-ক্ষমতা সবই রয়েছে যেহেতু আল্লাহ পাক মানুষের প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী করেছেন। অসত্য জিনিস এমনই হালকা, যার কোনোই ওজন নেই। এমনই দুর্বল যার নিজের শক্তি বলতে কিছুই নেই এবং এতোই তুচ্ছ সে জিনিস যে কারো ওপর তার কোনো ক্ষমতার বহিপ্রকাশও নেই।

মূর্তি পূজা কী?

আয়াতের মধ্যভাগে এসব মিথ্যা ধ্বজাধারীদেরকে, তাদের অলীক ধারণাকে এবং তাদের বানোয়াট কাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন না করে পরিত্যাগ করা হয়েছে, আর তাদেরকে এমনভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে যেন তাদের অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই, যার কারণে তাদেরকে সম্বোধন করে কোনো কথা না বলে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তাদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে

এরশাদ হচ্ছে, 'তারা নিছক ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করছে এবং পরিচালিত হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে'। সুতরাং তাদের কথায় কোনো যুক্তি নেই, কোনো জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না তাদের আচরণে এবং আত্ম-বিশ্বাস বলতেও তাদের কাছে কিছু নেই। তাদের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে একমাত্র কল্পনার ওপর এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নে চালিত হওয়াকেই তারা তাদের কাজের সপক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি। সেখানে ধারণা, প্রবৃত্তির চাহিদা ও মনের খাহেশের কোনো স্থান নেই। হক পথ গ্রহণের জন্যে চাই চূড়ান্ত ও নিশ্চিত বিশ্বাস এবং আবেগ মুক্ত হওয়া ও স্বার্থপরতার উর্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করার মানসিকতা। এজন্যে বলা হয়েছে, তাঁরা (হেদায়েতপ্রাপ্তরা) কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করেনি, বা প্রবৃত্তির তাড়নে পরিচালিতও হয়নি।' তাদের চালিকাশক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'অবশ্যই তাদের নিকটে এসেছে তাদের রব-এর পক্ষ থেকে হেদায়াত।' অতএব, ব্যক্তিগত ওযর-আপত্তি ও মনগড়া কোনো যুক্তি সন্ধান করার কোনো সুযোগ সেখানে নেই এবং কোনো কারণ তালাশ করাকেও সেখানে নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

যখন প্রবৃত্তির চাহিদা ও ঝোঁক প্রবণতার কাছে কোনো কাজকে ছেড়ে দেয়া হয় তখন সে কাজ মযবুত হয় না যেহেতু মানুষের খোশ-খেয়াল, স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিগত বুদ্ধি–সত্যপ্রাপ্তির

পথে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। সেখানে সত্য অপ্রকাশিত থাকাই আসল কথা নয়, বা যুক্তি-প্রমাণ দুর্বল হওয়াও মূল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে সেখানে এক সর্বগ্রাসী আবেগের শিকার হওয়ার কারণেই মানুষ কোনো কিছু করতে চায়, তারপর তার অংগ-প্রত্যংগকে সে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটিই হচ্ছে কোনো মানুষের জন্যে নিকৃষ্ট অবস্থা, যা তার নাফসের দাসত্বের কারণে সম্পন্ন হয় এবং তার মধ্যে সঠিক পথপ্রাপ্তির কোনো উপায় থাকে না, আর সেখানে কোনো যুক্তি-প্রমাণও তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

এই অবস্থায় সে অন্যায় ও অপ্রিয় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তাই আল্লাহ পাক বলছেন, 'মানুষ যা চায় তাই কি সে পেতে পারে?'

সুতরাং যতোটা সে আকাংখা করবে সত্য সত্যই সে ততোটা পাবে না। কিছু পরিবর্তন হবে এবং যা তার মন চাইবে ততোটাই বাস্তবে সে লাভ করতে পারবে না। কিছু বদলে যাবে, কিন্তু সত্য আর অসত্যের বেলায় এটা ঠিক নয়। সত্য সত্যই থাকবে এবং বাস্তবে যা সংঘটিত হওয়ার তা ঠিকই ঘটবে। মানুষের অন্তরের আবেগ ও চাহিদার পরিবর্তন হয় না এবং বাস্তবে এগুলো একেবারে বদলেও যায় না। মানুষ ভাবাবেগে গলিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয় এবং অত্যধিক আকাংখার কারণে ধ্বংসও হয়ে যায়। কোনো বিষয়ের প্রকৃতিকে বদলে দেয়া অথবা তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সে খুবই দুর্বল। সকল কাজের সাফল্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে যেভাবেই চান সেই ভাবেই তার মধ্যে পরিবর্তন আনেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর হাতেই রয়েছে আখেরাত ও পূর্ববর্তী অবস্থা'।

লক্ষ্যণীয় যে, আখেরাতের উল্লেখ করা হয়েছে আগে এবং (আয়াতের মধ্যে) পূর্বের অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে শেষে। ছন্দ ও আয়াতেগুলোর শেষে মিল রাখার উদ্দেশ্যে এবং বাস্তব অবস্থাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্যেও শেষ অবস্থাকে প্রথম অবস্থার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কোরআনুল করীমে অবলম্বিত পদ্ধতি, যে একই সাথে অর্থ ও বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরার জন্যে অধিকাংশ স্থান ছন্দময় শব্দ ও মধুর সুরে কথা পেশ করার ভংগি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় অর্থ বা বাক্যের সৌন্দর্যের মধ্যে কোনো ত্রুটি আসতে পারেনি! কোরআনের মর্যাদা রক্ষাও আল্লাহ তায়ালারই হাতে। তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেই ভাবেই এর মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সুতরাং বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটির প্রকাশভংগির সাথে আর একটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

যখন চূড়ান্তভাবে জানানো হলো যে, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সকল ঘটনা আল্লাহর হাতেই রয়েছে। অর্থাৎ পরে ও পূর্বে যা ঘটবে তা সবই আল্লাহ পাক জানেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু সংঘটিত হবে, তখন ফেরেশতাদেরকে দেবী হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাদের শাফায়াত পাওয়া যাবে বলে যে ভুল ধারণা তার কোনো মূল্যই আর থাকে না। যেমন বলা হয়েছে, 'আমরা তাদের পূজা-অর্চনা শুধুমাত্র এই জন্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেবে।' আসলে এইসব ধারণ-কল্পনার কোনো ভিত্তি নেই। ফেরেশতারা সারাক্ষণ আকাশে পরিভ্রমণরত। তারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে কথা বলার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কারো পক্ষে কিছু বলতে পারবে না। তাই আল্লাহ পাক জানাচ্ছেন, 'কত ফেরেশতা আকাশমন্ডলীর মধ্যে রয়েছে, যারা কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। তবে যার জন্যে আল্লাহ পাক চাইবেন এবং যার ওপর তিনি রাযী-খুশী থাকবেন তার জন্যে তিনি অনুমতি দিলে পরে তার পক্ষে কোনো ফেরেশতা সুপারিশ করতে পারবে।

ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে তাদের অযৌক্তিক কথাগুলোকে তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার পর এখানকার আলোচনায় তাদের দাবীকে একেবারেই মূলোৎপাটিত করা হয়েছে। অতএব, সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণিত হলো যে, পরবর্তীকাল এবং পূর্ববর্তীকালের সকল ফায়সালা একমাত্র আল্লাহরই হাতে এবং অন্তরের মধ্যে অবস্থিত আকীদা– বিশ্বাস সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এপর্যায়ে এসে মানুষ সত্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হতে পারে না এবং তাদের পক্ষে বুঝা সহজ হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালার খুশী ও অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতেও পারবে না এবং কারো সুপারিশ গ্রহণও করা হবে না। অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর ফায়সালার মালিক। আর এই কারণেই একমাত্র তাঁরই দিকে পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সকল বিষয়ের ব্যাপারে মুখপেক্ষী হতে হবে।

এ প্রসংগের সমাপ্তি পর্যায়ে মোশরেকদের অনুমান ও ধারণা-কল্পনা সম্পর্কে আরও একবার আলোচনা করা হচ্ছে; বলা হচ্ছে, যারা আখেরাত সম্পর্কে বিশ্বাস করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতারা যে আল্লাহ তায়ালার নূরের সৃষ্টি এবং তাঁর আজ্ঞাবহ দাস, একথাকে বিশ্বাস করে না। এই কারণেই তাদের কথার মধ্যে তাদের আকীদার দুর্বলতা ফুটে উঠে এবং আসলেই তারা যে ফেরেশতা সম্পর্কে বিশ্বাস করে না তা প্রকাশ পেয়ে যায়। আখেরাত অবিশ্বাসীদের যুক্তিহীন ক্রিয়াকান্ড

তাই এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই যারা আখেরাত সম্পর্কে বিশ্বাস করে না, তারা মেয়েদের নামেই ফেরেশতাদের নাম রাখে। আসলে এ বিষয়ে তাদের কোনোই জ্ঞান নেই, একমাত্র আন্দায– অনুমান করেই তারা চলে ও বলে, অথচ এসব আন্দায-অনুমান সত্যপ্রাপ্তির পথে কোনো সহায়তা করে না।'

এখানে এই শেষ সমালোচনাটি এসেছে লাত, ওযযা ও মানাতকে কেন্দ্র করে, যেহেতু মোশরেকরা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কন্যা হিসেবে গণ্য করতো, আর এটি হচ্ছে এমন একটি বাজে কথা যার মূলে কোনো দৃঢ় বিশ্বাস নেই, নিছক ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে তারা এসব কথা বলে। ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান লাভ করার কোনো উপায় তাদের কাছে নেই। আল্লাহর সাথে ফেরেশতাদের আত্মীয়তার যে সম্পর্কের কথা তারা বলে তার মূলে ভুল আন্দাজ-অনুমান ছাড়া তাদের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। আর এসব অনুমানভিত্তিক কোনো কথা সত্যপ্রাপ্তির পথে কোনো সাহায্য করে না বা সেই সত্যের কোনো বিকল্পও এটা নয় যা পরিত্যাগ ও পরিহার করে তারা আন্দায-অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করছে।

যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে এবং ফেরেশতাদেরকে মেয়েদের নামে ডেকে আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে উল্লেখ করে তাদের এই হীন আকীদা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার পর (তাদেরকে সম্বোধন না করে) রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হচ্ছে যাতে করে মোশরেকদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখানো যায় এবং তাদের সকল কাজের ফায়সালা সেই মহান আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া হয় যিনি অন্যায়কারী ও নেককার ব্যক্তিদেরকে জানেন এবং যিনি সত্য-সঠিক পথের ধারক ও বাহকদেরকে নেক প্রতিদান দেবেন ও পথভ্রষ্টদেরকে দেবেন তাদের প্রাপ্য উচিত সাজা, আর যাঁর হাতে রয়েছে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়, আর যিনি ইনসাফের সাথে সবার হিসাব গ্রহণ করবেন এবং কারো প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করবেন না। সেদিন সেই সকল

ব্যক্তির গুনাহখাতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকেও তিনি দেখেও দেখবেন না। যারা কোনো কাজ করার পর শরমিন্দা হয় এবং সে অন্যায়ের ওপর টিকে থাকে না। তিনি অবশ্যই কঠিন শিলাখন্ডের মধ্যে লুধায়িত জিনিস এবং পত্র পল্লব ও বস্ত্রে আচ্ছাদিত সকল গোপন বস্তু সম্পর্কে খবর রাখেন। কারণ তিনিই তো সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাদের জীবনের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন জিনিস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তাই তিনি এরশাদ করছেন,

অতএব, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং দুনিয়ার জীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুই চাইলো না, তাদের থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাদের (বিবেচনায় তাদের) জ্ঞানের উৎস তো এই দুনিয়াটাই। অবশ্যই তোমার রব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে আর তাকেও জানেন যে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করেছে। আর আকাশমন্ডলীর মধ্যে ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে, সব কিছুর মালিকও একমাত্র তিনিই। এই মালিক হওয়ার কারণেই তিনি অন্যায় কাজ করনেওয়ালাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং নেক কাজ করনেওয়ালাদেরকে তাদের বদলা দেবেন......... তিনি ভাল করেই জানেন কে তাঁকে ভয় করে চলে (ও তাঁরই ভয়ে বাছ-বিচার করে চলে)। ৩০-৩২

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অবজ্ঞা প্রদর্শন তার জন্যে, যে তাঁর (আল্লাহ তায়ালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর দুনিয়ার জীবন (ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য) ছাড়া আর কিছু চায় না। সে মোশরেকদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে গিয়েই এ কথাগুলো রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং যাদের ইতিবৃত্ত, আন্দাজ-অনুমান-ভিত্তিক কাজ ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাস সম্পর্কে ইতিপূর্বে এ সূরার মধ্যে আলোচনা এসেছে।

এরপর আল্লাহ সোব্হানাহু ওয়া তায়ালা ঐ সকল মুসলমানকে সম্বোধন করেছেন যারা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ বিমুখ ও ঈমান-বিরোধী লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে। যারা একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থের কারণেই সকল কাজ করে এবং দুনিয়ার লোভ ও লাভ ছাড়া তারা আর কিছু দেখতে পায় না। তারা না আখেরাতকে বিশ্বাস করে আর না একদিন হিসাব দিতে হবে, একথার কোনো পরওয়া করে। এ বে-ঈমানরা মনে করে পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করাই তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, এরপর আর কোনো চাওয়া-পাওয়ার নেই। আর এই অনুভূতির ভিত্তিতেই তারা তাদের জীবনের পথ রচনা করে। তারপর মানুষের বিবেক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যাঁর সম্পর্কে সে মনে করে যে, তিনি সকল কাজকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সীমাবদ্ধ এই দুনিয়ার জীবন শেষে তার কাজের হিসাব নেবেন। অবশ্য আজকের পুঁজিবাদী সমাজের লোকদের মধ্যেও এই ধর্মীয় অনুভূতি বিরাজমান রয়েছে।

মোমেনদের আরেকটি স্বভাব

আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাসীরা এ সকল লোকের সাথে কাজ-কারবার করা ও সামাজিক মেলামেশাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের হিসাব-নিকাশ থেকে আখেরাতকে দূরে নিক্ষেপ করে। কারণ এই দুই দলের প্রত্যেকের জীবনের নিজস্ব একটি গতিপথ আছে যা একটি থেকে অপরটি পৃথক হওয়ার কারণে একটির সাথে আর একটি মিশতে পারে না। তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। তাদের জীবনের সকল মাপকাঠি, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ধ্যান-ধারণা সবই বিভিন্ন। সুতরাং তারা

কেউই জীবনের যে কোনো ব্যাপারে পরস্পর সহায়ক হতে পারে না এবং পৃথিবীতে কোনো তৎপরতা চালাতে গিয়ে একে অপরের শরীকও হতে পারে না। জীবনের মূল্যবোধের চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্ম-তৎপরতার পদ্ধতিতে এবং এসব প্রচেষ্টার মধ্যে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এবং পরস্পর সহযোগিতা ও অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে নানাপ্রকার ওযর-আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কোন্ জিনিস উভয় দলকে কাছাকাছি আনতে পারে এবং এক দলকে অপরের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য করতে পারে? আল্লাহর স্মরণবিমুখ এবং একমাত্র দুনিয়ার প্রত্যাশী এইসব লোকের সাথে সামাজিক মেলামেশার সময়ে তাদের সাথে কিভাবে উঠা-বসা করা যায় সে ব্যাপারে প্রকৃত মোমেন ব্যক্তি বড়ই মুশকিলে পড়ে যায়। কারণ ধর্ম-নিরপেক্ষ এসব ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আল্লাহর শক্তিকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করে। অবশ্য, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আরও কিছু কারণ আছে, আর তা হচ্ছে, এই দলের লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং দুনিয়ার জীবনের বাইরে তারা আর কিছুই চায় না, যার কারণে এরা আল্লাহর কাছে হীন ও তুচ্ছ। এমতাবস্থায় তাদের মর্যাদা যাই হোক না কেন, তারা সত্য থেকে বহু দূরে রয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আখেরাতের বিশ্বাস তাদের নাগালের বাইরে। তারা দেয়ালের অপর প্রান্তে অবস্থান করছে, অর্থাৎ দুনিয়ার এই জীবনের চৌহদ্দীর মধ্যে তারা পরিবেষ্টিত 'আর এটিই হচ্ছে তাদের জ্ঞান লাভের স্থান।' এই কারণেই যে যত বড়ই হোক না কেন তার কোনো মূল্য না থাকার এটিই মূল কারণ। ইসলামী সমাজের কোনো স্থানেই তাকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়।

যতই তাকে সঠিক পথ দেখানো হোক না কেন, সে ভুলের ওপর দৃঢ় হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তি অন্তরের একাগ্রতা, তীব্র অনুভূতি ও বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেললো এবং দৃষ্টির অন্তরালের কোনো কিছুকে বিশ্বাস করলো না, তার পক্ষে মূল্যবান কোনো কিছু জানা সম্ভবই নয়। অথচ তার দৃষ্টিশক্তির বাইরে রয়েছে আর একটি ভয়ানক জগত যা নিজে নিজেই পয়দা হয়ে যায়নি। এইভাবে তার অস্তিত্ব এমনই একটি বিষয় যা মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে, অথচ তার সৃষ্টিকর্তা যখন বর্তমান আছেন বলে সে অনুভব করে তখন, তার কোনো কর্মকান্ড বে-ফায়দা হতে পারে না। তবে মানুষের জন্যে এ দুনিয়ার জীবনই যদি সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য ও শেষ পরিণতি, তাহলে আখেরাতের যিন্দেগীর কোনো প্রয়োজন থাকতো না এবং তা বে-ফায়দা হতো। সুতরাং যে কোনো দিক দিয়েই চিন্তা করা হোক না কেন সৃষ্টির এই বাস্তবতাই সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমানের যথার্থতা প্রমাণ করে। এমনি করে বিশ্বজগতের সৃষ্টি আখেরাতের ওপর ঈমান আনারও যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। সাথে সাথে, সেই মহান স্রষ্টা যিনি এই বিশাল বিশ্বকে পয়দা করেছেন তাঁর এসব সৃষ্টি যে অযথা নয় তারও যথার্থতা প্রমাণ করে।

এ কারণেই, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দুনিয়ার এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে তাকে উপেক্ষা করাটাই বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু সে অপাত্রে দান করে এবং অজায়গায় নিজের ধন-সম্পদ খরচ করে এই জন্যে স্পষ্টভাবে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের প্রয়োজন রয়েছে এবং যেহেতু দুনিয়ার জীবনকেই সে তার জ্ঞান-লাভের একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে এজন্যে ইসলামের অনুসারীরা অবশ্যই তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং কোনো ব্যাপারেই তাকে মূল্য দেবে না। এইভাবে দুনিয়াদার ও সংকীর্ণমনা এসব ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের জন্যেই আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহর নির্দেশ যদি খেয়াল করে দেখি এবং তা মান্য করি, তাহলে এর তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হবে না। অবশ্যই আমরা ইহুদীদের মত একথা বলবো না যে, 'আমরা শুনলাম, কিন্তু অমান্য করলাম।' আল্লাহ পাক ধরনের আচরণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন! এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমার রব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এবং কে সঠিক পথকে আঁকড়ে ধরেছে।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, ওরা পথভ্রষ্ট। এজন্যেই তিনি চাননি যে, তাঁর নবী এবং তাঁর উম্মতের হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখুক। এমনকি তাদের সাথে মেলামেশা করুণ বা তাদের সাথে সমাজ-দরবার করুক তাও তিনি চাননি। যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত এবং এর উর্ধে আর কোনো জীবন আছে বলে যারা কল্পনাও করতে পারে না, সেই সব ব্যক্তি দ্বারা ধোঁকা খেয়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হোক তাও তিনি চান না বা চাইতে পারেন না। বরং, তাঁর খালেস বান্দাহদেরকে ওদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি নিজেই তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ান এবং সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি ও সত্য সঠিক চেতনার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেন। এই সত্য-চেতনা যার মধ্যে এসে যায়, সে তখন ভুল পথ পরিহার করে এবং তখন তার এই সঠিক চেতনাই তাকে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাকে ছক টেনে বুঝিয়ে দেয় যে, এই হচ্ছে হাতে-নাতে পাওয়া দুনিয়ার লোভ ও লাভের সীমানা এবং এই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ এ পার্থিব জীবন।

মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

এ অক্ষম, অবুঝ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা যে জ্ঞান লাভ করেছে তা নিছক সাধারণ মানুষের জ্ঞান এবং তাদের নিজেদের মত মূর্খ ব্যক্তিদের নিকটেই তা গ্রহণযোগ্য। দুনিয়ার বাস্তব জীবনে সাধারণ মানুষের হৃদয়াবেগ, গ্রহণযোগ্যতা ও আন্তরিক অনুভূতির যথেষ্ট প্রভাব ও মূল্য অবশ্যই রয়েছে। তাই বলে ভুল পরিণতির ক্ষতি ও অনিষ্টতাও আর দূর হয়ে যেতে পারে না, খতম হতে পারে না অজ্ঞানতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির মন্দ পরিণাম। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং মানুষের কাজ ও তার প্রতিদানের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এমন দুটি সত্য যা যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ধরা পড়ে এবং এই যথার্থতা অনুভব না করলে সে জ্ঞান মানুষের জীবনে কোনো কাজে লাগে না, না তার উন্নতির ক্ষেত্রে সে জ্ঞান কোনো ভূমিকা রাখতে পারে আর না তার মর্যাদা বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হয়। মানুষের প্রত্যেকটি জ্ঞানই তার জীবনে কিছু না কিছু অবদান রাখে, কখনও তার মানবতা বিকাশে সহায়ক হয়, আর কখনও তার সাহিত্য ও সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করে। তার জ্ঞান যদি এ সবের কোনো একটি অবদানও রাখতে না পারে, তাহলে সে জ্ঞান হয় নিছক যান্ত্রিক উন্নয়ন অথবা মানবতা-বিধ্বংসী কোনো অস্ত্র। আর মানুষের মানবতার উন্নতি যদি না হলো, তাহলে শুধুমাত্র যান্ত্রিক উৎকর্ষ সাধনে আসলে কার ফায়দা হবে!

মানুষের এই যে চেতনা যে, তার সৃষ্টিকর্তা কেউ আছেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার আশেপাশে অবস্থিত সজীব ও নির্জীব সব কিছুর সৃষ্টিকর্তাও একমাত্র তিনি, এ চেতনা সেই একই জীবন ও জগতের অস্তিত্বের চেতনার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। মহান সে সৃষ্টিকর্তা তাকে এক বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছেন এবং সে উদ্দেশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে মূল্যবান যেহেতু সকল সৃষ্টির সাথে মানব সৃষ্টির প্রয়োজন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে মহাকালের সকল দিনগুলো থেকে ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ সমন্বিত পরিবার থেকেও সে একজন ব্যক্তি হিসেবে বড়, বড় সে ব্যক্তি হিসেবে তার গোটা জাতি থেকে, তার দেশ থেকেও সে অনেক বড় এবং যাদেরকে নিয়ে মানুষ বস্তুগত সমাজ ও আধুনিক সভ্যতা গড়ে তোলে তাদের থেকেও তার ব্যক্তিত্ব অনেক উর্ধে, সে সৃষ্টির সকল বৈচিত্র ও গঠনশৈলী থেকে অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ!

মানব জীবনে আখেরাত বিশ্বাসের প্রভাব

মানুষের জানা দরকার যে, একদিন অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তা তার হিসাব নেবেন এবং তার ভাল বা মন্দ কাজের প্রতিদান দেবেন এবং সেই দিনটিই হবে আখেরাত—এই জ্ঞানই তার চিন্তা-চেতনা ও ধারণাশক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনে। তার তৎপরতাকে প্রভাবিত করে এবং তার জীবনের লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং অন্তরের মধ্যে নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার এক তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করে। এতে তার কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং শক্তি উজ্জীবিত হয়। কারণ তার ধ্বংস ও পরিত্রাণ এই অনুভূতির ওপর নির্ভর করে। এর প্রভাব পড়ে তার নিয়ত ও কাজের ওপর, আর এইভাবে মানুষ শক্তি লাভ করে এবং সৃষ্টির সব কিছুকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এই সচেতনতা হয় এই জন্যে যে এতে করে তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা প্রহরী জেগে উঠে, তাকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তখন সে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তার বিবেক জেগে উঠার ফলে কল্যাণ প্রত্যাশায় সে আশান্বিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায় ও (আত্ম) নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করার কারণে সে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে আস্থা অর্জন করে। এমনকি তখনও সে হতাশ ও মন ভাংগা হয় না যখন পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে বিফল হয় ও কষ্ট পেতে থাকে। মোমেন মানুষ হিসাবে তাকে সদা সর্বদা কল্যাণ ও নেক কাজের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্যে অবিরত সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সে নির্দেশিত হয়েছে। তাতে দুনিয়ায় সে বিফল হোক বা সফল হোক, তার পরওয়া যেন না করে। কারণ তার পরম ও চরম চাওয়ার ও পাওয়ার স্থান হচ্ছে আখেরাত!

জীবনের সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান এবং এটি জীবনের সব থেকে মৌলিক বিষয়ও বটে। এমন কি খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র থেকেও মানুষের জীবনে এই দুটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশী। এ দুটি বিশ্বাস মযবুতভাবে যার মধ্যে বর্তমান রয়েছে সেই মানুষ, আর যার মধ্যে এ দুটির অস্তিত্ব নেই সে পশু, বরং তার থেকেও অধম!

অবশ্য অনেক সময় বিশ্বাসের পরিমাপগুলো কম-বেশী হয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা কারো কম, কারো বেশী এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে ধারণা-কল্পনাও মানুষে মানুষে বিভিন্ন হয়। এতে তেমন কিছু আসে-যায় না। কারণ আমরা ইচ্ছা করলেও সকল মানুষের মধ্যে এসব বিষয় সমান করে গড়ে দিতে পারবো না এবং সকল মানুষের চিন্তা-চেতনাকেও এক করে ফেলতে পারবো না, যেহেতু সৃষ্টি-বৈচিত্রের মধ্যে সব বিভিন্নতা হচ্ছে এক অমোঘ নিয়ম।

আর এই সব কারণেই আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং একমাত্র দুনিয়ার জীবনকেই যে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে চেয়েছে, তার সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী একজন মোমেনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, অংশীদার হিসেবে কোনো কাজ এক সাথে করা, এক সাথে বসবাস করা, পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতার জীবন যাপন করা, পারস্পরিক যত্ন নেয়া এবং একসাথে সমিতি ও বৈঠক করা—কোনোটাই সম্ভব নয়। ঈমান ছাড়া সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে যতভাবে যত কথাই বলা হোক না কেন, সবই হবে বৃথা, অসম্ভব এবং নিছক কল্পনা। এ প্রচেষ্টা চালানোতে আসলে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতাই করা হবে. যেহেতু আল্লাহ পাক বলছেন,

'সুতরাং, মুখ ফিরিয়ে নাও প্রত্যেক সেইসব ব্যক্তি থেকে, যে আমার থেকে ফিরে গিয়েছে এবং সে একমাত্র দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।'

'আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।' (কথাটি বলা হচ্ছে এই জন্যে) যেন তিনি অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের তাদের কাজের উচিত প্রতিদান দেন এবং নেক প্রতিদান দেন তাদেরকে যারা সুন্দরভাবে নেক কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছে।'

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার মালিকানা যে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হাতে, সে বিষয়ের ওপর এই বিবৃতি অত্যন্ত জোরালো প্রভাবপূর্ণ ও স্পষ্টভাবে এ সত্যটি তুলে ধরছে যে, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব, যিনি আখেরাতের জীবন বানিয়েছেন এবং তার আগমনকে স্থির করে রেখেছেন একমাত্র তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সব কিছুর মালিক। তিনিই উচিত প্রতিদান দিতে সক্ষম। এ ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে এবং এর কারণগুলো নির্ধারণ করনেওয়ালাও একমাত্র তিনি। তাঁর মালিকানার বিশেষত্ব হচ্ছে, পূর্ণ ইনসাফের সাথে, যার যতটুকু পাওনা, তাকে পরিপূর্ণভাবে ততটুকু তিনি দেবেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যারা অন্যায় করেছে যেন তাদেরকে তিনি ততটুকু প্রতিদান দেন যতটুকু তারা করেছে এবং যেন সুন্দরভাবে নেক প্রতিদান দেন তাদেরকে যারা ভাল কাজ করেছে।'

সগীরা গুনাহ বলতে কী বুঝায়

এরপর আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাদের জন্যে একটি বিশেষ সীমা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন যারা নেক কাজ করেছে—এই কথা বলে যে, আর তাদেরকে সুন্দরভাবে প্রতিদান দেবেন, 'যারা বড় বড় গুনাহ ও লজ্জাজনক কাজ পরিহার করে চলবে .....তবে (মানবীয় দুর্বলতা ও শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে যারা ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিতে লিপ্ত হবে, তাদের সে ত্রুটিগুলো তিনি উপেক্ষা করবেন—দেখেও দেখবেন না।'

বড় গুনাহ বলতে বুঝায় বড় বড় নাফরমানির কাজ বা অবাধ্যতা এবং 'ফাওয়াহেশ' বলতে বুঝায় বড় বড় অপরাধ ও লজ্জাজনক কাজ। আর 'লামাম' এর অর্থে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম ইবনে কাছীর বলেন, এটা বিচ্ছিন্ন ও মূল কাজ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী কাজ! কারণ 'লামাম' হলো ছোট ছোট গুনাহ ও তুচ্ছ কার্যাবলী। ইমাম আহমদ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবু হোরায়রাহ্ নবী (স.) থেকে 'লামাম' সম্পর্কে যে কথাগুলো বর্ণনা করেছেন তার থেকে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ আমি আর কোথাও দেখিনি। নবী (স.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো আদম সন্তানের ভাগ্যে ব্যভিচারের কোনো অংশ লিখে দেন, তখন নির্ঘাত সে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব, চোখের যেনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা (ইচ্ছা করে নিষিদ্ধ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে দেখা) এবং মুখের যেনা হচ্ছে (নিষিদ্ধ ও লালসাপূর্ণ) কথা উচ্চারণ করা। আর মনের কাজ তো এই যে, সে আকাংখা করে এবং কারো প্রতি প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু লজ্জাস্থান এই কামনা-বাসনাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে অথবা কামনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। (১)

ইবনে জরীর বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, (তাঁর বর্ণনা মতে) চোখের যেনা হচ্ছে ইচ্ছা করে নিষিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখা, ঠোঁট দুটির যেনা চুম্বন করা, হস্তদ্বয়ের যেনা কামনার সাথে বা অবৈধভাবে কাউকে ধরা, পদদ্বয়ের যেনা হচ্ছে যেনার নিয়তে কোনো দিকে পদচালনা করা। একাজকে লজ্জাস্থান সত্যায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।

---

(১) বোখারী ও মুসলিম এ হাদীসটিকে আবদুর রযযাক-এর বরাত দিয়েরেওয়ায়াত করেছেন।

এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি তার লজ্জাস্থানকে এ নিষিদ্ধ কাজে এগিয়ে দেয়, তাহলে সে যেনাকারী হবে, আর যদি এগিয়ে না দেয়, তাহলে তার যেটুকু অপরাধ হবে তারই নাম হবে 'লামাম'। মাসরূক ও শা'বী এইভাবেই বলেছেন।

ইবনে লুফাফা আত্তায়েফী নামে পরিচিত আব্দুর রহমান ইবনে নাফে' বলেন, 'আমি আবু হোরায়রাহ্কে 'ইল্লাললামামা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, চুমু দেয়া, ইচ্ছা করে বারবার দেখা, চোখ দিয়ে ইশারা করা এবং জড়িয়ে ধরা। তারপর যখন এক লিংগ অপর লিংগের সাথে এমনভাবে লাগানো হয় যে গোসল ওয়াজেব হয়ে যায়–সেই অবস্থাটাই হবে (প্রকৃত) যেনা।

অতপর 'লামাম'-এর অর্থে এসব কথা পরস্পর কাছাকাছি অর্থবোধক।

এ পর্যায়ে আরও কিছু কথা পাওয়া যায়,

আলী ইবনে আবি তালহা হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বলছেন, 'ইল্লাললামামা' অর্থ যা পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। যায়েদ ইবনে আসলামও অনুরূপ বলেন।

ইবনে জারীর মোজাহেদের কথা উদ্ধৃত করেন, তিনি এ আয়াতের 'লামাম' সম্পর্কে বলেন, সেই ব্যক্তির অপরাধ, যে গুনাহে সামান্য অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু পরে সে সেই অভ্যাস ত্যাগ করেছে। ইবনে জারীর আর এক পর্যায়ে বলেন, যা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস-এর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, তিনি বলেন,

সে ব্যক্তি যে লজ্জাকর কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু পরক্ষণেই সে তওবা করে। তিনি আরও বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন,

হে আল্লাহ, তুমি যদি ক্ষমা করো তাহলে গভীরভাবে ক্ষমা করো।

কে আছে এমন ব্যক্তি যে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে প্রলুব্ধ না হয়েছে? এমনি করে তিরমিযী পর্যায়ক্রমে আহমদ ইবনে ওসমান, আল বাসরী এবং তিনি আবু আসেম আননাবীল থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তারপর বলেছেন যে, এটা সহীহ হাদীস বটে, তবে শেষ বর্ণানাকারীর উল্লেখ না থাকায় এটা খুব জোরালো হাদীস নয়।

আবার আর একটি হাদীসের বর্ণনায় ইবনে জরীর থেকে জানা যায় যে, আবু হোরায়রাহ্ (রা.) বলেন, সেই সব ব্যক্তি সম্পর্কে যারা 'লামাম' ব্যতীত বড় বড় (কাবীরা) গুনাহ ও লজ্জাজনক কাজ থেকে বেঁচে থাকে আমি দেখতে পাচ্ছি তাদেরকে (শাস্তি থেকে) তুলে নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, 'লামাতুন' যেনার একটি অংশ বটে, কিন্তু এতটুকু আচরণ করার পর বাস্তব যেনায় লিপ্ত না হয়ে যতটুকু ক্রটি হয়েছে তার জন্যে যদি তওবা করে এবং পুনরায় সে আচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং তার সে আচরণকে 'লামাতুন' বলে গণ্য করা হবে। চুরির ইচ্ছা করে বাস্তবে চুরি না করাকেও এই শ্রেণীতে ফেলা হবে যদি সে উক্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় না করে। অনুরূপভাবে মদপান করতে চাইলো, কিন্তু থেমে গেল এবং সে ইচ্ছা ত্যাগ করলো, সেটাও 'লামাতুন' বলে গণ্য হবে। আবু হোরায়রাহ্ (রা.) বলেন, এগুলো সবই তুচ্ছ গুনাহ (লামামুন বা আল লামামু)।

এইভাবে আরও কিছু 'মওকুফ' হাদীস আছে যেগুলোর মধ্যে উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। প্রথম কথা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী আরও কিছু কথা এ সম্পর্কে পাওয়া গেলেও আমরা মনে করি শেষোক্ত কথাটি কোরআনের কথার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে, 'অবশ্যই তোমার রব ক্ষমা প্রদর্শনে বড়ই উদার এবং তাঁর ক্ষমার ভান্ডার বড়ই প্রশস্ত।' এতে ক্ষমার প্রশস্ততার কথা উল্লেখ করায় বুঝা গেল 'লামামুন' হচ্ছে, লজ্জাজনক ও বড় গুনাহগুলোর

দিকে অগ্রসর হওয়া, কিন্তু গুনাহের কাজটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই থেমে যাওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করা। এখানে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, 'ইল্লাললামামা' বলে যে 'ব্যতিক্রম' অর্থ বুঝানো হয়েছে সে কথাটি মূল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কথা নয়। এতে ভাল লোকদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারাই ভাল লোক যারা পরহেয করে বড় বড় মন্দ কাজ ও লজ্জাজনক কাজ থেকে, তবে (মানবীয় সাধারণ দুর্বলতার কারণে যে সব ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় সেগুলো আল্লাহর কাছে ধর্তব্য নয়, যেহেতু মন্দ কোনো কাজে পতিত হতে হতে তারা থেমে যায়, জলদি করে ফিরে আসে এবং পুনরায় এ পথে অগ্রসর হয় না বা বারবার এ কাজে এগিয়ে যায় না। এইভাবে আল্লাহ পাক বলেছেন,

'আর যারা কোনো লজ্জাজনক কাজ করলো অথবা নিজেদের ওপর যুলুম করলো, কিন্তু আল্লাহর কথা স্মরণ হতেই তারা কৃতকর্মের জন্যে তওবা-এস্তেগফার করে ক্ষমাপ্রার্থী হলো (তাদের জন্যে রয়েছে অবারিত দ্বার– খোলা রয়েছে ক্ষমার সে মহা ভান্ডার)। আর এমন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে আছে, যে যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করতে পারে! তবে, (একটি শর্ত হচ্ছে) জেনে বুঝে (ও ইচ্ছা করে) যেন তারা বারবার সে গুনাহগুলো না করে।' এ ধরনের ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ পাক 'মোত্তাকী' বলে অভিহিত করেছেন এবং তাদেরকে ক্ষমা ও এমন জান্নাত দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন যার প্রশস্ততা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সম্মিলিত প্রশস্ততার সমান।(১) সুতরাং, এই অবস্থাটাই হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও সুবিস্তৃত মাগফেরাত হাসিলের জন্যে নিকটতম।

যাবতীয় প্রতিদান শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছে

আয়াতটিকে এই কথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, অন্যায় কাজ ও নেক কাজের প্রতিদান কাকে কিভাবে এবং কতোটা দেয়া হবে তা সম্পূর্ণ আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারে মজুদ রয়েছে, মানুষের যাবতীয় কাজকে সামনে রেখেই তিনি তাদের বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

এরশাদ হয়েছে, 'তিনি তোমাদেরকে যখন পৃথিবীর মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন থেকেই তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো করে জানেন, আর যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণ আকারে বিরাজ করছিলে তখন থেকেই তিনি তোমাদের খবর রাখেন।'

মানুষের এই প্রকাশ্য কাজগুলো সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আগাম জ্ঞানের কথাই উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এ জ্ঞান প্রকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান যা অন্য কেউ জানে না, জানেন তিনি যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মূল অবস্থাকে যখন পৃথিবী থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন তখন থেকেই তাঁর এ জ্ঞান রয়েছে সবার সম্পর্কে, আর এই জন্যেই তিনি গায়েব জানেন। মানুষ যখন মাতৃগর্ভাশয়ে ভ্রূণ আকারে বিদ্যমান, যখন তারা দিনের আলো দেখেনি, তখন থেকেই সবার সম্পর্কে তাঁর এ পরিপূর্ণ জ্ঞান বর্তমান রয়েছে। মানুষ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তার সম্পর্কে এ সঠিক জ্ঞান এবং তার কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সে কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে বলে এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আর কারো মধ্যে এই জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু অংশ জানা আছে বলে যদি কেউ মনে করেও তা হবে সম্পূর্ণ বাজে কথা এবং চরম বেয়াদবী বলে ধরে নেয়া হবে, যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে মনে করবে যে, সে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কিছু খবর রাখে এবং নিজের কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে বলবে, 'আমি অমুক, তমুক' তার এ অহমিকা তাকে ধিক্কৃত করবে। 'অতএব, খবরদার, তোমরা নিজেদেরকে দোষমুক্ত বলে প্রকাশ করো না, তিনিই ভাল জানেন কে তাঁকে ভয় করে চলে।'

---

(১) সূরায়ে আলে ইমরান –আয়াত ১৩৩-১৩৬

তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে তাঁকে তোমরা জানাবে এর কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই, আর তাঁর কাছে তোমাদের পরিমাপ করে তোমরা দেখাবে—এরও কোনো দরকার নেই, কারণ তাঁর কাছেই তো সব কিছুর পূর্ণ জ্ঞান বর্তমান রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)—এর দৃঢ়তা

এরপর আসছে সূরার শেষ অধ্যায়টি যার মধ্যে মেশানো রয়েছে ছন্দ মিল। এ অংশ প্রথমাংশের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে আকীদা-বিশ্বাসের সেই মৌলিক কথাগুলোকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যা প্রথম নিবেদিতপ্রাণ ইবরাহীম (আ.) দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছিলেন, একজন মানুষ হিসেবে তিনি চিনেছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে, চিনেছিলেন তিনি তাঁর মনিবকে সেই প্রকৃতি প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা যা তাঁর অস্থিমজ্জার মধ্যে আল্লাহ পাক পয়দা করে দিয়েছিলেন এবং যে সত্যানুভূতি এক এক করে তাঁর জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে প্রতিফলিত হচ্ছিল। এই সত্যানুভূতির কারণেই তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন প্রকৃতির রহস্যকে। এই অনুভূতি যখন পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হলো, তখন প্রকম্পিত হৃদয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে চিনলেন, তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।

মানুষের মধ্যে অবস্থিত সত্য-চেতনাকে ডাক দিয়ে বলা হচ্ছে,

‘দেখেছো কি তুমি সেই ব্যক্তিকে যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (কাউকে দেয়ার সময়) অত্যন্ত অল্প দেয় এবং কৃপণতা করে? তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যা সে দেখতে পায়? তাকে কি জানানো হয়নি সেই হেদায়াতের কথা যা মূসা (আ.)-এর কাছে অবতীর্ণ সহীফাসমূহে বর্তমান রয়েছে? রয়েছে ইবরাহীমের কেতাবে, যে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলো? সে সকল সহীফাতে একথা বলা হয়েছে যে, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না এবং মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকে কিছু নেই ....সুতরাং, তোমার রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের ব্যাপারে তোমরা বিতর্ক করছো? (আয়াত ৩৩-৫৫)।

‘(হে মানবমন্ডলী, তোমাদের মধ্যে যে নবী এসেছে) সে অতীতে আগত সতর্ককারীদের মতই একজন সতর্ককারী। অতি নিকটে সেই ভয়ানক কেয়ামত এসে গেছে (আগত প্রায় সেই মহা বিপদ) যার ভয়াবহতা দূর করা তিনি ব্যতীত আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এখন এই যে কথা (নবী মোহাম্মদ তোমাদের কাছে পেশ করছে) সে বিষয়ে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছো এবং তোমরা কি হাসি-ঠাট্টা করছো? আর কেয়ামতের ভয়ে একটুও কান্নাকাটি করছো না? বরং তোমরা অহংকারে ফেটে পড়ছো। (না, এমনটি করো না, সময় থাকতেই সাবধান হও) অহংকার পরিহার করে আল্লাহর সামনে অবনত মাথায় ঝুঁকে পড়ো (সেজদা করো) এবং তাঁর আনুগত্য করো পুরোপুরিভাবে।’

‘আর এ তো সেই ব্যক্তি যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, খুব কমই সে দেয় এবং চরম কৃপণতা করে।’ এই ব্যক্তির অদ্ভুত কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বিস্ময় প্রকাশ করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওপরের কথাটি নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পথে খুব কম সম্পদ ব্যয় করতো, তারপর এক সময়ে দৈন্যের ভয়ে ব্যয় করা একেবারেই বন্ধ করে দিলো। যামাখশারী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর ‘কাশ্শাফে’ খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, সে ব্যক্তি হচ্ছে ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ বিষয়ে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, অবশ্য এ বিষয়ের ওপর তিনি কোনো সঠিক দলীল-প্রমাণ পেশ করেননি, আর ওসমান (রা.) সম্পর্কে ও তাঁর প্রকৃতি, আল্লাহর পথে অকাতরে, অবিরতভাবে এবং বে-হিসাব তাঁর

দান-খয়রাত সম্পর্কে যারা খবর রাখে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে যারা জানে এবং যারা তাঁর অনিরুদ্ধ নেক কাজ সম্পর্কে ধারণা রাখে, তারা যামাখশারীর একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।(১)

অবশ্য, যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে এবং উদাহরণস্বরূপও কোনো মানুষের কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মর্যাদাপূর্ণ পথ থেকে সরে দাঁড়াবে এবং তার মাল ও জান এই আকীদা-বিশ্বাসকে কায়েম করার জন্যে খরচ করার পর কৃপণতা করবে, অর্থাৎ এ উন্নত মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছুতে দুর্বলতা প্রদর্শন করবে এবং খরচ করা বন্ধ করে দেবে-এই বক্তব্যের কথাগুলো এক আজব ব্যাপার বলে তার কাছে মনে হয়। আশ্চর্যের ব্যাপারই বটে। ধরনের ব্যক্তির অবস্থাকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করার এক নযীর হিসেবে কোরআন করীম তুলে ধরেছে। এরশাদ হচ্ছে,

সে কি গায়েব জানে?

'তার কাছে কি গায়বের জ্ঞান আছে, যা সে দেখে?'

গায়েব বা অদৃশ্য জিনিস দেখা বা জানার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি ব্যতীত গায়েবের কোনো কিছু আর কেউই দেখতে পায় না। এজন্যে মানুষ এ জিনিসকে বিশ্বাস করতে চায় না যা গোপন রয়েছে। তার দায়িত্ব হচ্ছে ভাল কাজ করা ও ভাল কাজে ব্যয় করা এবং সারা জীবন ধরে সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করা। আর এত বেশী খরচ না করা যা এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। তার জন্যে অজ্ঞাত ভবিষ্যতে সাফল্যের নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারে না। সে শুধু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে, নিজ কর্তব্য পালন করতে পারে এবং এক হকদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পারে মাত্র। এর সাথে সে আল্লাহর নিকটে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারে ও তার নেক কাজগুলো কবুল হবে বলে আশা করতে পারে।

'তাকে কি জানানো হয়নি সেই সকল জিনিস সম্পর্কে যা মূসার নিকটে প্রেরিত সহীফাসমূহে রয়েছে? এবং ইবরাহীমের নিকটে প্রেরিত কেতাবেও সে কর্তব্যগুলোর কথা বলা হয়েছে যা সে পুরোপুরি পূরণ করেছিলো?'

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এত প্রাচীন জীবন ব্যবস্থা যে, এর সাথে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এ ব্যবস্থার বুনিয়াদ এবং এর নিয়ম-কানুন মযবূতভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রসূলদের আগমনের পরম্পরায় এ ব্যবস্থার এক অংশ আর এক অংশকে সত্যায়িত করেছে। শুধুমাত্র স্থান ও কালের ব্যবধান ছাড়া এতে অন্য কোনো পার্থক্য নেই। এই জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কেই তো মূসা (আ.)-এর সহীফাগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। এই জীবন ব্যবস্থাই তো মূসা (আ.)-এর পূর্বে ইবরাহীম (আ.)-কে দেয়া হয়েছিলো। ইবরাহীম (আ.) সেই মহান ব্যক্তি যিনি তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করেছিলেন, সব কিছু দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন

(১) উল্লেখিত ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ
যামাখশারী বলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ওসমান (রা.) তাঁর সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করতেন। একদিন আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সা'দ, ইবনে আবী সারাহ বললেন (যিনি তাঁর দুধ ভাই ছিলেন), যেভাবে তুমি খরচ কর, তাতে শীঘ্রই তোমার নিকট কোন সম্পদ থাকবে না। জওয়াবে হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমার গুনাহখাতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক আছে, আর যা আমি করছি তার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ কামনা করি এবং তাঁর ক্ষমা চাই। তখন দুধ ভাই আব্দুল্লাহ বললেন, বেশ তো, সফরের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভর্তি তোমার উটনীটিকে আমাকে দাও, আমি তোমার সকল গুনাহের বোঝা লাঘব করে দেব। তখন তিনি তাকে তার চাহিদা মতো সব কিছু দিয়ে দিলেন, তাকে সাক্ষী রাখলেন এবং এরপর থেকে দান-খয়রাত করা বন্ধ করে দিলেন। তখন (তাঁর সম্পর্কে) এই আয়াত নাযিল হলো। এ রেওয়ায়াতের সত্য না হওয়াটা পরিষ্কার, অধিকাংশ বর্ণনাকারীরাই এ ব্যাপারে একমত হননি।

করেছিলেন। দায়িত্ব পালনের যে নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিলো তার হক তিনি আদায় করেছিলেন। কৃপণতা বা সংকীর্ণতা মোকাবেলায় এবং দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে এবং তাশদীদ-এর সাথে 'অফফা' পদবাচ্য শেষ হয়েছে, যাতে করে শেষের দিকে মিল হওয়ার সাথে সাথে সুরের এক মধুর ঝংকার উঠে।

মূসা (আ.)-এর কেতাবে কি আছে এবং ইবরাহীম-এর কেতাবেই বা কি আছে যা সে পূরণ করেছিলো! সেখানে ছিলো 'কেউ কারো বোঝা বহন করে দেবে না'। অতএব বুঝা গেলো, সেদিন কোনো ব্যক্তিই অন্য কারো বোঝা বহন করে দেবে না–না কেউ কারো বোঝা হালকা করে দিতে পারবে, আর না নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেউ নিজে হালকা হতে পারবে। সুতরাং, যেমন করে কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো দায়িত্ব এবং গুনাহের বোঝা হালকা করার ক্ষমতা পাবে না, তেমনি অপরের কোনো দায়িত্ব ও গুনাহের বোঝাও হালকা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

'আর মানুষ যে চেষ্টা করবে তাকে তাই দেয়া হবে' অন্য কথায় মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকে কিছু নেই।

এইভাবে মানুষের নিজের কামাই-রোযগার, প্রচেষ্টা ও কাজ ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তাই করা যায় না। কোনো ব্যক্তির আমলনামায় অপর কারো কাজ যোগ হবে না, আর কারো আমলনামা থেকে কিছু কেটে নিয়ে অপর কারো আমলনামায় কিছু বাড়ানো হবে না, আর এই দুনিয়ার জীবন তাকে দেয়া হয়েছে ভাল কাজ করার জন্যে এবং সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার জন্যে, মৃত্যু আসার সাথে সাথেই কাজের এ সুযোগ শেষ হয়ে যায় এবং সকল কাজ ও তৎপরতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবে রসূলুল্লাহ (স.)-এর থেকে জানা যায়, এমন কিছু কাজ আছে যা মৃত্যুর পরেও চালু থাকে। যেমন তিনি বলেছেন, 'মানুষ মারা গেলে তিন ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সবার কাজের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সে ব্যক্তির কাজ চলতে থাকে যে নেক সন্তান রেখে গেছে এবং সে তার জন্যে দোয়া করতে থাকে, অথবা কোনো সদকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা রেখে গেছে যার থেকে সে ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও ফায়দা পেতে থাকে, অথবা সে কোনো জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা রেখে গেছে যার থেকে সে ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও মানুষ উপকৃত হতে থাকে।(১) এই তিনটি কাজ প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই কাজ বলে গণ্য হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে ইমাম শাফেয়ী দলীল নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে, তার পড়াশুনা দ্বারা সে মৃত ব্যক্তির ওপর সে সওয়াব পৌঁছায় না, কারণ সে পড়াশুনা মৃত ব্যক্তির নিজের কোনো কাজ বা উপার্জন করা জিনিস নয়। আর এই কারণেই রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর উম্মতকে এই সওয়াব-রেসানী করার জন্যে আহ্বান জানাননি বা উৎসাহিতও করেননি অথবা কোনো স্পষ্ট কথা বা ইশারা-ইংগিতেও তিনি এজন্যে বলেননি, এমনকি সাহাবাদের মধ্য থেকেও কোনো ব্যক্তি থেকে এ কাজের সমর্থনে কোনো কথা পাওয়া যায়নি। যদি এটা উত্তম কাজ হত, তাহলে তাঁরা নিজেরা আমাদের পূর্বে এ কাজ করতেন। তবে নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে কেউ কিছু করলে তা হবে নিজস্ব ব্যাপার, তার জন্যে কোরআন-হাদীসের দলীল থাকা বড় কথা নয়। সেখানে বিভিন্ন প্রকার কেয়াস করা অথবা মত প্রয়োগ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। অতপর দোয়া বা সদকা করার প্রসংগ ভিন্ন। সে ব্যাপারে তো শরীয়তদাতার পক্ষ থেকে স্পষ্ট দিক-নির্দেশিকা রয়েই গেছে।(২)

---

(১) আবু হোরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ননা হয়েছে।

(২) ইবনে কাছীর তাঁর তফসীরে এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

চেষ্টা কর্ম অনুযায়ী ফলাফল

'আর তার চেষ্টা-সাধনাকে শীঘ্রই সে দেখবে, তারপর তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।'

অতএব, কোনো চেষ্টা বা কোনো কাজ এবং উপার্জন কিছুতেই বিনষ্ট হবে না। আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্য থেকে এবং তাঁর সূক্ষ্ম দাঁড়িপাল্লা থেকে কোনো জিনিস বাদ পড়বে না। শীঘ্রই প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রচেষ্টার ফল পুরোপুরিভাবে পেয়ে যাবে, কিছুমাত্র কমও তাকে দেয়া হবে না, বা কোনো যুলুম বা বে-ইনসাফীও তার প্রতি করা হবে না।

এইভাবে ইনসাফপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে পেশ করা হয়েছে। এর ফলে মানুষের কাছে মানবতার সেই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা তাকে আত্মপ্রত্যয়ী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, সত্যপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী সৃষ্টি হিসেবে কায়েম রাখবে। সে হবে এমন সম্মানী যে তাকে সৎ কাজের সুযোগ দান করা হবে এবং তারপর সে এ কাজ করলো কিনা সে ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে এবং এইভাবে বিনিময় দান করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত আদালত সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে যে তার প্রতি অবিচার হবে না, সেখানে কারো খোশ খেয়াল মত বিচার হবে না। বিচার কাজে কোনো ক্রুটি-বিচ্যুতি আসার সুযোগ আসবে না এবং না জানার কারণে বা কোনো তথ্য গোপন থাকার ফলে কোনো বে-ইনসাফী সেখানে হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমার রবের নিকটেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে।'

অতএব, সেদিন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দিকে গমনের পথ ছাড়া অন্য আর কোনো পথই থাকবে না। তাঁর কাছে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয়স্থল সেদিন থাকবে না, থাকবে না সেদিন আর কোনো বাসস্থান তাঁর প্রদত্ত বাসস্থান ছাড়া। হয়ত সে থাকবে নেয়ামতে ভরা বাসগৃহে অথবা দোযখের আগুনের মর্মান্তিক দহনে। মানুষের হৃদয়-পটে, চেতনা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে এই অবস্থাটির চিত্র এঁকে দিয়ে এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে ওয়াকেফহাল করা হচ্ছে যেন সে এর থেকে সঠিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে। এমতাবস্থায়, যখনই সে বুঝবে যে, তার পরিসমাপ্তি আল্লাহর কাছে, যেখানে সব কিছুর পরিসমাপ্তি হবে, সব বিষয়ের এবং সকল ব্যক্তির, তখন সে দেখতে পাবে পথের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকার অথবা এপথ ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই, আর তখনই সে তার মন ও কাজকে এই সত্য ও বাস্তবতার নিরিখে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে, অথবা সাধ্যানুযায়ী সে এ পথের উপযোগী করে গড়তে ও পরিচালনার চেষ্টা চালাতে থাকবে। তার মন ও চিন্তা-চেতনা পরিসমাপ্তির এ দিনটিকে কেন্দ্র করে জীবন পথের শুরু থেকেই সফলতা অর্জনের জন্যে আশান্বিত হয়ে থাকবে।

মানব জীবনে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন

এরপর পার্থিব জীবন যাপন কালে আখেরাতের এ চিন্তা তার অন্তর ও মন-মগযের মধ্যে এমন এক আবর্ত সৃষ্টি করবে যে, সে প্রতিনিয়ত ও সর্বাবস্থায় জীবনের সর্ব পর্যায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির চিহ্ন নিজের মধ্যে দেখতে আকাংখী হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষাপটেই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই হাসান এবং তিনি কাঁদান, অর্থাৎ হাসানোর কাজ যেমন তিনি করেন, তেমনি কাঁদানোর ক্ষমতাও তাঁর হাতে।'

এ আয়াতের আওতায় বহু রহস্য লুকিয়ে আছে এবং এর মধ্যে বিভিন্ন প্রেরণা উদ্রেককারী কথা মেলে যা হৃদয়-মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই, সে কথাগুলো যেমন মানুষকে হাসতে সাহায্য করে, তেমনি আখেরাত-ভীতি মানুষের মধ্যে ক্রন্দনও সৃষ্টি করে। এই দুটি কাজই

মানুষের মধ্যে তীব্র অনুভূতির বহিপ্রকাশ। এ দুটি অবস্থাই মানব-সৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহস্যময় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্কে কেউ জানে না কেমনভাবে এবং কখন এ অবস্থা সংঘটিত হবে, অর্থাৎ কখন কিভাবে হাসি-কান্নার সৃষ্টি হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কখনও এই হাসি-কান্নার জন্যে বড় কোনো কারণের প্রয়োজন হয় না, মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দরুন তার অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে এমন কিছু চাপ সৃষ্টি হয় যার কারণে সে হাসে বা কাঁদে, আবার কোনো কোনো সময় অনেক বড় বড় কারণেও হাসি বা কান্নার উদ্রেক করে না। এই জন্যেই বলা হয়েছে, 'তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।'

আল্লাহ তায়ালাই মানুষের মধ্যে হাসি ও কান্নার প্রেরণাসমূহ পয়দা করে দিয়েছেন এবং হাসি-কান্নার উদ্রেক তিনিই করান মানুষের আভ্যন্তরীণ গুপ্ত ও রহস্যময় আবেগ-উৎকণ্ঠার ভিত্তিতে। তাই কোনো কারণে কখনও সে হাসে আবার অন্য কারণে কখনও সে কাঁদে। আবার দেখা যায় যে কারণে আজকে সে কাঁদছে, সেই একই কারণে পরের দিন সে হাসছে। আবার আজকে যে কারণে সে হাসছে, সেই একই কারণে পরের দিন সে কাঁদছে। এটা কোনো পাগলামি বা ভুলের কারণে নয়। এর পেছনে মানুষের পরিবর্তনশীল মানসিকতাই ক্রিয়াশীল। আর বিভিন্ন মূল্যায়নবোধ, আবেগ-উৎকণ্ঠা আনয়নকারী নানাপ্রকার অনুভূতি, প্রতিরোধও বিবেচনাশক্তি মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে এক রকম থাকে না।

'তিনিই হাসান, আর তিনিই কাঁদান' .....আবার এমনও হয় যে, একই সময় পর্যায়ক্রমে তিনি মানুষকে হাসান ও কাঁদান। এসবই সম্ভব হয় বাস্তব অনুভূতির তারতম্যের কারণে। আবার এমনও দেখা যায়, কোনো ব্যাপারে একদল লোক হাসছে, কিন্তু এ একই ব্যাপারে আর এক লোক কাঁদছে। কারণ ব্যাপারটি হয়তো কারো জন্যে একটি চমকপ্রদ ঘটনা, আবার হয়ত অপরের জন্যে দুর্ঘটনা। কেউ হয়তো এ ঘটনাকে আলিঙ্গন করতে পারছে, আবার অপর কেউ ঐ ঘটনা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাচ্ছে।

'তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।' আজকে দেখা যাচ্ছে, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ব্যক্তি হাসছে, কিন্তু যখন এ ঘটনার কুফল সে পরবর্তী কালে দেখছে তখন সে কাঁদছে। সে কামনা করছে, যদি কাজটি না হতো এবং এ কাজে সে খুশী প্রকাশ করতে গিয়ে না হাসতো। আর এইভাবেই দুনিয়ায় আজ কতজন হাসছে, যারা আখেরাতে কাঁদতে থাকবে, কিন্তু সে কান্না সে দিন কোনো কাজে লাগবে না।

এই সব বিভিন্ন চেহারা, প্রতিবিম্ব, অনুভূতি ও বিভিন্ন অবস্থা এবং আরও বহু জিনিস এই ছোট্ট আয়াতটি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যা অনুভূতি ও চেতনার কাছে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে, যা আত্মার মুক্তির পথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এবং যতই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আখেরাতের এ চিন্তা মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আখেরাতের ভয়ংকর সংকট থেকে নাজাতের পথে সে এগিয়ে যায় এবং তার মধ্যে হাসা ও কাঁদার আবেগগুলো নিত্য নতুনভাবে ক্রিয়াশীল হতে থাকে, আর কোরআনে বর্ণিত বহু অবস্থার মধ্যে আখেরাতের এ চিত্রটি এক বিশেষ মোজযা হিসাবে কাজ করে।

জীবন মৃত্যুর চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর হাতে

'আর তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই জীবিত করেন।'

এমনি করে কালামে পাকের এই আয়াতগুলো হৃদয়ানুভূতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে কাজ করে।

'তিনিই মারেন এবং তিনিই যিন্দা করেন'–কথাটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে তিনিই মৃত্যু দান করার ও জীবন দেয়ার কাজের সূচনা করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে, '(মহান আল্লাহ সেই সত্তা) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবন দান করেছেন। এ দুটি অবস্থার অভিজ্ঞতা বারবার হওয়ার ফলে সাধারণভাবে এ দুটি অবস্থাকে মানুষ ভালভাবেই বুঝেছে। এতদসত্ত্বেও এটা বাস্তব সত্য কথা যে, মানুষ যখন এ দুটি অবস্থার প্রকৃতি এবং গোপন রহস্য বুঝার চেষ্টা করে, তখন অবস্থা দুটি এক অজানা রহস্য হিসেবেই থেকে যায় (অনুভব করলেও সুনির্দিষ্টভাবে বুঝা সম্ভব হয় না)। মৃত্যু কি? জীবনই বা কি? এ দুটি অবস্থার তাৎপর্যই বা কি? এ দুটি অবস্থার চেহারা কি এবং প্রকৃতিই বা কি! এই আংগিকে যখন মানুষ গবেষণা চালায়, তখন তার চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। কি ভাবে মৃদু-মন্দ গতিতে সৃষ্টিজগতে জীবন পদার্পণ করলো! সে জীবন কি? কোত্থেকে এলো এবং কেমনভাবেই বা সৃষ্টির আবরণের মধ্যে ধরা দেয়ায় সে যিন্দা হয়ে গেল? আর কেমনভাবেই বা এই সৃষ্টির মাঝে সে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে অথবা জীবন্ত সৃষ্টির সবার মাঝে পরিভ্রমণরত রয়েছে? মৃত্যুই বা কি? জীবনের আগমনের পূর্বে মৃত্যু কিভাবে ছিলো এবং জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কিভাবে বিরাজ করবে–এ সব কিছুর রহস্য পর্দার অন্তরালে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই নিহিত।

মৃত্যু দান করলেন এবং তিনি যিন্দা করলেন। একথার লক্ষ কোটি অর্থ হতে পারে, অর্থাৎ একই মুহূর্তে কোটি কোটি ধরন ও উপায়ে জীব জগতে মৃত্যু আসতে পারে ও জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারে। একই মুহূর্তে কোটি কোটি মৃত্যু সংঘটিত হয়, আবার ঐ একই মুহূর্তেই কোটি কোটি জীবন বাস্তবে আসে। এর মধ্যে যে রহস্য রয়েছে তা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। আবার এমনও দেখা যায়, বহু মৃত্যুর কারণে আরও বহু জীবন বাস্তবে আসে। যুগে যুগে এর বিস্তর দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে এসেছে যা দূর অতীতে ঘটেছে এবং মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় সংরক্ষিত রয়েছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে এইভাবে মৃত্যু এসেছে, আবার নতুন নতুন জীবনও এসেছে। পৃথিবী নামক এ গ্রহে মানব সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকে এমন জীবন এসেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এ গ্রহ ব্যতীত আরও যেসব গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির বুকে রয়েছে, সেসবের মধ্যে কত জীবন আছে এবং কত মৃত্যু এসেছে সে সবের কথা হিসাব নাই-ই বা করলাম, কারণ তাদের সম্পর্কে মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।(১)

এসব জীবন-মৃত্যুর অসংখ্য ঘটনা জগতে ঘটেছে যার বিবরণ দেয়ার মতো ভাষা বা কথা আমাদের কাছে নেই। সেসব চিন্তা করতে গেলে মানুষের হৃদয় গভীর আবেগে প্রকম্পিত হতে থাকে, কিন্তু সেসব ঘটনার পরিমাপ করা বা কল্পনার নেত্রেও সেসব দৃশ্য দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালার জোড়ায় জোরায় সৃষ্টি

'আর তিনি একটি মাত্র শুক্রবিন্দু থেকে নর-নারীর জোড়া পয়দা করেন যখন তা (শুক্রবিন্দু লাফিয়ে লাফিয়ে) নির্গত হয়।'

---

(১) এখন অবশ্য পৃথিবী ছাড়া একাধিক গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন, তবে একথা কতোটুকু সত্য তা আগামী কালের আবিষ্কার উদ্ভাবনের মাধ্যমেই জানা যাবে।–সম্পাদক

জীবন সৃষ্টির এ বিরাট কাজ প্রতি মুহূর্তে উপর্যুপরি সংঘটিত হয়ে চলেছে। বারবার নযরের সামনে ঘটতে দেখে এর গুরুত্ব, অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র মানুষ ভুলে যায়। অথচ একটু খেয়াল করলেই মানুষ বুঝতে পারবে, যত জিনিস সম্পর্কেই মানুষ চিন্তা করুক না কেন তার মধ্যে এটিই হচ্ছে সব থেকে বড় আশ্চর্যজনক রহস্য।

'নুৎফাতুন তুমনা'—অর্থ শুক্রকোষ থেকে শুক্র বীজকে স্থানচ্যুত করা হয় বা স্খলিত করা হয়। এ স্খলন হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন শরীরের মধ্য থেকে ঘাম, অশ্রু, শিকনি ইত্যাদি বেরিয়ে আসে। এ বস্তুটি আল্লাহর ক্ষমতার রশিতে নিয়ন্ত্রিত এক নির্দিষ্ট বিরতির ব্যবধানে স্খলিত হয়। তারপর কি হয়? তারপর এই অতি তুচ্ছ ও সূক্ষ্ম বস্তুটি রূপ নেয় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের। আর এই মানুষের মধ্যে কেউ হয় পুরুষ এবং কেউ হয় নারী! কেমন করে এটা হয়? এই মণি নির্গত হওয়ার কাজ সংঘটিত না হলে কেমন করে সেই আশ্চর্যজনক মানুষ বাস্তবে আসতো? কেমন করে এই শক্ত ও সুগঠিত মানুষের অস্তিত্ব চিন্তা করা যেত, কি করেই বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর এমন সুদৃঢ় বন্ধন সম্ভব হতো! কোথায় লুকিয়ে ছিলো এই মানুষটি শুক্রবীজের কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুতে? হাঁ এক ফোঁটা শুক্রবীজের মধ্যে কোটি কোটি শুক্র-কীটের কোনো একটির মধ্যে নিহিত ছিলো আজকের এই পূর্ণাঙ্গ মানুষটি! কোথায় লুক্কায়িত ছিলো সে হাড্ডি, মাংস ও চামড়ার মধ্যে, আচ্ছাদিত ছিলো শিরা-উপশিরা চুল ও নখের ভিতর। পথে-ঘাটে, নানা বর্ণের পোশাকের আবরণে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-প্রকৃতি ও যোগ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে? লুকিয়েছিলো কোন্ সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোষের মধ্যে যা একমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এবং যা এক ফোঁটা শুক্রের মধ্যে কোটি কোটি সংখ্যায় বিচরণশীল? সেই সব কোষের মধ্যে পুরুষ ও নারী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে বিরাজ করছিলো কোথায়, কোন সে গোপন আবাস স্থলে। হাঁ, আবর্তন চক্রের সমাপ্তি পর্যায়ে সেই জীবন্ত কীট এসে গর্ভাশয়ে স্থির হলো এবং ভ্রূণ আকারে আত্ম-প্রকাশ করলো।

যে কোনো মানব-হৃদয় এই মহা বিস্ময়কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ করবে এবং আল্লাহর দিকে মন রুজু করবে, সে কিছুতেই আখেরাতকে অস্বীকার করতে পারবে না এবং অহংকারও করতে পারবে না। অবশ্যই সে বলে উঠবে হাঁ, এইভাবেই সৃষ্টিকুল বাস্তবে এসেছে এবং এইভাবেই একই নিয়মে সবখানে শান্তি বিরাজমান রয়েছে। অতপর প্রাকৃতিক এসব দৃশ্য থেকে শিক্ষা নিতে গিয়ে সে বলবে, যে মহান স্রষ্টা এইভাবে সৃষ্টিলোককে বাস্তবে এনেছেন, তিনি অবশ্যই মানব জাতিকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম—অন্যান্য প্রাণী যাদেরকে এই একই প্রকারের জীবন দেয়া হয়েছে, তারা জন্মগতভাবে এসব যোগ্যতাপ্রাপ্ত, এজন্যে পুনরায় এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এইভাবে সৃষ্টি রহস্যের কোনো একটি রহস্য যখন কারো সামনে উদঘাটিত হয়ে যায়, তখন পরবর্তী বহু রহস্য ভান্ডারের দ্বারও তার সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। কে সেই মহান সত্তা, যিনি এই সত্য উদঘাটনের ক্ষমতা দান করেছেন, এ মানব শ্রেণীকে পুনরায় জীবিত করে সংরক্ষণের জন্যে কে গোপন প্রেরণা সৃষ্টি করলো? দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর কে তাকে পুনরায় শক্তি যোগায়? কে তাকে চলার জন্যে সত্য সঠিক পথ বাত্লে দিয়েছে এবং সেই পথে চলার জন্যে তার মধ্যে সুপ্ত এক আগ্রহ কে রেখে দিয়েছে? কে সেই মহান সত্তা যিনি মানব শ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন? সেসব বৈশিষ্ট্য সহ তাকে পুনরায়

জীবিত করার এই আগ্রহ এবং এর গুরুত্বই বা কি? একাজ করার জন্যে তাঁর ইচ্ছা, আগ্রহ ও নির্দেশ যদি না হতো, তিনি যদি এটা না-ই দিতেন এবং এর জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যদি সৃষ্টি না-ই করতেন, তাহলে কি অবস্থা হতো? (এই সব নানাপ্রকার প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, যার কোনো জওয়াব আমরা খুঁজে পাই না।)

পুনরুত্থান আল্লাহ তায়ালার একক ক্ষমতা

প্রথম জন্মগ্রহণ–যেহেতু অহরহ আমাদের সামনে এ ঘটনা ঘটছে, এজন্যে একে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু পুনরায় জন্ম বা পুনরুত্থান হওয়ার ব্যাপারটি দৃষ্টির অন্তরালে থাকার কারণে সেই ব্যাপারে মানুষের মনোযোগ সরাসরি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'এবং পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই।'

এই পুনরুত্থান রয়েছে অদৃশ্য ও আমাদের কাছে অজানা। কিন্তু সেই দিবসটির প্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে প্রথম জন্মগ্রহণ দিবসটি বর্তমান। পুনরুত্থান ঘটা যে সম্ভব তা প্রথম জন্ম লাভের ব্যাপারটি খেয়াল করলে বুঝতে পারি। যিনি পুরুষ ও নারীর জোড়াকে সেই শুক্রবিন্দু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা স্খলিত (স্থানচ্যুত) হয়, তিনি হাড্ডি ও গলিত অবস্থার মধ্য থেকে পুনরায় অস্তিত্বে আনতে নিসন্দেহে সক্ষম। অবশ্যই হাড্ডি এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ বা গলিত শবদেহ তো তরল শুক্র-বিন্দু থেকে তুচ্ছ কোনো পদার্থ নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যাপারটি প্রকৃত পক্ষে যে সংঘটিত হবে, তার প্রমাণ কি! এবং এর যৌক্তিকতা কিভাবে বুঝা যায়? জন্ম প্রক্রিয়ার এই যে ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা গেছে যে, এটি একটি গোপন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংঘটিত হয়, এ ব্যবস্থাপনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক শুক্র-জীব কোষ এক দীর্ঘ ও জটিল পথ-পরিক্রমার পর পরিণত হয় পুরুষ, না হয় নারীর ভ্রূণে। এই ব্যবস্থার পথ-পরিক্রমা অবশ্যই সেই চলমান ও বিধ্বস্ত পৃথিবী থেকে অধিক কঠিন যার মধ্যে কোনো কিছুই পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয় না এবং কোনো এহসানকারী তার প্রতিদান পূর্ণ মাত্রায় পায় না। আর না কোনো অন্যায়কারী তার পূর্ণ বদলা (শাস্তি) পেতে পারে। এই সকল বিষয়ে হিসাব-নিকাশ করলে পুনরুত্থান-দিবসের আগমন সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসংগত। সুতরাং প্রথম জন্ম বা আগমন পুনরায় জন্ম হওয়ার যুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই কারণেই 'পুনরুত্থান'কে প্রথম আগমনের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম জন্ম ও পরবর্তী উত্থান–এই দুই সময়েই আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে অভাবমুক্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে অভাবী রাখেন।

ধনী নির্ধন সবই আল্লাহ তায়ালার হাতে

এরশাদ হচ্ছে, 'তিনিই (মানুষকে) অভাবমুক্ত বানিয়েছেন, আবার তিনিই তাদেরকে অভাবী করেছেন।'

আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বহু প্রকারের সচ্ছলতা দিয়েছেন। আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছেন, দিয়েছেন সুস্থতা ও স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য এবং উত্তম সন্তানাদি। আরও দিয়েছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও চিন্তার আযাদী। এর সাথে আরও দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রশস্ততা ও সেই পাথেয় যার কোনো তুলনা নেই। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি সচ্ছলতা দিয়েছেন, দিয়েছেন সবই যা দুনিয়ায় দেয়ার আছে। এমনি করে আখেরাতেও দেবেন তাকে যা কিছু তার প্রয়োজন।

সৃষ্টজীব মাত্রই অভাবগ্রস্ত ও অন্তসারশূন্য। তারা নিজেদেরকে অভাবমুক্ত বোধ করতে পারে না এবং আল্লাহর ভান্ডার থেকে না পেয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে কিছু পাওয়ারও আশা করতে

পারে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তার যাবতীয় অভাব দূর করতে পারেন। এ সব হচ্ছে বাস্তব জীবনের এমন প্রয়োজন যা তারা নিজেরা জানে এবং যা তাদের চোখগুলো দেখে এবং তাদের অন্তর অনুভব করে, যাতে তারা একই মাত্র উৎস থেকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর পথ দেখতে পায় এবং সেই একই ভান্ডার থেকে তাদের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়ার জন্যে রুজু করতে পারে কারণ অন্য সবাই সর্বতোভাবে অভাবী এবং নিঃস্ব।

'আর তিনিই হচ্ছেন শে'রা নামক নক্ষত্রের রব।'

আর শে'রা হচ্ছে এমন একটি নক্ষত্র যা সূর্য থেকে বিশগুণ ভারী এবং তার আলো সূর্যের আলো থেকে পঞ্চাশ গুণ বেশী। আর আমাদের এই পৃথিবী থেকে সূর্যের যে দূরত্ব সূর্য থেকে তার দূরত্ব আরও কোটি কোটি গুণ বেশী।

আরবে অনেকে এই নক্ষত্রের পূজা করতো এবং অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞানে এই নক্ষত্রটিকে দেখার জন্যে বহু লোক চেষ্টা-সাধনা করতো। সুতরাং এ বিষয়ে আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে যে, সে শে'রার রবও আল্লাহ রব্বুল ইযযত এবং এই অস্তমিত নক্ষত্রের কসমই দেয়া হয়েছে আলোচ্য সূরার শুরুতে। এ সূরা আরও জানাচ্ছে যে ঊর্ধাকাশে অবস্থিত এক বিশেষ জগতে অবশেষে সবাইকে যেতে হবে, যেমন তাওহীদ-বিশ্বাসের লক্ষ্য এই একই আখেরাতের জীবন-লাভ এবং শেরেক-এর নিরর্থক ও মনগড়া দাবী প্রত্যাখ্যান।

এরই সাথে শেষ হচ্ছে মানুষের নিজের মধ্যে ও গগন-বিদারী দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য রহস্যরাজির ওপর এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এরপর আমরা পশ্চাৎপন্থীদের আচরণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। এসব লোকেরা যুগে যুগে সতর্ককারী নবীদের আগমনের পর তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যেমন তাঁদেরকে মোশরেকরা প্রত্যাখ্যান করতে দেখেছে এবং তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেও আখ্যায়িত করেছে। নবীদের প্রেরণ ও তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছানো—এ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছাসমূহ এক এক করে ইতিপূর্বে যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

তিনিই প্রথম আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, ধ্বংস করেছেন সামূদ জাতিকেও এবং তাদের মধ্য থেকে কেউই রেহাই পায়নি। ধ্বংস করেছেন ইতিপূর্বে নূহ (আ.)-এর জাতিকেও। তারা ছিলো আরও বড় যালেম এবং আরও কঠিন বিদ্রোহী এবং মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বস্তি ওপরে তুলে নিক্ষেপ করেছেন, তারপর তাকে ঢেকে দিয়েছেন পুরোপুরিভাবে। এখন বলো, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ সে নেয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করছো?

মহাকালের মধ্যে (দুনিয়ার এ জীবন) দ্রুতগতিতে অতিক্রমশীল এ এক নিদারুণ সফর। বিশাল এ সফর ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি কিছু দিনের জন্যে সাময়িকভাবে অবস্থান করার জন্যে এক সুযোগ পায় যখন সে অপরকে কঠিনভাবে আঘাত করে। এ আঘাত চেতনাকে ভীষণভাবে ঘায়েলও করে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের পরিণতি

আবারও আদ, সামূদ ও নূহ (আ.)-এর জাতির কথা উল্লেখ করছি। এদের সম্পর্কে কোরআনের পাঠকরা ভালভাবেই কোরআনের বিভিন্ন জায়াগায় জানতে পেরেছে। 'মোতাফেকাত' বলতে লূত জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এদেরকে যেসব কারণে ধ্বংস করা হয়েছিলো তা ছিলো—মিথ্যা, মিথ্যা দোষারোপ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পথে চলা। এসব অপরাধ তাদেরকে অতলান্ত হাবিয়া দোযখের দিকে নিক্ষেপ করেছে এবং তাদেরকে যমীনের বুকে ধসিয়ে দিয়েছে।

'সুতরাং ঢেকে ফেলেছে তাদেরকে পৃথিবী পুরাপুরি এমনভাবে যে, আজ তাদের কোনো নাম-নিশানাও অবশিষ্ট নেই।' এককালে পৃথিবীতে তারা এতো শক্তিমান জাতি থাকা সত্ত্বেও এমনভাবে মানুষ তাদেরকে আজ ভুলে গেছে যে, কেউ তাদেরকে স্মরণ করে না, তাদের কথা উল্লেখও করে না। তবু, (মানুষের শিক্ষার জন) তাদেরকে যেসব এলাকায় ধ্বংস করা হয়েছিলো এবং ধসিয়ে দেয়া হয়েছিলো, সেখানকার ধ্বংসাবশেষ এখনও মানুষের জন্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শাস্তির এ চিহ্নগুলো দুনিয়াবাসীকে এখনও জানায়। শক্তির বড়াই করলে এমনি করে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেয়া হবে এবং কখনও মাথা তোলার সুযোগ থাকবে না।

'সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কোনো নেয়ামতকে নিয়ে তোমরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো?'

যেসব বিষয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন তার মূল কথা হচ্ছে, শক্তি-সামর্থ এবং যাবতীয় নেয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্ব যে আল্লাহর তা তারা অস্বীকার করে নিজেদেরকেই শক্তিমান বলে ঘোষণা দিয়েছিলো এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বপ্রকার যুলুম চালিয়েছিলো। তাই আল্লাহ পাক জানাচ্ছেন, তিনি কি এসব অন্যায়কারীকে ধ্বংস করেননি? তিনি কি মিথ্যার ওপর সত্যকে বিজয়ী করেননি? এইভাবে অপ্রমাণিত করেননি তাদের দাবীকে। ফলে তারা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে! যারা চিন্তা করে এবং শিক্ষা নিতে চায়, তাদের জন্যে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা জানার বহু নিদর্শন এইসব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে। মানুষকে শিক্ষাদান করার ব্যাপারে এসব কি আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত নয়? সুতরাং, আল্লাহ তায়ালার কোন্ কোন্ নেয়ামতের ব্যাপারে তোমরা বিতর্ক চালাচ্ছো? একথার সম্বোধন করা হয়েছে সবার জন্যে। প্রত্যেক অন্তর ও প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের জন্যে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির শিল্প-নৈপুণ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং সবখানেই আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত দেখতে পারে। এমনকি নানা প্রকার বিপদের মধ্যেও তাঁর নেয়ামতের সন্ধান তারা পায়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও মানুষের ওপর এবং দিগন্তবলয়ে বিস্তৃত আল্লাহর ইচ্ছার বহিপ্রকাশগুলোকে সামনে নিয়ে মানুষের চিন্তা করা দরকার চরম মিথ্যাবাদী ও নবীদেরকে প্রত্যাখ্যানকারী প্রাচীন এসব জাতি ও তাদের তৎপরতা সম্পর্কে। তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে গভীর চিন্তা জাগবে সত্য সঠিক পথ গ্রহণ করার জন্যে এক মনোবল সৃষ্টি হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও চলমান ঘটনাসমূহ মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক মহা-বিপদ-সংকেত হিসেবে আমাদের মন-মগজকে আন্দোলিত করতে থাকবে।

তাই, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসছে, 'এ মহান নবী হচ্ছে অতীতে আগত অন্যান্য সতর্ককারী (নবীদের) ন্যায় একজন সতর্ককারী। মহাপ্রলয় (কেয়ামত) আগতপ্রায়। (যখন তা এসেই পড়বে, তখন) আল্লাহ ব্যতীত ঐ ভয়ানক বিপদকে কেউ দূর করতে পারবে না।'

এই যে রসূল (তোমাদেরকে সতর্ক করে চলেছেন), যাঁর রসূল হওয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তোমরা নানাপ্রকার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছো এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে সতর্ককারী রসূল কিনা এ বিষয়ে তোমরা কি নানা ধরনের তর্ক করছো?—এ বিষয়ে জেনে নাও, অবশ্যই সে পূর্বে আগত অন্যান্য নবী রসূলদের মতই একজন সতর্ককারী রসূল। অন্যান্য-নবী রসূলরা যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন এবং আখেরাত সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, এ রসূলও সেই একই দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। আর অবশ্যই কেয়ামত হওয়ার দিন নিকবর্তী হয়ে গেছে।

সেই দিন শীঘ্র সমাগত হওয়ার সময় এসে গেছে যখন সব কিছুকে ভীষণ ঝড়ের বেগে চালিত করা হবে। সেই দিনটিতেই হবে মহা প্রলয় এবং সেই মহা ধ্বংস সম্পর্কেই এই সতর্ককারী তোমাদেরকে সে বিষয়ে হুশিয়ার করছেন, অথবা সে এমন এক আযাবের সন্ত্রাস যার প্রকৃতি

আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না এবং যাকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা থামিয়ে দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক। এজন্যেই বলা হয়েছে, 'তা দূর করার ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারও নেই।'

হাসি কান্নার আসল রহস্য

হঠাৎ করে এ মহা বিপদ আসার সময় অতি আসন্ন এবং পরম দয়ালু উপদেশদাতা নবীও মুক্তির দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তখন তোমাদের অবস্থা হবে এই যে, তোমরা পেরেশান হয়ে মাতালের মতো টলতে থাকবে এবং কোনো স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এ অবস্থা কিছুতেই দূর হবে না। এ প্রসংগে এরশাদ হচ্ছে,

'কি ব্যাপার, একথায় কি তোমরা খুবই আশ্চর্য হচ্ছো? হাসছো? একটুও কাঁদছো না? বরং উপহাস-বিদ্রূপ করছো?'

একথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা অধিকাংশ মানুষের ওপর প্রযোজ্য। একথাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা সবারই কর্তব্য এবং বর্তমান একথাগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ কথার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অতএব, কোন্ জিনিসের কারণে তারা আশ্চর্য হচ্ছে এবং কোন্ কথার ওপর তারা হাসছে? অপরদিকে রয়েছে আল্লাহর বেশ কিছু অনুগত বান্দাহ, তারা মহা সৌভাগ্যবান। পৃথিবীর বুকে বসবাস করার সময়েই তারা আশা করে যে, একদিন তাদের সমুদয় কাজের হিসাব দিতে হবে। তারা দুনিয়ার এ যিন্দেগীতে কান্নাকাটি করে সেই ভয়ানক দিনে মুক্তির প্রয়াসে। তাই, সেদিন ভয়ানক আযাবের দৃশ্যের পাশাপাশি এরা মুক্তি লাভ করে সৌভাগ্যবান হবে।

এখানের একথাগুলো যেন চাপা স্বরে তাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে যাচ্ছে, তাদের কান ও অন্তরের মধ্যে তার নিজস্ব স্বরে ঘোষণা করছে এবং ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে তাদের নিজ অস্তিত্বের কথা স্মরণ করার জন্যে প্রেরণা যোগাচ্ছে। তবু তারা ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

তাই, তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে, 'সেজদা করো আল্লাহর এবং একমাত্র তাঁরই সার্বিক আনুগত্য কর'। এই প্রসংগে এ আহবান এমন একটি আওয়ায বান্দার মনে প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি করে এবং অন্য সব কিছু থেকে তাকে উদাসীন করে দেয়। আর এই তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মধ্যে এক দীর্ঘ ভূমিকার পর এমন কিছু কথা পেশ করা হয়েছে যা হৃদয়কে সত্যিই গভীরভাবে আন্দোলিত করে।

এরই ফলে এ আয়াতটি যখন পঠিত হলো তখন সেইসব মোশরেক, যারা কোরআন ও ওহীর সত্যতা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত ছিলো, যারা আল্লাহ ও রসূল-এর ব্যাপারে ঝগড়া করছিলো, তারা সবাই একযোগে সেজদায় পড়ে গেল।

এই সূরার মধ্যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখ দিয়ে কেয়ামতের ঐসব ভয়াবহ বিবরণ বেরুনোর সাথে সাথে তারা সেজদায় পতিত হলো। উপস্থিত এসব লোকের মধ্যে মুসলমান ও মোশরেক উভয় শ্রেণীর মানুষই বর্তমান ছিলো। কোরআনের এই তেজোদৃপ্ত বাণীর সামনে তারা স্থির থাকতে অক্ষম হয়ে গেলো। কোরআনের এই ক্ষমতার কাছে তারা নিজেদের অজান্তেই পরাজয় বরণ করে সেজদায় পড়ে গেলো। বেশ কিছু সময় ধরে সেজদায় পড়ে থাকলো। দীর্ঘ সময় ধরে এই সেজদায় অতিবাহিত করার পর তারা যখন মাথা তুললো, তখন সেজদায় থাকাকালে যেমন আত্মহারা অবস্থায় ছিলো তেমনি আত্মহারা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ধরে তারা বসে থাকলো।

এই বিবরণ মোতওয়াতের হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। তারপর এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নানা কথা এসেছে। আসলে এটা কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিলো না। এ ছিলো আল-কোরআনের এক বিশেষ মোজেযা, যা হৃদয়ের ওপর এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো!

এ ঘটনাটি এত রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা গেছে যা ভুল বলে মন মানতে চায় না। মুসলমানদের সাথে মোশরেকরা সেজদায় পড়ে। এর পেছনে কি কারণ জানার জন্যে আমার খুবই আগ্রহ হলো। কোনো বিশেষ হৃদয়গ্রাহী অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আসার পূবেই আমি নিজেই কিছু নির্ণয় করেছি এবং আমার কাছে তা খুবই স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত মনে হয়েছে।

একটি হাদীস ও তার ব্যাখ্যা

'হাদীসে গারানীক' নামে পরিচিত মিথ্যা ও বানোয়াট এ রেওয়ায়েতটি আমি নিজে পড়েছি, যা ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে জরীর আত্তাবারী-রচিত ইতিহাসেও উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো মোফাসসেরও আল্লাহর বাণী–'আমি তোমার পূর্বে যে কোনো নবী-রসূল প্রেরণ করেছি, সে নবী বা রসূল যখনই কোনো আকাংখা পেশ করেছে, শয়তান তার আকাংখার মধ্যে নিজের কিছু কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। অতপর, শয়তানের আনীত সে কথাগুলোকে আল্লাহ পাক নাকচ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কথাগুলো মযবৃত ও নিসন্দেহ বানিয়ে দিয়েছেন।' এ রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কেই ইবনে কাছীর কিছু সুন্দর তথ্য পেশ করে বলেছেন (আল্লাহ পাক তাকে নেক প্রতিদান দিন), এ রেওয়ায়েতগুলোর সবগুলোই হচ্ছে 'মুরসাল' যার সহীহ হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ রেওয়ায়েতগুলো অধিকাংশ খুব বিস্তারিত, কিছু সংখ্যক মিথ্যা ও বানোয়াট কথায় ভরা যা রসূল (স.)-এর কথা বলে চালানো হয়েছে। ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, সূরায়ে নাজম যখন নাযিল হয়, তখন মোশরেকরা বলছিলো, এ লোকটি যদি আমাদের মাবূদ দেবতাদের সম্পর্কে কিছু ভাল কথা বলতো, তাহলে তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে আমরা অবশ্যই মেনে নিতাম। কিন্তু ইহুদী-নাসারাদের মধ্যে যেসব লোক তার আনীত এই নতুন ব্যবস্থাকে মানছে না, তবু তাদেরকে তো এলোকটি এভাবে নিন্দা করে না বা গালিও দেয় না যেমন আমাদের দেব-দেবতাদের নিন্দা করে। অথচ, বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর সাহাবারা ওদের থেকে যে দুর্ব্যবহার ও প্রত্যাখ্যান পেয়েছেন তাতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন এবং তাদের ভুল পথে চলতে থাকায় তিনি অত্যন্ত বেদনাহতে ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন যেন তারা হেদায়াতের পথ গ্রহণ করে। এরপরই যখন আল্লাহ তায়ালা সূরা 'নাজ্ম' নাযিল করে বললেন, তোমরা লাত, ওযযা এবং তৃতীয় আর একটি দেবী মানাত সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কি?' সে সময় শয়তান একথা যোগ দিয়েছিলো সেখানে আল্লাহ তায়ালা আল্লাদ্রোহীদের কথা বলতে গিয়ে বললেন, ওরা হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুন্দরী মেয়েলোক এবং তাদের সুপারিশ এত মূল্যবান যা আশা করা হয়। আসলে এসব শয়তানের ছন্দময় কথা এবং তার দুরভিসন্ধি। এ দুটি কথা মক্কার মোশরেকদের মনে স্থান করে নিলো এবং তাদের মুখেও সে কথা জারি হয়ে গেলো। আর মক্কাবাসীরা একথাগুলো থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করলো ও বললো, যাক, মোহাম্মদ তার জাতির ও তাদের প্রথম ধর্মের দিকে ফিরে এসেছে। কথাটি রসূল (স.)-এর কানে গেলে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে সূরায়ে নাজ্ম পড়লেন, তারপর তিনি এবং উপস্থিত মুসলিম ও মোশরেক জনগণ সবাই সেজদায় পড়ে গেলেন। শুধুমাত্র মোশরেক বর্ষীয়ান নেতা ওলীদ ইবনে মুগীরা সিজ্দা করা থেকে বিরত রইলো। সে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে তার ওপর সেজদা করলো। তখন উপস্থিত দু'পক্ষের লোকজন সবাই

রসূলুল্লাহ (স.)-এর সেজদা দেখে চমৎকৃত হলো এবং বিশেষ করে মুসলমানগণ আশ্চর্য হলেন যে, ঈমান-ইয়াকীন ছাড়া মোশরেকরা কি ভাবে সেজদা করলো! তারপর যখন রসূল (স.)-এর আকাংখার মধ্যে শয়তান উপরোক্ত কথাটি প্রবেশ করিয়ে দিলো, তখন মোশরেকরা আশ্বস্ত হলো যে, তারা তাদের দেব-দেবীদের সম্মানার্থেই সেজদা করেছে। শয়তানও তাদের মনে একথা জাগিয়ে দিলো যে, রসূলুল্লাহ (স.) সূরায়ে নাজম-এর মধ্যে একথা পড়েছেন যার কারণে সবাই এসব দেব-দেবীর সম্মানে সেজদা করেছে। এরপর একথাগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং শয়তানও সবখানে একথা প্রকাশ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আবিসিনিয়াতে সবার কাছে, এমনকি মুসলমানদের কাছেও খবরটি পৌঁছে গেলো। সেখানে ওসমান ইবনে মাযঊন ও তাঁর সংগীরাও উপস্থিত ছিলো। তারা বলাবলি শুরু করে দিলো যে, মক্কাবাসী সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে নামাযও পড়েছে। তাদের কাছে এ খবরও পৌঁছলো যে, ওলীদ ইবনে মুগীরা হাতে মাটি নিয়ে তার ওপর সেজদা করেছে। আরও খবর পৌঁছলো যে, মক্কায় মুসলমানগণ নিরাপদ হয়ে গেছে, যার কারণে তারা আবিসিনিয়া থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

শয়তান যা কিছু কথা সূরায়ে নাজম-এর সাথে জুড়ে দিয়েছিলো আল্লাহ পাক তা মনসূখ (নাকচ) করে দিয়ে তাঁর আয়াতগুলো সন্দেহমুক্ত করে দিলেন এবং মনগড়া কথা থেকে মুক্ত করে জানালেন, 'তোমার পূর্বে যে কোনো রসূল বা নবী পাঠিয়েছি ....।' আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফায়সালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন এবং ফেরেশতাদের সম্পর্কে শয়তানের ছন্দপূর্ণ তৈরী করা কথা থেকে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তা পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন। এরপর মোশরেকরা তাদের পূর্ব গোমরাহী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাবের দিকে পুনরায় ফিরে গেলো, বরং তাদের দুশমনী আরও বেড়ে গেলো।

আরও কিছু রেওয়ায়েত পাওয়া গেছে যা এই বানাওটী কথাকে আরও জোরদার করেছে এবং 'সুন্দরী ফেরেশতাদের' কাহিনীকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা বলে প্রচার করেছে এবং জানিয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.) কোরায়শদেরকে খুশী করার জন্যে এবং দ্বীন-ইসলামের দিকে আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উৎসাহপূর্ণভাবে এরকম কিছু কথা বলেছিলেন।

এসমস্ত মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনাকে প্রথম অবস্থাতেই নাকচ করে দেয়া হয়েছে–যখন এগুলো প্রচার হওয়ার ভয় দেখা গিয়েছিলো। নবুওতের নিরাপত্তা ও কোরআনকে মিথ্যা ও মানুষের মনগড়া কথা থেকে মুক্ত রাখার জন্যেও প্রথম সুযোগেই এ ছাঁটাই-বাছাই করা হয়েছে। এটা এজন্যেও প্রয়োজন ছিলো যাতে কোরআন করীমের সকল বাক্য বা শব্দ সকল প্রকার পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং আলোচ্য সূরার বর্ণনাভংগি চূড়ান্তভাবে বানোয়াট–এ কাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করে এ সূরার মধ্যে অলীক দেব-দেবীর প্রতি মোশরেকদের বিশ্বাস এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় কল্প কাহিনীর প্রতি কঠিন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। অতএব, ওপরে (শয়তানের তৈরী করা) কথা দুটি এ সূরার অংশ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এমনকি আর একটি প্রচলিত কথাও যুক্তিহীন, যার মধ্যে বলা হয়েছে, শয়তান মোশরেকদের কানে এই বাক্য দুটি এনে দিয়েছিলো যা মুসলমানগণ শুনতে পায়নি। এখানে চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, এ সব মোশরে তো আরবই ছিলো যারা তাদের ভাষা ভাল করেই বুঝতো এবং বর্ণনার মধ্যে যে কাব্যিক সৌন্দর্য ছিলো তাও যথাযথভাবে অনুভব করতো। কাজেই হঠাৎ করে একটি অপ্রাসংগিক কথা এলে তার সত্য সম্পর্কে তাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে না! দেখুন, আয়াতে কি বলা হচ্ছে, 'তোমাদের

জন্যে হচ্ছে পুরুষ (সন্তান) আর তাঁর (আল্লাহ) জন্যে কন্যা (সন্তান)? এটা বড়ই বে-ইনসাফ-পূর্ণ বন্টন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে তোমাদের কিছু বানানো নাম যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা নিজেরা এসব নামকরণ করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কিছু দলীল নাযিল করেননি (শেষ পর্যন্ত)।' এর পরবর্তী কথাগুলো তারা (মোশরেকরা) শুনতে পাচ্ছে, 'যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তারাই ফেরেশতাদেরকে মেয়েদের নামে নামকরণ করেছে, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই (আসলে এবিষয়ে তারা কিছুই বুঝে না)। তারা শুধুমাত্র ধারণা-কল্পনার ওপরই কথা বলে এবং ধারণার বশবর্তী হয়েই চলে। আর এটা নিশ্চিত যে, নিছক ধারণা সত্য প্রাপ্তিতে কোনো সাহায্য করে না।' এর পূর্বে আরও ওরা (মোশরেকরা) শুনছে, 'আকাশে কত শত ফেরেশতা রয়েছে যারা তাদের পক্ষে কোনো সুপারিশ করার অধিকার রাখে না, তবে আল্লাহ পাক যদি কারও সম্পর্কে সুপারিশের অনুমতি দেন এবং তিনি খুশী হন তো তার কথা ভিন্ন। একথাগুলো শোনার সময় সে মোশরেকরা রসূল (স.)-এর সাথে সেজদা করেনি, কারণ সেজদার প্রসংগ এখানে আসেনি। এখানে তাদের দেব-দেবীর কোনো প্রশংসাও করা হয়নি বা তারা শাফায়াত করতে পারবে বলেও জানানো হয়নি। ওরা এই মিথ্যা রেওয়ায়েতকারীর মত কোনো নির্বোধ ব্যক্তিও ছিলো না। আসলে এ সব মিথ্যা বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে পাশ্চাত্য ছিদ্রান্বেষণকারীরা এ কথাগুলো লুফে নিয়ে নিজেদের গরজ মত হঠকারিতার সাথে কথাগুলো চালিয়ে দিয়েছে (যেন মানুষ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়)।

তাহলে অবশ্যই এ কারণ ছাড়া অন্য আরও কোনো ব্যাপার ছিলো যার কারণে মোশরেকরা সেজদা করেছিলো এবং আবিসিনিয়ার মোহাজেররা একটি নির্দিষ্ট সময় পর অন্য কোনো কারণে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

মোহাজেররা আবিসিনিয়া থেকে কেন ফিরে এলেন এবং কিছু দিন থাকার পর পুনরায় কেন আবার হিজরত করলেন তা নির্ণয় করার জন্যে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সেজদা করার কারণটি এই প্রসংগে আমরা বুঝতে না পারায় বিরোধী ভাব দেখাচ্ছি।

ওপরে বর্ণিত কারণ ব্যতীত সেজদা করার আরও কিছু কারণ আছে বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় সেজদা করার ব্যাপারটি আদতেই সংঘটিত হয়নি। দু'মাস বা তিন মাস পরে আবিসিনিয়া থেকে মোহাজেরদের ফিরে আসার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সম্ভবত এ ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মোহাজেরদের ফিরে আসার পেছনে কিছু না কিছু এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই ঘটে থাকবে।

এধরনের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা আমারও যা আমি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি।

আমরা কয়েক জন লোক একবার এক জায়গায় বসে কথা বলছিলাম, এমন সময় কাছাকাছি কোনো এক জায়গা থেকে কোরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনতে পেলাম এবং যখন খেয়াল করে বুঝতে পারলাম যে, সূরায়ে আন্ নাজম পাঠ করা হচ্ছে, তখন আমাদের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেলো এবং আমরা মনোনিবেশ সহকারে চুপ করে তেলাওয়াত শুনতে লাগলাম। যে কারী সাহেব পড়ছিলেন তার কণ্ঠস্বরটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী ছিলো। তিনি বড় সুন্দর করে থেমে থেমে পড়ছিলেন।

যখন তিনি সুমধুর সুরে কোরআন পড়ছিলেন, তখন আমি ধীরে ধীরে তাঁর সেই সুর লহরী আকণ্ঠ পান করছিলাম, পান করছিলাম—মোহাম্মদ (স.)-এর সেই মুহূর্তের হৃদয় দিয়ে যখন আকাশের উচ্চতম মার্গে তিনি আরোহণ করেছিলেন, যখন তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহর সৃষ্ট ফেরেশতার আসল চেহারায় দেখছিলেন। আমি যেন তাঁরই সেই অবস্থানে নিজেকে অনুভব

করছিলাম। এ এমন এক আশ্চর্য ঘটনা যা চিন্তা করতে গেলে মানুষ বুদ্ধিহারা হয়ে যায়। আমি যেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথেই সেই পরম মুহূর্তে অবস্থান করছিলাম যখন তিনি ঊর্ধাকাশের দিকে দ্রুতগতিতে আরোহণ করে সেদ্‌রাতুল মোনতাহা ও জান্নাতুল মাওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এই কল্পনা করছিলাম। বড় তৃপ্তির সাথে এবং আমার শক্তি ও অনুভূতি দিয়ে সেই সুরসুধা পান করছিলাম। ফেরেশতা, তাদের এবাদত, তাদের বান্দাহ ওয়া এবং নিরন্তর তাদের আল্লাহর অনুগত সৃষ্টি হিসেবে কাজ করা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছি, আর পাশাপাশি অনুভব করেছি কী চরম নির্বুদ্ধিতার সাথে তাদের সম্পর্কে মোশরেকরা চিন্তা করে এবং তাদের সম্পর্কে কত মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে তারা পতিত হয়।

এরপর মাটি থেকে তৈরী মানুষ ও ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে তার আগমনের বিষয়েও ভেবেছি। তারপর বুঝেছি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এসব কিছুর রহস্য জানেন।

সূরাটির শেষ ভাগে উল্লিখিত এ সকল বিস্ময়কর রহস্যরাজির সংস্পর্শে এসে আমার অস্তিত্ব প্রকম্পিত হতে থেকেছে। এখানে পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সেইসব জিনিস সম্পর্কে বলা হয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ দেখে না এবং এমন সব সুনির্দিষ্ট কাজের উল্লেখ করা হয়েছে যার কোনো তুলনা নাই আর যার হিসাব-নিকাশ করে অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে। অবশেষে, বান্দাহর সকল কাজ আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, যা সে জীবনের বিভিন্ন চলার পথে করতে থেকেছে। তখন অনেকে হাস্য-মুখরিত অবস্থায় থাকবে আর অনেকে থাকবে ক্রন্দনরত ও আত্ম-অনুশোচনীয় বিলাপরত। কেউ মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে আর কেউ নতুন এ জীবনের অমরত্ব কামনা করবে। মানব সৃষ্টির সূচনাতে শুক্রবিন্দু অন্ধকারাচ্ছন্ন এক সুড়ং পথে এগুতে থাকে এবং এর গোপন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে করতে একপর্যায়ে এসে তা নর বা নারীর ভ্রূণে পরিণত হয়। এর পরেই পরবর্তীতে এক নতুন জীবে পরিণত হয়। এইভাবেই মানব প্রকৃতির পূর্ণত্ব লাভের পথে এক নিরন্তর সংগ্রাম চলতে থাকে এবং যেন এক প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া তাকে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এরপর আমি ভীতি প্রদর্শনকারীর (নবীর) সর্বশেষ শব্দটি হঠাৎ করে আসা ধ্বংসের পূর্বেই যেন শুনতে পেলাম।' 'এই হচ্ছে সেই ভীতি প্রদর্শনকারী যা পূর্বে আসা অন্যান্য ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্যতম। মহা-বিপর্যয় আগতপ্রায়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এই বিপদকে হঠাতে পারে না।'

তারপর এল পরবর্তী প্রচন্ড এক শব্দ এবং আমার গোটা অস্তিত্ব ভয়ানক ক্রন্দনের সাথে থরথর করে কেঁপে উঠলো, 'এই কথাতে তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছো? হাসছো? কাঁদছোনা! আর তোমরা কি ঠাট্টা-মস্কারি করছ!

তারপর যখন শুনলাম, 'আল্লাহর সামনে সেজদায় পড়ে যাও এবং তাঁরই পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য কর।' তখন এই কম্পন ছড়িয়ে পড়লো আমার অন্তর থেকে নিয়ে সমগ্র অংগ-প্রত্যংগে। আর অংগ-প্রত্যংগের এই কম্পন-এর প্রবাহ এমনভাবে আমার গোটা অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেললো যে, আমি নিজেকে আর সামলাতে পারছিলাম না। গোটা দেহ প্রচন্ড বেগে কাঁপছিলো, কিছুতেই সে কম্পনকে থামাতে পারছিলাম না। এর সাথে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হয়ে চলেছিলো, যা শত চেষ্টা করেও আমি থামাতে পারছিলাম না।

ঠিক এই মুহূর্তেই আমি অনুভব করলাম, সেজদার ঘটনাটি ছিলো অবশ্যই সত্য এবং এই সেজদার কারণও যথার্থ। আমি অনুধাবন করলাম যে, কোরআনের এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কারণেই সে সেজদার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো। সম্ভব হয়েছিলো সূরার মধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন

ঘটনার সংস্পর্শে এসে। সূরায়ে নাজম আমি এই প্রথম পড়লাম বা শুনলাম তা তো নয়, কিন্তু এইবারেই উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হলো এবং আমার মধ্যে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। এর ভীষণ শক্তি আমার হৃদয় পুরোপুরিভাবে অনুভব করলো এবং এর প্রভাবে আমার যে অবস্থা হওয়া দরকার তা হলো। মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (স.) যখন সূরাটি তেলাওয়াত করছিলেন তখন উপস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনিও তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়েই সূরাটি পড়ছিলেন এবং এর পূর্বে সূরাটি পড়ে যেভাবে অভিভূত হয়েছেন এবারও সেই একইভাবে তিনি মুগ্ধ-আবেগে প্রকম্পিত হয়েছেন। আমাদের কাছে পাঠরত সে কারী সাহেবের কণ্ঠস্বরের মধ্যে শ্রোতাদের ধমনীতে যেন সেই গোপন শক্তি অনুভূত হচ্ছিলো যা মোহাম্মদ (স.)-এর কণ্ঠস্বরে ছিলো, যার কারণে তারা কাঁপছিলো আর সমস্ত হৃদয় দিয়ে শুনছিলো, 'অতএব, আল্লাহকে সেজদা করো ও তাঁরই এবাদত করো।' একারণে মোহাম্মদ (স.) ও মুসলমানগণ সেজদা করলেন। উপস্থিত অন্যান্য মানুষ যারা শুনেছিলো তারাও সেজদায় পড়ে গেল।

হাঁ কেউ বলতে পারে 'আপনার ওপর দিয়ে একটি বিশেষ অবস্থা যাওয়ার কারণে এবং আপনার এক বিশেষ অভিজ্ঞতা হওয়ার দরুন আপনি এসব অনুমান করছেন, কারণ আপনি মুসলমান, কোরআনে করীমকে আপনি ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন এবং আপনার অন্তরে কোরআনে করীমের বিশেষ একটি প্রভাব রয়েছে। কিন্তু অন্যরা তো ছিলো মোশরেক, যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিলো এবং কোরআনকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলো।'

সেজদা করার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন উঠেছে তার মোকাবেলা করতে গিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, এক, এ সময় যিনি সূরাটি পড়ছিলেন তিনি খোদ আল্লাহর প্রিয় নবী মোহাম্মদ (স.), যাঁর ওপর কোরআনের মূল উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে এই কোরআনে করীম সরাসরি জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। কোরআন নিয়েই তিনি কাজ করেছেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থই তাঁকে পরিচালনা করেছে। তিনি কোরআনকে হৃদয়-প্রাণ দিয়ে এতটা ভালবেসেছেন যে, কেউ ঘরের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করছে শুনতে পেয়ে তাঁর পদযুগল ভারী হয়ে গেছে, গতি মন্থর হয়ে গেছে আর তিনি দরজার পাশে পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। আর আলোচ্য এই সূরাটিতে যে ইংগিত পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় ঊর্ধাকাশে সশরীরে সফরকালে জিবরাঈল আমীনের কাছ থেকে এ সূরাটি তিনি পেয়েছেন। যে সময় তিনি তাঁর প্রথম সেই চেহারায় দেখেছেন যা ওহী নাযিলের একেবারে শুরুতে তাঁর নযরে এসেছিলো। আর আমি! আমি তো এ সূরাটি শুনছিলাম একজন সাধারণ ক্বারীর কণ্ঠ থেকে। এই দুই শোনার মধ্যে নিসন্দেহে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে,

মোহাম্মদ (স.)-এর মুখ থেকে মোশরেকরা যখন এ সূরাটির তেওলায়াত শুনছিলো, তখন তাদের হৃদয় ভয় ও কম্পন মুক্ত থাকতে পারেনি। একমাত্র হিংসা-বিদ্বেষ এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নিম্নবর্ণিত দুটি ঘটনা তাদের ভীত-বিহবল চিত্তের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়েছে,

আবু লাহাবের পুত্র ওৎবার ঘটনাটি তুলে ধরতে গিয়ে ইবনে আসাকির জানাচ্ছেন, আবূ লাহাব ও তার পুত্র ওৎবা সিরিয়া সফরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিল। তাদের সাথে একই কাফেলায় যাওয়ার জন্যে আমিও প্রস্তুত হলাম। তখন আবূ লাহাব পুত্র ওৎবা বললো, আল্লাহর কসম, আমি মোহাম্মদ-এর কাছে গিয়ে তার রব সম্পর্কে কটাক্ষপাত করে কিছু কষ্ট দিয়ে আসি।

একথা বলার পর মোহাম্মদ (স.)-এর কাছ সে গেল এবং বললো হে মোহাম্মদ, আমি অস্বীকার করছি সেই ব্যক্তিটিকে যে ব্যক্তি নিকটবর্তী হয়েছিলো এবং আরও কাছে এসে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো। তারপর মুখোমুখি রাখা দুটো ধনুকের থেকেও কাছে এসে গিয়েছিলো, বরং আরও নিকটতর হয়েছিলো।' তখন নবী (স.) শুধু বললেন, হে আল্লাহ, এর ওপর তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি কুকুরকে সওয়ার করে দিয়ো।' এরপর সে তার বাপের কাছে ফিরে গেলে তার বাপ তাকে বললো, হে পুত্র আমার, কারও জন্যে মোহাম্মদ বদ্দোয়া করলে তাকে কেউ নিরাপত্তা দিতে পারে না। একথা শোনার পর আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং সিরিয়ার দ্বার-প্রান্তে 'আবরা' নামক স্থানে পৌঁছে গেলাম। এর পর এক পাদ্রীর এবাদতখানাতে গেলে সে পাদ্রী সাহেব বললেন, হে আরববাসীরা, এ শহরে আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছেন? এখানে প্রতিনিয়ত তেমনি করেই সিংহরা গর্জন করে যেমন করে অহরহ মেষপাল ডাকতে থাকে। তখন আবূ লাহাব বললো, 'তোমরা তো আমার বার্ধক্যের অবস্থা জান আর একারণে তোমাদের কাছে আমার কতটুকু অধিকার আছে তাও বুঝো। অপরদিকে এই যে ব্যক্তিটি (মোহাম্মদ) আমার ছেলেকে কি বদ্দোয়া দিয়েছে তাও তোমাদের জানা আছে। আল্লাহর কসম, আমি তো মনে করি তার কোনো নিরাপত্তা নেই। অতএব, তোমাদের মাল-মাত্তা এই এবাদতখানার কাছে একত্রিত করে তার ওপর আমার পুত্রকে শয়ন করাও এবং এর চতুর্দিকে তোমরা বিছানা রচনা করো।' একথার পর আমরা সেই মত কাজ করলাম। তারপর এক সময় সিংহ এলো এবং আমাদের সবার মুখ শুঁকতে লাগলো। কিন্তু, যাকে সে চাইছিলো তাকে না পেয়ে পিছিয়ে গিয়ে এক লাফে মাল-মাত্তার ওপর ঝাঁপিয়ে ছিলো এবং ওকে (উৎবাকে) শুঁকে দেখে তাকে আক্রমণ করলো এবং তার মাথা টুকরা টুকরা করে ফেললো। তখন আবূ লাহাব বললো, 'আমি অবশ্যই বুঝেছিলাম যে, মোহাম্মদ কারও জন্যে বদ্-দোয়া করলে তার বাঁচার আর কোনোই উপায় থাকে না।'

এটিই হচ্ছে সেই প্রথম ঘটনা যা আবূ লাহাব নিজে প্রত্যক্ষ করেছে। মোহাম্মদ (স.)-এর নিজের চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও সে ছিলো তাঁর চরম দুশমন এবং সে-ই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যার ওপর কোরআনে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তার ও তার পরিবারের ওপর অভিশাপ দিতে গিয়ে নাযিল হয়েছে–ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হাত দুটি, পুরোপুরিভাবে। কোনো কাজে লাগবে না তার (মৌরুসী সূত্রে প্রাপ্ত) ধনসম্পদ এবং সেই সম্পদ যা সে উপার্জন করেছে। শীঘ্রই কুন্ডলী পাকিয়ে উঠা আগুনে সে প্রবেশ করবে, প্রবেশ করবে সেথায় শুকনা কাঠ (কাঁটা) বহনকারিণী তার স্ত্রীও। তার গলায় খেজুর-শাখার আঁশে তৈরী রশির ফাঁস লেগে যাওয়ায় সে মরবে। ..... ওপরে বর্ণিত আবু লাহাবের ছেলে ওৎবার পরিণতিতে যে কথা সে ব্যক্ত করেছিলো তাতে মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর মুখ নিসৃত বাণী সম্পর্কে তার তীব্র অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ছেলের জন্যে মোহাম্মদ (স.)-এর বদ-দোয়া শোনার সাথে সাথে তার হৃদকম্পন শুরু হয়েছিলো এবং কেঁপে উঠেছিলো তার সকল অংগ-প্রত্যংগ।

দ্বিতীয় ঘটনা ওৎবা ইবনে আবী রাবীয়া একবার মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে কিছু সময় কাটালো। বর্ষীয়ান এ ব্যক্তিটিকে কোরায়শরা তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলো। কারণ তাদের মতে এই ব্যক্তির হাতে তাদের হাতের দেব-দেবীরা লাঞ্ছিত হচ্ছিল এবং সে কোরায়েশদের একতায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলো, সে এখানে এসে মোহাম্মদ (স.)-কে ধন-দৌলত, সাম্রাজ্য অথবা সুন্দরী নারীর

লোভ দিয়ে বশীভূত করতে চেষ্টা করলো। লোভনীয় এ প্রস্তাবগুলো পেশ করা শেষ হলে তাকে মোহাম্মদ (স.) বললেন, 'আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি আবুল ওলীদ?' সে বললো, হাঁ। তখন তাকে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'এবারে আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনুন।' সে বললো, 'আচ্ছা শুনছি।' তখন রসূলুল্লাহ (স.) পড়তে শুরু করলেন **'বিস্‌মিল্লাহির রাহিমানির রহীম, হা-মীম, তানযীলুম মিনার রাহমানির রহীম ...** পরম করুণাময় মহান দাতা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ বাণী। এ হচ্ছে সেই কেতাব যার আয়াতগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় সেইসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এ কোরআন। এ কেতাব সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। কিন্তু হায় ওদের বেশীরভাগ লোকই এ কেতাবকে প্রত্যাখ্যান করলো, যার কারণে তারা এ কেতাবের বাণী শুনতেও প্রস্তুত নয়।' এইভাবে পাক কোরআনের বর্ণনাধারা এগিয়ে চললো এবং যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন 'এর পরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তখন তুমি ওদেরকে বলো, আমি তোমাদেরকে সেই কঠিন আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা আ'দ ও সামুদ জাতিকে পাকড়াও করেছিলো।' তখন সে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অস্থির হয়ে তাঁর মুখের ওপর হাত রেখে বললো, বাবা, তোমার জাতির প্রতি রহম করো।' তারপর সে নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে সবিস্তারে এ ঘটনা বললো। আরও বললো, তোমরা জান, মোহাম্মদ যখন কোনো কথা বলে ফেলে তখন কিছুতেই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। অতএব, আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের ওপর সেই কঠিন আযাব অত্যাসন্ন।(১)

এটাই হচ্ছে সেই বয়স্ক লোকটির অনুভূতি যে আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার ওপর কোরআনের প্রভাবে প্রকম্পন জারী হয়ে যাওয়াটা স্পষ্ট। বিদ্বেষ ও অহংকার থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা ভয়ের ছাপ তাদের মুখের ওপর পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতো।

মোহাম্মদ (স.)-এর কাছ থেকে যখন তারা সূরা আন্ নাজম-এর তেলাওয়াত শুনেছিলো তখনও এ একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তাদের ওপর হয়েছিলো। সুতরাং, কোরআনের বাণী শুনে তাদের অন্তর অপ্রতিরোধ্যভাবে বিগলিত হতো এবং তাদের সর্বাংগে ভয়ভীতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো। তখন তারা আর নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। আর এই কারণে সূরায়ে 'আন নাজমে' সেজদার আয়াত শোনার সাথে সাথে কোরায়েশের মোশরেক ব্যক্তিদের পক্ষে মুসলমানদের সাথে সেজদায় পড়ে যাওয়াটা ছিলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা কোনো মিথ্যা সৃষ্টিকারীর রেওয়ায়াতে পাওয়া সুন্দরী-নারী'র বানোয়াট কেসসা-কাহিনীর ফল ছিলো না!

(১) বিভিন্ন রেওয়ায়াতের সংক্ষিপ্ত সার।

সূরা আল ক্বামার

আয়াত ৫৫ রুকু ৩

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝٧ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝٩

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে ! ২. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা কোনো নিদর্শন দেখলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো হচ্ছে এক চিরাচরিত যাদুকরী (ব্যাপার)। ৩. (তারা সত্য) অস্বীকার করে এবং নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে, (অথচ) প্রত্যেক কাজের একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির (সময়) রয়েছে। ৪. অবশ্যই এ লোকদের কাছে (অতীত জাতিসমূহের ওপর আযাবের) সংবাদসমূহ এসেছে, (এমন সংবাদ) যাতে (বিদ্রোহের শাস্তির) হুশিয়ারী রয়েছে, ৫. এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানসমৃদ্ধ ঘটনা, যদিও এসব সতর্কবাণী তাদের কোনোই উপকারে আসে না, ৬. (হে নবী) তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন একজন আহ্বানকারী এদের একটি অপ্রিয় বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে। ৭. (সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে) কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের দল, ৮. তারা সবাই (তখন সেই) আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে; যারা (এ দিনকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা বলবে, এ তো (দেখছি আসলেই) এক ভয়াবহ দিন! ৯. এদের আগে নূহের জাতিও (এভাবে তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিলো, তারা আমার বান্দা (নূহ নবী)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে, তাকে (নানাভাবে) ধমক দেয়া হয়েছিলো।

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

১০. অবশেষে সে তার মালিককে ডাকলো (এবং বললো হে আমার মালিক), অবশ্যই আমি অসহায় (হয়ে পড়েছি), অতএব তুমিই (এদের কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও। ১১. এরপর আমি (তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং) প্রবল বৃষ্টির পানি বর্ষণের জন্যে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম, ১২. ভূমির স্তর (বিদীর্ণ করে তাকে পানির) প্রচন্ড প্রস্রবণে পরিণত করলাম, অতপর (আসমান ও যমীনের) পানি এক জায়গায় মিলিত হলো এমন একটি কাজের জন্যে, যা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিলো, ১৩. তখন আমি তাকে কাঠ ও পেরেক (নির্মিত একটি) যানে উঠিয়ে নিলাম, ১৪. যা আমার (প্রত্যক্ষ) দৃষ্টির সামনে (ধীরে ধীরে) বয়ে চললো, এটি ছিলো সে ব্যক্তির জন্যে একটি বিনিময়, যাকে (মাত্র কিছু দিন আগেও) অস্বীকার করা হয়েছিলো। ১৫. আমি (জলযান সদৃশ) সে জিনিসটিকে (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি, কে আছে (আজ এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার? ১৬. (হাঁ, এমন কেউ থাকলে এসো, দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী! ১৭. আমি (অবশ্যই) উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তোমাদের মাঝে এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার? ১৮. আ'দ জাতির লোকেরাও (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (তোমরা দেখে নিতে পারো তাদের প্রতি) আমার আযাব কেমন (কঠোর) ছিলো এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী! ১৯. এক স্থায়ী কুলক্ষণের দিনে আমি তাদের ওপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করেছিলাম, ২০. যা মানুষদের এমনভাবে ছুঁড়ে মারছিলো, যেন তা খেজুর গাছের এক একটি উৎপাটিত কান্ড! ২১. (হাঁ, দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব আর (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

২২. অবশ্যই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

রুকু ২

২৩. সামুদ সম্প্রদায়ও (আযাবের) সতর্ককারী (নবী ও রসূল)-দের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। ২৪. তারা বলেছিলো, আমরা কি এমন একজন লোকের কথা মেনে চলবো, যে ব্যক্তি একা– আমাদেরই একজন, (এভাবে) তার আনুগত্য করলে সত্যিই তো আমরা বড়ো গোমরাহী ও পাগলামী কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো। ২৫. আমাদের মাঝে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি, যার ওপর (আল্লাহর) ওহী নাযিল করা হয়েছে, (আসলে) সে হচ্ছে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি। ২৬. আগামীকাল (মহাবিচারের দিন) তারা ভালো করেই এটা জানতে পারবে, কে ছিলো তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি! ২৭. আমি (অচিরেই) তাদের পরীক্ষার জন্যে একটি উষ্ট্রী পাঠাবো, তুমি একান্ত কাছে থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করো এবং (একটুখানি) ধৈর্য ধরো এবং তাদের পরিণামটা দেখো, ২৮. তাদের বলে দাও, (কুয়ার) পানি অবশ্যই তাদের (ও উষ্ট্রীর) মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সবাই (পালাক্রমে) কুয়ার পাশে হাযির হবে। ২৯. পরিশেষে তারা (বিদ্রোহ করার জন্যে) তাদের (এক) বন্ধুকে ডেকে আনলো, সে (উষ্ট্রীকে ছুরি দিয়ে) আক্রমণ করলো এবং (সেটির পায়ের) নলি কেটে ফেললো। ৩০. (হ্যাঁ, অতপর তোমরাই দেখেছো) কেমন ছিলো আমার আযাব, (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী! ৩১. অতপর আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম মাত্র একটি গর্জন, এতেই তারা শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত জন্তু জানোয়ারদের দলিত খোয়াড়ের মতো হয়ে গেলো। ৩২. বোঝার জন্যে আমি কোরআন সহজ করে নাযিল করেছি, (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৩৩. লূতের জাতির লোকেরাও সতর্ককারী (নবী)-দের মিথ্যাবাদী বলেছিলো। ৩৪. (ফলে) আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম পাথর (নিক্ষেপকারী এক ধরনের) বৃষ্টি, লূতের পরিবার পরিজন ও তার অনুবর্তনকারীদের বাদে; রাতের শেষ প্রহরেই আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়েছিলাম, ৩৫. এ (কাজ)-টা ছিলো (তাদের প্রতি) আমার একান্ত অনুগ্রহ; যে ব্যক্তি আমার (অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাকে এভাবেই পুরস্কৃত করি। ৩৬. সে (লূত) আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে তাদের বার বার ভয় দেখিয়েছিলো, কিন্তু এ সতর্কীকরণে তারা বাকবিতন্ডা শুরু করে দিলো। ৩৭. (অতপর) তারা তার কাছে এসে (কুমতলবের জন্যে) তার মেহমানদের (নিয়ে যাবার) দাবী করলো, আমি (তখন) তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম, (আমি তাদের বললাম), এবার তোমরা আমার আযাব উপভোগ করো এবং (আমার) সতর্কবাণী (অবজ্ঞা করার পরিণামটা)-ও দেখে নাও! ৩৮. প্রত্যূষেই তাদের ওপর আমার এক অমোঘ আযাব প্রচন্ড আঘাত হানলো, ৩৯. (আমি বললাম,) অতপর তোমরা আমার এ আযাব আস্বাদন করতে থাকো এবং (আমার) সতর্ককারীদের উপেক্ষা করার (পরিণামটাও একবার) দেখে নাও। ৪০. আমি এ কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ (করে নাযিল) করেছি, কিন্তু কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

রুকু ৩

৪১. ফেরাউনের জাতির লোকদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী (অনেক নিদর্শন) এসেছিলো, ৪২. কিন্তু তারা আমার সমুদয় নিদর্শন অস্বীকার করেছে, (আর পরিণামে) আমিও তাদের (শক্ত হাতে) পাকড়াও করলাম– ঠিক যেমনি করে সর্বশক্তিমান সত্তা (বিদ্রোহীদের) পাকড়াও করে থাকেন।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

৪৩. (তোমরা কি সত্যিই মনে করছো,) তোমাদের (সমাজের) এ কাফেররা তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের চাইতে (শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে) উৎকৃষ্ট? অথবা (আমার) কেতাবের কোথাও কি তোমাদের জন্যে অব্যাহতি (-মূলক কিছু লিপিবদ্ধ) রয়েছে? ৪৪. অথবা তারা বলছে, আমরা হচ্ছি (সত্যিই) একটি অপরাজেয় দল। ৪৫. অচিরেই এ (অপরাজেয়) দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যাবে এবং (সম্মুখসমর থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে। ৪৬. (কিন্তু এ পালানোই তো তাদের শেষ নয়,) বরং তাদের (শাস্তিদানের) নির্ধারিত ক্ষণ কেয়ামত তো রয়েছেই, আর কেয়ামত হবে তাদের জন্যে বড়োই কঠিন ও বড়োই তিক্ত। ৪৭. অবশ্যই এসব অপরাধী (নিদারুণ) বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততার মাঝে পড়ে আছে। ৪৮. যেদিন তাদের উপুড় করে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে ঠেলে নেয়া হবে (তখন তাদের ঘোর কেটে যাবে, অতপর তাদের বলা হবে); এবার তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ উপভোগ করো, ৪৯. আমি সব কয়টি জিনিসকে অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি। ৫০. (আর) আমার হুকুম! সে তো এক নিমেষে চোখের পলকের মতোই (কার্যকর হয়)। ৫১. তোমাদের (মতো) বহু (বিদ্রোহী) জাতিকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ? ৫২. তারা যা কিছু করছে (তার) সবটুকুই (তাদের আমলনামায়) সংরক্ষিত আছে। ৫৩. (সেখানে যেমনি রয়েছে) প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়, (তেমনি) লিপিবদ্ধ আছে প্রতিটি বড়ো বিষয়ও। ৫৪. (অপরদিকে এ বিদ্রোহের পথ পরিহার করে) যারা (আল্লাহকে) ভয় করেছে, তারা অনাদিকাল (এক সুরম্য) জান্নাতে ও (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারায় থাকবে, ৫৫. (তারা অবস্থান করবে) যথাযোগ্য সম্মানজনক জায়গায়, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে সেই সকল সত্য-বিরোধী হঠকারী ও নবীদের প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিদের অন্তরের মধ্যে কেয়ামতের ভীষণ ও কঠিন ভয়ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অপরদিকে সত্যপন্থী মোমেনদের জন্যে সূরাটি গভীর প্রশান্তি ও তাদের অন্তরসমূহে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করেছে। সূরাটির মধ্যে আলোচ্য কথাগুলো বৃত্তের ন্যায় একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রত্যেকটি বৃত্তে সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি একটি জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। পরিসমাপ্তিতে যে কথাগুলো এসেছে তাতে পাঠকের অনুভূতির মধ্যে এক প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার হৃদয়-মন ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকে। তখন আল্লাহর এই কথা সামনে এসে যায় 'কেমন ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?' তার অনুভূতিতে ভীষণ চাপ ও আন্দোলন সৃষ্টি করার পরই আবার তার প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে যে কথাটি এসেছে তা হচ্ছে, 'আর অবশ্যই আমি আল্লাহ তায়ালা। কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতপর একে স্মরণ করবে এমন কেউ আছে কি?'

এ সূরার শুরুতে যে সব বিষয় রয়েছে সাধারণত তার ক্ষেত্র মক্কা মোকাররাম আর তা হচ্ছে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে যে ভয়ানক দৃশ্যটির অবতারণ হবে তার বর্ণনা এবং সূরার শেষে সে অবস্থাগুলোর মধ্য থেকে আর একটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি স্থানে নূহ (আ.)-এর কওমের নানা প্রকার অপতৎপরতা এবং আদ, সামূদ ও লূত আলাইহিমুসসালামের জাতিদের সীমলংঘনকর কার্যকলাপ ও তাদের বাড়াবাড়ির কথা তুলে ধরা হয়েছে। মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে এসব বিষয়গুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে এসেছে। তবে আলোচ্য সূরায় এসব কথাকে এক বিশেষ ভংগিতে পেশ করা হয়েছে। এখানকার বর্ণনাভংগি সম্পূর্ণ নতুন।

এসব বিষয় অত্যন্ত কঠিন, ভয়ানক, দ্রুতবেগে ও নিশ্চিতভাবে আসা ভীষণ অবস্থার কথা জানাচ্ছে। এসব অবস্থার বিবরণ যখন সামনে আসে, তখন পাঠকের হৃদয় সাংঘাতিকভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে যায়, তার সর্বাংগে এর প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং ধ্বংসের ভয় ও সন্ত্রাস তার শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চায়।

এ সূরার মধ্যে সব থেকে বড় বৈশিষ্ট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে যে, এখানে এতো দ্রুত বেগে সেই ভয়ানক কঠিন আযাবের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে যা পাঠককে ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। দুখের তার জিভ বের হয়ে আসতে চায়। কেয়ামতের দিন সত্যকে অস্বীকারকারীরা এসব দৃশ্য এমনভাবে দেখতে থাকবে যেন তারা নিজেরাই এই আযাবের মধ্যে পতিত রয়েছে এবং সে আযাবের বৃশ্চিক দংশনজ্বালা তীব্রভাবে অনুভব করছে। তারপর খবর দেয়া হচ্ছে যে, এক প্রকার আযাব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর এক প্রকার আযাব তাদেরকে পাকড়াও করবে, যা পূর্বের আযাব থেকে আরও বেশী কঠিন ও ভয়ানক হবে। এমনিভাবে পর পর সাত প্রকার আযাবের খবর দেয়া হয়েছে যা হবে চরম ধ্বংসাত্মক এবং অকল্পনীয় কঠিন।

অবশেষে মোমেনদের জন্যে যে অবস্থাটি আসবে তার উল্লেখ করে সূরাটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এ হবে ভিন্ন আর একটি দৃশ্য, যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নেককার ব্যক্তিরা ছায়াঘন বাগবাগিচার মধ্যে মনোরম ঘর-বাড়ীতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করবে। আল্লাহভীরুদের জন্যেই হবে এ চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা। এরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই

মোত্তাকীরা প্রবাহমান নহর-পরিবেষ্টিত বাগবাগিচার মধ্যে আনন্দ বিহারে সময় কাটাবে করবে। তারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান সম্রাটের সান্নিধ্যে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় অবস্থান করবে। সত্য বিরোধীরা নিদারুণ ভয়-ভীতি ও কঠিন আযাবে ভরা কম্পন সৃষ্টিকারী ও অপমানজনক শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে, 'সেদিন তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে বলা হবে, গ্রহণ করো আগুনের স্বাদ।'

তারপর তারা আর যাবে কোথায়। আর কোন্ কোন্ দৃশ্য তারা দেখবে? কোন্ কোন্ শাস্তির পর্যায় তারা অতিক্রম করবে? কোন্ কোন্ জাতি সে শাস্তিতে তারা নিপতিত হবে? এই ঠিকানা থেকে অপর কোন্ ঠিকানায় তারা গিয়ে পড়বে? এসব বিষয়ে পর্যায়ক্রমি ধারা-বিবরণী এ সূরার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীর

'কেয়ামত আগতপ্রায়, যখন চাঁদ ফেটে পড়ে যাবে .... যেন তারা বিক্ষিপ্ত পংগপালের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকবে, কাফেররা উর্ধাশ্বাসে দৌড়তে থাকবে আহবানকারীর দিকে এবং বলতে থাকবে, হাঁ, অবশ্যই এদিনটি বড়ই কঠিন।' (১-৮)

শ্বাস-রুদ্ধকর এই উত্থান সংবাদ এই মহাবিশ্বের অন্যান্য যে কোনো ঘটনা থেকে মারাত্মক এবং পরবর্তী সব থেকে বড় দুর্যোগ অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বাভাস দানকারী, যে দুর্যোগ মহা বিশ্বের অন্য কোনো বিপর্যয়ের সাথে তুলনীয় নয়।

একবার কল্পনার চোখে চেয়ে দেখা যাক এ ভয়ানক দৃশ্যের দিকে– 'কেয়ামত আসন্ন, ফেটে পড়েছে চাঁদটি' .....

সুতরাং, হায় সেই মহা-বিপর্যয়, হায় সেই ভীষণ ধ্বংসলীলা। হায় হায় কি হবে সেদিনকার অবস্থা যখন পাহাড়-পর্বত সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে উড়তে থাকবে! এই প্রথম দুর্ঘটনা যখন তারা দেখতে পাবে তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং পরবর্তী মহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় সকল ধ্বংস হয়ে যাওয়া জিনিস অপেক্ষ করতে থাকবে।

চাঁদ ফেটে যাওয়া ও দ্বিখন্ডিত হয়ে দুদিকে চলে যাওয়ার দৃশ্য আরবরা যে দেখেছিলো এ সংবাদটি এতো বেশী বর্ণনাকারীর মাধ্যমে জানা গেছে যে, এত মানুষ একসাথে মিথ্যে কথা বলছে বলেও কল্পনাও করা যায় না। এজন্যে সকল ইতিহাসবিদ এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। এ অবস্থার বিবরণ দিতে যে কথাগুলো এসেছে সে বর্ণনাধারায় যদিও সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু মূল ঘটনার বর্ণনায় সবাই একমত। কোনো বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং কোনো বর্ণনা বিস্তৃত।

চাঁদ দু'টুকরা করার ঘটনা

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কী যিন্দেগীতে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন দেখানোর জন্যে দাবী জানালে চাঁদ দুইবার ফেটে গেলো। তারপর পড়লেন, 'কেয়ামত আসন্ন, চাঁদ ফেটে গেলো।' ইমাম বোখারী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব-এর বরাত দিয়ে বলেন, মক্কাবাসীরা তাঁর নবুয়তের কোনো নিদর্শন দেখানোর জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে দাবী জানালে তাদেরকে তিনি (দুই দিকে) চাঁদের দুটি টুকরা দেখালেন। এমনকি সে দুই টুকরার মধ্যবর্তী স্থানে তারা 'হাররা' নামক স্থানটিও দেখতে পেলো। আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম বোখারী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব-এর বরাত দিয়ে বলেন, মক্কাবাসীরা তাঁর নবুয়তের কোনো নিদর্শন দেখানোর জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)- এর কাছে দাবী জানালে তাদেরকে

তিনি (দুই দিকে) চাঁদের দুটি টুকরা দেখালেন, এমনকি সে দুই টুকরার মধ্যবর্তী স্থানে তারা 'হাররা' নামক স্থানটিও দেখতে পেলো। আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম বোখারী ও মুসলিম আর একটি বর্ণনাধারায় হাদীসটি এনেছেন।

ইমাম আহমদ যোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রা.)-এর বরাত দিয়ে আর একটি হাদীস এনেছেন। রেওয়ায়াতকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময় চাঁদ ফেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটলো, তারপর দু'টুকরো হয়ে এক টুকরা এক পাহাড়ে অন্য টুকরোটি আর একটি পাহাড়ের ওপরে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে তারা বলে উঠলো, আমাদের ওপর মোহাম্মদ জাদু করেছে। কিন্তু আমাদেরকে জাদু করলেও সবাইকে তো আর জাদু করতে পারবে না। ইমাম আহমদ একাকী এই বর্ণনা এনেছেন। ইমাম বায়হাকী, তাঁর 'অন্দালাইল' গ্রন্থে হোসায়েন ইবনে আব্দুর রহমান-এর বরাত দিয়ে আর একটি বর্ণনাধারায় একই ভাবে এই হাদীসটি এনেছেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বোখারী আর একটি হাদীস এনেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী (স.)-এর জীবদ্দশাতে চাঁদ ফেটে দু-টুকরো হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে। অন্য আর একটি বর্ণনাধারায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম আর একটি হাদীস এনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আর একটি বর্ণনাধারায় ইবনে জারীর একই ঘটনার ওপর অন্য একটি হাদীস আনেন এবং বলেন, ঘটনাটি হিজরতের পূর্বে ঘটেছে। চাঁদ ফেটে গেলো এবং লোকেরা চাঁদের দুটি টুকরো দেখতে পেলো। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আওফীও আর একটি হাদীস এনেছেন। অন্য আর একটি বর্ণনাধারায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে তাবরানী যে হাদীসটি এনেছেন তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় চাঁদ ভেংগে গেলো, তখন উপস্থিত মোশরেকরা বলে উঠলো, চাঁদের ওপর সে (মোহাম্মদ) জাদু করেছে। এর পরই আয়াত নাযিল হলো,

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বরাত দিয়ে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে হাফেয আবূ বকর আল বায়হাকী বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগে চাঁদ আধাআধি হয়ে দুই টুকরো দুই দিকে চলে গেলো। এক টুকরো গেলো পাহাড়ের সামনের দিকে, অন্য টুকরো তার পেছনের দিকে। তারপর নবী (স.) বললেন, 'আয় আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো।' মুসলিম ও তিরমিযী অন্য আর একটি বর্ণনাধারায় অনুরূপ আর একটি হাদীস এনেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ যে হাদীসটি এনেছেন তাতে বলা হয়, রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায় চাঁদ ফেটে দু'টুকরো হয়ে গেলো, তখন সবাই তা নিজ নিজ চোখে দেখলো। তখন কোরায়শের লোকেরা বলে উঠলো, এটা তো ইবনে আবী কাবাশার জাদু।' রেওয়ায়াতকারী ইবনে মাসউদ বলেন যে, তারা বললো, ঠিক আছে, প্রত্যাবর্তনকারী মোসাফেররা কি বলে দেখা যাক, মোহাম্মদ সকল মানুষকে তো আর জাদু করতে পারবে না, মোসাফেররা ফিরে এলে চাঁদ ফেটে যাওয়ার কথা যথার্থ বলে সাক্ষ্য দিলো। ইমাম বায়হাকী আর একটি বর্ণনাধারায় প্রায় এই একই বিবরণীর আর একটি হাদীস এনেছেন। এ সকল রেওয়ায়াত হচ্ছে মোতওয়াতের যা বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং জানিয়েছে যে, এ ঘটনাটি মক্কা-মোকাররামাতেই সংঘটিত হয়েছে। শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে মিনা-র কথা বলা হয়েছে। তবে হিজরতের পূর্বে ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুয়তের পর এ ঘটনাটির সময়কাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। অধিকাংশ রেওয়ায়াত অনুযায়ী

চাঁদ ফেটে দুটি টুকরা হওয়ার কথা এসেছে এবং একটি মাত্র রেওয়ায়েতে চন্দ্র গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সকল মোতওয়াতের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে যে কথাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে ঘটনাটির অবস্থা, সময়কাল ও স্থান একটিই।

এটি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যা তখনকার মোশরেকদের সামনে কোরআন বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে। এর ফলে তারা এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে আর কোনো কথা তুলতে পারেনি বা মোহাম্মদ (স.)-কেও মিথ্যাবাদী বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারেনি। অবশ্য ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করার মতো কোনো সুযোগ তারা পায়নি। এমনকি কোনো সন্দেহও তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। নবী (স.)-কে ও তাঁর কথাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে একটি মাত্র পথই তারা খুঁজে বের করতে পেরেছিলো আর তা হচ্ছে ওরা বলেছিলো, সে আমাদেরকে ভয়ানক জাদু করে ফেলেছে। কিন্তু পরে তারা নিজেরাই যাচাই করে দেখে বুঝতে পেরেছিলো যে, এটা কোনো জাদু নয়। তারা হিসাব করে দেখেছিলো, তিনি তাদেরকে জাদু করলেও মক্কার বাইরে যে সকল মোসাফের ছিলো তাদেরকে তো আর জাদু করা তার সম্ভব হয়নি। কাজেই সেই সব মোসাফের মক্কায় আগমন করলে তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যখন তাদেরকে একই ঘটনার বাস্তব সাক্ষী হিসেবে পেলো, তখন তাদের মন থেকে সকল প্রকার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেল।

এখন আমাদের জন্যে একটি মাত্র কথা বাকি থেকে যায় যা আপনিও বলতে পারেন। আর তা হচ্ছে, মোশরেকেরা যে নবী (স.) কে চাঁদ ফাটিয়ে দিয়ে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ পেশ করতে বললো এটা তো কোরআনে সে আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী মোহাম্মদ (স.)-কে পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের মতো বিশেষ কারণেই সৃষ্টি ছাড়া বা অস্বাভাবিক কোনো মোজেযা দান করা হয়নি। এর জওয়াব হচ্ছে, বিশেষ কোনো কারণে অতীতে যে ধরনের মোজেযা এসেছে সেই ধরনের মোজেযা আর আসবে না। 'পূর্ববর্তী নবীদের কাছে যে সব নিদর্শন পাঠানো হয়েছিলো, সেগুলোকে তারা অস্বীকার করেছিলো বলেই তো আমি সে ধরনের নিদর্শন আর পাঠাবো না।' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সে ধরনের নিদর্শন পাঠানো আর ভাল মনে করেননি যেহেতু পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরা সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলো।

প্রতি ব্যাপারেই মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে প্রমাণ চাইতো। এজন্যে তাদের কথাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর দায়িত্ব এটা নয় যে, তাদেরকে মোজেযা দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবেন। তিনি তো একজন মানুষ ও রসূল ছিলেন। মানুষের সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই তাদেরকে তিনি কোরআনের দিকে আহবান জানিয়েছেন। যেহেতু একমাত্র কোরআনই জীবন পথে চলতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছে। তাই এপর্যায়ে কোরআন যে ভাষা ও যে ভাব-ভংগি ব্যবহার করেছে তা-ই কোরআনের মোজেযা, এর কোনো তুলনা নেই। মানুষ এই কোরআনের সমকক্ষ কোনো ভাষা ও ভাব-ভংগি ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। এরশাদ হচ্ছে, 'বলো, যদি মানুষ ও জিন জাতি সবাই একত্রিত হয়ে এই কোরআনের মতো কোনো গ্রন্থ হাযির করতে পারে তো নিয়ে আসুক। না, এ ব্যাপারে তারা পরস্পরকে সহায়তা করলেও এর সমকক্ষ কোনো গ্রন্থ তারা হাযির করতে পারবে না। আমি সব ধরনের উদাহরণ দিয়ে, কোরআনের কথাগুলো মানুষকে বুঝানোর ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অস্বীকার করেছে এবং তারা বলেছে, কিছুতেই তোমাকে আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্যে মাটি ফুঁড়ে ঝর্ণাধারা

বের করে আনবে, অথবা তোমার জন্যে একটি খেজুর ও আংগুরে ভরা বাগিচা বানিয়ে দেখাবে, যার মধ্যে প্রবাহমান ছোট ছোট নদী থাকবে। অথবা, তুমি যেমন বলছো যে, চন্দ্র গ্রহণ হবে সে রকম আকাশকে নামিয়ে এনে দেখাবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাযির করবে, অথবা তোমার জন্যে হবে একটি স্বর্ণনির্মিত ঘর অথবা তুমি আকাশের দিকে আরোহণ করবে। আর, দেখো, এসব কিছু যদি তুমি করে দেখাও, তা সত্তেও আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি একটি কেতাব (আকাশ থেকে) নিয়ে আসবে যা আমরা নিজেরা পড়ে দেখবো। এর জওয়াবে আল্লাহ তায়ালা বললেন, বলো, আমার রব সকল দুর্বলতা থেকে পবিত্র, আমি তো একজন মানুষ রসূল মাত্র।'(১)

চাঁদকে ফাটানোর ব্যাপারটি তো মোশরেকদের মোজেযা দেখানোর দাবীর জওয়াবে আনা হয়েছিলো অর্থাৎ এটাও তো অস্বাভাবিক একটি নিদর্শন ছিলো। এর জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-এর মর্যাদা প্রদর্শন করতে গিয়েই এ চাঁদ দু'টুকরো করার ঘটনা সংঘটিত করলেন। এটা নবুয়তের কোনো প্রমাণ স্বরূপ ছিলো না। বরং মানুষের নিজের মধ্যে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সব জিনিস নিরন্তর আবর্তন করে চলেছে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে এটা দেখানোর জন্যেই করা হয়েছে। নবী (স)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর দ্বারা এই অস্বাবিক ঘটনাটি পেশ করলেন। এটা যদি নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ হতো তাহলে কোরআন-এর কোনো আয়াত তৈরী করে আনার জন্যে কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হতো না।

এরপর আমরা কোরআনের দলীল ও মোতওয়াতের হাদীস দ্বারা চাঁদ ফেটে যাওয়ার ঘটনাটিকে প্রমাণ করতে চাই। এসব দলীল-প্রমাণ দ্বারা ঘটনাটি কোন্ স্থানে, কোন্ যুগে এবং কেমনভাবে ঘটেছিলো তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এ পর্যায়ে আমরা কিছু বর্ণনাধারায় আলোচিত এ ঘটনা ঘটার প্রয়োজনটিও বুঝতে চাই। কিন্তু এ ব্যাপারে কোরআনে প্রদত্ত ইংগিতকেই যথেষ্ট মনে করবো এবং এ ঘটনা থেকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণও করতে পারবো। কারণ মানুষের হৃদয়কে এই ইংগিত গভীরভাবে স্পর্শ করে তাকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলে এবং সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম হয়।

চাঁদ ফেটে যাওয়ার ঘটনাটি হচ্ছে এমন একটি অতি প্রাকৃতিক ঘটনা যার দিকে কোরআন মানুষের অন্তর-মন ও চোখগুলোকে আকৃষ্ট করেছিলো যেমন করে সদা-সর্বদা অন্যান্য সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নিদর্শনের দিকে খেয়াল করলে সেগুলো মানুষকে আকৃষ্ট করে। অনুভবযোগ্য অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ছোট বেলা থেকেই মানব-হৃদয়কে গভীরভাবে অভিভূত করতে থাকে, যখন সে নিজ আগ্রহে সর্বত্র বিরাজমান– সেসব স্থায়ী নিদর্শন বুঝতে না চাইলেও এসব দৃশ্য তাকে বরাবরই সত্য সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে থাকে। আর, মানুষ হেদায়াতের পথ ও সঠিক বুদ্ধি লাভ করার পূর্বে রসূলদের কাছ থেকে যেসব অতি প্রাকৃতিক শক্তির নিদর্শন দেখেছে, সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী থেকে অনেক বড় এবং অনেক বিস্ময়কর এবং এ সকল মোজেযা যেভাবে মানুষকে অভিভূত করে সেভাবে সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেনা।

আমাদের ধরে নেয়া দরকার যে, চন্দ্রকে দু'টুকরো করে দু'দিকে চালিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি অবশ্যই এক সাংঘাতিক মোজেযা (অসাধারণ ব্যাপার) ছিলো। কারণ এমনিতেই চাঁদ একটি বিরাট

---

(১) সূরা বনী ইসরাঈল-৫৯

বিস্ময়কর সৃষ্টি! এই উপগ্রহটির বিশালতা, এর অবস্থান, এর আকৃতি, এর প্রকৃতি, এর পরিক্রমা এবং পৃথিবীর জীবনের ওপর এর প্রভাব এবং মহাশূন্যে বিনা স্তম্ভে এর কোটি কোটি বছর ধরে টিকে থাকা সবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যা চোখ ও হৃদয়কে বিমুগ্ধ করে এই সব কিছুর উপস্থিতি এবং জীবনের ওপর এসব কিছুর প্রভাব মহান স্রষ্টার শক্তি-ক্ষমতার কথা জানায়, যা একমাত্র চরম ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরাই অস্বীকার করতে পারে।

কোরআন এসে মানব হৃদয়কে সৃষ্টিলোকের সব কিছুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে চেনার জন্যে যে সব দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেগুলোর দিকে খেয়াল করে তঁকে চিন্তা করতে আহবান জানিয়েছে। প্রাকৃতিক এসব রহস্যরাজি বিদগ্ধ হৃদয়ে মহান স্রষ্টা সম্পর্কে প্রতিটি মুহূর্তে চেতনা জাগাতে থাকে। এ চিন্তা-চেতনা কোনো নির্দিষ্ট যামানায় বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডে সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা বুঝার জন্যে গোটা সৃষ্টিলোকই এক মহাগ্রন্থ, যার পাতার কোনো সীমা-শেষ নেই, যার লয় নেই, ক্ষয় নেই। বিশ্বজোড়া সবটুকু মিলেই যেন একটি মহাগ্রন্থ, যা আল্লাহর উপস্থিতি ও একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার খবর জানায়। পৃথকভাবে দেখলেও এই বিশ্ব-প্রকৃতির ছোট-বড় প্রতিটি জিনিসই মহান আল্লাহর কথা জানাতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে মানব-হৃদয়ের কাছে আল্লাহর অচিন্তণীয়, অস্বাভবিক ও স্থায়ী নিদর্শনাবলীর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করার আহবান জানায়। তার হৃদয়ের কানে আল্লাহর একমাত্র মালিক হওয়া সম্পর্কে অকাট্য সাক্ষ্য হাযির করতে থাকে। একইভাবে সৃষ্টির রহস্য ভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে তাকে আহবান জানায়। তখন সে আল্লাহর পরিপূর্ণ ও অপরিসীম এই সৌন্দর্য ভান্ডার থেকে প্রাণ ভরে উপভোগ করতে থাকে, আর এসব কিছুর সাথে ঈমানের গভীর আবেগে তার হৃদয়-মন ভরপুর হয়ে যায়, পুলকিত হতে থাকে তার সমগ্র সত্তা এবং চরম শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে হেদায়াতের গভীর পেয়ালা থেকে সে আকণ্ঠ পান করে।

সূরাটির শুরুতে উপস্থাপিত এসব কিছুর মধ্যে কেয়ামত আসন্ন হওয়ার প্রচ্ছন্ন আভাস বিদ্যমান। এ কথা জানাতে গিয়ে চাঁদকে টুকরো করার অভূতপূর্ব ঘটনা পেশ করা হয়েছে, যাতে করে চিন্তাশীল মানুষ হিসাব করতে পারে, যে সব কিছু ফেটে পড়ে গোটা সৃষ্টিকুল লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার দিন খুব বেশী দূরে নয়। চাঁদ ফেটে যাওয়ার ঘটনার ওপর চিন্তা করতে সে বাধ্য হয়ে যায় এবং হৃদয় তাকে ডেকে ডেকে বলতে থাকে এই মহাবিশ্বের মধ্যে প্রলয়ংকর ধ্বংস নেমে আসা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কেয়ামত খুবই নিকটবর্তী

কেয়ামত আগতপ্রায়—এই বিষয়ের ওপর সাহ্ল ইবনে সা'দ-এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ রেওয়ায়াত করেছেন। সা'দ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি এবং কেয়ামত ঠিক এইরূপ'—একথা বলে রসূলুল্লাহ (স.) তর্জনী ও মধ্যম আংগুল দুটির দিকে ইশারা করলেন।(১)

ওয়াদা করা সেই ভয়ানক দিনটি আগমনের বার্তা প্রদানের সাথে বিশ্বব্যাপী যে প্রলয়কান্ড সংঘটিত হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী দান করায় ও এসকল অবস্থা আসার পূর্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাবে যা তারা বিভিন্নভাবে দেখতে পাবে সেগুলো বিবৃত করা সত্তেও এ কঠিন হৃদয়গুলো বিদ্বেষে

---

(১) এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম আবূ হাযেম সালামাতা ইবনে দীনার-এর হাদীস থেকে এনেছেন।

পরিপূর্ণই রয়ে গেল। বিদ্বেষেই হাবুডুবু খেতে লাগলো। তারা গোমরাহীর মধ্যেই রয়ে গেলো এবং আল্লাহর শক্তির বিস্তর নিদর্শন দেখিয়ে উপদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে বুঝানো সত্তেও যেমন তারা কোনো কথায় কান দেয়নি, তেমনি কেয়ামতের ধমকে প্রদানেও তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতাপূর্ণ ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন এলো না। এরশাদ হচ্ছে, 'যখন ওরা কোনো নিদর্শন দেখে (তখন তা থেকে কোনো শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা স্থায়ী এক জাদু। এইভাবে তারা নবী (স.)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছিলো। অথচ প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে রয়েছে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। আর অবশ্যই তাদের কাছে এসেছে মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মধ্যে রয়েছে সতর্কবাণী এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বুদ্ধিপূর্ণ কথা। কিন্তু সতর্ককারীদের থেকে তারা কোনো শিক্ষা নেয়নি।'

অবশ্যই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (ওই সত্যের আহবানকারী থেকে) এবং বলেছে, এ ব্যক্তি তো আমাদেরকে জাদু করেছে, অথচ তারা চাঁদকে দু'টুকরো করে দেয়ার ঘটনাটি নিজেদের চোখেই দেখতে পেলো। কোরআনের আয়াত সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তারা বলতো, এটা দারুণ কার্যকর এক জাদু। এইভাবে যতবারই তারা আল্লাহর কোনো নিদর্শন দেখেছে ততবারই এ একই কথা বলেছে। আর যখন আয়াতগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একের পর আর একটি এসেছে, তখন তারা বলে উঠেছে 'এতো স্থায়ী জাদু যার প্রভাব কোনো সময়েই শেষ হবে না।' আসলে সকল মোশরেক ব্যক্তি আয়াতগুলোর প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেই নারায ছিলো। তারা জানতে চাইতো না আয়াতগুলো তাদেরকে কি বলতে চায় এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তা সাক্ষ্য দেয়। তারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নে চালিত হওয়ার কারণেই নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কোনো যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে অস্বীকার করেছে তা নয়। সৃষ্টিজগতের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যে বাস্তব সত্য প্রতি-নিয়ত তাদের চোখে পড়ছে, সেগুলোকে সামনে রেখে তারা যে সুচিন্তিত মতামত পেশ করছে—তাও নয়।

প্রত্যেকটি সৃষ্টি স্থায়ী

'প্রত্যেকটি বিষয়ই স্থায়ী' অর্থাৎ, এ বিশাল সৃষ্টির বুকে যা কিছু আছে তার মধ্যে একটি স্থায়ী নিয়ম চালু রয়েছে, সকল জিনিস দৃঢ়তার সাথে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে, যার মধ্যে কোনো ছেদ নেই, নেই কোনো বিশৃঙ্খলা। সুতরাং, একথা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সৃষ্টিলোকের প্রতিটি জিনিস সুনির্দিষ্ট একটি নিয়মে ও স্থায়ীভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পরিবর্তনশীল কোনো আবেগ দ্বারা এগুলো চালিত নয় যে, নিয়মবিহীনভাবে এগুলো চলছে এবং এদের কারও সাথে কারও কোনো যোগাযোগ বা মিল নেই অথবা এমনও নয় যে, প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু একটি আর একটির সাথে সংঘর্ষশীল এবং একটি আর একটির বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে। প্রত্যেকটি জিনিসই নিজ নিজ স্থানে থেকে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলো সব কিছু সুনির্দিষ্ট এক ব্যবস্থাধীনে যে চলছে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সব কিছুর মধ্যে এই সুর ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ছায়াপথে আবর্তনরত গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছু সুনির্দিষ্ট এক নিয়মাধীন আবর্তন করে চলেছে। জীবজগতে এবং বৃক্ষ লতা-পাতা সব কিছুর মধ্যে একই নিয়ম বিরাজ করছে, বিরাজ করছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা সকল বস্তুর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভাগে। শুধু তাই নয়, শরীরের ও অংগ-প্রত্যংগের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে কাজ দেয়া হয়েছে। কিন্তু একথা বুঝতে হবে যে, আল্লাহর কুদরত ব্যতীত

এসব অংগ-প্রত্যংগের নিজস্ব কোনো ইখতিয়ার নেই নিজ ইচ্ছামত কিছু করার। এদের প্রত্যেকটিকে আল্লাহ তায়ালা যে যোগ্যতা দান করেছেন তার বাইরে ভাবের আবেগে কিছু করারও কোনো উপায় এগুলোর নেই, বরং সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে আবদ্ধ রয়েছে একমাত্র মানুষ ছাড়া সৃষ্টি লোকের সবাই ও সব কিছু এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছুর মধ্যে তাঁরই মহিমা প্রকাশিত। শুধু মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা এবং নিজ ইচ্ছাকে কাজে লাগানোর প্রবণতা দান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই তাদের কাছে এসেছে আল্লাহর বার্তাসমূহ যার মধ্যে সতর্ক হয়ে চলার পথ নিদের্শনা রয়েছে।' কিসের এসব খবর? সৃষ্টিলোকে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর খবর যা সবিস্তারে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন, বর্ণনা করেছেন পূর্বেকার সত্যবিরোধী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের ঘৃণ্য তৎপরতা ও তাদের করুণ পরিণতির কথা। আরও তিনি বর্ণনা করেছেন আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে যার চিত্র কোরআনে অতি চমৎকারভাবে আঁকা হয়েছে। এসব কিছুর বর্ণনা থেকে তারাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যারা কেয়ামতের শাস্তির হুমকি বিশ্বাস করে এবং তাতে ভয় পায়। কোরআনে করীমে উল্লিখিত বিজ্ঞানময় কথাগুলো অন্তরের গভীরে দাগ কেটে যায় এবং মহা-বিজ্ঞানময় আল্লাহর সূক্ষ্ম ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যে সব অন্তরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে তা আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) গুলো দেখতে পায় না এবং কোরআনে বর্ণিত খবর থেকে কোনো ফায়দাও তারা হাসিল করতে সক্ষম হয় না। সতর্ককারীর পর সতর্ককারী এসে যতো খবরই দিক না কেন তাদের ডাক এই বধিরদের কানে প্রবেশ করে না। এ বিষয়ে রব্বুল আলামীন এরশাদ করছেন, 'বিজ্ঞানময় একথাগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, কিন্তু সতর্ককারীদের এসব কথা তাদের কোনো উপকারেই লাগলো না। ঈমান আনার জন্যে যে সব হৃদয় উদ্বেলিত একমাত্র সেই সব হৃদয়েই আল্লাহ তায়ালা ঈমানের নেয়ামত দান করেন এবং তারাই এ মহা পুরস্কার লাভ করার অধিকারী।'

মানুষের হঠকারী স্বভাব

ওদের অস্বীকার করা, অসত্যের ওপর জিদ ধরে টিকে থাকা, কোরআনের খবরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং সত্যের নিকৃষ্টতম শত্রুদের সাথে থেকে বে-ফায়দা জিনিস নিয়ে চরম ভাবে মেতে থাকার আলোচনার পর আল্লাহ পাকের সম্ভাষণের গতি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে, যাতে করে সত্য বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ পায় এবং সেই ভয়ংকর দিনের প্রতীক্ষায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়– যে দিন কোনো হুমকিদানকারীর হুমকি প্রদর্শন কারও কোনো কাজে লাগবে না। অথচ আজকে তারা আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতার নিদর্শন চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও শিক্ষা নেয়ার সুযোগ হেলায় হারালো। তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন, '(হে রসূল) আল্লাহ তায়ালা সেইদিন ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন যে দিন চূড়ান্ত আহ্বানকারী ডাকতে থাকবে এক ভীষণ অপ্রিয় পরিণামের দিকে। সেদিন অবনমিত চোখে বিক্ষিপ্ত পংগপালের মতো তারা বেরিয়ে আসবে কবর থেকে (এবং) সেই আহবানকারীর দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে তারা বলতে থাকবে, হায়, বড়ই কঠিন আজকের এই দিনটি।'

সেই কেয়ামতের দিনের দৃশ্যাবলীর এই হচ্ছে এমন একটি চিত্র যার ভয়ংকর ও কঠিন ছবি বর্তমান সূরাটির সর্বত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আলোচ্য সূরার মধ্যে তার ভয়ংকর অবস্থাটি তুলে ধরে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সংঘটিত করে কেয়ামতের পূর্বাভাসই প্রদান করা হয়েছে।

ভয়াবহ সে দিনটি অতি কাছে

কঠিন সে দিনটি এসে গেছে, অতি কাছে এবং অতি শীঘ্র আসবে বলে ভীতি জন্মায় প্রত্যেক সেই পাঠকের হৃদয়ে–যে মনোনিবেশ সহকারে সূরাটি অধ্যায়ন করে; তার গোটা সত্ত্বাকে কাঁপিয়ে তোলে সে কঠিন দৃশ্যের চিন্তা-চেতনা, যখন এক মুহূর্তে কবরগুলো উৎক্ষিপ্ত করে দেবে বিক্ষিপ্ত পংগপালের মতো তার সকল অধিবাসীকে। ওয়াদা করা সেই দিনটিতে ছিটকে পড়া মানুষগুলোকে বিক্ষিপ্ত পংগপালের সাথে তুলনা করা হয়েছে যেন মানুষ কল্পনায় চেয়ে দেখে সেই মহা বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে যখন নতশিরে সারা পৃথিবীর ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ জমা হবে এক সুবিশাল প্রান্তরে। পংগপাল যেমন শত শত মাইলব্যাপী এলাকায় এক মহাবিপদ আকারে আবির্ভূত হয়ে সব কিছু খেয়ে সাফ করে দেয় এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন সীমাহীন এক প্রান্তরে সকল মানুষ জমা হয়ে যাবে এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকবে সেই আহবানকারীর দিকে যার ডাকে এই মহা প্রলয়কান্ড সংঘটিত হবে। তিনি ডাকবেন অজানা-অচেনা এমন এক ভয়ংকর কঠিন ও অপ্রিয় পরিণতির দিকে যার ব্যাপারে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এমনই মহা সম্মেলনে ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হৃদয়ে দ্রুতগতিতে একত্রিত হয়ে কাফেররা বলে উঠবে, হাঁ, 'বড়ই কঠিন দিন এটা'–এ হবে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও মহা বিপদে পতিত মানুষের মর্মজ্বালার এক হৃদয়-বিদারক হাহাকার। এই ভয়ংকর ও কঠিন দিনে পতিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক নাফরমান ব্যক্তিদের মধ্যে।(৩)

অতএব, আলোচ্য সূরাটিতে সেই যে কঠিন দিনটির কথা বলা হয়েছে তা এসে গেছে অতি কাছে। তবু ওরা সেই দিনটির আগমনকে সরাসরি অস্বীকার করছে শুধু সেদিনটিকেই নয় বরং নবী (স.)-কেও, সে দিনটির খবর দেয়ার কারণে এবং সে দিনটির ওপর অবতীর্ণ সূরা তাদের সামনে পেশ করার কারণে তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং, হে রসূল (স.) সেই দিন ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো যে দিন তা সত্য সত্যই এসে যাবে এবং তাদেরকে সেই ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিয়ো।

সূরাটির শুরুতে এই কঠিন ঘটনাগুলোর কথা বলে এবং কেয়ামতের দিন সত্যকে অস্বীকারকারীদেরকে যে বেদনাদায়ক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে, তার বিবরণ পেশ করার পর পূর্ববর্তী বহু অভিশপ্ত জাতির প্রতি আগত শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং নূহ (আ.)-এর আমল থেকে নিয়ে অন্যান্য সব জাতি যে গযবের সম্মুখীন হয়েছিলো তাও জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি। অতপর তারা প্রত্যাখ্যান করেছে আমার বান্দাকে এবং তাকে পাগল বলে অভিহিত করেছে। আর তাকে নানাভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে, যার কারণে সে তার রব-এর কাছে দোয়া করতে গিয়ে বলেছে, 'হে আমার রব! আমি পরাজিত হয়ে গেছি। অতএব, তুমি আমায় সাহায্য করো যেন ওদের ওপর বিজয়ী হতে পারি। এরপর আমি বৃষ্টিবর্ষণরত অবস্থায় আকাশের দরজাগুলোকে খুলে দিলাম এবং পৃথিবী ফাটিয়ে দিয়ে অসংখ্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিলাম। ....

হযরত নূহ (আ.)–এর ঘটনা

'এদের পূর্বে নূহের জাতি তাকে প্রত্যাখ্যান করলো।' অর্থাৎ তাঁর রসূল হওয়ার কথাটিকেই মিথ্যা বলে ফিরিয়ে দিলো এবং যে আয়াতগুলো তিনি নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো আল্লাহ তায়ালা

(৩) 'মাশাহেদুল ক্বেয়ামাতে ফিল কোরআন' নামক গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত।

প্রদত্ত নয় বলে দাবী করলো–'এইভাবেই তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো' এবং বললো, 'সে একটি বদ্ধ পাগল'। একই ভাবে যালেম কোরায়শরাও মোহাম্মদ (স.)-কে পাগল বলেছিলো এবং তাঁর প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করেছিলো, তাঁকে নানা কষ্ট দিয়েছিলো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলো এবং চেয়েছিলো যেন তিনি দাওয়াতী কাজ বন্ধ করে দেন, আর অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো 'এবং তাঁকে খতম করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছিলো।' এইসব হুমকি দিয়ে নবী নূহ (আ.)-কে তারা তাঁর দায়িত্ব পালন করা থেকে পিছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো।

এই কারণেই, অবশেষে নূহ (আ.) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই তাকে তাবলীগে দ্বীন-এর দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রবের দিকে এজন্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন যেন তাঁকে প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন। কেননা, এ দায়িত্ব পালন তাঁর ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে অবশ্যই তিনি চূড়ান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি তাঁর জাতিকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর সাধ্যমত তিনি চেষ্টার কোনোই কসুর করেননি।

সুতরাং, তাঁর রবের কাছে দোয়া করতে গিয়ে বললেন, 'আমি পরাজিত হয়ে গেছি, অতএব তুমি এদের ওপর প্রতিশোধ নাও।'

অর্থাৎ আমার শক্তি, আমার চেষ্টা চালানোর ক্ষমতা, আমার সাধ্য, ব্যর্থ হয়ে গেছে আমি দায়িত্ব পালনে নিশেষ হয়ে গেছি, 'পরাজিত হয়ে গেছি আমি, অতএব তুমিই প্রতিশোধ নাও।' তুমি নিজেই ওদের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে নাও হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে তোমার কাছেই সাহায্যপ্রার্থী। তোমার অধিকার আদায়ের জন্যে তোমার কাছেই সাহায্য চাইছি, সাহায্য চাইছি তোমার পথে চলতে, তুমিই সাহায্য পাঠাও। কারণ একাজ তো একান্তভাবে তোমারই। এ তো তোমারই দাওয়াত। আমার ভূমিকা-যা ছিলো তা নিশেষ হয়ে গেছে।

তবে এটা সত্য কথা, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর ইশারা ছাড়া এ কথাগুলো উচ্চারণ করা একজন নবীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, সম্ভব ছিলো না মহান রব্বুল আলামীনের কাছে এই আত্মসমর্পণ। তাঁর অনুমতি ও ইচ্ছানুক্রমেই কম্পিত হৃদয়ে নূহ (আ.)-এর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিলো। এই কারণে এরশাদে বারী নেমে এল, 'সুতরাং আমি খুলে দিলাম আকাশের দুয়ারগুলোকে বারিধারা বর্ষণরত অবস্থায় এবং সমগ্র পৃথিবীকে ফাটিয়ে অজস্র ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করালাম, যার ফলে এক সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে পানির প্লাবন নেমে এল।'

এ প্লাবন ছিলো এমন বিশাল যা বর্ণনা করতে সকল ভাষা ব্যর্থ, যার বিবরণ দিতে কোনো পুস্তকের পাতায় সংকুলান হবার নয়। এ কাজ অসীম শক্তি-ক্ষমতার মালিক আল্লাহর সরাসরি ফয়সালার বহিপ্রকাশ। যার জন্যে বলা হয়েছে, 'অতএব, আমি খুলে দিলাম।' এ আয়াতটি পাঠ করার সময় পাঠক অনুভব করে, যখন সারা বিশ্বের মালিক সীমাহীন শক্তি-ক্ষমতাধর প্রভু নিজে আকাশের দুয়ারগুলো খুলে দেয়ার ফয়সালা দিয়ে দেন, তখন সে বিষয়ের গভীরতা মানুষের পক্ষে আর বুঝা সম্ভব হয় না। তাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর শক্তি ক্ষমতা বুঝাতে গিয়ে নিজেকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করেছেন এবং 'প্রবল বৃষ্টিধারা' কথাটি ব্যবহার করে অবিরাম বারিধারাকে বুঝানো

হয়েছে। এই বৃষ্টিধারার একটি শক্তি রয়েছে এবং সঞ্চালনে সে শক্তির বহিপ্রকাশ ঘটে। 'আর গোটা পৃথিবীকে ফাটিয়ে দিয়ে অসংখ্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করলাম'–একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, গোটা পৃথিবীকে এমনভাবে ফাটিয়ে দিয়ে পানি উছলে উছলে বের করা হলো, যেন সমগ্র পৃথিবীটিই ঝর্ণাধারায় পরিণত হলো।

এই অবিরাম বর্ষণধারার পানি পৃথিবীর বুক চিরে ফুটে উঠা পানির সাথে মিলিত হয়ে সেই মহা প্লাবন ত্বরান্বিত হয়ে গেল। 'এই পানি স্ফীত হতে লাগলো এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যার ফয়সালা পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিলো।' অর্থাৎ ওপর ও নীচের পানি একত্রিত হয়ে এক নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে এগিয়ে গেল, যার সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়ে গিয়েছিলো। এই দুই সম্মিলিত পানির ধারার কাজ ছিলো পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা। উভয়ে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগত দাস হিসাবে তাঁর ইচ্ছাকেই পূরণ করেছে।

অবশেষে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়ে গেলো যা পরিব্যাপ্ত হলো সব কিছুর ওপরে এবং যা পৃথিবীর সব কিছুকেই ডুবিয়ে দিলো, সব কিছুর ওপর ছাপিয়ে উঠে নিশ্চিহ্ন করে দিলো সকল অপবিত্রতার আবর্জনাকে । অথচ আল্লাহর নবী নূহ (আ.) শেরেকের এসব কলুষতা থেকে পৃথিবী মুক্ত হওয়ার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা শেরেক ও কুসংস্কারের ব্যাধি নিরাময় করার জন্যে তাঁর আবেগ-উৎকণ্ঠা ও প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। যে দরদ-মহব্বত নিয়ে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-ব্যাপী তিনি দাওয়াতী কাজ করেছিলেন এবং মানুষকে সকল প্রকার সংকট থেকে মুক্ত করার জন্যে যে চেষ্টা-সাধনা করেছিলেন, তা সবই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে আরোহণ করালাম কাঠের তক্তা ও পেরেক নির্মিত এক জাহাজে, যা আমার সাহায্যক্রমে চলতে থাকলো। যে নবীকে মাত্র কিছুদিন আগেও অস্বীকার করা হয়েছিলো তার জন্যে (এই প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়ে জাহাজে আশ্রয় পাওয়া) ছিলো এক মহা পুরস্কার স্বরূপ।' এখানে আলোচনার ধারা থেকে সেই জাহাজটির বিশালতা এবং এ আরোহীদের রক্ষা পাওয়া যে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো তা সহজেই অনুমান করা যায়। জাহাজটি ছিলো কাঠের তক্তা ও পেরেকের সাহায্যে নির্মিত। বিশাল এ তরীর বিবরণ যতই দেয়া হোক না কেন, এর মূল্য যে কতো তা এ কিছু তেই বুঝানো যাবে না। এ তরী খোদ আল্লাহরই পরিচালনায় এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ভেসে বেড়াতে লাগলো। সকল কিছু ধ্বংস হয়ে গেলো, শুধু বেঁচে রইলেন নবী নূহ (আ.) আর তারা যাদেরকে তিনি জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন–এটাই হচ্ছে তাঁর পুরস্কার যেহেতু তাঁকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। অস্বীকার করা হয়েছিলো এবং হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহর পরিচালনাকে যারা হৃষ্টচিত্তে মেনে নেয় তিনি চরম সংকটা থেকে উদ্ধার করে এইভাবেই তাদেরকে প্রতিদান দেন এবং সত্য পথে থাকার কারণে যে যতই ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদের সাথে করুক না কেন, আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে সম্মানিত করেন। আল্লাহর পথে থাকার কারণে যাদেরকে নিষ্পেষণ করা হয় তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এইভাবে সর্বপ্রকার শক্তি সরবরাহ করে থাকেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে থাকার উদ্দেশ্যে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে, তারপর তার যাবতীয় কাজকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করবে, তার দাওয়াতী কাজের ফল পাওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়েও আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করবে এবং সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছেই দোয়া করবে, সেই ব্যক্তির খেদমতের জন্যে এবং তাকে সাহায্য করার জন্যে সৃষ্টির ছোট-বড় সকল বস্তুই নিয়োজিত হয়ে যাবে, আর সব কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর সকল শক্তি-ক্ষমতা নিয়ে, সত্য পথে টিকে থাকতে তাকে সাহায্য করবেন।

শিক্ষাগ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?

আল্লাহর সাহায্যের এমনই বিরাট এবং পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য যখন সামনে আসে এবং সত্যপথের পথিকের সামনে যখন হক পথের সঠিক তথ্য চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পায়, তখন হকপন্থীদের অন্তর সত্যের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যেন সত্যকে তারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছে, তখন সে নির্দ্বিধায় ও সর্বান্তকরণে আঁকড়ে ধরে সত্যের পথকে, যেন তার ফলকে তারা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করছে। এইভাবে তারা প্রভাবিত হয় এবং মন-প্রাণ দিয়ে সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। তাই জিজ্ঞাসার সুরে ডাক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, '(নূহের আমলের) এই মহাপ্লাবনকে পরবর্তীকালের লোকের জন্যে আমার শক্তি-ক্ষমতার এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। এর থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করবে কি?'

মহা প্লাবনের এই যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়ে গেল, তা সবিস্তার মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় আল্লাহর ইচ্ছাতেই সুপরিচিত ও সংরক্ষিত হয়ে রয়ে গেলো। যুগের পর যুগ ধরে যাতে করে এ ঘটনা থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে তার জন্যে তাদের স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই ভয়ানক দৃশ্যটিকে অমলিন রেখে দিলেন। তাই তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করছেন, 'শিক্ষা নেয়ার মতো কেউ আছে কি?' অর্থাৎ, কেউ এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হবে কি?

তারপর, আযাবের ভয়াবহতা ও সতর্ককারী নবীর সত্যতা সম্পর্কে তুলে ধরতে গিয়ে প্রশ্ন আকারে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, কেমন ছিলো বলো দেখি আমার (সে প্লাবনের) আযাব ও সতর্কবাণী?

সে আযাবের চিত্র আঁকতে গিয়ে কোরআন বলছে, সে আযাব ছিলো যেমন ধ্বংসাত্মক, তেমনি ভীষণ এবং নবী নূহ (আ.) সঠিকভাবেই অবশ্যম্ভাবী সে আযাব আসা সম্পর্কে সতর্কতা-সংকেত দিয়ে চলেছিলেন।

কোরআনকে বুঝার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে

এই-ই তো সেই কোরআন, যা আজও অবিকলভাবে আমাদের সামনে মওজুদ আছে, যা পড়া সহজ বুঝা সহজ। এই মোবারক গ্রন্থ পাঠ করার জন্যে এর মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। পড়তে ভালো লাগে, চিন্তা করতে ইচ্ছা হয়, এ কেতাব সত্যের প্রতি সহজ সরলভাবে আহবান জানায়। কোরআন মানুষকে তাই সরবরাহ করে যা তার স্বভাব-প্রকৃতি চায়। মানুষের মনের মধ্যে এ পাক কালাম গভীর আবেগ সৃষ্টি করে এবং এর বৈচিত্র, নতুনত্ব, চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না, বারবার তেলাওয়াত করা সত্ত্বেও কিছুতেই এ পবিত্র গ্রন্থ পুরাতন হতে চায় না। যতই কোরআনে করীমের ওপর জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করা হয়, ততই যেন নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পেতে থাকে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এ পাক কালাম এমনই মধুর পরশ বুলিয়ে দেয় এর ভক্তের অন্তরে যে বারবার তা পড়তে ইচ্ছা করে এবং যতই পড়া হয় ততই এ অমিয় সুধার সাথে তার মহববত বাড়তে থাকে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি অবশ্যই সহজ করে দিয়েছি কোরআনকে, অতএব আছে কি কেউ এর থেকে শিক্ষা নেয়ার?'

এইভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে পেছনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে বারবার স্মরণ করানো হচ্ছে। যে কোনো মানুষের অন্তরে এ ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সত্য সঠিক পথ গ্রহণ করার আহবান জানানো হচ্ছে এবং সত্যকে জেনে-বুঝে অস্বীকারকারীদের জন্যে অবশ্যম্ভাবী শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করে তাদেরকে সময় থাকতেই চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পাপিষ্ঠ আ'দ জাতির অবস্থা

'আদ জাতি তার নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় কি ভাবে তাদের ওপর আমার আযাব এসে পড়লো তা চিন্তা করে দেখেছো কি? আমি, তাদের ওপর এক চরম অশুভ দিনে প্রচন্ড বাতাসের আযাব পাঠালাম, যা চিরদিনের জন্যে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। এ আযাব তাদেরকে উপড়ে যাওয়া খেজুর গাছের মতো উৎখাত করে দিলো। এখন ভেবে দেখো কি কঠিন ছিলো এ আযাব এবং পূর্বেই প্রদত্ত সতর্কবাণীর প্রতি তারা কি ব্যবহারটিই করেছিলো? আর আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে এই কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, এখন আছে কি কেউ এর থেকে শিক্ষা নেয়ার মতো মানুষ?'

এ হচ্ছে দ্বিতীয় সেই জনপদটি, অথবা দ্বিতীয় সেই আযাবের দৃশ্য যা অত্যন্ত কঠিনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত না-ফরমানদের বীভৎস চিত্রটি তুলে ধরেছে এবং তুলে ধরেছে নূহ (আ.)-এর আমলে তাঁর জাতি যে মারাত্মক অপতৎপরতায় লিপ্ত ছিলো তাদেরই পরিণতির অনুরূপ আর একটি দুঃখজনক পরিণতিকে। উল্লেখযোগ্য যে, নূহ (আ.)-এর জাতিই হচ্ছে নবী ও তাঁর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করায় সর্বপ্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।

অতীতের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে এ পর্যায়ে প্রথমই আ'দ জাতির প্রত্যাখ্যান করার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং এ বিষয়টির ওপর আগত আয়াতটি শেষ করার পূর্বেই বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'অতপর কেমন হলো আমার আযাব ও সতর্কীকরণের ফল?' অর্থাৎ আদ জাতির সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কি মারাত্মক ফল দাঁড়ালো তা দেখেছো কি? এরপর আল্লাহ তায়ালা সে ভয়ানক হিংস্র নেকড়ের থাবার মতো মহা বিপদের প্রকৃতি জানাতে গিয়ে বলছেন,

'অবশ্যই আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম এক দুর্লক্ষুণে দিনে এমন এক তীব্র ও ভয়ানক বাতাস যা তাদেরকে উৎপাটিত খেজুর গাছের মতো উৎক্ষিপ্ত করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো।' 'রীহুন সরসরুন' বলতে এক প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাসকে বুঝায়। এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যে ঝংকার ফুটে উঠেছে তাতে সে তীব্র বায়ুর প্রকৃতি এমনিই অনুমান করা যায় এবং তার ধ্বংসাত্মক চেহারা যেন মূর্ত হয়ে উঠে। 'নাহ্সুন' শব্দটি বলতে দুর্লক্ষণ, ভাগ্য বিপর্যয় এবং বিপজ্জনক অবস্থাকে বুঝায়। যে আদ জাতি দুর্গম গিরি সংকটে পাথরের পাহাড় খোদাই করে ঘর-বাড়ী তৈরী করে দাবী করেছিলো যে, এসব ঘর-বাড়ী কেউ কোনোদিন ভাংতে পারবে না বা তাদেরকে কেউ ধ্বংসও করতে পারবে না। তাদের ওপর এমন শীতল ঘূর্ণিঝড় দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এসব গুহার মধ্য থেকে খেজুর গাছ উপড়ে আনার মতো বের করে এনে আছড়ে আছড়ে খতম করে দিলেন যে, এমন কঠিন ভাবে দুনিয়ার আর কাউকে তিনি ধ্বংস করেননি। পৃথিবীর মানুষ চিন্তা করে দেখুক ধ্বংসলীলার এমন কঠিন নযীর দ্বিতীয়টি আর আছে কি?

এ দৃশ্য যেমন ভয়ানক তেমনি ভীতিপ্রদ, যেহেতু তাদের হাড়-মাংস কঠিন শুকনা তৃণলতার মতো উক্ত পর্বতাঞ্চলের সন্নিহিত মরুভূমিতে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছিলো এবং আজও তা বিরাজমান। আর আদ জাতির ওপর যে বায়ুপ্রবাহ পাঠানো হয়েছিলো তাই-ই হচ্ছে 'আল্লাহর সেই বাহিনী' যা দিয়ে তিনি অহংকারী ও সীমালংঘনকারী জাতিকে নীস্ত নাবূদ করে দিলেন। বায়ুর এ শক্তি আল্লাহরই এক সৃষ্টি, যাকে তিনি সুসংবাদ বহনকারী হিসাবে কাজে লাগান এবং যার জন্যে ইচ্ছা তার জন্যে ধ্বংসাত্মকও বানান। এই বায়ুকে কত জনপদের জন্যে আরাম ও শান্তির বস্তু হিসাবে পাঠিয়ে তাদেরকে ধন্য করেছেন এবং তাঁরই ইচ্ছা ও নির্দেশে এই বায়ু মানুষের কত কল্যাণকর কাজে লেগেছে। যিনি এই বায়ুকে কাজে লাগিয়েছেন তিনিই তো সব কিছুর মালিক এবং তিনিই সবাইকে সুসংবাদ দানকারী।

'তাই কেমন হলো আমার আযাব এবং কেমন হলো আমার পথ প্রদর্শনা?' ওপরের একথাটিকে এ দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেছেন এবং তারপর সে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে তার জওয়াব দিয়েছেন!

এরপর বিশেষ এক ভংগিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই জনপদের প্রতি নেমে আসা শাস্তির উপর্যুপরি উল্লেখের পর একথা বলে এ প্রসংগটির যবনিকাপাত করা হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে সহজ করে দিয়েছি এই কোরআনকে, সুতরাং আছে কি কেউ সদুপদেশ গ্রহণ করার?'

এরপর, সেই দৃশ্যটির ওপর আলোচনা আসছে যা এই প্রসংগের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং যা ইতিহাসের পাতায় আজও অম্লান হয়ে রয়েছে,

সামুদ জাতির অবস্থা

'তারা অস্বীকার করলো নবীদেরকে এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো সামূদ জাতি তার সতর্ককারীদেরকে। বললো তারা 'আমাদের মতোই এক ব্যক্তি না এই লোকটি! যার অনুসরণ করতে হবে আমাদের? তা করলে তো আমরাও দারুণ ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে দোযখবাসী হয়ে যাব। এর থেকে কেউ আছে কি শিক্ষা গ্রহণ করার? (আয়াত ২৩-৪০)

আরব উপদ্বীপে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে আ'দ জাতির পরেই ছিলো সামূদ জাতির স্থান। এই দুটি জাতি ছিলো সম-সাময়িক। আ'দ জাতি ছিলো আরবের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী, আর সামূদ জাতি ছিলো উত্তরাঞ্চলে। আ'দ জাতির মতো সামূদ জাতিও সতর্ককারী নবীদেরকে অস্বীকার করেছিলো এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো। নবীদের প্রতি তাদের এই নাফরমানীও বিরুদ্ধাচরণের কথা গোটা আরব দেশে অবিশ্বাস্যরূপে ছড়িয়ে ছিলো। তারা জাতি হিসাবে যেমন প্রসিদ্ধ ও নামকরা ছিলো, তেমনি তাদের হিংসাত্মক তৎপরতা ও করুণ পরিণতিও ছিলো সবার জানা।

এতদসত্তেও তারা বললো, 'লোকটি কি আমাদের মতোই এক সাধারণ ব্যক্তি নয়, তাহলে তার আনুগত্য করব কেন? তা যদি করি তাহলে তো আমরাও ভ্রান্তিতেপড়ে যাবো এবং দোযখবাসীতে পরিণত হব। আমাদের মধ্য থেকে কি একমাত্র তার কাছেই এসব উপদেশবাণী নেমে এলো? (না, এ হতে পারে না), বরং এ লোকটি হচ্ছে নিকৃষ্ট এক মিথ্যাবাদী।'

যুগের পর যুগ ধরে নবীদের প্রতি বারবার এমন সব মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে যা তাঁদের হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। কতো মারাত্মক তাদের এই বাক্যবাণ, 'আমাদের মধ্যকারই কি এ এক ব্যক্তির আনুগত্য করতে হবে? তা করলে তো অবশ্যই আমরা ভ্রান্ত হয়ে যাবো (গোমরাহীর মধ্যে পতিত হব) এবং (এর ফলে) দোযখবাসীতে পরিণত হয়ে যাব। তাদের পেটভরা এই অহংকারই তাদেরকে নবী (আ.)-এর দাওয়াতের তাৎপর্য বুঝতে দেয়নি, (অর্থাৎ অহংকারের কারণে দাওয়াতের কথাগুলোর দিকে তারা খেয়াল করে তাকাতে পারেনি)। তারা দাওয়াত দানকারীকে দেখেছে তুচ্ছ এক ব্যক্তি হিসাবে।তাদের বিবেচনায় লোকটি আমাদের মতোই এক সাধারণ ব্যক্তি না? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে কেন?

আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে (দাওয়াতদানকারী হিসাবে) বাছাই করে থাকেন, তাতে হয়েছেটা কি? আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন কোন্ পাত্রে রেসালাত-এর দায়িত্ব দিতে হবে। কাজেই, তিনি তাঁর পছন্দ মতো ব্যক্তিকেই রেসালাত-এর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন, সদুপদেশ দান করার কাজ অর্থাৎ ওহীর আমানতই হচ্ছে আসল জিনিস যার

দিকে খেয়াল করা প্রয়োজন এবং ওহীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করাই আসল কাজ। 'বান্দাদের মধ্য থেকে যে বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজের জন্যে পছন্দ করেন তার যোগ্যতা এবং এ কাজের জন্যে তার প্রস্তুতি কতটা আছে তা তিনিই জানেন, যেহেতু তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনিই সকল উপদেশমালা অবতরণকারী, এরপরও বাছাই করার প্রশ্ন কেন?' এ হচ্ছে একটি বাজে সন্দেহ বা বাজে প্রশ্ন যা না-ফরমান লোকদের মনেই জাগ্রত হয়। যে সব ব্যক্তি দাওয়াতের বিষয়বস্তুর দিকে তাকাতে চায় না, দেখতে চায় না তার মধ্যে সত্য ও সঠিক জিনিস কতটা আছে, তারাই এসব সন্দেহ করতে থাকে। তারা শুধু দাওয়াতদানকারীর দিকেই তাকায় এবং তার তুলনায় নিজেদের বড়ত্ব বিবেচনায় এ দাওয়াত দানকারীর আনুগত্য থেকে দূরে সরে থাকে। তারা মনে করে, এ ব্যক্তির আনুগত্য করতে গেলে তাকে বড় মনে করতে হবে এবং তাকে সম্মান দিতে হবে তার আত্মসম্ভ্রমবোধ এটা মেনে নিতে পারে না।

আর এই কারণেই তারা মনে মনে বলে, 'এ ব্যক্তি কি আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ নয়? এর আনুগত্য করতে যাব কেন? এর আনুগত্য করলে তো আমরা গোমরাহ্ এবং দোযখবাসী হয়ে যাবো।' অর্থাৎ, হায় এই ব্যক্তির ওপর ঈমান আনার মতো অপ্রিয় কাজটি যদি আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়! সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, হেদায়াতের পথে চললে তারা গোমরাহ্ হয়ে যাবে বলে ভয় করছে। আরও তারা মনে করছে যে, তারা দোযখবাসী হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তারা ভাবছে, একটি দোযখের নয়, তারা বহু দোযখের অধিবাসী হয়ে যাবে। অথচ, বাস্তব সত্য হচ্ছে, নবীর অনুসরণ করলেই তারা ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে!

এই সব বাজে চিন্তা-ভাবনার কারণে যে রসূলকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্য সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে বাছাই করলেন তাঁকে তারা নানাভাবে দোষারোপ করতে লাগলো, দোষারোপ করতে লাগলো মিথ্যাবাদী বলে, লোভী বলে। এতটুকু বলেই তারা ক্ষান্ত হলো না। তাঁকে ভীষণ লোভী এবং চরম মিথ্যাবাদী বলে গালিও দিতে থাকলো। বললো, সে এমন মিথ্যাবাদী যে তার কথা বা উপদেশ মানার যোগ্যই নয়। 'আশিরুন' বলতে বুঝায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণে ভীষণ লোভী। অবশ্য অতীতে আল্লাহর পথে যারাই আহবান জানিয়েছেন তাদের সবাইকেই এই দোষারোপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দোষারোপ করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্যে দাওয়াতী কাজকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নবীকে মিথ্যাবাদী বলে তারাই এভাবে দাবী করে যাদের বিবেক-বুদ্ধি খতম হয়ে গেছে এবং যারা কুপ্রবৃত্তির গোলামী করে এবং তাদের অন্তরের লাগামছাড়া ইচ্ছামত নিজেরা চলে। তাদের এই আচরণকে ইতিহাসে বর্ণিত 'নিজেদেরকে নিজেরা ধূলামলিন করার' কাহিনীর সাথে তুলনা করা যায়। হঠাৎ করে কোনো জিনিসের প্রতি একটু মনোযোগী হয়ে তারা আশা করে যে, এ কাজের সুফল তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাবে। তারা চলমান বিভিন্ন ঘটনাকে অস্বীকার করে, সত্যকে দেখেও দেখে না, চিন্তাও করে না ভবিষ্যতে কি হবে না হবে। নিজেদের পান্ডিত্য দেখাতে গিয়ে তারা শুধু সেই কথাই বলে যায় যাতে তাদের পান্ডিত্য প্রকাশ পায়। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের ধমক দিতে গিয়ে বলছেন, 'শীঘ্রই তারা জানতে পারবে কে চরম মিথ্যাবাদী এবং কে ভীষণ লোভী।'

কোরআনে বর্ণিত কেসসা-কাহিনীর এ হচ্ছে এক বিশেষ বর্ণনাভংগি। এ এমন এক পদ্ধতি যা সে কাহিনীকে জীবনের জন্যে এক বাস্তব ও প্রাণবন্ত উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছে এবং সে কাহিনী যেন মানুষের ধমনীতে প্রাণপ্রবাহ ছুটিয়ে দিয়েছে আর মানুষ অনুভব করেছে যেন চোখের সামনেই ঘটনাটি ঘটছে। পরবর্তী ঘটনার জন্যে মন অপেক্ষমান হয়ে যায় এবং মনে করে অদূর

ভবিষ্যতেই সংশ্লিষ্ট অবস্থাটি ঘটতে যাচ্ছে। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আগামী কালই তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী এবং কে ভীষণ লোভী।' অর্থাৎ আগামী কালই তাদের সামনে সঠিক অবস্থাটি প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এ সত্য যখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন তারা কিছুতেই আর রেহাই পাবে না। প্রকৃতপক্ষে যারা মিথ্যাবাদী ও ভীষণ লোভী তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক বিপদের দরজা সেই দিন খুলে দেয়া হবে। অতপর এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে নির্দিষ্ট সেই উটনীটি পাঠাবো, সুতরাং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো এবং সবর কর। আর জানিয়ে দাও তাদেরকে যে পানি পান করার দিন তাদের মধ্যে ভাগ করা রয়েছে। প্রত্যেকের জন্যে প্রয়োজন নিজ নিজ নির্দিষ্ট দিনে যথাস্থানে হাযির হওয়া।'

এ পর্যায়ে এসে পাঠক থমকে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে কি ঘটতে যাচ্ছে তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কারণ উটনীটিকে তো তাদের পরীক্ষার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছিলেন। তাদের সঠিক অবস্থা নিরূপণের জন্যে ছিলো এ পরীক্ষা এবং রসূলও এ পর্যায়ে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। সেই রসূল যাঁকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করার জন্যে। তাদের কার্যকলাপ ধৈর্যের সাথে লক্ষ্য করে তিনি দেখছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন, কি কঠিন বিপদ তাদের ওপর নেমে আসবে এবং তাদের প্রতি আসা পরীক্ষার অবসান ঘটবে। এ গোত্রের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত উটনীটির পানি পান করার দিন ভাগ করা ছিলো। এ ছিলো বিশেষ একটি উঁটনী যার সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যেত যে, এটি ছিলো আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার এক নিদর্শন এবং এক বিশেষ চিহ্ন। এজন্যে একদিন উটনীটির পানি পানি করার জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো এবং আর একদিন ছিলো সে গোত্রের পানি গ্রহণ করার জন্যে, যাতে পানির ঘাটে একদিন উঁটনীটি পানি পান করার জন্যে হাযির হয় এবং অন্যদিন সে গোত্রটি উপস্থিত হয়ে পানি গ্রহণ করে।

এরপর পুনরায় কাহিনীটির বিশেষ বর্ণনার দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানানো হচ্ছে, 'এরপর তারা তাদের সংগীকে ডাকলো এবং সে এসে উঁটনীটিকে ধরে ফেললো ও নির্মমভাবে হত্যা করলো।'

এসব লোকদের যে সংগী (যে লোকটি উটনীটিকে হত্যা করলো), সে নগরীর মধ্যে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদেরই একজন ছিলো। সূরা 'আন নাম্‌ল'-এ আল্লাহ তায়ালা এদের সম্পর্কে বলছেন, 'সে নগরীতে নয় জন লোকের একটি দল ছিলো, যারা শুধু বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াতো, কখনই কোনো ভাল কাজ তারা করতো না।' আর এদেরই সম্পর্কে সূরা 'আশ্‌ শামস্‌'-এ আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, 'যখন তাদের মধ্যকার সব থেকে বড় দুষ্ট ব্যক্তিটি তৎপর হয়ে উঠলো'। আর এ কথাটিও বলা হয়েছে এ জঘন্য চরিত্রের লোকটি যখন কোনো শয়তানী কাজ করতে চাইতো, তখন প্রচুর পরিমাণে মদ পান করে নিত, আর তখন সে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে আর দ্বিধা বোধ করতো না। সেই ব্যক্তিই আল্লাহর প্রেরিত সেই উটনীটিকে হত্যা করলো যাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শক্তির এক নিদর্শন হিসাবে সে গোত্রের মধ্যে পাঠিয়ে ছিলেন। অবশ্যই তাদের রসূল তাদেরকে স্পষ্টভাবে একথা বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর এ উটনীটির গায়ে হাত দিলে তাদের ওপর নির্ঘাত ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব নাযিল হয়ে যাবে। 'এতদসত্ত্বেও তারা তাদের সেই নিকৃষ্ট সংগীটিকে ডেকে পাঠালো, এবং সে এসে উঁটনীটিকে ধরলো ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো।' এর ফলে তাদের ওপর প্রদত্ত পরীক্ষা সমাপ্ত হলো এবং নাফরমানদের জন্যে নির্ধারিত সেই মহাবিপদ সংঘটিত হয়েই গেলো। 'সুতরাং, কেমন হলো আমার সে আযাব আর কেমন ভাবে বাস্তবায়িত হলো আমার সতর্কবাণী, দেখলে তো?'

এ হচ্ছে আশ্চর্যবোধক এবং ভীতিপ্রদ এক প্রশ্ন। এ প্রশ্নটি করা হয়েছে আযাব সম্পর্কে নবীর হুঁশিয়ার করে দেয়ার পর–যখন হতভাগা লোকটি উটনীটিকে মেরে ফেললো, তার পর দিন ভোর বেলাতেই ওই ভয়ানক আযাব তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। 'আমি পাঠালাম তাদের ওপর ভীষণ এক চীৎকারধ্বনি, যা তাদেরকে শুকনা ভূষির মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো।'

এই চীৎকার ধ্বনি সম্পর্কে কোরআন বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। অবশ্য, সুরা 'ফুস্‌সেলাত'-এর এক আয়াতে এই চীৎকারধ্বনি বা ভীষণ এক শব্দের আযাবের কথা বলা হয়েছে, এরশাদ হয়েছে,

'এর পরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তখন বলো, আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি সেই মহা চীৎকারধ্বনির আযাব সম্পর্কে, যা আ'দ ও সামূদ জাতির ওপর এসে পড়েছিলো।' এখানে 'সয়হাতুন' ও 'সায়েক্বাতুন' শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত। আবার কখনও এই আযাবের তীব্রতা বুঝানোর জন্যে এ শব্দ দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্যে এ শব্দ দুটির অর্থ একই। কখনও এ বিকট শব্দ বলতে বুঝায় এক মহা চীৎকারধ্বনি যা সহ্য করতে না পেরে মানুষ মরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং কোন্ দিক থেকে ওই শব্দ আসছে তা বুঝার মতো ক্ষমতা থাকে না।

সেই হতভাগ্য জাতির ওপর সেই মহা চীৎকারধ্বনি একবারই এসেছিলো এবং তাতেই তাদের যা পরিণাম হবার তাই হয়েছিলো, অর্থাৎ 'তারা হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ শুকনা ভূষির মতো।' সে জনপদের ওপর আসা মহা বিপদ ছিলো তাদের নিজেদেরই অর্জিত ফল। তাদের পরিণতি শুকনা খড়কুটার মতো হয়ে গিয়েছিলো। কারণ তাদের লাশগুলো ওই ভয়ানক আযাবের কবলে পড়ে মরুভূমিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং সেখানে রোদে শুকিয়ে শুকনা চূর্ণ ভূষির মতোই সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিলো, আর এই অবস্থাটি ছিলো মাত্র একবারেরই এক প্রচন্ড শব্দের পরিণতি।

এ ছিলো একটা ভয়ানক দুঃখজনক দৃশ্য। এ দৃশ্যটি কোরায়শের কাফেরদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে যাতে করে তারা তাদের বড়ত্ব ও অহংকার ত্যাগ করতে পারে। তাদেরকে দেখানো হয়েছে যে, পৃথিবীর বড় বড় শক্তিমান জাতি কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, তুচ্ছ পশুর চর্বিত ভূষির মতোই তারা মিশে গেছে মাটির সাথে।

এই কঠিন ও ভয়ানক দৃশ্যকে তাদের সামনে তুলে ধরে তাদের অন্তরকে কোরআনের দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেন তারা এসব থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং চিন্তা করতে পারে। সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির দৃশ্য আজও যা বর্তমান আছে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ। 'আর অবশ্যই আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে। অতএব, কেউ কি আছে শিক্ষা নেয়ার মতো?'

এরপর আল্লাহ তায়ালা যবনিকা নিক্ষেপ করছেন সে চর্বিত ও অভিশপ্ত ভূষির পর, তবু তাদের সে করুন দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে এবং অন্তরের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। এজন্যে কোরআনে করীম এ অভিশপ্ত জাতির দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে সেই সব ব্যক্তিকে যারা অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত হয়ে যায় ও এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে।

কওমে লূতের ঘৃণ্য আচরণ

অতপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নে বর্ণিত আর এক নতুন জাতির করুন ইতিহাসের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেখাচ্ছেন যে আরব উপদ্বীপের মধ্যে তাদেরও এক সাংঘাতিক পরিনামের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে, প্রত্যাখ্যান করলো লূত (আ.)-এর জাতি উপদেশের বাণীকে .... আর আমি সহজ করে দিয়েছি কোরআনে করীমকে, আছে কি কেউ এর থেকে শিক্ষা নেয়ার'। কোরআনে অন্যান্য জায়গায় ও লূত (আ.)-এর কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া মূল উদ্দেশ্য নয়, শুধু নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার পরিণতি কত ভয়াবহ হবে তা বুঝানোর জন্যে ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হয়েছে। সে হতভাগ্য জাতির প্রতি যে কঠিন শাস্তি নাযিল হয়েছিলো তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে, আর তারপর এক এক করে নবীদের অমান্যকারীদের ওপর নেমে আসা কঠিন ও বেদনাদায়ক আযাবের বর্ণনা দান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'লূত (আ.)-এর জাতি প্রত্যাখ্যান করলো এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো ভীতি প্রদর্শনকারী নবীদেরকে'—এই ইংগিতের জের ধরে সে অবাধ্য জাতির প্রতি নেমে আসা চরম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই আমি বর্ষণ করেছি তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি, একমাত্র লূত-এর পরিবার বাদে। ভোর বেলায় আমি তাদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে নিলাম। এটা আমার এক বিশেষ অবদান। এইভাবে যারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে তাদেরকে আমি প্রতিদান দেই।'

'হাসেব' বলতে সেই বাতাসকে বুঝায় যা পাথর বহন করে। বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। 'হাসেব' শব্দের মধ্যে এমন এক সংকেত আছে যার দ্বারা পাথর বর্ষণ করা বুঝানো হয়েছে। এ শব্দটির মধ্যে রয়েছে প্রচন্ডতা, ভয়াবহতা এবং সে অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভীষণ এক অবস্থার বর্ণনা। এ কঠিন অবস্থায় লূত (আ.)-এর পরিবার ব্যতীত আর কেউ বাঁচতে পারেনি এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ছিলো একজন ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীও বাঁচেনি। অন্যান্য সবার বেঁচে যাওয়া এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত হিসেবে ছিলো। এই পরিবারের সদস্যরা ও সংগী-সাথীদের ঈমান ও শোকরগোযারীর কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে এই নাজাত দান করেছিলেন। 'এমনি করে শোকরগোযার যে করে তাকে আমি মহান আল্লাহ নাজাত দান করি।' অর্থাৎ এই সব ধ্বংসলীলা ও ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও আমি তাদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

এখানে এ কাহিনীটির দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে: মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও কঠিনভাবে পাকড়াও করা। বিস্তারিত আলোচনা এই দুই অবস্থাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হবে। কোরআনের মধ্যে কাহিনী বর্ণনার জন্যে অবলম্বিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এ হচ্ছে একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে কোনো কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার প্রেক্ষাপট বা কার্যকারণ বর্ণনা করা হয়েছে প্রথম।[১] নীচে এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো,

'আর অবশ্যই সে (নবী) তাদেরকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে যথাযথভাবে সতর্ক করেছে, কিন্তু তারা সেসব সাবধান বাণীর ওপর সন্দেহ আরোপ করেছে এবং ওরা সেই নবীকে চাপ দিয়েছে যেন সে তার মেহমানদের সাথে লজ্জাকর ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেয়। যার ফলে আমি তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিয়ে বলেছিলাম, চোখে দেখ আমার শাস্তি, যা আমি সতর্ক করার পর পাঠালাম। আর তারপর পরবর্তী প্রভাতে তাদের ওপর নেমে এলো স্থায়ী আযাব।'

---

(১) দেখুন 'আততাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন' পুস্তকের মধ্যে 'আল ক্বেসসাতু ফিল কোরআন' অধ্যায়।

অথচ লূত (আ.) তার জাতিকে এ অন্যায় কাজের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে অবিরত সতর্ক করে চলেছিলেন যা কদাচিত কোনো মানুষ করে থাকে। কিন্তু হতভাগ্য সে জাতি ওই সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করে হাসি ঠাট্টা করে সে কথাগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের নবীর সাথে তারা উপদেশ সম্পর্কে যুক্তিহীনভাবে ঝগড়া করেছে সে কথাগুলো আল্লাহর বাণী, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছে এবং আদৌ এ অন্যায় আচরণের জন্যে শাস্তি আসতে পারে বলে তারা সন্দেহ করেছে। এইভাবে এই সন্দেহপূর্ণ মনোভাব তারা পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং নবীর সাথে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এতটুকুতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা নবীকে বাধ্য করতে চেয়েছে যেন তিনি তাঁর সেই ফেরেশতা মেহমানদের সাথে সেই দুর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেন। তারা ভেবেছিলো, এই মেহমানরা প্রভাত বেলায় আগত কিছু সংখ্যক বণিক, যার কারণে তারা অস্বাভাবিক ও ঘৃণ্য দুরভিসন্ধিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলো। চেয়েছিলো তারা লজ্জা-শরমের সকল সীমা অতিক্রম করে লূত (আ.)-কে প্রলুব্ধ করতে যেন তারা আগত মেহমানদের সাথে তাদের মন্দ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারে। তাদের এই চরম অসুস্থ মানসিকতার কারণে নবীর সতর্কবাণীতে তারা এতটুকু কর্ণপাত করলো না এবং এর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সামান্য একটু চিন্তাও করলো না।

এই পর্যায়ে এসে আল্লাহর ক্ষমতার হাত এগিয়ে এল এবং ফেরেশতারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন, যার ফলে 'আমি মহান আল্লাহ তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিলাম।' এরপর তারা আর কোনো জিনিস বা কাউকে দেখতে পারলোনা। লূত (আ.)-কে বাধ্য করতে বা মেহমানদের শরীর স্পর্শ করতেও তারা আর সমর্থ হলো না। চোখ অন্ধ করে দেয়া দ্বারা এখানে যে ইংগিতটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আলোচ্য এই যে বিশেষ ক্ষেত্র, এখানেই তাদের দৃষ্টিশক্তি কাজ করেনি। অন্যান্য জায়গার জন্যে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেমন ছিলো সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তারা বললো, হে লূত, আমরা তোমার রব-এর পক্ষ থেকে আগত দূত, ওরা কিছুতেই আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।' এখানে বিশেষভাবে অবস্থাটির উল্লেখ করা হয়েছে যার কারণে সে হতভাগারা লূত (আ.)-এর কাছে পৌঁছুতে পারেনি। আর সেটা হচ্ছে চোখের ওপর পর্দা পড়ে যাওয়া।

এ কাহিনীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে এমনভাবে বলা হচ্ছে, যেন দৃশ্যটি আমাদের সামনে ভাসছে এবং শাস্তিতে ঘেরাও হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে বলা হচ্ছে 'নাও, এবারে স্বাদ গ্রহণ করো আমার আযাবের এবং ভোগ করো আমার সতর্কবাণীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের পরিণতি।' অর্থাৎ, এই হচ্ছে সেই শাস্তি যার সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিলো এবং যে সতর্কবাণী সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করেছিলে।

এ হতভাগা জাতির চোখের জ্যোতি তুলে নেয়ার ঘটনাটি ঘটেছিলো বিকাল বেলায়, যাতে করে তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে সকাল বেলা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর অবশ্যই তাদেরকে পরদিন সকাল বেলায় স্থায়ী আযাব ঘিরে ফেললো।' এই ছিলো সেই আযাব যার বিবরণ সংগে সংগেই দান করা হল–আর এটাই ছিলো সেই পাথরবৃষ্টি যা সেই ঘৃণ্য কলুষতা ও অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেছিলো।

আযাবের ঘটনাটিকে আবার ভিন্নভাবে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এই দৃশ্যকে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যেন শাস্তির পুরো অবস্থাটি একই সময়ে সংঘটিত হয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্তদেরকে এমন সময়ে ডাক দিয়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে যখন তারা নিজেদের চোখেই আযাব দেখতে পাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অতএব, স্বাদ গ্রহণ করো আমার আযাবের এবং ভোগ করো আমার সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করার পরিণাম।'

এরপর এই কঠিন দৃশ্যের অবতারণার পর পরই আসছে স্নেহপূর্ণ এক সম্বোধন,

'আর অবশ্যই আমি কোরআনকে উপদেশ হাসিল করার উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং এর থেকে শিক্ষা নেয়ার মতো কেউ আছে কি?'

ফেরাউন ও তার জাতির অবস্থা

সে জাতির এই করুণ ইতিহাস তুলে ধরার পর এবার আরবের বাইরের এক বিখ্যাত জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে। সে জাতির ঔদ্ধত্য এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাদের ড়যন্ত্র পৃথিবীর মানুষের কাছে সুপরিচিত। এদের সত্যের বিরুদ্ধে তৎপরতার পরিণাম তুলে ধরে ইংগিতে একথা জানানো হচ্ছে যে, সত্যকে উৎখাত করার জন্যে যারা অপচেষ্টা চালাবে, তাদেরকে এই একই পরিণাম ভোগ করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

ফেরআউনের জাতির কাছে সতর্কবাণী এলো, কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনকে অস্বীকার করলো, যার ফলে আমি আমার সার্বভৌম ক্ষমতা বলে তাদের পাকড়াও করলাম।' এইভাবে ফেরআউন ও তার সভাসদদের আচরণের দুটি দিক তুলে ধরা হয়েছে: সতর্কবাণী নিয়ে তাদের কাছে নবী মূসা (আ.)-এর আগমন এবং তাঁর আনীত মোজেযাগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা। তারপর এর শাস্তি স্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর নেমে আসা আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার দিকে ইংগিত করে তাদের ওপর নেমে আসা আযাবের কঠোরতা ও ভীষণতা জানানো হয়েছে। এ কাহিনীর মধ্যে একথাও জানানো হয়েছে যে, ফেরআউন শক্তি-ক্ষমতার দাপটে কত বড় যুলুম ও বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু দুনিয়া দেখে নিয়েছে কি ভাবে তার মিথ্যা-গর্ব চূর্ণ হয়ে গেছে এবং কিভাবে তার শক্তি-ক্ষমতার অলীক দাপট খর্ব হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ও তার বংশাবলীকে যখন পাকড়াও করলেন, তখন প্রকৃত শক্তি-ক্ষমতার মালিক কে তা প্রমাণিত হয়ে গেলো। তার দাপট, তার গর্ব ও যুলুম-নির্যাতনের সমুচিত শাস্তি আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে দিলেন যা আজও পৃথিবীর মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

জবরদস্ত শক্তিমান ও যালেম ফেরআউনের জাতির ওপর নেমে আসা এই কঠিন শাস্তি ছিলো আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ সরাসরি কঠিন আযাব। এরপর এ ধরনের কঠিন আযাব সরাসরিভাবে আর নাযিল হয়নি।

বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা পর্দা নিক্ষেপ করে রেখেছেন এই শেষ আযাবের ওপর যা ফেরআউন ও তার জাতির ওপর নাযিল হয়েছিলো। তবে সত্যকে যারা প্রত্যাখ্যান করে, তারা আজও যখন এ আযাব দেখে এবং অন্তরের গভীরে তারা অনুভব করে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করলে বা কারও প্রতি জেনে বুঝে যুলুম করলে যে-কোনো মুহূর্তে এ কঠিন আযাব এসে যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে যালেম জাতিসমূহের প্রতি বারবার নেমে আসা শাস্তির ছবি আজকের যালেমদের অবচেতন মনে বিরাজমান রয়েছে এবং এজন্যে তারা শংকিত যে, কখন আবার তাদের ওপর সে

দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা নেমে আসে। এ জন্যে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রব্বুল আলামীন ইংগিতে বলছেন যে, অতীতের সে ভীষণ আযাবের কথা জানা সত্তেও যদি তারা এখনও সংশোধিত না হয়, তাহলে পূর্ব থেকে আরও কঠিন আযাব এবং আরও অনেক বড় দুর্ভোগ তাদের ওপর নেমে আসবে। আল্লাহর ভাষ্য লক্ষ্যণীয়,

'তোমাদের মধ্যে যেসব কাফের বা অস্বীকারকারীরা রয়েছে, তারা পূর্ববর্তী যালেমদের থেকে কোন্ দিক দিয়ে ভাল? অথবা আসমানী কেতাবসমূহে কি তোমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা এসেছে? অথবা একথাও তারা বলে নাকি' যে, আমরাই সবদিক দিয়ে বিজয়ী হবো? (তাদের জানা থাকা দরকার যে) শীঘ্রই তাদের শক্তিজোটকে পরাভূত করা হবে এবং সেদিন তারা পেছন ফিরে পালাতে থাকবে, বরং তাদের জন্যে ওয়াদা করা কেয়ামত আগতপ্রায় যা হবে আরও বেশী দুর্ভাগ্যজনক এবং আরও বেশী কঠিন। কিন্তু অপরাধী চক্রের ভুল কিছুতেই ভাংবে না। তারা বরাবর গোমরাহীর মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং অবশেষে দগ্ধীভূত প্রজ্বলিত আগুনে। তাদের একটু চিন্তা দরকার সেই দিন সম্পর্কে, যে দিন তাদেরকে মুখের ওপরে টেনে-হেঁচড়ে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। বলা হবে, স্বাদ গ্রহণ করো এই দোযখের। অবশ্যই আমি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছি এক নির্দিষ্ট পরিমাপে আর, আমার ফয়সালা এসে যাওয়া সে তো একটিমাত্র মুহূর্তের ব্যাপার। আমি তোমাদের বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, সুতরাং এখনও বলো শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?

দেখো, ওরা যা কিছু অতীতে করেছে তা সবই (আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত) বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ছোট-বড় সকল বিষয়ই যথাযথভাবে লিখিত রয়েছে।'

এসব সতর্কবাণী দুনিয়ার জীবন ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্যে। এসব বর্ণনার মাধ্যমে এই সতর্কীকরণের প্রতিটি কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে, পালানোর বা আযাব থেকে বাঁচার সকল পথ ওদের জন্যে খতম হয়ে গেছে, এমনকি তাদেরকে যে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিরও কোনো অবকাশ নেই। এত ছিলো অতীতে সত্যবিরোধীদের তৎপরতা। কিন্তু এ কঠিন পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে সত্য সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করার পথে তোমাদের জন্যে কোন্ জিনিস অন্তরায় হয়ে রয়েছে? তাই এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের মধ্যে অস্বীকারকারী (কাফের যারা রয়েছে), তারা কি ওদের থেকে কোনো অংশে উত্তম?' কোন্ কারণে (বর্ণিত) সেসব ব্যক্তি থেকে তোমাদের মধ্যকার কাফেররা ভাল? 'তোমাদের মুক্তির বার্তা বহন করে আসমানী কেতাবগুলোতে কোনো কথা নাযিল হয়েছে কি?' অর্থাৎ ওদের মুক্তির পক্ষে আসমানী কেতাবগুলো কোনো সাক্ষ্য বহন করে কি? যার কারণে কুফরী ও নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অপরাধ মাফ হয়ে যেতে পারে? এর কোনোটাই সত্য নয়। কোনোক্রমেই তোমরা পূর্ববর্তী এসব আযাবপ্রাপ্ত লোক থেকে উত্তম নও এবং আসমানী কেতাবসমূহে তোমাদের মুক্তির ঘোষণা নিয়ে কোনো সংবাদও আসেনি। বরং তোমাদের পূর্বেকার ব্যক্তিরা যে সব পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সেই একই পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এরপর সম্বোধনের গতি ফিরে যাচ্ছে সাধারণ লোকদের দিকে এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে, 'ওরা কি বলছে আমরাই সাহায্যপ্রাপ্ত এক জনগোষ্ঠী?'

আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তদের কেউ পরাজিত করতে পারে না

তখনই তারা এইভাবে কথা বলে যখন তারা নিজেদের সমন্বিত জোটকে দেখে এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কথা চিন্তা করে। এভাবে, প্রকৃতপক্ষে তারা জোটবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ধোকা খায় ও বলে– আমরাই সাহায্যপ্রাপ্ত, আমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না বা আমাদের ওপর কেউ বিজয়ীও হতে পারবে না। এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা আসছে–

'অতি শীঘ্র সকল জোটকে ভেংগে দেয়া হবে এবং এ দুশমনের দল পেছন ফিরে পালাতে থাকবে।'

তখন বাতিল শক্তির এ জোট তাদেরকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না এবং ওদের শক্তি-ক্ষমতাও তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। এ ঘোষণা যিনি দিচ্ছেন তিনি মহাশক্তিমান এবং জবরদস্ত ক্ষমতার মালিক। তাঁর শক্তি-ক্ষমতা বরাবর ছিলো এবং চিরদিন একই ভাবে তা অটুট থাকবে।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বোখারী (র.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রসূল (স.)-এর জন্যে নির্মিত একটি সুরক্ষিত গোলচক্রে অবস্থানকালে তিনি বলছিলেন, 'হে আমার পরওয়ারদেগার, আপনার চুক্তি ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, হে আমার মালিক! তুমি কি চাও, পৃথিবীতে তোমার এবাদাত-বন্দেগী এবং তোমার হুকুম পালন আর কোনো দিন না করা হোক।' এতটুকু বলার সাথে সাথে আবূ বকর (রা.) তাঁর হাত ধরে কাতরস্বরে বললেন, ব্যস করুন ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার জন্যে যথেষ্ট বলা হয়ে গেছে ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার রবকে অনেক শক্ত কথা আপনি বলে ফেলেছেন, আর না। তারপর তিনি তাঁর এ অবস্থান ক্ষেত্র থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন এবং বর্মপরিহিত অবস্থায় লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেলেন। তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো, 'শীঘ্রই তাদের জোট ভেংগে যাবে এবং তারা পেছন ফিরে পালাতে থাকবে।'

ইবনে হাতেম ইকরামার বরাত দিয়ে আর একটি হাদীস এনেছেন: উপরোক্ত আয়াত যখন নাযিল হলো তখনও ওমর (রা.) বললেন, কোন্ দল পরাভূত হবে, কোন্ জোট পরাজয় বরণ করবে? ওমর (রা.) আরও বলেন, বদর যুদ্ধের দিন দেখলাম রসূলুল্লাহ (স.) বর্মাবৃতাবস্থায় লাফ দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং বলছেন, 'শীঘ্রই তাদের জোট ভেংগে যাবে এবং তারা পেছন ফিরে পালাতে থাকবে।' তারপর সেই দিনই আমি এ কথার ব্যাখ্যা বুঝেছিলোম!

অথচ এত ছিলো দুনিয়ার পরাজয় এবং এ পরাজয়ই শেষ পরাজয় নয়, এর পরে রয়েছে আখেরাত। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার এ পরাজয় এতো শক্ত নয়, এতো যন্ত্রণাদায়কও নয়, তবু দুনিয়ার একটি ক্ষতির উল্লেখ করে আর একটিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে,

'বরং কেয়ামতের সে ভয়ানক আযাবের ওয়াদাই তাদের সাথে করা হয়েছে এবং কেয়ামত আরও বেশী কষ্টকর, আরও বেশী যন্ত্রণাদায়ক।' অর্থাৎ পৃথিবীতে যত আযাব তারা দেখেছে অথবা দেখবে সে সব কিছু থেকে আখেরাতের আযাব আরও বেশী কঠিন এবং আরও বেশী যন্ত্রণাদায়ক হবে। যে সব দৃশ্য তাদের সামনে এ পর্যন্ত এসেছে সে সব থেকে আরও বেশী যন্ত্রণাদায়ক হবে আখেরাতের আযাব। অর্থাৎ, ঝড়, তুফান ঘুর্ণিঝড়, গগনবিদারী চীৎকারধ্বনি এবং প্রচন্ড পাথরবৃষ্টি যা মহাশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে ফেরআউন ও তার বংশাবলীকেও পাকড়াও করেছিলো, সে সব থেকে আখেরাতের আযাব অনেক অনেক বেশী কঠিন।

পাপিষ্ঠদের ভয়াবহ শাস্তি

তারপর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে ওই আযাব কতটা কষ্টদায়ক ও কতটা যন্ত্রণাদায়ক হবে এবং এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেয়ামতের ভীষণ দৃশ্যাবলী তুলে ধরা হচ্ছে,

'অবশ্যই অপরাধীরা ভ্রান্তির মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। যার ফলে প্রবিষ্ট হবে তারা দোযখের আগুনে। স্মরণ করে দেখো সেদিনের কথা যেদিন তাদেরকে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। বলা হবে 'সাকার' নামক দোযখের স্বাদ গ্রহণ করো।' অর্থাৎ, এমন গোমরাহীর মধ্যে তারা আজ রয়েছে যার ফলে তাদের সকল জ্ঞানপাপীকে ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দোযখের মধ্যে তাদের শরীরের চামড়া ও চামড়ার নীচের গোশ্তগুলো পুড়তে থাকবে। কেননা, ইতিপূর্বে তারা ও তাদের মতোই আরও অনেকে বলতে থেকেছে, 'আমাদের মতোই একজন মানুষ না এ মোহাম্মদ, যার আনুগত্য করা লাগবে? তাহলে তো আমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে যাবো এবং দোযখবাসী হব।' তাই আজকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে আসল গোমরাহী কোন্‌টি এবং কিসের ফলে তাদেরকে দোযখবাসী হতে হবে!

তাদেরকে মুখের ওপর টানতে টানতে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। এ আযাব যেমন হবে কঠিন তেমনি, হবে অপমানজনক, আর এ আযাব দান করা হবে তাদের শক্তির দাপট দেখানো ও অহংকার প্রদর্শনের প্রতিদানস্বরূপ। এসকল আযাবের সাথে যে মানসিক যন্ত্রণাও তাদেরকে দেয়া হবে তা হচ্ছে অন্যান্য আযাবের সাথে বাড়তি আযাব। অর্থাৎ তাদের অন্যায় আচরণের কারণে যে শাস্তি পেতে হবে তা তাদের অন্তর বলতে থাকে, সে কথাগুলো যেন শুনতে থাকে এবং চোখেও যেন দেখতে থাকে। তাই এরশাদ হয়েছে–

'তোমরা 'সাকার' দোযখের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

এহেন ভয়ংকর আযাবের দৃশ্যের আলোকে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তার লক্ষ্য হলো সমগ্র মানব জাতি, বিশেষ করে মক্কার কোরায়শরা। একথাগুলো উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তাদের অন্তরে আল্লাহর মর্যাদা, তাঁর অতলস্পর্শী জ্ঞান এবং বিশ্ব পরিচালনার সীমাহীন ক্ষমতার কথা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই আযাব দেয়া হবে দুনিয়াতে, তারপর রয়েছে আখেরাতের আযাব। মুসলমান ও কাফের–এ উভয় জাতির পূর্বে বহু রসূল ও বহু সতর্কবাণী এসেছে, এসেছে কোরআন ও আরও বহু আসমানী কেতাব। এ সকল কেতাবের মধ্যে যত কথা এসেছে তা সব কিছু মানব-দানব, পশুপাখী এবং সৃষ্টির অন্যান্য সব কিছুকে কেন্দ্র করেই এসেছে।

কোনো সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়

সৃষ্টির মধ্যে ছোট-বড় যা কিছু আছে, সব কিছুকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বোধগম্য প্রচুর যুক্তি। যুক্তিহীনভাবে বা এলোমেলোভাবে কোনো কিছুকে পয়দা করা হয়নি। কোনো জিনিসই বেফায়দা নয়, বা একটি আর একটির সাথে সংঘর্ষশীলও নয় বা বিনা পরিকল্পনায় হঠাৎ করে সৃষ্টি করা হয়েছে তাও নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি সৃষ্টি করেছি প্রতিটি জিনিসকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো।' অর্থাৎ ছোট-বড়, বাকশক্তিসম্পন্ন ও বাকশক্তিহীন, প্রত্যেক গতিশীল ও গতিহীন, অতীত ও বর্তমানের প্রতিটি জিনিস, জানা-অজানা প্রতিটি জিনিসকেই আমি একটি বিশেষ পরিমাপ অনুযায়ী পয়দা করেছি। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের পারস্পরিক প্রয়োজনে সুসামঞ্জস্যভাবে পয়দা করেছি এবং এই কারণেই একটির সাথে আর একটির অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।

এমন এক পরিমাপ যেন বাস্তবে এদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে, এই লক্ষ্যেই এদের গুণাবলী ও বৈশিষ্টসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, নির্ধারণ করা হয়েছে এদের পরিমাণকে, প্রত্যেকের অস্তিত্বকালকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে, এদের অবস্থান ক্ষেত্রকেও নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে পারস্পরিক যোগ্যসূত্রকে যাতে করে সৃষ্টির বুকে প্রত্যেকটি বস্তু নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারে। কোরআনের সহজ ও ছোট্ট এই ক্ষুদ্র দলীলে বর্ণিত কথাগুলো বিরাট এক সত্যকে উদঘাটন করা হয়েছে যা অত্যন্ত ভীতিপ্রদও বটে এবং যে কথাগুলো গোটা সৃষ্টিজগতের ওপর প্রযোজ্য। এ এমন এক বাস্তব সত্য, যা আচমকা হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং যার লক্ষ্য সৃষ্টিজগতের সব কিছু, সব কিছুতেই যার সাড়া মেলে এবং সব কিছুর সাথে তা অংগাংগিভাবে জড়িত। আর যে কোনো হৃদয় অনুভব করে যে সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বন্ধন বিরাজমান এবং একটি আর একটির অস্তিত্বের জন্যে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। মানব হৃদয় যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে এসব জিনিস প্রত্যক্ষ করে, তখন যেন হঠাৎ করে তার সামনে সৃষ্টি-রহস্যের জট খুলে যায়। প্রতিটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো আপনা থেকেই এই সংযোগ বিধানের মাধ্যমে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে–এসব জিনিসের দিকে যখন মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তখন হৃদয় ভক্তি-বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে যায়।

বিশ্বের সকল উপায়-উপকরণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাপের এই যে ব্যবস্থা পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা এগিয়ে চলেছে, মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী এগুলো সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান লাভ করার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে এবং এইভাবে কিছু নিত্য নতুন তথ্যও আবিষ্কার করে চলেছে। কিন্তু তাদের এসব জ্ঞান-গবেষণার ওপর আরও একটি অতি সূক্ষ্ম জিনিস রয়েছে যা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সব কিছুর ওপরে যার স্থান, যা যে কোনো বিদগ্ধ মানব-প্রকৃতি অনুধাবন করতে সক্ষম, যার উপর সৃষ্টিজগতের সব কিছু আপনা থেকে কাজ করে চলেছে, আর তা হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে একটি সুষ্ঠু অনুপাত বিরাজমান। এই অনুপাতের সামান্যতম হেরফের হলে সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে লন্ডভন্ড হয়ে যাবে।

আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা এই বাস্তবতাকে অনেকাংশে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এ সত্য-সন্ধানে অধুনা ব্যবহৃত উপায়-উপকরণ গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজির একটি থেকে অপরটির দূরত্ব কত তা অনেকাংশে অনুমান করতে সক্ষম হয়েছে। মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত রাশি রাশি তারকা পারস্পরিক আকর্ষণের কারণে অহরহ কাজ করে চলেছে।

কিন্তু এসব তারকামন্ডলীর গতিবিধি সম্পর্কে জ্যোতির্বিদরা যত গবেষণাই করুক না কেন, কোনো পর্যায়ে গিয়েই তারা দাবী করতে পারে না যে, তাদের প্রাপ্ত তথ্যই চূড়ান্ত। কেননা, আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রায়ই ভুল হয়ে থাকে এবং বাস্তবে প্রতিনিয়তই এসব ভুল ধরা পড়ছে। এর ফলে আজকে যা সত্য, আগামীতে দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য পাওয়ার পর পেছনের অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তারকারাজির ব্যাপারে একথাগুলো বিশেষভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মহাশূন্যে অবস্থিত রহস্যরাজি উদ্ঘাটনের ব্যাপারেও এ সত্য প্রমাণিত হয়।

যে পৃথিবীর বুকে আমরা বসবাস করছি তা সংস্থাপনে মহাশূন্যের সবকিছুকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, তা নিরূপণ করতে গিয়ে মানুষ হয়রান হয়ে যায়। পৃথিবীর সকল বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা এমন পরিমাপ মতো তৈরী করেছেন যেন তা মানুষের জন্যে কল্যাণকর হয়। এসব বস্তুর অনুপাতে সামান্যতম হেরফের হলে উপকার তো দূরের কথা মানব জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। বরং এ পৃথিবী পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। অতীতে সূর্যের তাপের তারতম্যের কারণে কখনো কখনো ভীষণ বিপর্যয় এসেছে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের চতুর্দিকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে

পৃথিবীর নিরন্তর আবর্তন হয় এবং সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এরপর আমরা দেখি চাঁদের গতি পৃথিবীর আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর পানির স্ফীত হওয়া এবং নেমে যাওয়া ও জোয়ার-ভাটা হওয়ার কাজ নিরন্তরভাবে একই গতিতে চলছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই একই নিয়মে এসব কাজ চলছে। এ সবের মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন হলে গোটা বিশ্বে মহা বিপর্যয় সংঘটিত হবে।

জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যে সব বড় বড় উপকরণ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যেও পারস্পরিক এক চমৎকার মিল রয়েছে। জীবন এবং যে বিশ্বলোকে জীবনের স্পন্দন বর্তমান রয়েছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। জীবজগতের অস্তিত্বের জন্যেও একে অপরের সহায়ক শক্তি হিসাবে তারা কাজ করে চলেছে এই গভীর সত্য যে কোনো বিদগ্ধজনের চেতনায় সাড়া জাগায় আর কোরআনে করীমের এই আয়াতে এ সব বিষয়ে চিন্তা করার জন্যে উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকটি জীবন ও তার অস্তিত্বের জন্যে ক্রিয়াশীল কার্যকরণসমূহ একথা স্পষ্ট ভাবে জানায় যে, অবশ্যই একদিন সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর বেঁচে থাকার জন্যে এবং জীবনে আরাম-আয়েশ লাভ করার প্রয়োজনে অবশ্যই তাকে পারিবারিক জীবন যাপন করতে হবে।

সৃষ্টির জীবকুলের মধ্যে পারস্পারিক এই যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান এ বিষয়ে এখানে কিছু ইংগিত দান করা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না। অবশ্য পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আরও অনেকগুলো সূরাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

একবার ছোট ছোট পাখীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, এদের অংগ-প্রত্যংগ খুবই কম। কারণ তারা কয়েকটি মাত্র ডিম দেয় এবং তাদের দু একটি মাত্র বাচ্চা হয়, যদিও তারা একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ স্থানে বাস করে। কিন্তু বহু দীর্ঘজীবী এই বিশাল সৃষ্টির মোকাবেলায় তারা টিকে আছে। অনেক বাচ্চাদানকারী জীবজন্তু যারা বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশে বাস করতে পারে, তারা বহু বাচ্চাদানকারী আরও অনেক পাখীকে হত্যা করে এবং সংখ্যায় সেগুলো অনেক বেশী ও অধিক থাকা ও জন্মানো সত্ত্বেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। লক্ষ্যণীয় যে, বৃহৎ আরও অনেক জীব-জানোয়ার আছে যাদের মানুষ খাদ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং পৃথিবীর আরও বহু কাজ সম্পাদন করার জন্যে তাদেরকে কাজে লাগায়। এ বিষয়ে নীচের কবিতাংশটি লক্ষ্যযোগ্য,

'নিশিদিন দেখেছি আমি অসংখ্য নিরীহ পক্ষীকুল
যারা কখনও কারও ক্ষতি করিতে নারে–
আবার হেরেছি সেইসব ক্ষুরধার চঞ্চুওয়ালা চিলশকুন
যারা হারায়ে আপন বাচ্চাদের বিলাপ করিয়া মরে।

এটিই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির সেই নিগূঢ় রহস্য, যার নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে তিনিই করে চলেছেন এবং আমাদের সামনে যার হাজারো নযীর বর্তমান রয়েছে। এ সকল ব্যবস্থাপনা সেই মহামহিম পরওয়ারদেগারের ইশারায় চলছে, যিনি হিংস্র ও নিরীহ সকল প্রাণীর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে অদৃশ্য হাতে সকল কিছুর আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন।

মাছিকুল কোটি কোটি ডিম দেয় বটে, কিন্তু দুসপ্তাহের বেশী তা বাঁচে না। কয়েক বছর এরা বেঁচে থাকলে এবং এ হারে ডিম দিতে থাকলে গোটা পৃথিবী মাছিতে ছেয়ে যেত এবং তাদের জীবন এর বিষাক্ততায় ধ্বংস হয়ে যেত তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে মানুষ, কোনো প্রকারেই এ বিশ্বে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা তখন সম্ভব হতো না। কিন্তু যিনি এই মহাবিশ্বকে পরিচালনা করছেন তিনি সব কিছুর মধ্যে এমনই ভারসাম্য বজায় রেখেছেন যেন এর মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে। কেননা, মানুষের জন্যেই তো সমগ্র সৃষ্টি এবং তাদেরই প্রয়োজনেই যার যতক্ষণ বাঁচা

দরকার ততক্ষণ সে বাঁচতে পারে। তাই কারও আয়ুষ্কাল আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন অত্যন্ত কম এবং কারও আয়ুষ্কাল করেছেন দীর্ঘ। অবশ্যই এসব ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা সহজেই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক হচ্ছে রোগজীবাণু, এর বৃদ্ধিও হয় সকল প্রাণী থেকে বেশী এবং এর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াও সবচেয়ে অধিক। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এগুলো যেমন সর্বাধিক দুর্বল, তেমনি এগুলোর বয়োসীমাও সব থেকে কম। এগুলো মাত্রার বেশী শীতল স্পর্শে ও একটু অধিক তাপে কোটি কোটি সংখ্যায় মারা যায়। সূর্যের কিরণে এবং পাকস্থলীস্থ পাচকরসে এবং রক্তের মধ্যে অবস্থিত জলীয় আর্দ্রতায় এবং আরও বহু প্রক্রিয়ায় এগুলো প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ জীব-জানোয়ার ও খুব অল্প সংখ্যক মানুষের ওপর এগুলো বিজয়ী হয়। এগুলো তেমন শক্তিশালী এবং দীর্ঘজীবী হলে মানুষের জীবন সকল জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যেতো। দুনিয়ার সকল প্রাণীর অস্তিত্বকে শত্রুর মোকাবেলায় টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা দান করা হয়েছে। প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহারোপযোগী এসব অস্ত্র বিভিন্ন ধরনের এবং শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য হওয়াটা এক প্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অপরকে পাকড়াও করার মতো শক্তির অধিকারী হওয়াও আর এক ধরনের অস্ত্র হিসাবে কাজ দেয়। এই উভয় প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে আবার বিভিন্ন রং ও প্রকৃতি রয়েছে।

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ছোট প্রাণী, সাপকে দেয়া হয়েছে তীব্র বিষ এবং দুশমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা। বিশালকায় সাপকে দেয়া হয়েছে শারীরিক প্রচণ্ড পেশীশক্তি, আর এ কারণেই তাদের ওপর অন্যদের বিষক্রিয়া তেমন কার্যকর হয় না। অপরদিকে গান্ধি পোকার শক্তি খুবই কম, কিন্তু এ পোকার মধ্যে পুড়িয়ে দেয়ার শক্তি রয়েছে এবং এটি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। যে একে স্পর্শ করবে তার ওপরেই এর দাহিকাশক্তি কার্যকর হবে; আর এই শক্তিই শত্রুর আক্রমণ থেকে তাকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

আবার হরিণকে দেয়া হয়েছে তীব্রগতিতে দৌড়ানো ও লাফানোর শক্তি, সিংহকে দেয়া হয়েছে প্রচণ্ড পেশী শক্তি ও শিকার ধরার ক্ষমতা। এইভাবে ছোট বড় প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে কিছু না কিছু বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে যার বলে সে জীবিকা অর্জন করে এবং নিজেকে অপরের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। এই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে মানুষ, জীবজন্তু, পক্ষীকুল এবং অন্য সকল প্রকার প্রাণী সমান।

শুক্রবীজের অধিকারী সকল প্রাণী যৌন মিলনের পর জরায়ুতে যে ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয়, তা বাচ্চাদানীর গায়ে লেগে থাকে। এ ডিম্বকোষের মধ্যে প্রবলভাবে খাদ্য গ্রহণের চাহিদা এসে যায়, যার কারণে সে বাচ্চাদানীর গায়ে ছড়িয়ে থাকা ও সঞ্চরণশীল রক্ত-কণিকা থেকে নিজ প্রয়োজন মতো রক্ত চুষে চুষে খেয়ে বড় হয়। এইভাবে গঠিত ভ্রূণটি মাতৃজঠরের সাথে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং অবশেষে নতুন এক শিশুরূপে জন্মলাভ করে। আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা পূরণ করতে গিয়ে এই দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া ও কঠিন পথ-পরিক্রমায় তাকে অগ্রসর হতে হয়। এক্ষেত্রে, এজন্যে ক্ষতিকর খাদ্য অথবা বিরূপ পরিবেশ থেকে আল্লাহরই মহান ইচ্ছায় তাকে রক্ষা করা হয়।' (১)

নবজাত শিশুকে কে লালন পালন করেন?

এরপর মহান আল্লাহ কী চমৎকারভাবে এই নবজাত শিশুটির লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মায়ের বুকে তার জন্যে দুধের প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন, আর এ উদ্দেশ্যে গর্ভধারণ করার শেষভাগে মাতৃস্তন দুগ্ধভারে স্ফীত হয়ে যায় এবং বাচ্চা প্রসবের সাথে সাথে স্তনের

(১) 'আল্লাহ অল্ ই'লমু অল্ হাদীস -অধ্যাপক আব্দুর রাযযাক নওফল পৃঃ ৪৬-৪৭

কোটরগুলোতে হালকা হলুদ-মাখা সাদা দুধ প্রস্তুত হয়ে যায় যা বাচ্চা মুখ লাগানোর সাথে সাথে প্রবাহিত হতে থাকে। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রবহমান এই দুধ এমন রাসায়নিক পদার্থে তৈরী যা বাচ্চাকে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। আর জন্মগ্রহণের পরদিন থেকেই এই দুধ বাচ্চার বৃদ্ধির কাজে লেগে যায়। মহান আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও মমতাভরা ইচ্ছাতে মাতৃবক্ষ থেকে বেরিয়ে আসা স্তনযুগল বাচ্চার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে দিনে দিনে আরও বড় হয় এবং আরও অধিক দুধ সরবরাহ করতে থাকে। এমনকি বছর খানেক পরে গিয়ে এই দুধের পরিমাণ দিনে দেড় লিটার পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অথচ এর পূর্বে দুধের পরিমাণ ৮/৯ আউন্সের বেশী কখনও হয় না। বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দুধও বাড়তে থাকে। এ বিস্ময় এখানেই শেষ হয়ে যায় না, বরং দুধের প্রকৃতি ও ঘনত্বও পরিবর্তন হতে থাকে। শিশুর হজম শক্তির সাথে সংগতি রেখে প্রথম দিকে পানির মতো পাতলা হালকা মিষ্টি দুধের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে শিশুর ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য ও হজমশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে মাতৃস্তনের এই দুধকে করে দেয়া হয় আরও ঘন, অধিক মিষ্টি এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী চিকনাযুক্ত।' (১)

আর পূর্ণাংগ মানুষ গঠনের লক্ষ্যে এইভাবে বিভিন্ন প্রস্তুতি তাকে দান করা হয়, নির্ধারণ করে দেয়া হয় তার পেশা এবং কর্মপদ্ধতি। এ সময়ে ব্যবস্থা করা হয় তার জন্যে জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা। এ সকল ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের মনে দুরন্ত বিস্ময় সৃষ্টি করে তা হচ্ছে, সৃষ্টিক্রিয়ার স্থায়িত্বের জন্যে গৃহীত উপায় উপকরণের সংগতিপূর্ণ সম্মিলন এবং আল্লাহর নির্ধারিত কাজকে পূর্ণত্বদানের প্রয়োজনেই এ বিপুল সমারোহ। সৃষ্টির সকল কৌশলের মধ্যে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অদৃশ্য হাতকে সক্রিয় দেখতে পাই, দেখতে পাই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজ তিনিই আঞ্জাম দিচ্ছেন, বরং আরও কঠিন সত্য হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের সঞ্চালন প্রতিক্রিয়ায়ও তাঁরই ইচ্ছা কার্যকর রয়েছে। এর সাথে আরো উজ্জ্বল সত্য হচ্ছে শরীরের প্রত্যেকটি কোষকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহর নযর এদের সকলের ওপর সমানভাবে বিদ্যমান। তিনিই এদের প্রতিপালন ও দেখাশুনা করেন। মহাবিশ্বের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত এসব

বিস্ময়ের ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবু তার জটিলতা এবং পূর্ণত্ব সম্পর্কে আমরা একটি মাত্র সূক্ষ্ম ইংগিত দিতে চাই। একবার মানুষের মুখস্থ শক্তির কথা ভেবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মুখস্থ রাখার শক্তি দান করেছেন। যে সকল ছোট ছোট শিরা-উপশিরা কোনো জিনিসকে মুখস্থ রাখার জন্যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলছে তা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য। তবু মানুষ এসব রহস্য জানার ও বুঝার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার জ্ঞানে যেগুলো ধরা পড়েছে তার বিবরণ পেশ করা হলো।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ ফলে বলা হয়েছে, শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশীল শিরা-উপশিরার মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় ও মুখস্থ রাখার কাজ করছে একটিমাত্র শিরা, আর তা হচ্ছে শরীরের মধ্যে অবস্থিত এক হাজার বিলিয়ন শিরা-উপশিরার অন্যতম। তবে এককভাবে এ শিরা কাজ করে চলেছে তা নয়। অন্যান্য সকল শিরা-উপশিরার পারস্পরিক সহযোগিতায় এ সব শিরা কাজ করে চলেছে এবং প্রতিটি শিরা বা উপশিরার কাজগুলোও এদের সবার পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। একটি থেকে আর একটি কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলো এমনভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ যে, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে যখন এগুলো ধরা পড়ে তখন ভীষণভাবে হয়রান হয়ে যেতে হয়। এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামান্যতম ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা গোটা শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে।

(১) আল্ মাস্দারুস সাবেক্ব পৃঃ ৪৭-৪৮

প্রাণী ও পরিবেশ

জীবজন্তুর শ্রেণী, পরিবেশ ও জীবনধারণের সামগ্রীর বিভিন্নতায় তাদের প্রচেষ্টা ও বাঁচার প্রস্তুতিমূলক কার্যকলাপে বহু বিভিন্নতা থাকে। সিংহ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা এবং অন্যান্য যেসব হিংস্র জন্তু জংগলে বাস করে তাদের দন্ত নখরকে তাদের প্রয়োজন মতোই গড়ে দেয়া হয়েছে। তারা ঝাপ দিয়ে অন্যান্য জীবজন্তু শিকার করে, এছাড়া খাদ্য লাভ করার আর কোনো উপায় তাদের নেই। এরা ধারাল দাঁত ও তীক্ষ্ণ থাবা দ্বারা শিকারকে চিরে ফেড়ে তাদের রক্ত পান করে ও তাদের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। আর এজন্যে তাদের প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির প্রয়োজন যা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে ধারাল দাঁত দিয়েছেন, দুপাশের চারটি শক্তিশালী চোয়ালের দাঁত ও মাড়ি দিয়েছেন। পায়ের মাংসপেশীগুলোকে করেছেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ধারাল নখ ও পাঞ্জার অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে সজ্জিত করেছেন। শিকারের জন্তুগুলো ছোট ও বড় সব রকমের হয়। এইসব জন্তুর কঠিনপাচ্য গোশত হজম করার উপযোগী পাচকরস ও হযমশক্তি দিয়ে দিয়েছেন এই শিকারী জন্তুদের পাকস্থলীর মধ্যে।

অপরদিকে, ছোট-বড় তৃণজীবী ও গৃহপালিত অনেক পশু চারণক্ষেত্রে চরে চরে ঘাস খায়। আকার ও প্রকৃতির বিভিন্নতায় এরাও নানা প্রকারের হয় এবং এদের শক্তি-সামর্থও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

পরিবেশের বিভিন্নতায় এদের বিভিন্ন হজমশক্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এদের প্রয়োজনের উপযোগী করে এদের মুখ ও চোয়ালগুলোকে তৈরী করে দেয়া হয়েছে। এদের দাঁত ও পাশের লম্বা মাড়িগুলো তত শক্ত নয়। এগুলোকে দেখলেই বুঝা যায় যে, এগুলো হিংস্রজন্তু নয় এবং এগুলো ফেড়ে চিরে খাওয়ার জন্তুও নয়। এসব পশু ঘাস পাতা ও খড়কুটা খেয়ে বাঁচে। তারা ঘাস পাতা দ্রুতগতিতে খেয়ে একেবারে গিলে ফেলে যাতে করে মানুষের যে খেদমতের জন্যে তাদেরকে পয়দা করা হয়েছে তা সঠিকভাবে তারা আঞ্জাম দিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এই শ্রেণীর জন্তুকে আশ্চর্য রকমের হজমশক্তি দিয়েছেন। তাদের ভুক্তদ্রব্য প্রথম পৌঁছায় পাকস্থলীর উপরিভাগে যাকে রক্ষণাগার বলা যায়। এখানে খাদ্যদ্রব্য জমা করে রেখে তারা কাজ করে এবং কাজ শেষে যখন বিশ্রাম করে, তখন পুনরায় ভুক্ত ঘাস-পাতা মুখের মধ্যে তুলে এনে জাবর কাটতে থাকে এবং মিহি করে চিবানোর পর এগুলোকে পাকস্থলীতে পাঠায়, সেখান থেকে ক্ষুদ্র-অন্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। এরপর ক্ষুদ্র অন্ত্র থেকে এই খাদ্য বৃহৎ অন্ত্রে পৌঁছায়। তারপর আর একটি কোটরে এই ভুক্ত দ্রব্যের নির্যাস পৌঁছানো হয়, যাকে বলা যায় আবর্তনের চতুর্থ স্তর। পশুর খাদ্যগ্রহণ ও জীর্ণকরণের এই দীর্ঘসূত্রিতার একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের সার্বিক উপকার সাধন। অধিকাংশ সময়ে জাবর কাটা পশু, ব্যস্ততার জন্যেই এইভাবে ঘাসপাতা প্রথমে সংগোপনে গিলে ফেলতে বাধ্য হয়। পশু বিষয়ক বিজ্ঞানীরা বলেন যে, জাবর কাটা এ সব পশুর জন্যে একান্তই প্রয়োজন, বরং আরও সত্য কথা হচ্ছে, তার অস্তিত্বের জন্যেই এই জাবর কাটা অপরিহার্য। তা না হলে এসব গবাদি পশু মাঠে-ময়দানে চরে খেত। ঘাসপাতা ও তরুলতা যা এসব পশু খায়, সেগুলো হজম করা এদের জন্যে বেশ কষ্টকরই হয়ে যেত। কারণ এদের পাকস্থলীর মধ্যে 'স্যালোলোজ' নামক একটি পদার্থ আছে যা ঘাস- পাতার খাদ্য গ্রহণ করলে এগুলোর মধ্যকার ফাঁকগুলো পূর্ণ করে দেয়। ঘাসপাতা হজমের জন্যে বেশ লম্বা এক সময়ের প্রয়োজন। এইভাবে খাদ্য গলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা ও পাকস্থলীর মধ্যে সংরক্ষণাগারে সে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি নাই থাকত, তাহলে মাঠে গরু চরতে দীর্ঘ সময় লাগিয়ে দিত। হয়ত পুরোদিনটাই তার লেগে যেত খাদ্য জীর্ণ করতে এবং পুনরায় প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না এবং তার মাংসপেশীগুলো খাদ্যগ্রহণ ও চিবানোর ব্যাপারে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতো। এর পরিবর্তে, আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় গবাদি পশুর

এই যে দ্রুতগতিতে খাদ্যগ্রহণ, পাকস্থলীর উপরিভাগে এক নির্দিষ্ট ভান্ডারে তা সংরক্ষণ করে রাখা এবং আধা হজম অবস্থায় ভুক্ত দ্রব্য গেজিয়ে ওঠা যাতে করে আরও মিহি করে চিবানো ও গলধকরণ সম্ভব হয়- এসব কিছু ব্যবস্থা এই জন্যেই করা হয়েছে যাতে পশুগুলো মানুষের খেদমতে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে। খেতে পারে এবং হজমও করতে পারে। আহ! মহাব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে এ কী চমৎকার ব্যবস্থা! (১)

অপর দিকে রয়েছে হিংস্র পাখীগুলোর অবস্থা যারা বাঁকা, তীক্ষ্ণ ও ছুঁচালো চঞ্চু দ্বারা ছোঁ মেরে শিকার ধরে বা খাদ্য সংগ্রহ করে, যেমন প্যাঁচা, তাদেরকে এ অস্ত্র দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তারা তাদের খাবারগুলো ছিড়ে টুকরা টুকরা করে গলাধকরণ করতে পারে। পাশাপাশি আবার তাকান পাতিহাঁস ও রাজহাঁসগুলোর দিকে, দেখবেন তাদের চ্যাপ্টা ও চওড়া ঠোঁটগুলোকে কিভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে যেন এগুলো বড় বড় গর্তওয়ালা চামচ বিশেষ। এগুলো দ্বারা তারা মাটি ও পানির মধ্য থেকে তাদের খাদ্য খুঁজে বের করে এবং তাদের ঠোঁটের কিনারা দিয়ে দাঁতের মতো ছোট ছোট ও খরখরে কিছু অতিরিক্ত গোশত রয়েছে যার দ্বারা বিভিন্ন আগাছা কেটে খেতে পারে।

আর এক শ্রেণীর পাখী আছে যারা মোটেই হিংস্র নয়, যেমন মুরগী, কবুতর এবং এ জাতীয় আরও অন্যান্য পাখী, যারা মাটির মধ্য থেকে খাদ্য বীজ খুঁজে সংগ্রহ করে। তাদের চঞ্চুগুলো বেশ খাটো, ছোট ছোট পায়ে তারা চলে এবং হামাগুড়ি দেয়ার মতো চরে চরে খায়। আরও অনেক পাখী রয়েছে যাদের ঠোঁটগুলো বেশ বড় ও লম্বা। এসব পাখীর ঠোঁটের গোড়াগুলোতে রয়েছে ব্লাডার সদৃশ এক প্রকার থলি, দেখতে মনে হয় সেগুলো যেন কোনো শিকারীর জাল। এ সব লম্বা ঠোঁটওয়ালা প্রত্যেক পাখীর প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ।

হুদহুদ ও সারস পাখীর ঠোঁটগুলো লম্বা ও ছুচালো এবং এগুলো তৈরী করাই হয়েছে মাটির অগভীর তলায় অবস্থিত বিভিন্ন আগাছা ও পোকামাকড় তালাশ করে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়ার জন্যে। এসব পশু-পাখী সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান একথাই দাবী করে যেকোনো পাখীর খাদ্য খাবার সম্পর্কে মানুষের পক্ষে অবগত হওয়া অবশ্যই সম্ভব। এবারে পাখীর হজমশক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় যে, এ এক অদ্ভুত এবং বড়ই আশ্চর্যজনক এক ব্যবস্থা। ওদেরকে খাদ্য চিবানোর জন্যে কোনো দাঁত দেয়া হয়নি, দেয়া হয়েছে ঠোঁটের (শেষভাগে) তলদেশে এক প্রকার ব্লাডারসম রক্ষণাগার যাকে প্রথম পাকস্থলী বলা যায়। এখানে ভুক্তদ্রব্য প্রথম হজম হয়। পাখী শক্ত খাদ্যদ্রব্য টুকিয়ে টুকিয়ে খেয়ে ওই প্রথম থলিতে পাঠিয়ে দেয় যাতে হজম করার ব্যাপারে প্রথমেই এই থলি তাকে সাহায্য করে।

আমরা যদি একবার এই নিগূঢ় রহস্যময় বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং এই কেতাব, 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বিশ্লেষণ-কায়দায় নিরীক্ষণ করি এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ের দিকে তাকাই, তাহলে আমাদের সামনে আরও বহু রহস্যের দ্বার উদঘাটিত হতে থাকবে; সন্ধান পাবো আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বহু জীবাণুর যা এমিবা নামে পরিচিত যার মধ্যে একটিমাত্র কোষ আছে, সেখানে গিয়েই আমরা আল্লাহর কুদরতের হাতকে সক্রিয় দেখতে পাবো, দেখতে পাবো সেখানেও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, বুঝতে পারবো এই সূক্ষ্ম জীবাণুর যাবতীয় গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

এই এমিবা অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক প্রাণী বা জীবাণু, যা অতি সংগোপনে রক্ত শোষণ করে, যা বক্ষদেশের উপরিভাগে এবং জলাভূমিতে বাস করে অথবা বাস করে নীচু জলাভূমিতে অবস্থিত পাথরের ওপর পতিত গ্যাড়ানীর মধ্যে, যাকে খোলা চোখে দেখা সম্ভব হয় না, একমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই তা দেখা সম্ভব। এগুলো হচ্ছে জেলীর মতো কিছু বস্তু, পাত্রের কারণে

(১) 'আল মাস্‌দারুস সাবেক' আরবী সংস্করণ পৃঃ ৭২-৭৩

যার আকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে। অনেক সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে এগুলোর আকৃতি বদলে যায়, ব্যবহারের কারণেও এগুলোর আকৃতি বদলে যায়। যখন এগুলোতে নাড়া লাগে, তখন এদের শরীরের মধ্য থেকে নির্গত এক প্রকার নির্যাস এগুলোকে প্রতিরোধ করে। পায়ের মতোই এক প্রকার বস্তু এর পছন্দনীয় স্থানে এগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং এগুলোর সঞ্চালনশক্তিকে এক নকল পা বলে অভিহিত করা হয়েছে। খাবার পেলে এগুলো দ্বিগুণ, তিনগুণ বা বহুগুণে বেড়ে যায়, কিন্তু এদের ওপর পাচক-রস এসে পড়ার সাথে সাথে এগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তখন এগুলো শরীরের গঠনমূলক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এজন্যে এ বৃদ্ধিকে এক মিথ্যা পদক্ষেপ বলা যায়। এগুলো উপযুক্ত খাদ্য পেলে একগুণ বা দ্বিগুণ বা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু হজমকারী পাচক-রস এদের ওপর পতিত হওয়ার ফলে এগুলো শরীরের জন্যে উপকারী হয়ে যায়। এবং এদের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো নির্গত হয়ে যায়। এরা পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং সমস্ত শরীরের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এ এমন এক অভিনব সৃষ্টি যা খালি চোখে দেখা যায় না, জীবন্ত এসব জীবাণু অবশ্যই নড়াচড়া করে, খাদ্য গ্রহণ করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ে। এর বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয়ে যায়। তারপর বৃদ্ধি পূর্ণত্ব লাভ করলে এগুলো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, যাতে প্রত্যেক ভাগ নতুন এক প্রাণীতে পরিণত হয়।

শাকসব্জি ও তরুলতার জীবন আরও বিস্ময়কর। এর বিস্ময় মানুষ, জীবজন্তু ও পাখীর জীবন থেকে কোনো অংশেই কম নয় এবং এ সকল সৃষ্টির মধ্যে ওদের বহিপ্রকাশ হওয়ার বিষয়টিও একেবারে নগন্য নয়। 'আর (মহান সে স্রষ্টা) যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে এবং তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার ভাগ্য সুনিপুণভাবে।' (১)

আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টির বিষয়টি অবশ্যই আরও বড় এবং আলোচিত বিষয়গুলো থেকে তা আরও ব্যাপক, বিশেষ করে মানব সৃষ্টি',(২) যার মধ্যে তকদীর ও তদ্‌বীর বিষয়গুলোর উভয়টি সমভাবে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিলোকের সবকিছুর মধ্যে যে স্পন্দন রয়েছে নিত্য নতুন ঘটনাবলীর সংযোজন ও আকস্মিক ঘটনাবলী এবং একই ধারায় চলার প্রকৃতি। এসবের মধ্যে ছোট বড় সব কিছু কিছু মিলে গড়ে উঠে এক অনবদ্য ইতিহাস। এসবের দিকে তাকালে দেখা যাবে সবকিছু এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ তৈরী যেন এসব একজন মাত্র ব্যক্তির জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং একই উৎস থেকে তা উৎসারিত। এই ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থান হবে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পূর্ব থেকে নির্ধারিত স্থানে সে বাস করবে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে সে লালিত-পালিত হবে। প্রত্যেকটি জিনিসের অস্তিত্ব এবং সৃষ্টিলোকের প্রতিটি জিনিসের সাথে সে একই নিয়মে বাঁধা থাকবে—এটাও বহু আগে স্থির হয়ে আছে । বড় বড় ঘটনা-দুর্ঘটনার সাথে যেমন সে জড়িত রয়েছে, তেমনি সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে চলতে হবে—এটাও পূর্বেই নির্ধারিত ।

এ প্রসংগে শেষ ও চূড়ান্ত কথা হচ্ছে যে সব কিছুই পূর্বে স্থিরীকৃত এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিটি জিনিস পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে । আর চুপিসারে পিঁপড়ার দলের কাজ করে যাওয়া, পাখীর মুক্ত বাতাসে উড্ডয়ন করা, বড় বড় জাহাজের সমুদ্রযাত্রা, নদী পথে নৌকা বিহার ও বড় বড় নৌকার মাল-সামান আনা-নেয়ার এই যে ধারা সবই আবাহমানকাল ধরে একই ভাবে চলে আসছে।

(১) 'আল মাসদারুস সাবেক' পৃঃ ১০১-১০২
(২) মানব শরীরের ওপর আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল সম্পর্কে অধিক জানার জন্য– হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ রচিত 'প্রজন্মের প্রহসন' বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে

সময়ের আবর্তন, স্থানের পরিবর্তন কোনো কিছুর পরিমাণের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি,নানা রূপ চেহারা ও আকৃতি -প্রকৃতি এবং সময় ও পরিধেয় বস্ত্র এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে এক ভারসাম্যপূর্ণ মিল দেখা যায়–এ সবই পূর্ব-নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট এক নিয়মে চলে আসছে । তক্দীরের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত যা আমাদের সামনে রয়েছে। সে দৃষ্টান্তটি হচ্ছে, ইয়াকুব (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের জন্ম কোনো বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। এ ঘটনা ত আল্লাহর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে সংঘটিত হয়েছিলো যেন ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাকে সহ্য না করতে পেরে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং পিতার কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অন্ধ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে এবং সেখান থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে হত্যা না করে মিসরের অধিপতির পণ্যের চাহিদা মিটাতে গিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারে। এখানেই শেষ নয়, আল্লাহ তায়ালা আরও চেয়েছিলেন ইউসুফ (আ.) যেন মিসরের অধিপতির প্রাসাদে তিনি রাজার হালে লালিত-পালিত হন। চেয়েছিলেন যেন তাঁর প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এসব কেন হয়েছিলো ? এসব ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যেন কারাগারে দুই কয়েদীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় এবং তারা তাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানার জন্যে তাঁর কাছে আসতে পারে । এরই বা প্রয়োজন কি ছিলো? তাৎক্ষণিক ভাবে এর কোনো জবার পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মানুষ একে অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, কেন এসব ঘটনার অবতাণনা ? কী দোষে হে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফকে এ শাস্তি পেতে হলো ? কেনই বা হযরত ইয়াকুবকে এমনভাবে কষ্ট দেয়া হলো যে, নিদারুণ দুঃখে এ মহান নবী তাঁর দৃষ্টি শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন ? কেনই বা আল্লাহর পবিত্র ও নির্দোষ এ বান্দাকে এসব ঘটনাবলীর মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হলো। এসব জটিলতার অর্থ সাথে সাথে কেনই বা বুঝতে দেয়া হলো না ? এসমস্ত ঘটনার প্রথম জবাব দেয়া হলো ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের এক-চর্তুথাংশের ও বেশী সময়কাল কারাগারের কষ্ট সহ্য করার পর। এর কারণ একটিই, আর তা হচ্ছে তাঁর ভাগ্যে এটা লিখিত ছিলো যে, এসব ঘটনা অতিক্রম করে তিনি সাতটি বছর ধরে মিসরের দুর্ভিক্ষের দুঃসময়ে মিসর, তার অধিবাসী ও আশেপাশের গোত্রসমুহের ওপর কর্তৃত্ব করবেন এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করবেন। তারপর কি হলো ? তারপর এটাও নির্ধারিত ছিলো যে, তিনি তাঁর পিতামাতা ও ভাই-বেরাদরকে মিসরে নিয়ে আসবেন এবং তাদেরই বংশের মধ্য থেকে বনী ইসরাইল জাতির উত্থান হবে যাতে তাদের ওপর ফেরআউন নির্যাতন চালাতে পারে এবং তাদের উদ্ধারকল্পে মূসা (আ.) তাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে গড়ে উঠেন । কাজেই তাঁর [ইউসুফ (আ.)-এর] জীবনের এসব ঘটনা ছিলো পূর্বে নির্ধারিত ভাগ্য লিখন। এর মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া ছিলো তাঁর দায়িত্ব যা তিনি যথাযোগ্যভাবে পালন করেছেন । এ সমস্ত ঘটনা ও বাতাসের গতি ধরে আজকের বিশ্ব সম্মুখে এগিয়ে চলেছে এবং বিশ্বের সকল বিষয়ের ওপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

আজকে কে আছে এমন যে এ উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেবে যে ইয়াকুব (আ.)-এর দাদা বিবাহ করার পর জন্মভূমি পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্যে মিসরে চলে গেলেন তা কোনো বিচ্ছিন্ন ও একক ঘটনা ছিলো না এবং তার মধ্যে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার মতোও কোনো কিছু ছিলো না। এগুলো এবং ইতিপূর্বেকার ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলী ছিলো আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা মাফিক ঘটনাপঞ্জীর ক্রমধারা, যার কারণে আমরা দেখতে পাই ইবরাহীম (আ.) ইরাকের নিবাস পরিত্যাগ করে মিসরে বসতি স্থাপন এবং বিবি হাজেরাকে বিয়ে করার পর তার

গর্ভে ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মগ্রহণ, ইসমাঈল ও তাঁর মায়ের পবিত্র কা'বা ঘরের কাছে বসতি স্থাপন ইত্যাদি ঘটনাবলী । এরপর ইবরাহীম (আ.)-এর বংশের এই সিঁড়িতে আরব উপদ্বীপের মধ্যে পৃথিবীতে রেসালাত প্রেরণের জন্যে সব থেকে উপযোগী মক্কা নগরীতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণ ও প্রতিপালন হওয়া সবই ছিলো তকদীরের অপরিহার্য অবদান, যাতে করে বিশ্বমানবতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় ।

ঘটনার ধারাবাহিকতা যেন এক অদৃশ্য মালা, যে সূত্রে সে মালা গাঁথা তার সুদূর শেষ প্রান্তে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের নূর-এর শেষ জ্যোতি জ্বালানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । এজন্যেই ছিলো এই একটির পর আর একটি আসা ঘটনাবলী, এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দু পর্যন্ত টানা সরলরেখা এবং তার মধ্যে বিচিত্র ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশ।

এসব কিছু সংঘটিত হবে—এ ছিলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যার জন্যে গভীর, রহস্যাবৃত ও সূক্ষ্ম সেসব ঘটনা পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় একটির পর একটি তিনি সংঘটিত করেছেন।

মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যেসব সূত্র রয়েছে তার সব থেকে কাছের প্রান্তটি সে দেখে এবং দূরের অপর প্রান্তটি না দেখতে পেয়ে হয়রান হয়ে যায়। আবার কোনো সময় এমনও হয় যে, তার সংকীর্ণ বয়োসীমার মধ্যে শুরু ও শেষের ঘটনাবলী এত দীর্ঘ হয় যে, দুই প্রান্তের সমাবেশকে সে একত্রে দেখতে বা আন্দায করতে পারে না, যার জন্যে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না এবং তার কাছে আল্লাহর ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিহিত রহস্যাবলী গোপনই থেকে যায়। আর এ কারণেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনায় লিপ্ত হয়ে যায়, ক্রুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে অনেক পদক্ষেপ নিতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেন, প্রতিটি জিনিসের জন্যে নিয়তি নির্ধারিত রয়েছে, যাতে করে কর্মনির্বাহকের কাছে সকল কর্মকে সমর্পণ করা হয় এবং তাদের অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায় ও প্রশান্তি লাভ করে। তারা সবাই আল্লাহর নির্ধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে এবং সেভাবেই সবকিছুর ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা এগিয়ে চলছে। পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও স্থিরতার কারণে যে নিশ্চিন্ততা ও নির্লিপ্ততা আসে তার সাথে তকদীরের ওপর বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তকদীর ও তদ্‌বীর (ভাগ্য ও প্রচেষ্টা) এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে নিবিড় এক সম্বন্ধ। এ দুটির সমন্বয়ে গড়ে উঠে মানুষের মধ্যে এমন এক কর্মক্ষমতা যা বড় বড় কাজ এবং জটিল থেকে জটিল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ ইংগিতে সমাধা করতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে আল্লাহর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

'আমার কাজ তো মাত্র একটিই, যা এক মুহূর্তের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে যায়, অথবা এমন একটি কথা যার দ্বারা সকল কিছু পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়। এ ব্যাপারে ছোট-বড় সব কাজের নিয়ম একই। অবশ্যই তা হচ্ছে বস্তুসমূহ ব্যবহারোপযোগী মানুষের জন্যে নির্ধারিত ব্যবস্থা। ভাগ্য-লিখন যা আছে তাকে কোনো কালে কোনো মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। এক মুহূর্ত বা মানুষের চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে তার থেকেও কম সময়ের মধ্যে তা সংঘটিত হয়। মানুষকে বুঝানোর জন্যেই শুধু এ তুলনাটুকু দেয়া হলো। মহাকাল বা সময়, যা ধরা-ছোঁয়া যায় না—এ ক্ষুদ্র পৃথিবীর আবর্তনের কারণে মানুষ কল্পনার চোখেই শুধু সময়কে দেখতে পায় বা অনুভব করে। আল্লাহর কাছে সীমাবদ্ধ এ সময়ের কোনো গুরুত্ব নেই, বরং তার কাছে সময় বলতে কোনো জিনিসই নেই।

আকাশে, বাতাসে, মর্তে, অন্তরীক্ষে, সর্বত্র বিরাজমান একটি মাত্র শক্তি যা এ বিশাল সৃষ্টিজগতকে বাস্তবে এনেছে, সেই মহাশক্তিই সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংঘটিত

করেন। সেই শক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালা যা খুশী তাই করেন। এ শক্তি দ্বারা তিনি সবকিছুকে যেন্দা করেন, এই শক্তি দ্বারা বস্তুকে এখান থেকে ওখানে এবং ওখান থেকে এখানে আনা-নেয়া করেন। এই শক্তি দ্বারা তিনি মৃত্যুর পরিণাম দান করেন। এই শক্তি দ্বারা তিনি অসংখ্য আকৃতি-প্রকৃতির মধ্য থেকে বিশেষ আকৃতিতে কাউকে অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেন। এই শক্তি দ্বারা তিনি শেষ বিচারের দিনে পুনরায় সবাইকে কবর থেকে তুলবেন। একত্রিত হওয়ার সেই চরম দুর্যোগপূর্ণ দিনে এই শক্তি দ্বারাই তিনি সৃষ্টিকে কেয়ামতের দিন তুলবেন।

সেই মহাশক্তির চেষ্টার কোনো প্রয়োজন নাই, তাঁর কাছে সময়ও কোনো ব্যাপার নয়। সেই মহাশক্তি সকল শক্তির উৎস এবং সকলের ভাগ্য তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। আর সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সব কিছুই তাঁর জন্যে সহজ।

কত পাপিষ্ঠ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে

এই শক্তি দিয়েই তিনি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা সাব্যস্তকারীদেরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের পর ধ্বংস করবেন এবং এই শক্তি দ্বারাই তিনি মিথ্যা আরোপকারী সবাইকে তাদের অবশ্যম্ভাবী করুণ পরিণতি সম্পর্কে স্মরণ করাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই তোমাদের বহু গোত্রকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, সুতরাং শিক্ষা গ্রহণকারী কেউ কি আছে? আর যা কিছু ওরা করেছে তা সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ছোট-বড় সকল অপরাধের কথাই আসমানী কেতাবের ছত্রে ছত্রে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে।'

এরাই মিথ্যা আরোপকারী ও অস্বীকারকারী গোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে, 'সুতরাং শিক্ষা গ্রহণকারী কেউ আছে কি?' যে শিক্ষা নেবে ও বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করবে?

ওদের এই বেদনাদায়ক প্রচেষ্টা ইহজগতে শাস্তিপ্রাপ্তির ফলে যে শেষ হয়ে যাবে তা নয়, বরং এরপর শেষ বিচারের দিনে তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে এবং সে হিসাব নেয়ার ব্যাপারে কোনোক্রমেই কম করা হবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'আর যা তারা করেছে তার প্রত্যেকটি জিনিস আসমানী কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রেরিত ছোট ছোট পুস্তিকাতেও প্রয়োজনীয় হেদায়াত লেখা রয়েছে যাতে করে কেয়ামতের দিনে সেগুলো হাযির করা যায় 'আর প্রতিটি ছোটবড় কাজ লিখিত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কেতাবে এসব কথা সুন্দরভাবে লেখা রয়েছে। এর কোনো একটি অংশও ভুল হয়ে যাবে না যেহেতু কেতাবে লেখা রয়েছে।

দোযখবাসীদের দুরাবস্থা ও করুণ শাস্তি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দান করার পর এবার অপর অধ্যায়ের আলোচনা আসছে, অর্থাৎ মিথ্যারোপ যারা না করে এবং সত্যের বাতি যাদেরকে কল্যাণকর কাজের দিকে এগিয়ে দেয়, তাদের প্রসংগে আলোচনার সূচনা করা হচ্ছে। যিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছেন, তাঁর ছায়াতলে এসে যারা মোত্তাকী-পরহেযগার অর্থাৎ আল্লাহভীরু হওয়ার কারণে মন্দ বর্জনকারী হয়ে গেলো, তাদের প্রসংগে এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই মোত্তাকীরা বাগবাগিচায় ভরা এমন বেহেশতে থাকবে যার মধ্যে প্রবহমান থাকবে কুলকুলু নাদিনী নির্ঝরিণীসমূহ। যথাযোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন ও অবস্থানে তারা উপবিষ্ট থাকবে, থাকবে তারা সকল শক্তি-ক্ষমতার মালিক মহাসম্রাট আল্লাহ রব্বুল ইযযতের পরম সান্নিধ্যে।'

এদের পাশাপাশি কল্পনার চোখ দিয়ে একবার দেখা যাক সে হতভাগা দোযখবাসীদের দিকে। চরম ভ্রান্তির মধ্যে পতিত এসব অপরাধীর দল কেমন দিশাহারা হয়ে রয়েছে এবং তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে, দীনহীন অবস্থায় তাদেরকে টেনে-খিঁচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠা দোযখের ইন্ধন হিসাবে নিক্ষেপ করার জন্যে। অভিসম্পাত ও ধিক্কার

চতুর্দিক থেকে বর্ষিত হচ্ছে তাদের প্রতি, আর তার সাথে সাথে তাদের শরীরকে ঝলসে দেয়া হচ্ছে নিদারুণ দোযখের আযাবের কশাঘাতে। আওয়ায আসছে, 'স্বাদ নাও চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অনির্বাণ অগ্নিশিখার।'

নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের চিত্রটিও লক্ষ্যণীয় ফুলে-ফলে ভরা বাগবাগিচা, যার মধ্যে রয়েছে মৃদুমন্দ ধারায় প্রবাহিত নির্ঝরিণী। আরও রয়েছে 'পরম পুলকময় মহান মর্যাদার আসন' অর্থাৎ স্বয়ং বিশ্ব সম্রাটের সিংহাসনের পাশেই তাদের অবস্থান।

এসব নেয়ামতের স্বাদ যেমন তারা মধুময় অনুভূতি দ্বারা লাভ করবে, তেমনি তাদের সর্বাংগ দ্বারা আস্বাদন করবে, 'থাকবে তারা সকল প্রকার নেয়ামতভরা বাগ-বাগিচাসমূহে ও সদা স্নিগ্ধ প্রস্রবণের আনন্দঘন পরশে।' এমনকি নেয়ামত দানকারী মহান প্রভুর প্রিয় সম্ভাষণ হবে সকল প্রকার নেয়ামতের বড়। এ নেয়ামত ও এ সকল সম্বোধন কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হবে না, বরং আল্লাহর এসব মেহমানদের প্রতি সকল প্রকার আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা প্রদর্শিত হবে।

অন্তর ও আত্মার পরিতৃপ্তি লাভ করবে এই নেয়ামতপ্রাপ্ত। তার সাথে আরও লাভ করবে তারা সম্মান ও মর্যাদা মহাসম্রাটের সান্নিধ্যে। যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট তারা হবে মহান সম্রাটের সান্নিধ্য লাভে ধন্য।

এ মর্যাদার আসনে ক্ষণিকের জন্যে বা সাময়িকভাবে তারা সমাসীন হবে-তাই-ই নয়, বরং এটা হবে তাদের স্থায়ী অবস্থান-ক্ষেত্র, মহাসম্মানের সাথে আল্লাহর কাছেই তারা নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করবে। রব্বুল আলামীনের স্নেহ-আদরের পরশ লাভে সদাই থাকবে পুলকিত। এ সকল নেয়ামতের স্থায়িত্ব সম্পর্কে হবে তারা পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত। আর এ সকল নেয়ামত লাভের কারণ হচ্ছে এই যে, তারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর ভয়ে সদা-সর্বদা বাছবিচার করে চলেছে, ভয়ে-ভয়ে জীবন যাপন করেছে। কি হবে-না হবে- এ আশঙ্কায় থেকেছে সদা কম্পমান আর অপেক্ষমান থেকেছে আল্লাহর সন্তোষের জন্যে নিশিদিন। তাই আল্লাহ তায়ালাও দুটি ভয় এক সাথে কাউকে দেন না। দুনিয়ায় যে তাকে ভয় করে চলবে অবশ্যই আখেরাতে তার জন্যে আযাবের ভয় নেই। অতএব, নগদ পাওনা লাভের ব্যাপারে যে তাকে ভয় করবে, বিলম্বে প্রাপ্য জিনিসের ব্যাপারে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর নিরাপত্তার সাথে সাথে পাবে সে ভয়-ভাবনাহীন আবাস-স্থল, সেখানে সে বাস করবে মহব্বত ভরা পরিবেশে ও মর্যাদার মধ্যে।

পাক পবিত্র এ মহান কালামের নিরাপত্তাদানকারী ছায়াতলে বসে পথ-প্রদর্শনকারী উল্লেখিত ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে এ সূরাটির ওপর আলোচনা শেষ হচ্ছে। এর মধ্যে একাধারে অপরাধীদের জন্যে নানা প্রকার ভয় ও শাস্তির বিবরণ এবং চূড়ান্তভাবে মোশরেকদেরকে পাকড়া, ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি দানের সাথে সাথে যারা কোরআনের ছায়াতলে এসে সত্য-সঠিক পথ ও নিরাপত্তা লাভ করতে চেয়েছে তাদের আত্মাকে নানা প্রকার নেয়ামতের আশ্বাস-দানে আশ্বস্ত করা হয়েছে। এইভাবে যাবতীয় জ্ঞান ভান্ডারের উৎস এবং মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, তা প্রত্যেক সত্যসন্ধ মানুষের অন্তর-প্রাণ ও আত্মার জন্যে এক মহা প্রশান্তি কাজ করেছে। এ প্রসংগে অতি সূক্ষ্ম বিষয় তকদীর সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে সবার জন্যে নির্দিষ্ট ও অমোঘ নিয়তি যার বাইরে কেউই যেতে পারে না বা কারো পক্ষে কিছু করাও সম্ভব নয়।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহ্যাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহ্কাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ